হাঁসুলীবাঁকের উপকথা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৪
দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৫৫
তৃতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮
চতুর্থ সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৬২
পঞ্চম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬৪
ষষ্ঠ সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৬
প্রকাশক—মনোজ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
মুদ্রাকর—মন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১া১, দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা-৬
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

সাত টাকা পঞ্চাশ ন. প.

৩৯৫২
STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA
৯.2.৬0

পরম শ্রদ্ধেয়

কবি কালিদাস রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দাদা,

রাঢ়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' আপনার অজানা নয়। সেখানকার মাটি, মানুষ, তাদের অপভ্রংশ ভাষা—সবই আপনার সুপরিচিত। তাদের প্রাণের ভোমরা-ভোমরীর কালো রঙ ও গুঞ্জন আপনার পল্লীজীবনের ছবি ও গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই মানুষদের কথা শিক্ষিত সমাজের কাছে কেমন লাগবে জানি না। তুলে দিলাম আপনার হাতে। ইতি—

লাভপুর, বীরভূম
আষাঢ়, ১৩৫৫

তারাশঙ্কর

প্রকাশকের নিবেদন

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' বাংলা-সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ব'লে সর্বজনের স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এর জন্য তারাশঙ্করকে "শরৎ-চন্দ্র-পদক ও পুরস্কার" দানে সম্মানিত করেছেন। পাঠকবর্গ সমাদর করেছেন—তার প্রমাণ আমরা প্রকাশক হিসাবে দাখিল করতে পারি। প্রথম সংস্করণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েছে। সে দিক দিয়েও বইখানি একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে আজ প্রায় চার মাস। এই চার মাসের মধ্যে রসিক পাঠকবর্গের তাগিদে আমরা বিব্রত হয়েছি। কিন্তু তার চেয়েও আমাদের বিব্রত করেছেন তারাশঙ্কর। তাঁর মতো অতৃপ্ত লেখক বাংলা দেশে বিরল। প্রতি সংস্করণেই তিনি বইয়ের সংস্কার ক'রে থাকেন। হাঁসুলীবাঁকের দ্বিতীয় সংস্করণের সময়—সংস্কার করতে বসে বইখানিকে তিনি প্রায় নূতন করে লিখেছেন। তাতে বইখানির কলেবর পূর্বের চেয়ে আরও প্রায় দশ ফর্মা বেড়ে গিয়েছে। কাহার-জীবনের যে সব কথা পূর্বে ছুট পড়েছিল, লেখক সে সব বলেছেন এবং চরিত্রগুলিকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলবার জন্য নূতন ঘটনা-সংস্থান ক'রে বইখানিকে প্রায় নূতন গ্রন্থে পরিণত করেছেন। বইখানি এইভাবে বড় হয়ে যাওয়ার জন্যই বাধ্য হয়ে আমাদের দাম বাড়াতে হ'ল। দেশের মানুষের কথা ভাবি নি, এ কথা নয়—ভেবেছি, কিন্তু নিরুপায় হয়ে বাড়াতে হয়েছে। কাগজের দর, ছাপাখানার দর যে ভাবে বেড়েছে তার কথা বাংলাদেশের লোকের অজ্ঞাত নয়। একান্ত বিনয়ের সঙ্গেই সেই কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিবেদন শেষ করছি।

মনোজ বসু

তৃতীয় সংস্করণ

এ সংস্করণেও লেখক কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA

হাঁসুলী বাঁকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে কে শিস দিচ্ছে রাত্রে। দেবতা কি ;, কি রক্ষ বোঝা যাচ্ছে না। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ ক'রে কাহারেরা।

কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক—অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প-পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মত। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি-গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলী; কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে—তখন মনে হয় রূপোর হাঁসুলী। এই জন্যে বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক। নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াই শো বিঘা জমি নিয়ে মৌজা 'বাঁশবাঁদি', লাট জাঙলের অন্তর্গত। বাঁশবাঁদির উত্তরেই সামান্য খানিকটা ধানচাষের মাঠ পার হয়ে জাঙল গ্রাম। বাঁশবাঁদি ছোট গ্রাম; দুটি পুকুরের চারি পাড়ে ঘর তিরিশেক কাহারদের বসতি; জাঙল গ্রামে ভদ্রলোকের সমাজ—কুমার-সদ্‌গোপ, চাষী-সদ্‌গোপ এবং গন্ধবণিকের বাস, এ ছাড়া নাপিতকুলও আছে এক ঘর, এবং তন্তুবায় দু ঘর। জাঙলের সীমানা বড়; হাঁসিল জমিই প্রায় তিন হাজার বিঘা, পতিতও অনেক—নীলকুঠির সাহেবদের সায়েবডাঙার পতিতই প্রায় তিন শো বিঘা।

সম্প্রতি জাঙল গ্রামের সদ্‌জাতির ভদ্রলোক বাবু মহাশয়েরা বেশ খানিকটা ভয়ার্ত হয়ে উঠেছেন। অল্প আড়াই শো বিঘা সীমানার বাঁশবাঁদি গ্রামের অর্থাৎ হাঁসুলী বাঁকের কাহারেরা বলছে—বাবু মশায়েরা 'তরাস' পেয়েছেন। অর্থাৎ ত্রাস। পাবারই কথা। রাত্রে কেউ যেন শিস দিচ্ছে। দিনকুড়িয়ে

শিস উঠেছিল জাঙল এবং বাঁশবাঁদির ঠিক মাঝখানে ওই হাঁসুলী বঁ
পশ্চিম দিকের প্রথম বাঁকিতে—বেলগাছ এবং শ্যাওড়া ঝোপে ভর্তি জনসাধারণের কাছে মহা-আশঙ্কার স্থান ব্রহ্মদৈত্যিতলা থেকে। তারপর কয়েকদিন উঠেছে জাঙলের পূর্ব গায়ে কোপাইয়ের তীরের কুলকাঁটার জঙ্গল থেকে। তারপর কয়েকদিন শিস উঠেছিল আরও খানিকটা দূরে—ওই হাঁসুলী বাঁকের দিকে স'রে। এখন শিস উঠছে বাঁশবাঁদির বাঁশবনের মধ্যে কোনখান থেকে।

বাবুরা অনেক তদন্ত করেছেন। রাত্রে বন্দুকের আওয়াজ করেছেন, দু-একদিন লাঠি সোঁটা বন্দুক নিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে হৈ-চৈ করেছেন, খুব জোরালো হাতখানেক লম্বা টর্চের আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারদিক দেখেছেন, তবু সন্ধান কিছুরই হয় নাই। কিন্তু শিস সেই সমানেই বেজে চলেছে। ক্রোশখানেক দূরে থানা। সেখানেও খবর দেওয়া হয়েছে; ছোট দারোগাবাবুও এসেছিলেন দিন তিনেক রাত্রে, কিন্তু তিনিও কোন হদিস পান নাই। তবে নদীর ধারে ধারে শব্দটা ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা ঠিক। এইটাই তিনি সমস্ত শুনে ঠাওর ক'রে গিয়েছেন।

দারোগাবাবু পূর্ববঙ্গের লোক—তিনি ব'লে গিয়েছেন, নদীর ভিতর কোন একটা কিছু হচ্ছে। 'নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস।' ভাবেন, খানিকটা ভাবেন। সন্ধান মিললে পর খবর দিবেন।

'নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস'—কথাটা অবশ্য ডাকপুরুষের বচন—পুরুষানুক্রমে চ'লে আসছে দেশে। সে কথা কখনও মিথ্যা নয়, কিন্তু দেশভেদে বচনেরও ভেদ হয়, তাই ও-কথাটা হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদির জাঙল গ্রামে ঠিক খাটে না। বাংলাদেশের এই অঞ্চলটাতেই খাটে না। সে হ'ল বাংলাদেশের অন্য অঞ্চল। জাঙল গ্রামের ঘোষ-বাড়ির এক ছেলে ব্যবসা করে কলকাতায়। কয়লা বেচা-কেনা করে, আর করে পাটের কারবার। বাংলাদেশের সে অঞ্চল ঘোষবাবু ঘুরে এসেছে। সে বলে—সে দেশই হ'ল নদীর দেশ। জলে আর মাটিতে মাখামাখি। বারোটি মাস ভরানদী বইছে; য়ার আসছে, জল উছলে উঠে নদীর কিনারা ছাপিয়ে সবুজ মাঠের মধ্যে

ছলছলিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ; জোয়ারের পর আসছে ভাঁটার পালা, তখন মাঠের জল আবার গিয়ে নামছে নদীতে ; নদীর ভরা কিনারা খালি হয়ে কূল জাগছে। কিন্তু তাও কিনারা থেকে বড়জোর দু-আড়াই হাত ; তার বেশি নামে না। সে নদীও কি এমন-তেমন, আর একটি দুটি ? সে যেন গঙ্গা-যমুনার ধারা, থৈ থৈ করছে, থমথম করছে ; এপার থেকে ওপার পারাপার করতে এ দেশের মানুষের বুক কেঁপে ওঠে। আর সে ধারা কি একটি ? কোথা দিয়ে কোন্ ধারা এসে মিশল, কোন্ ধারা কোথায় পৃথক হয়ে বেরিয়ে গেল—তার হিসাব নাই। সে যেন জলের ধারার সাতনরী হার,—হাঁসুলী নয়। নদীর বাঁকেরই কি সেখানে অন্ত আছে ? ‘আঠারো বাঁকি’ ‘তিরিশ বাঁকি’র বাঁকে বাঁকে নদীর বিচিত্র চেহারা সেখানে। দু ধারে সুপারি আর নারিকেল গাছ ;—সারি নয়—বাগিচা নয়—সে যেন অরণ্য। সঙ্গে আরও যে কত গাছ, কত লতা, কত ফুল,—তা যে দেখে নাই, সে কল্পনা করতে পারবে না। সে দেখে আশ মেটে না। ওই সব নারিকেল-সুপারির ঘন বনের মধ্য দিয়ে বড় নদী থেকে চ'লে গিয়েছে সরু সরু খাল, খালের পর খাল। সেই খালে চলেছে ছোট ছোট নৌকা। নারিকেল-সুপারির ছায়ার তলায় টিন আর বাঁশের চেঁচা বেড়া দিয়ে তৈরি ঘরের ছোট ছোট গ্রাম লুকিয়ে আছে। সরু খালগুলি কোন গাঁয়ের পাশ দিয়ে, কোন গ্রামের মাঝখান দিয়ে চ'লে গিয়েছে—গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ও-দেশের ছোট নৌকাগুলি এ দেশের গরুর গাড়ির মত। নৌকোতেই ফসল উঠছে ক্ষেত থেকে খামারে, খামার থেকে চলেছে হাটে-বাজারে, গঞ্জে-বন্দরে ; ওই নৌকাতেই চলেছে—এ গাঁয়ের মানুষ ও-গাঁয়ের কুটুমবাড়ি, বহুড়ী যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি, মেয়ে আসছে বাপের বাড়ি ; মেলা-খেলায় চলেছে ইয়ারবন্ধুর দল। চাষী চলেছে মাঠে—তাও চলেছে নৌকোতেই, কাস্তে নিয়ে লাঙল নিয়ে একাই চলে নৌকো বেয়ে। শরতের আকাশের ছায়াপথের মত আদি-অন্তহীন নদী,—সেই নদীতে কলার মোচার মত ছোট্ট নৌকোর মাথায় ব'সে—বাঁ হাতে ও বাঁ বগলে হাল ধ'রে, ডান হাতে আর ডান পায়ে বৈঠা চালিয়ে চলেছে। ঘোষের ছেলে শতমুখে সে দেশের কথা ব'লে ফুরিয়ে

উঠতে পারে না। এ নদীর ধারে বাস—ভাবনার কথাই বটে। ভাবনার কথা বলতে গিয়ে ঘোষের ছেলের চোখে ভয় ফুটে ওঠে—সময়ে সময়ে শরীরে কাঁটা দেয়। ওই নদীর সাতনরী হার আরও নীচে গিয়ে এক হয়ে মিশেছে। তখন আর নদীর এপার ওপার নাই। মা-লক্ষ্মীর গলার সোনার সাতনরী হয়ে উঠেছে যেন মনসার গলার অজগরের বেড়; নদী সেখানে অজগরের মতই ফুঁসছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলে-ফুলে উঠছে, যেন হাজার ফণা তুলে দুলছে। এরই মধ্যে কখনও ওঠে আকাশে টুকরো খানেক কালো মেঘ—দেখতে দেখতে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যায় তার উপর, যেন কেউ আগুনে-গড়া হাতের আঙুলের ঘা মেরে বাজিয়ে দেয় ওই কালো মেঘের 'বিষমঢাকি'র বাজনা। যে বাজায় তার মাথায় জটার দোলায় আকাশ-পাতাল দুলতে থাকে। অজগর তখন তার বিরাট অঙ্গ আছড়ে আছড়ে হাজার ফণায় ছোবল মেরে নাচে—ফুঁসিয়ে ফুঁসিয়ে মাতনে মাতে। নদীর জলে তুফান জাগে। সে তুফানে বাড়ি ঘর গ্রাম—গোলা গঞ্জ বন্দর—মানুষ গরু কীটপতঙ্গ সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। আবার তুফান নাই, ঝড় নাই, বাইরে দেখতে-শুনতে সব শান্ত স্থির, কোথাও কিছু নাই—হঠাৎ নদীর ধারের গাঁয়ের আধখানা কাঁপতে লাগল, টলতে লাগল—দেখতে দেখতে কাত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল অজগরের মতো নদীর অথৈ গর্ভে। মানুষকে সেখানে বারো মাস এক চোখ রাখতে হয় আকাশের কোলে—কালো মেঘের টুকরোর সন্ধানে, আর-এক চোখ রাখতে হয় সবুজ ঘাসে-ফসলে-ঢাকা চন্দনের মত মাটির বুকের উপর—ফাটলের দাগের খোঁজে। ভাবনা সেখানে বারো মাসই বটে।

ছোট দারোগা সেই দেশের মানুষ, তাই ও-কথা বলছেন। কিন্তু হাঁসুলী বাঁকের দেশ আলাদা। হাঁসুলী বাঁকের দেশ কড়াধাতের মাটির দেশ। এ দেশে নদীর চেয়ে মাটির সঙ্গে মানুষের লড়াই বেশি। 'খরা' অর্থাৎ প্রখর গ্রীষ্ম উঠলে নদী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়, ধূ-ধূ করে বালি-- এক পাশে মাত্র একহাঁটু গভীর জল কোনমতে ব'য়ে যায়—মা-মরা ছোট মেয়ের মত শুকনো মুখে দুর্বল শরীরে, কোনমতে আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে। মাটি তখন হয়ে

ওঠে পাষাণ; ঘাস যায় শুকিয়ে, গরম হয়ে ওঠে আগুনে-পোড়া লোহার মত; কোদাল কি টামনায় কাটে না, কোপ দিলে কোদাল-টামনারই ধার বেঁকে যায়; গাঁইতির মত যে যন্ত্র সে দিয়ে কোপ দিলে তবে খানিকটা কাটে, কিন্তু প্রতি কোপে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে। খাল বিল পুকুর দীঘি চৌচির হয়ে ফেটে যায়। তখন ওই নদীই রাখে মানুষকে বাঁচিয়ে; জল দেয় ওই নদী। নদীর ভাবনা এখানে বারো মাসের নয়।

নদীর ভাবনা এখানে চার মাসের। আষাঢ় থেকে আশ্বিন। আষাঢ় থেকেই মা-মরা ছোট মেয়ের বয়স বেড়ে ওঠে। যৌবনে ভ'রে যায় তার শরীর। তারপর হঠাৎ একদিন সে হয়ে ওঠে ডাকিনী। কাহারদের এক-একটা ঝিউড়ি মেয়ে হঠাৎ যেমন এক-একদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, পাড়া-পড়শীকে শাপ-শাপান্ত ক'রে, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খ'সে, চোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইট পাটকেল পাথর, দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে কুলে কালি ছিটিয়ে দিয়ে, তেমনি ভাবেই সেদিন ওই ভরা নদী অকস্মাৎ ওঠে ভেসে। তখন একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী! ক্ষমা নাই—ঘেন্না নাই, দিগম্বরীর মত হাঁক ছেড়ে, ডাক পেড়ে, শতমুখে কলকল খলখল শব্দ তুলে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে। গ্রাম বসতি মাঠ শ্মশান ভাগাড়, লোকের ঘরের লক্ষ্মীর আটন থেকে আঁস্তাকুড়—যা সামনে পড়ে মাড়িয়ে তছনচ ক'রে দিয়ে চ'লে যায়। সেও একদিন দুদিন। বড়জোর কালে-কস্মিনে চার-পাঁচ দিন পরেই আবার সম্বিৎ ফেরে। কাহারদের মেয়েও যেমন রাগ পড়লে এসে চুপ ক'রে গাঁয়ের ধারে ব'সে থাকে, তারপর এক-পা, দু-পা ক'রে এসে বাড়ির কানাচে শুয়ে গুনগুন ক'রে কাঁদে কি গান করে, ঠিক ধরা যায় না।—তেমনই ভাবে কোপাইও দুদিন বড়জোর চারদিন পরে আপন কিনারায় নেমে আসে, কিনারা জাগিয়ে খানিকটা নীচে নেমে কুল-কুল শব্দ ক'রে ব'য়ে যায়। চার মাসের মধ্যে এমনটা হয় পাঁচবার কি সাতবার, তার বেশি নয়। তার মধ্যে হয়তো একবার, কি

দু-তিন বৎসরে একবার ক্ষ্যাপামি করে বেশি। কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার-কন্যে।

তবে কন্যার পাপে কুল নষ্ট। কোপাইয়ের বন্যায় ঘরদোর না ভাঙলেও ভুগতে হয় বইকি। জল সরে গেলে ভিজে মাটি থেকে ভাপ উঠতে আরম্ভ করে—মাছিতে মশাতে ভ'রে যায় দেশ। মানুষ চলে, মানুষের মাথার উপর ঝাঁকবন্দী মশা সঙ্গে সঙ্গে চলে ভনভন শব্দে, মানুষের শরীর শিউরে ওঠে, তাদের কামড়ে অঙ্গ ফুলে ওঠে দাগড়া হয়ে। গরুর গায়ে মাছি ব'সে থাকে চাপবন্দী হয়ে, লেজের ঝাপটানিতে তাড়িয়ে কুলিয়ে উঠতে না পেরে তারা অনবরত শিঙ নাড়ে, কখনও কখনও চার পা তুলে লাফাতে থাকে। তাকে সাহায্য করে তালপাতা চিরে ঝাঁটার মত করে বেঁধে তাই দিয়ে আছড়ে মাছি মারে, তাড়িয়ে দেয়। এর কিছুদিন পরেই আরম্ভ হয় 'মালোয়ারী'র জ্বর।

আরও আছে কোপাইয়ের বন্যার দুর্ভোগ। সাঁওতাল পরগনার পাহাড়িয়া নদী কোপাইয়ে ওই দু-তিন বৎসর অন্তর যে আকস্মিক বন্যা আসে—যাকে বলে 'হড়পা বান', সেই বন্যার স্রোতে প'ড়ে ক্বচিৎ কখনও এক-একটা 'গুলবাঘা' ভেসে এসে হাঁসুলী বাঁকের এই খাপছাড়া বাঁকে, বাঁশবাঁদি গাঁয়ের নদীকূলের বাঁশবনের বেড়ার মধ্যে আটকে যায়। কখনও মরা, কখনও জ্যান্ত। জ্যান্ত থাকলে বাঘা এই বাঁশবনেই বাসা বাঁধে আর আসে ভালুক; দুটো-একটা প্রতি বৎসরই আসে ও-বেটারা। কিন্তু আশ্চর্য, ও-বেটারা ম'রে কখনও আটকে থাকে না বাঁশবনে। জ্যান্ত বাঘ কদাচিৎ আসে, মরাও ঠিক তাই। গোটা এক পুরুষে দুটো এসেছে—একটা মরা, একটা জ্যান্ত। মরাটাকে টেনে বের ক'রে জেলার সায়েবকে সেটার চামড়া দেখিয়ে জাঙলের ঘোষেরা বন্দুক নিয়েছে। জ্যান্তটাকে কাহাররাই মেরেছিল, সেটা দেখিয়ে বন্দুক নিয়েছে গন্ধবণিকেরা। ভালুক এলে, কাহারেরাই মারে, প্রতিবার বন্যার পর বাঁশবন খুঁজে-পেতে দেখতে পেলে লাঠি সোঁটা খোঁচা বল্লম তীর ধনুক নিয়ে তাড়া ক'রে মেরে হৈ-হৈ ক'রে নৃত্য করে; নিজেদের

বীর্যে মোহিত হয়ে প্রচুর মদ্য পান করে। আর এখানেই আছে বুনো শুয়োর, কাহারদের লাঠি সোঁটা খোঁচা বল্লম সত্ত্বেও এখানে বুনো শুয়োরের একটা দস্তরমত আড্ডা-আড়ত গ'ড়ে উঠেছে। অবশ্য বাঁশবাঁদির বাঁশবেড়ের জঙ্গলে নয়, এখান থেকে খানিকটা দূরে সাহেবডাঙায়। কাহারদের দৌরাত্ম্যে ওরা বাঁশবাঁদির এলাকায় বাসা বেঁধে রক্ষা পায় না। ওদের বড় আড্ডা হ'ল প'ড়ো নীলকুঠির কুঠি-বাড়ির জঙ্গলে। রাত্রে শূকরের দল ঘোঁতঘোঁত শব্দ করে নদীর ধারে ছুটে বেড়ায়, দাঁতে মাটি খুঁড়ে কন্দ তুলে খায়। কখনও কখনও দুটো একটা ছটকে এসে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। অকস্মাৎ কেউ কেউ সামনে প'ড়ে জখম হয়। তখন কাহারেরা ওদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করে। অস্ত্র নয়, ফাঁদ। বুনো শুয়োর মারবার আশ্চর্য কৌশল ওদের। হাত-খানেক লম্বা বাখারির ফালির মাঝখানে আধ হাত লম্বা শক্ত সরু দড়ি বেঁধে প্রান্তভাগে বাঁধে ধারালো বঁড়শি। বঁড়শিতে টোপের মতো গেঁথে দেয় কলা এবং পচুই মদের ম্যাতা। এমনই আট-দশটা ছড়িয়ে রেখে দেয় পথের প্রান্তরে। মদের ম্যাত্যার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে শুয়োর বেটারা মাটি শুঁকে শুঁকে এসেই পরমানন্দে গপ ক'রে মুখে পুরে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে বঁড়শি গেঁথে যায় জিভে অথবা চোয়ালের মধ্যে। তখন পায়ের খুর দিয়ে টেনে বঁড়শি ছাড়াতে চেষ্টা করে—তাতে ফল হয় বিপরীত, চেরা খুরের মধ্যে বঁড়শির দড়ি ঢুকে গিয়ে শেষে আটকায় এসে বাখারির ফালিতে। একদিকে বঁড়শি আটকায় জিভে, অন্য দিকে দড়ি-পরানো খুর আটকায় বাখারিতে, বেটা শুয়োর নিতান্তই শুয়োরের মত ঠ্যাঙ তুলে তিন পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সকালে কাহারেরা আসে লগুড় হাতে, এসেই দমাদম ঠেঙিয়ে মেরে টেনে নিয়ে গিয়ে ভোজনযজ্ঞে লাগিয়ে দেয়।

আর আসে মধ্যে মধ্যে কুমীর। প্রায়ই সব মেছো কুমীর। কুমীর এসে জাঙলের বাবুভাইদের মাছ-ভরা পুকুরে নামে। সে আর উঠতে চায় না। বাবুরা বন্দুক নিয়ে দুম-দাম গুলি ছোঁড়ে, কুমীর ভুস ক'রে ডোবে আবার এক কোণে নাকটি জাগিয়ে ওঠে। কাহারেরা পাড়ের উপর ব'সে হুঁকো টানে

আর আমোদ দেখে। তবে হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদির ঘাটের পাশে যে দহটা আছে, সেখানে আসে সর্বনেশে মানুষ-গরু-খেকো বড় কুমীর—এখানকার লোকে বলে, 'ঘড়িয়াল'। তখন কাহারেরা চুপ ক'রে ব'সে থাকে না। তারা বের হয় দল বেঁধে; সর্বাঙ্গে হলুদ মাখে, সঙ্গে নেয় কোদাল কুড়ুল লাঠি সড়কি, বড় বড় বাঁশের ডগায় বাঁধা শক্ত কাছির ফাঁস। নদীর ধারে ধারে খুঁজতে থাকে কুমীরের আস্তানা। পাড়ের ধারে গর্তের মধ্যে শয়তানের আস্তানার সন্ধান পেলে মহা উৎসাহে তারা গর্তের মুখ বন্ধ ক'রে উপর থেকে খুঁড়তে থাকে সেই গর্ত। তারপর গর্তের নালার মধ্যে অবরুদ্ধ শয়তানকে তারা হত্যা করে। কখনও সুকৌশলে ফাঁস পরিয়ে বেঁধে টেনে এনে নিষ্ঠুরভাবে দু-তিন দিন ধ'রে ঠেঙিয়ে মারে। গর্তে কুমীর না পেলে গোয়ালপাড়ার গোয়ালাদের মহিষের পাল এনে সেগুলোকে নামিয়ে দেয় দহে। মহিষে জল তোলপাড় ক'রে তুলে ঘড়িয়ালকে বের করে। তারপর কুম্ভীরবধের পালা। সে প্রায় এক দক্ষযজ্ঞ। কুম্ভীর বেটাকে দক্ষের সঙ্গে তুলনা করা কখনই চলে না, কিন্তু কাহারদের মাতন—সে শিবঠাকুরের অনুচর নৃত্য ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

মোট কথা, এ দেশে—এই হাঁসুলীর বাঁকে নদীর ভাবনা খুব বেশি নয়; যেটুকু আছে, তার একটুমাত্র 'মালোয়ারী'র পালাটা ছাড়া সকল ভাবনার ভার একা বাঁশবাঁদির কাহারদের উপর। কিন্তু এবারের এই শিস দেওয়ার ব্যাপারে তারাও হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। প্রথম প্রথম তাদের ধারণা হয়েছিল ব্যাপারটা চোরডাকাতের নয়, ব্যাপারটা বৃন্দাবনী ধরনের কিছু। তারা ক্ষেপেও উঠেছিল। কারণ এই অঞ্চলের বৃন্দাবনী ব্যাপারে নায়িকারা এক শো জনের মধ্যে নিরেনব্বুই জনই হয় তাদের ঘরের মেয়ে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের এ ধারণা পাল্টে গিয়েছে। এখন তাদের ধারণা ব্রহ্মদৈত্যতলার 'কর্তা' কোন কারণে এবার বিশেষ রুষ্ট হয়েছেন। হয়তো বা তিনিই ওই বেলবন ও জাওড়াজঙ্গল থেকে বিদায় নিয়ে নদীর ধারে ধারে চ'লে যাচ্ছেন—শিস দিয়ে সেই কথা জানিয়ে দিয়ে চলেছেন হাঁসুলী বাঁকের অধিবাসীদের। এ নিয়ে

তাদের জল্পনা-কল্পনা চলছিল। ঘরে ঘরে কুলুঙ্গীতে সিঁদুর মাখিয়ে পয়সাও তুলেছে তারা, এবং এ বিষয়ে জাঙলের ভদ্রলোক মহাশয়দের উদাসীনতা দেখে তারা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছে। বেচারী কাহারদের আর সাধ্য কি? জ্ঞানই বা কতটুকু? তবু ওরাই বসালে মজলিস। উপায় কর এর! কিন্তু কাহারদের আবার দুটি পাড়া, 'বেহারা'-পাড়া আর 'আটপৌরে'-পাড়া। বেহারা-পাড়ার মাতব্বর বনওয়ারী আটপৌরেদের সম্পর্কে ঘাড় নেড়ে হতাশা প্রকাশ ক'রে বললে—বছরে একবার পূজো, তাই ভাল ক'রে দেয় না। তা 'লতুন' পূজো দেবে!

নিমতেলে পানুর ভাল নাম প্রাণকৃষ্ণ। পাড়ায় দুজন প্রাণকৃষ্ণ থাকায় এ প্রাণকৃষ্ণের বাড়ির উঠানের নিমগাছটির অস্তিত্ব তার নামের আগে জুড়ে দিয়ে নিমতেলে পানু ব'লে ডাকা হয়। সে বললে—জান মুরুব্বি, কথাটা আমি বাপু, ভয়ে বলি নাই এতদিন। তা কথা যখন উঠল, বুয়েছ কিনা, আর কি বলে যেয়ে—কাণ্ড যখন খারাপ হতেই চলেছে, তখন আর চেপে থাকাটা ভাল লয়। কি বল?

গোটা মজলিসটির লোকের চোখ তার উপর গিয়ে পড়ল। বনওয়ারী ব'সে ব'সেই ঘেঁষড়ে খানিকটা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছেন বল্ দিকিনি?

মুখ খুলেছিল পানু, কিন্তু তার আগেই একটা সুচালো বাঁশীর শব্দ বেজে উঠল। সেই শিসের শব্দ! শব্দটা আসছে—বাঁশবাঁদি গাঁয়ের দক্ষিণের বাঁশবন থেকে। সকলে চকিত হয়ে কান খাড়া ক'রে চুপ ক'রে রইল। বনওয়ারী ব'সে ছিল উত্তর মুখ ক'রে, বাঁ হাতে ছিল হুঁকো—সে ডান হাতটা কাঁধের উপর তুলে, পিছনে তর্জনীটা হেলিয়ে ইঙ্গিতে দক্ষিণ দিকটা দেখিয়ে দিলে সকলকে। পিছনে দক্ষিণ দিকে বাঁশবেড়ের মধ্যে শিস বাজছে।

আবার বেজে উঠল শিস! ওই!

কাহার-বাড়ির মেয়েরা সব উদ্বিগ্ন মুখে উঠানে নেমে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে। কারও হাতে রান্নার হাতা; কেউ ছেলে ঘুম পাড়াচ্ছিল,

তার কোলে ছেলে ; কেউ কাঁকুই দিয়ে নিজের চুল আঁচড়াচ্ছিল, তার বাঁ হাতে ধরা রইল চুলের গোছা, ডান হাতে কাঁকুই ; কেউ কেরোসিনের ডিবে জেলে ঘরের পিছনে দেওয়াল থেকে ঘুঁটে ছাড়িয়ে আনতে গিয়েছিল, সে কেরোসিনের ডিবে আর খানচারেট ঘুঁটে হাতেই ছুটে এসে দাঁড়াল দশজনের মধ্যে। কেবল বদ্ধকালা বুড়ী সুচাঁদ কাহারনী সকলের মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল ; সে উপরের অঙ্গের কাপড়ের আঁচলটা নিঃসঙ্কোচে খুলে কাঁথা-সেলাই-করা সুচে পুরানো কাপড়ের পাড়ের কস্তা পরিয়ে একটা লম্বা ছেঁড়া মুড়ছিল, ভুরু কুঁচকে নীরব প্রশ্ন তুলে সকলের দিকে চেয়ে সেই শুধু ব'সে রইল। কিছু বুঝতে না পেরে অবশেষে সে তার অস্বাভাবিক মোটা গলায় অভ্যাসমত চীৎকার ক'রে প্রশ্ন করলে—কি ?

সুচাঁদের মেয়ে বসন—অর্থাৎ বসন্ত, মায়ের বধিরত্বের জন্য লজ্জা পেয়ে সে পিছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে—মর তুমি।

সুচাঁদ আবার প্রশ্ন করলে এবং আরও বেশি একটু চীৎকার ক'রেই বললে —বলি, হ'ল কি ? উঠে দাঁড়ালি যে সবাই ?

এবার নাতনী পাখী—অর্থাৎ বসন্তের মেয়ে পাখী এসে তার কানের কাছে চেঁচিয়ে বললে—শি—স।

—শিস ? তা ওই জাঙলের ছোঁড়ারা কেউ দিছে।

—না—না। হাত নেড়ে বুঝিয়ে পাখী বললে—সেই শি—স।

এই মুহূর্তটিতেই আবার শিস বেজে উঠল।

পাখী দিদিমাকে ঠ্যালা দিয়ে বললে—ওই শোন। কিন্তু সুচাঁদ চকিত হয়ে পাখীর মুখে হাত চাপা দিয়ে মেরুদণ্ড সোজা ক'রে বসল। শুনতে পেয়েছে সে। এবং সে উঠে দাঁড়াল ; প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পা দিয়ে অবধি সে গাঁয়ে-ঘরে বুকে কাপড় নামমাত্রই দিয়ে থাকে, তাও দেয় মেয়ে বসন্তের অনুরোধে। এবং সেই উদ্দেশ্যেই আজ এই মুহূর্তে ছেঁড়া আঁচলটা সে সেলাই করছিল কিন্তু ছেঁড়া আঁচলটা টেনে গায়ে তুলতে সে ভুলেই গেল। আঁচলটা টানতে টানতেই এসে বনওয়ারীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে খুব

চীৎকার ক'রে বললে—দেবতার পুজো-আচ্চা করাবি, না, গাড়েপাড়ে যাবি ?

বনওয়ারীও খুব চীৎকার ক'রে বেশ-ভঙ্গি ক'রে হাত-পা নেড়ে বললে—দেবতার পূজো কি আমা-সোমাদের থেকে হয় পিসী ? বাবুরা কিছু না করলে আমরা কি করব ?

—তবে মরবি ? মরতে তোদের মরণই হয় আগে।

—তা কি করব বল ? ভগমানের বিধেন যা তাই তো হবেন। গাঁয়ের দখিন দিক আগুলে যখন আছি, আর আমরাই যখন কি বলে—ছিষ্টির ওঁচা, তখন আগেই আমাদিগে মরতে হবেন বইকি !

নিমতেলে পানু ব'লে উঠল—না মুরুব্বি। এবার খ্যানত হ'লে আগে তোমার ওই চৌধুরী-বাড়িতেই হবেন। আমি জানি।

বনওয়ারী ভুরুতে এবং দৃষ্টিতে সুগভীর বিস্ময় ও প্রশ্ন জাগিয়ে তুলে বললে—ব্যাপারটা কি বল দি-নি ?

সুচাঁদ বললে—কি ? কি বললি ?

—কিছু লয় গো। তোমাকে বলি নাই। ব'স দিকি তুমি।

পাখী এসে সুচাঁদকে হাতে ধ'রে টেনে সরিয়ে নিয়ে বললে—ব'স এইখানে।

পানু বললে—ইবারে যে পূজোটি গেল মুরুব্বি, তার পাঁঠাটি খুঁতো ছিলেন।

সবিস্ময়ে সকলে ব'লে উঠল—খুঁতো ছিল ? মেয়েরা শিউরে উঠল—হেই মা গো !

পানু বৃত্তান্তটি প্রকাশ করলে। পানুর ছাগলের একটি বাচ্চাকে খুব ছোটতে কুকুরে কামড়েছিল।—হেই এতটুন বাচ্চা তখন তোমার, তখন এক শালার কুকুর খপ ক'রে ধরেছিল পেছকার পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে দেখেছিল লটবরের মা, হাতে ঝাঁটা ছিল—কুকুরটাকে এক ঝাঁটা মেরে ছাড়িয়ে নিয়েছিল ; কিন্তুক দুটি দাঁত ব'সে গিয়েছিল। হলুদ-মলুদ লাগিয়ে সেরে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম—ওটাকে খাসী ক'রে দেব। তা তোমার এখন-তখন ক'রে হয়

নাই, বড় হয়ে গেল। তখন ভেবেছিলাম, কেটে-মেটে একদিন পাড়ায় ভাগা। দিয়ে খেয়ে লোব। ই বছর বুঝলে কিনা, একদিন শালার পাঁঠা করেছে কি? চ'লে গিয়ে ঢুকেছে চৌধুরীবাড়ি; আর খাবি তো খা—বাবুদের শখ ক'রে লাগানো—কি বলে বাবু, সেই ফুলের গাছ। এখন, ধ'রে বেঁধে রেখেছিল। খোঁজে খোঁজে আমি গেলাম। গেলাম তো চৌধুরীদের গোমস্তা মারলে আমাকে তিন থাপ্পড়। তারপর সেই গাছ দেখিয়ে বললে—কলকাতা থেকে পাঁচ টাকা দাম দিয়ে কলম এনেছিলাম। তোকে দাম লাগবে কলমের। আমি কি বলব? দেখলাম—বেটা পাঁঠা গাছটার পাতা ডাল খেয়েই ক্ষ্যান্ত হয় নাই—টেনে-উপড়ে একেবারে নেতার মেরে দিয়েছে। আমি তো পায়ে হাতে ধরলাম। শেষ-মেষ পাঁঠাটাকে দিয়ে খালাস। আমি বললাম—কিন্তু দেখেন মাশায়, খুঁতো পাঁঠা, কেটে ফিষ্টি-মিষ্টি ক'রে খাবেন, কিন্তুক দেবতা-টেবতার থানে যেন পুজো-টুজো দেবেন না মাশায়। তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি, নিজের বেটা ওই লটবরের মাথায় হাত দিয়ে কিরে ক'রে বলতে পারি মুরুব্বি, আমি দুবার বলেছিলাম—খুঁতো পাঁঠা, খুঁতো পাঁঠা, হেই মাশায়, যেন দেবতা-থানে দেবেন না। তা এবার বেহ্মদত্যিতলায় কত্তার পুজোতে দেখি—পেরথম চোটেই চৌধুরীবাবুদের সেই পাঁঠা পড়ে গেল। 'এশ্বর' জানেন—আমার দোষ নাই।

সুচাঁদ খুব বেশি স'রে যায় নাই। কাছেই ব'সে একদৃষ্টে পানুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কথাগুলি শুনছিল; তারই হাতের ডিবেটার আলো পরিপূর্ণভাবে পড়েছিল পানুর মুখের উপর। সে এবার প্রায় কথাগুলিই বুঝতে পেরেছে। সে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললে—ভাল লয়, ভাল লয়, এ কখনও ভাল লয়।

সমস্ত মজলিসটা থমথম ক'রে উঠল। মনে হ'ল, সুচাঁদের মুখ দিয়ে যেন দেবতাই ওই কথাগুলি বললেন—ভাল লয়, ভাল লয়, এ কখনও ভাল লয়।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে ব'সে রইল।

সেই থমথমে মজলিসে সুচাঁদ আবার আরম্ভ করল—ওই বাবার দয়াতেই

হাঁসুলী বাঁকের যা কিছু। ওই চৌধুরীরা তিন পুরুষ আগে তখন গেরস্ত, সাহেবদের নীলকুঠির গমস্তা। কুঠিরও তখন ভাঙা-ভাঙটা অবস্থা। সেবার এল কোপাইয়ে 'পেলয়' বান। সে অনেক দিন আগে, তখন আমরা হই নাই ; বাবার কাছে গল্প শুনেছি। দুপুরবেলা থেকে ভাসতে লাগল কোপাই। রাত এক পহর হতে হতে—তু-ফা-ন! 'হদের' পুকুরের শাহী পাড় পর্যন্ত ডুবে গেল। নীলকুঠির সায়েব মেম গাছে চড়ল। তারপর সমস্ত রাত হড়-হড়-হড়-হড় বান চললই—বান চললই। চারদিক আঁধার ঘুরঘুট্টি। আর ঝম-ঝম জল। সে রাত যেন আজ পার হয়ে কাল হবে না। এমন সময়, রাত তখন তিন পহর চলছে,—হাঁসুলী বাঁকের অনেক দূরে নদীর বুকে যেন আলো আর বাজনা আসছে ব'লে মনে হ'ল। দেখতে দেখতে পঞ্চশব্দির বাদ্যি বাজিয়ে নদীর বুক আলোয় 'আলোকীন্নী' ক'রে এক বিয়েসাদীর নৌকোর মতো নৌকো এসে লাগল হাঁসুলী বাঁকের দহের মাথায়। সায়েব দেখেছিল—সে ঝাঁপিয়ে নামল জলে। মেম বারণ করলে। শুনলে না। তখন মেম আর কি করে? মেমও নামল। সায়েব এক কোমর জল ভেঙে চলল নৌকো ধরতে। হঠাৎ ওই বাবার থান থেকে বেরিয়ে এলেন কত্তা। বলতে কাঁটা দিয়ে উঠছে গায়ে! সত্যিই শিউরে উঠল সুচাঁদ।—এই ন্যাড়ামাথা, ধবধব করছে রঙ, গলায় রুদ্দাক্ষি, এই পৈতে, পরনে লাল কাপড়, পায়ে খড়ম—কত্তা জলের ওপর দিয়ে খড়ম পায়ে এগিয়ে এসে বললেন—কোথা যাবে সায়েব? নৌকো ধরতে? যেয়ো না, ও নৌকো তোমার লয়। সায়েব মানলে না সে কথা। বললে—পথ ছাড়, নইলে গুলি করেঙ্গা। কত্তা হাসলেন,—বেশ ধরাঙ্গা তবে নৌকো। বাস্, যেমনি বলা অমনি সায়েব মেমের এক কোমর জল হয়ে গেল অথৈ সাঁতার, সঙ্গে সঙ্গে এক ঘুরনচাকিতে পাক দিয়ে ডুবিয়ে কো-থা-য় টেনে নিয়ে গেল—সোঁ ক'রে। চৌধুরী ছিল সায়েবের কাছেই আর একটা গাছের ডালে ব'সে। কত্তা এসে তাকে ডাকলেন—নেমে আয়। চৌধুরী তখন ভয়ে কাঁপছে। কত্তা হেসে বললেন—ওরে বেটা, ভয় নাই, নাম্। তুই ডুববি না। বললে না পেত্যয় যাবে বাবা—চৌধুরী নামল, তো এক হাঁটুর বেশি

জল হ'ল না। কত্তা হাসলেন, তা'পরে আঙুল দেখিয়ে বললেন—নৌকে লেগেছে দেখেছিস? ও নৌকো তোর। আমার পূজো করিস, দেবতা কাছে মাথা নোয়াস, অতিথিকে জল দিস, ভিখিরীকে ভিখ দিস, গরিবকে দয়া করিস, মানুষের শুকনো মুখ দেখলে মিষ্টি কথা বলিস। যখের কাছে ছিলেন লক্ষ্মী, তোকে দিলাম। যতদিন আমার কথা মেনে চলবি—উনি অচলা হয়ে থাকবেন। অমান্যি করলে ছেড়ে যাবেন, আর নিজেই ফলভোগ করবি। তাকেই—সেই কত্তাকেই—এত হতচ্ছেদা! মা-লক্ষ্মী তো গিয়েছেন। অধর্মের তো বাকি নাই। শেষ-মেষ সেই কত্তার থানেই খুঁতো কুকুরে-ধরা [illegible] পাঁঠার পূজো! এতে কি আর দেবতা থাকেন! দেবতাই বটেন—সেইজন্যই শিস দিচ্ছেন। চ'লে যাবেন, তাই জানিয়ে দিছেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন গাঢ় হয়ে উঠছিল ক্রমশ। হাঁসুলী বাঁকের নদীর চরে গ্রামের কোল ঘেঁষে নদীর সঙ্গে সমান্তরালভাবে বেঁকে চ'লে গিয়েছে গ্রামের বাঁশের বেড়। হাঁসুলীর মত গোল নদীর বেড়, তাই তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে যে বাঁশবেড় বা বাঁশের বাঁধ সেও গোলাকার। বাঁশ বাঁদিকে ঘিরে রেখেছে সবুজ কস্তার ডুরি মালার মত। সেই বাঁশবন থেকে অন্ধকার গোল হয়ে এগিয়ে আসছে কাহারপাড়ার বসতিকে কেন্দ্র করে। উঠানের মজলিসের আলোটার মাথার উপরে এসে আলোর বাধা পেয়ে যেন থমথম করছে। প্যাচাগুলো কর্কশ চেরা গলায় চীৎকার ক'রে উড়ে যাচ্ছে। বাদুড় উড়ছে—পাখসাটের শব্দে মাথার উপরের বাতাস চমকে চমকে উঠছে। মধ্যে মধ্যে দুটোতে ঝগড়া ক'রে পাখসাট মেরে চিলের মত চীৎকার করছে। এরই মধ্যে সুচাঁদের এই গল্পে সেই বেলবন ও শ্যাওড়াবনের কর্তার মাহাত্ম্য, তাঁর সেই গেরুয়াপরা ন্যাড়ামাথা, রুদ্রাক্ষ ও ধবধবে পৈতেধারী চেহারার বর্ণনা শুনে এবং সেই কর্তার কাছে কুকুরে-ধরা পাঁঠা দেওয়ার অপরাধের কথা মিলিয়ে সকলে একেবারে নিদারুণ ভয়ে আড়ষ্ট পঙ্গু হয়ে গেল। কার একজনের কোলের ছেলেটা কেঁদে উঠল। মজলিসসুদ্ধ লোক বিরক্তিভরে ব'লে উঠল—আঃ!

ছেলেটার মা স্তন মুখে দিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে সেখানে থেকে পালাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু তার সাহস হ'ল না একা ঘরের ভিতরে যেতে।

সুচাঁদ হঠাৎ আবার বললে—পানা, অপরাধ কিন্তু তোমারও বটে বাবার থানে।

পানু এমন অভিযোগের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তা ছাড়া ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, কেন কে জানে ভয় তারই হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সুচাঁদের কথা শুনে সে উত্তর দিতে চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না।

তারপর বনওয়ারী সুচাঁদকে সায় দিয়ে বললে— তা ঠিক বলেছে পিসী। পাঁঠাটি তো পানুর ঘরের।

সুচাঁদ এতক্ষণ ধ'রে নিজে একাই কথা ব'লে আসছিল—কানে না-শোনার সমস্যা ছিল না। বনওয়ারী কথা বলতেই সমস্যাটা নতুন ক'রে জাগল। এমন গুরুতর তত্ত্বে রায় দেবার অধিকার কাহারপাড়ায় প্রাচীন বয়সের দাবিতে সুচাঁদ তার নিজস্ব ব'লে মনে করে। তাতে কেউ বাদ-প্রতিবাদ করলে, সে 'রপমান' সুচাঁদের সহ্য হয় না। এ দিক দিয়ে তার অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি। বনওয়ারীর কথা কানে শুনতে না পেয়ে সে ধারণা করলে—বনওয়ারী তার কথার প্রতিবাদ করছে, তার কথাকে সে মৃদুস্বরে কথা ব'লে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। স্থির দৃষ্টিতে সে বনওয়ারীর দিকে চেয়ে একটু ঝুঁকে, হাত নেড়ে বললে—তোর মত বনওয়ারী, আমি ঢের দেখেছি—বুঝলি! তুই তো সেদিনের ছেলে রে। মা ম'রে যেয়েছিল, মাওড়া' ছেলে—অ্যাই ডিগ্‌ডিগে 'প্যাট'। আমার দুধ খেয়ে তোর হাড়-পাঁজরা ঢাকল। আমার গতর তখন ভাগলপুরের গাইয়ের মতন, বুকেও দুধও তেমনি অ্যাই মোষের গাইয়ের মতন। তু আজ আমার ওপর কথা কইতে আসিস? এই আমি ব'লে রাখলাম, তু দেখিস—গাঁয়ের নোকেও দেখবে—বছর পার হবে না, পানুর 'খ্যানত্‌' হবে।

পানু শিউরে উঠল। পানুর বউ দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে—মেয়েদের মধ্যে;—মৃদু অথচ করুণ স্বর তুলে সে কেঁদে উঠল।

বনওয়ারী এবার চীৎকার ক'রে বললে—তাই তো আমিও বলছি গো। তুমিও যা বলছ, আমিও তাই বলছি।

—তাই বলছিস ?

—হ্যাঁ। বলছি, পাঁঠাটি যখন পানুর ঘরের, তখন পানুর অপরাধ খণ্ডায় কিসে ?

সুচাঁদের ঘোলাটে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—বুদ্ধিমত্তার তৃপ্তির একটা হাসিও ফুটে উঠল মুখে, সে বললে—অ্যা-অ্যাই ! খণ্ডায় কিসে ?

পানু কাতর হয়ে প্রশ্ন করলে—তাই তো বলছি গো, খণ্ডায় কিসে তাই বল ? শুনছ ? বলি—'পিতিবিধেন' কি বল ? তারস্বরে চীৎকার ক'রে বললে শেষ কথা কটি।

—পিতিবিধেন ?

—হ্যাঁ।

একটু ভাবলে সুচাঁদ। বনওয়ারী প্রমুখ অন্য সকলে আলোচনা আরম্ভ করলে।—তা কাল একবার চল সবাই চৌধুরী-বাড়ি। বলা যাক সকল কথা খুলে।

সুচাঁদ বললে—আর একটি পাঁঠা তু দে পানু। আর পাড়া-ঘরে চাঁদা তুলে বাবার থানে পূজো হোক একদিন। জাঙলের নোকে যদি 'রবহেলা' করে—আমরা আপনাদের কত্তব্য করি। না, কি বলিস বনওয়ারী ? আর পিতিবিধেন কি আছে বল্ ? কত্তা তো দেবতা,—তিনি তো বুঝবেন আমাদের কথা।

বনওয়ারী বার বার ঘাড় নাড়লে।—হ্যাঁ, তা বটে, ঠিক কথা। কি বল গো সব ?

সকলেই ঘাড় নাড়লে। প্রহ্লাদ, গোপীচাঁদ, পাগল, দু নম্বর পানু, অমণ, সকলেই সম্মত হ'ল,—হোক, পূজো হোক।

ঠিক এই মুহূর্তে হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারটা একটা নিষ্ঠুর চীৎকারে চিরে যেন ফালি ফালি হয়ে গেল। কোন জানোয়ারের চীৎকার। সে চীৎকার

তীব্রতায় যত যন্ত্রণাকাতর, তীক্ষ্ণতায় সে তত অসহনীয়। বুনো শুয়োরের বাচ্চার চীৎকার। সম্ভবত দল থেকে ছটকে পড়েছিল কোন রকমে, সুযোগ বুঝে শেয়ালে ধরেছে। শুয়োরের বাচ্চার মত এমন তীরের মত চীৎকার কেউ করতে পারে না। আর পারে খরগোশে—বুনো মেটে খরগোশ। এ চীৎকার খরগোশেরও হতে পারে।

ঠিক এই সময়ে ঘেউ ঘেউ ক'রে শব্দ করে ছুটে এল একটা কুকুর। কালো রঙের প্রকাণ্ড বড় একটা কুকুর দৃপ্ত ভঙ্গিতে সতেজ চীৎকারে পাড়া মজলিস চকিত ক'রে মজলিসের মাঝখান দিয়ে—লোকজন না মেনেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল ওই চীৎকার লক্ষ্য ক'রে। কুকুরটার গায়ের ধাক্কা লাগল সুচাঁদের গায়ে। ধাক্কা খেয়ে এবং ঠিক কানের কাছে ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে সুচাঁদ চমকে উঠল। পর-মুহূর্তে সে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল—এই দেখ্‌ বনওয়ারী, এই এক পাপ। ওই যে হারামজাদা বজ্জাত—ওই ওর পাপের পেরাশ্চিত্তি করতে হবে সবাইকে; ওই হারামজাদার জরিমানা কর্‌ তোরা। শাসন কর্‌। শাসন কর্‌। শাসন কর্‌।

বনওয়ারী কিছু উত্তর দেবার আগেই—মেয়েদের মধ্য থেকে ফোঁস ক'রে উঠল সুচাঁদের নাতনী—বসন্তের মেয়ে পাখী। সে ব'লে উঠল—ক্যানে, সে হারামজাদা আবার করলে কি তোমার? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো! যত রাগ তোমার সেই হারামজাদার ওপর!

মেয়েরা এবার মুখ টিপে হাসতে লাগল। আশ্চর্য নাকি মানুষের জীবনে 'রঙে'র ছোঁয়াচের খেলা! এ দেশের এরা, মানে হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরা, নরনারীর ভালবাসাকে বলে 'রঙ'। রঙ নয়—বলে 'অঙ'। ওরা রামকে বলে 'আম', রজনীকে বলে 'অজুনী', রীতকরণকে বলে 'ইতকরণ', রাতবিরাতকে বলে 'আতবিরেত'। অর্থাৎ শব্দের প্রথমে র থাকলে সেখানে ওরা র-কে অ ক'রে দেয়। নইলে যে বেরোয় না জিভে, তা নয়। শব্দের মধ্যস্থলের র দিব্যি উচ্চারণ করে। মেয়ে-পুরুষের ভালবাসা হ'লে ওরা বলে—অঙ লাগয়েছে দুজনাতে। রঙই বটে! গাঢ় লাল রঙ। এক ফোঁটার ছোঁয়াচে মনভরা অন্ত

রঙের চেহারা পাল্টে দেয়। যে মেয়েরা এতক্ষণ আশঙ্কায় কাজকর্ম ছেড়ে নির্বাক হয়ে মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়ে সুচাঁদের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনছিল এবং আশঙ্কাজনক ভবিষ্যতের কথা ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিল না, তারাই পাখীর কথার মধ্যে সেই রঙের ছোঁয়াচ পেয়ে মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠল, মুখে হাসি দেখা দিল। ব্যাপারটার মধ্যে 'রঙ' ছিল।

সুচাঁদের ওই 'হারামজাদা'টির নাম করালী। করালী এই পাড়ারই ছেলে। চন্দনপুরে রেলের কারখানায় কাজ করে করালী। কথায় বার্তায় চালে চলনে কাহারপাড়ার সকলের থেকে স্বতন্ত্র। কাউকেই সে মানতে চায় না, কিছুকেই সে গ্রাহ্য করে না। যেমন রোজগারে, তেমনই খরুচে। সকালে যায় চন্দনপুর, বাড়ি ফেরে সন্ধ্যায়। আজ বাড়ি ফিরে শিস শুনেই সে কুকুর আর টর্চ নিয়ে বেরিয়েছে। এই করালীর সঙ্গে পাখীর মনে মনে রঙ ধরেছে। তাই পাখী দিদিমার কথায় প্রতিবাদ ক'রে উঠল। ওদের এতে লজ্জা নাই। ভালবাসলে সে ভালবাসা লজ্জা বল, ভয় বল, পাড়াপড়শীর ঘৃণা বল, কোন কিছুর জন্যই ঢাকতে জানে না কাহারেরা। সে অভ্যাস ওদের নাই, সে ওরা পারে না। সেই কারণেই মধ্যে মধ্যে কাহারদের তরুণী মেয়ে বানভাসা কোপাইয়ের মত ক্ষেপে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে দাঁড়ায়। তার উপর পাখী বসন্তের মেয়ে, বসন্তের ভালবাসার ইতিহাস এ অঞ্চলে বিখ্যাত। তাকে নিয়ে সে এক পালা-গান হয়ে গিয়েছে এক সময়। গান বেঁধেছিল লোকে, "ও— বসন্তের অঙের কথা শোন।"

সে অনেক কথা। তবে বসন্তের মেয়ে পাখীর কথা এদিক দিয়ে আরও একটু স্বতন্ত্র। এই গাঁয়েই তার বিয়ে হয়েছে। কাহারপাড়ার পূর্বকালের মাতব্বর-বাড়ির ছেলের সঙ্গে। কিন্তু ভাগ্য মন্দ—সে রুগ্ন, হাঁপানী ধরেছে এই বয়সে। এদিকে পাখী ভালবেসেছে করালীকে। করালীকে সমাজের মজলিসে এইভাবে অভিযুক্ত করায় সে মজলিসের মধ্যেই দিদিমার কথার প্রতিবাদ ক'রে উঠল।

দিদিমাও পাখীকে খাতির করবার লোক নয়; সেও সুচাঁদ। সুচাঁদও পাখীর

মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ব'লে উঠল—ওঃ, অও যে দেখি মাখামাখি। বলি ওলো ও হারামজাদী! আমি যে নিজের চোখে ছোঁড়াকে ওই কত্তার থানে ওই কেলে কুকুরটাকে সাথে নিয়ে বাঁটুল ছুঁড়ে ঘুঘু মারতে দেখেছি।

ঠিক সেই সময় মজলিসের পিছন থেকে কেউ, অর্থাৎ করালীই ব'লে উঠল—কত্তা আমাকে বলেছে, তু যখন আমার এখানে বাঁটুল ছুঁড়ছিস, তখন আমি একদিন ওই বুড়ী স্থচাঁদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ব দড়াম ক'রে। তু সাবধান হোস বুড়ী, বিপদ তোরই। সে হা-হা ক'রে হেসে উঠল। তার হাসির দমকায় মেয়েদের হাসিতে আরও একটু জোরালো ঢেউয়ের দোলা লাগল।

বনওয়ারী হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল—অ্যাই করালী!

করালী হেসে উঠে বললে—ওরে 'বানাস্' রে! ধমক মার যে?

—ব'স্ ব'স্। ব'স্ হারামজাদা, তু ব'স্।

—দাঁড়াও, আসছি আমি।

—কোথা যাবি?

—যাব।—হেসে বললে—দেখে আসি কাণ্ডটা কি? তাতেই তো কুকুরটাকে ছেড়ে দিলাম।

—না। কাণ্ড কি সে তোমার দেখবার পেয়োজন নাই। সে আমরা জানি। তোমাদের পাপেই সব হচ্ছে।

হা-হা ক'রে হেসে উঠল করালী।—কি? ওই বেহ্মদত্যি ঠাকুর? উঁহু।

—খবরদার করালী! মুখ খ'সে যাবে।

—এই দেখ! আমার মুখ খ'সে যাবে তা তোমাদের খবরদারি কেন?

ওদিকে বাঁশবনের মধ্যে কোথাও কুকুরটার চীৎকারের ভিতর হঠাৎ যেন একটা সতর্ক ক্রুদ্ধ আক্রমণোদ্যোগের সুর গর্জে উঠল। এই মুহূর্তে সে নিশ্চয় কিছু দেখেছে, ছুটে কামড়াতে যাচ্ছে। করালী একটা অতি অল্প-জোর টর্চের আলো জ্বেলে প্রায় ছুটেই পুকুরের পাড় থেকে নেমে বাঁশবাঁদির বাঁশবেড়ের গভীর অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। গোটা মজলিসটা স্তব্ধ হয়ে

গেল। করালীর কি অসীম স্পর্ধা, কি দুর্দান্ত দুঃসাহস! শুধু পাখীই খানিকটা এগিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে, ডাকলে—যাস না। এই যাস না বলছি। ওরে ও ডাকাবুকো! এই দেখ্! ওরে ও গোঁয়ার গোবিন্দ! যাস্ না! যাস না।

তার কণ্ঠস্বর ঢেকে গেল কুকুরটার একটা মর্মান্তিক আর্তনাদে।

বনওয়ারী বললে—হারামজাদা মরবে, এ তোমাকে আমি ব'লে দেঁলাম সুচাঁদপিসী।

কুকুরটা আর্তনাদ করতে করতে ছুটে ফিরে এল। সে এক মর্মান্তিক আর্তনাদ।

পিছন পিছন ফিরে এল করালী।—কালুয়া, কালুয়া!

কালুয়া মনিবের মুখের দিকে চেয়ে স্থির হবার চেষ্টা করলে, কিন্তু স্থির হতে পারলে না সে। কোন ভীষণতম যন্ত্রণায় তাকে যেন ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে পাক দিয়ে ফিরতে লাগল কালুয়া। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে প'ড়ে গেল মাটিতে, মুখ ঘষতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে গোঙাতে লাগল।

করালী তার পাশে ব'সে গায়ে হাত বুলাতে লাগল, কিন্তু কুকুরটা যেন পাগল হয়ে গিয়েছে, মনিব করালীকেও কামড়াতে এল। ছটফট করতে লাগল, মাটি কামড়াতে আরম্ভ করলে, কখনও মুখ তুলে চেঁচালে—অসহ্য যন্ত্রণ অভিব্যক্ত করলে, তারপরই মাটিতে মুখ ঘষলে।

করালী স্থির হয়ে ব'সে দেখছিল। তার টর্চটার দীপ্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণত হয়ে আসছে। হঠাৎ সে মৃদুস্বরে বিস্ময়ে ও আতঙ্কের সঙ্গে বললে—রক্ত!

—রক্ত!

—হাঁ।

সে আঙুল দেখালে—কালুয়ার নাকের ছিদ্রের দিকে। মুখ দিয়ে, না দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে। শেষে ঘটল একটা বীভৎস কাণ্ড। হঠা

চোখ দুটো ফুলে উঠে ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ধারা পড়ল কালো রোমের উপর দিয়ে। সমস্ত কাহারপাড়া দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল।

বনওয়ারী ভয়ার্ত বিজ্ঞস্বরে বললে—কর্তা।

কর্তা বোধ হয় খড়ম-সুদ্ধ বাঁ পাটা ওটার গলায় চাপিয়ে চেপে দিলেন।

দুই

সেই দিনই, শেষরাত্রে, তখন ভোরবেলা।

ঘুমের ঘোরের মধ্যে আর্তনাদ ক'রে উঠল বনওয়ারী। তার স্ত্রী গোপালীবালা চমকে জেগে উঠে তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলে—ওগো, বলি—ওগো! ওগো!

ফাল্গুন মাসের শেষ, বিশ তারিখ পার হয়ে গিয়েছে। কঠিন মাটির দেশ। এরই মধ্যে এখানে বেশ গরম পড়েছে, সন্ধ্যাবেলা বেশ গরম ওঠে; কিন্তু শেষরাত্রে শীত-শীত করে। বনওয়ারী বলে—গা-সিরসির করে। সমস্ত রাত্রি বনওয়ারীর ভাল ঘুম হয় নাই। শেষরাত্রে গায়ে কাঁথাটা টেনে নিয়ে আরামে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ বু-বু ক'রে চীৎকার করে উঠল। গোপালীবালা তাকে ঠেলে তুলে দিলে—ওগো—ওগো!

বনওয়ারী ঘুম ভেঙে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল। তারপর উঠে বসল।

গোপালীবালা জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছিল? স্বপন দেখছিলা না কি গো? এমন করে চ্যাচালা কেনে গো! সেও কাঁপছিল ভয়ে।

—হুঁ। একবার তামুক সাজ্ দেখি।

—কি স্বপন দেখলা বল দি-নি? এমন ক'রে তরাসে বুবিয়ে উঠলে কেনে গো?

—কত্তা আইছিলেন। হাত দুটি জোড় ক'রে কপালে ঠেকালে বনওয়ারী।

—কত্তা! শিউরে উঠল গোপালী।

হুঁ কত্তা। পিসীর কথাই ঠিক গোপালী। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে—লে, শিগগির তামুক সাজ্। খেয়ে আটপৌরে-পাড়া হয়ে তবে যাব নদীর ধারে। লইলে হয়তো দেখা পাব না।

—বাবার পূজো দিতে হবে। আটপৌরে-পাড়ার চাঁদা চাই।

পরম কাহার আটপৌরে-কাহারপাড়ার মাতব্বর। তার কাছে যাবে বনওয়ারী।

বাঁশবাঁদি পুরোপুরি কাহারদের গ্রাম—গ্রাম ঠিক নয়, ওই জাঙল গ্রামেরই একটা পাড়া। তবে জমিদারী সেরেস্তায় মৌজা হিসেবে ভিন্ন ব'লে—ভিন্ন গ্রাম বলেই ধরা হয়। ছুটি পুকুরের পাড়ে ছুটি কাহারপাড়া। বেহারা-কাহার এবং আটপৌরে-কাহার। বেহারা-কাহারপাড়াতেই চিরকাল লোকজন বেশি, প্রায় পঁচিশ ঘর বসতি ; পূব দিকে নীলের মাঠের বড় সেচের পুকুর নীলের বাঁধের চার পাড় ঘিরে বেহারাদের বসবাস। কোশকেঁধে-বাড়ির বনওয়ারী বেহারা-পাড়ার মুরুব্বি। বেহারা-কাহারেরা পাল্কী বয়। বনওয়ারীর পূর্বপুরুষ এক কাঁধে পাল্কি নিয়ে এক ক্রোশ পথ চ'লে যেত, কাঁধ পর্যন্ত বদল করত না—তাই ওদের বাড়ির নামই 'কোশকেঁধেদের' বাড়ি। ওদের বংশটাই খুব বলশালীর বংশ। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা, কিন্তু গড়ন-পিটনটা কেমন যেন মোটা হাতের ; অথবা গড়নের সময় ওরা যেন অনবরত নড়েছে ; পালিশ তো নাই-ই।

বেহারা-পাড়া থেকে রশিখানেক পশ্চিমে আটপৌরে-কাহারদের বসতি। 'গোরার বাঁধ' ব'লে মাঝারি একটা পুকুরের পাড়ের উপর ঘর ছয়েক আটপৌরে-কাহার বাস করে। আটপৌরেরা পাল্কী কাঁধে করে না, ওরা বেহারাদের চেয়ে নিজেদের বড় ব'লে জাহির করে। খুব ভাল কথা ব্যবহার ক'রে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে। বলে—আটপৌরে হ'ল—অষ্টপহরী।

অর্থাৎ 'অষ্টপ্রহরী'।

আসল অর্থ পাওয়া যায় চৌধুরীদের বাড়ির পুরানো কাগজে। সে সব কাগজ এখন প্রায় উইয়ে খেয়ে শেষ ক'রে এনেছে। উইয়ে-খাওয়া কাগজের স্তূপের মধ্যে কিছু কিছু এখনও পুরো আছে। তার মধ্যে ১২২৫-২৬ সালের

জমাওয়াসিল বাকি থেকে পাওয়া যায়—গোটা বাঁশবাঁদি মৌজাটাই ছিল উচ্চ ভূমি—ওখানে কোন পুকুরও ছিল না, বসতিও না। জাঙল গ্রামে মোটমাট দশ ঘর বাস্তর উল্লেখ পাওয়া যায়, সবাই তারা ছিল চাষী সদ্‌গোপ। ১২৫০ সালের কাগজে দেখা যায়—এক নতুন জমাপত্তন—নীলকর শ্রীযুক্ত মেস্তর জেনকিন্স সাহেবের নামে। সেই জমার মধ্যে সেই জাঙলের যাবতীয় পতিত ভূমি, তার সঙ্গে গোটা বাঁশবাঁদি মৌজাটাই প্রায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। জাঙলের পশ্চিম দিকে উঁচু ডাঙার উপর এখনও কুঠি-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ এবং হ্রদের পুকুর ব'লে একটা পুকুর দেখা যায়। ওই হ্রদের পুকুরের জল পাকা নালা বেয়ে এসে নীল পচানোর পাকা চৌবাচ্চাগুলি ভর্তি ক'রে দিত। সেখানটা এখন জঙ্গলে ভ'রে গিয়েছে এবং ওইখানেই বুনো শুয়োরের একটা উপনিবেশ গ'ড়ে উঠেছে। বাঁশবাঁদি মৌজা বন্দোবস্ত নিয়ে সায়েবরাই ওখানে পুকুর কাটায়, এবং বাঁশবাঁদির সমস্ত পতিতকে নীলচাষের জন্য হাঁসিল ক'রে তোলে। সেই হাঁসিল করবার জন্যই এই কাহারপাড়ার লোকেরা বাঁশবাঁদিতে আসে। এসেছিল অনেক লোক। তার মধ্যে এই কাহার কয়েক ঘরই এখানে বসবাস করে। কয়েকজন পেয়েছিল কুঠি-বাড়িতে চাকরি, লাঠি নিয়ে ঘুরত-ফিরত, আবার দরকারমত সাহেব মহাশয়ের ঘরদোরের কাজ করত; এজন্য তাদের জমি দেওয়া হয়েছিল, এবং এখানকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চব্বিশ ঘণ্টার কাজের জন্য চাকরানভোগীরা খেতাব পেয়েছিল—অষ্টপ্রহরী বা আটপৌরে। বেহারা-কাহারেরা, নীলের জমি চাষ করত এবং প্রয়োজনমত সাহেব-মেমদের পাল্কি বইত। নীলের জমি সেচ করবার জন্য বড় পুকুরটা কাটানো হয়েছিল ব'লে ওটার নাম 'নীলের বাঁধ'। আর 'গোরার বাঁধ' নামটা হয়েছে 'গোরা' অর্থাৎ সাহেবদের বাঁধ ব'লে। পুকুরটার জল ভাল—ওই পুকুরে সেকালে কারও নামবার হুকুম ছিল না, ওখান থেকেই যেত সাহেবের ব্যবহারের জল, মধ্যে মধ্যে কুঠিয়াল সাহেবের কাছে সমাগত বন্ধু-বান্ধব গোরা সাহেবেরা এসে স্নান করতে নামত। স্নান করত নাকি উলঙ্গ হয়ে। সেই আমল থেকে কাহারদের কয়েকটা ঘরে রূপ এসে বাসা বেঁধেছে। পরম কাহারদের গুষ্টিটার

রঙই সেই আমল থেকে ধবধবে ফরসা। স্চাঁদপিসীর কর্তাবাবা অর্থাৎ বাবার বাবার রঙ ছিল একেবারে সাহেবের মত। স্চাঁদপিসীর রঙও ফরসা। মেয়ে বসন্ত খুব ফরসা নয়। কিন্তু ওর মেয়ে পাখী তো একেবারে ‘হলুদমণি পাখী’; চৌধুরীবাড়ির কর্তার ছেলে অকালে ম’রে গেল মদ খেয়ে, নইলে যুবতী পাখীর এখনকার মুখের সঙ্গে তার মুখের আশ্চর্য মিল দেখা যেত। তেমনই বড় বড় চোখ, তেমনই সুডৌল নাক, চুলের সামনেটা পর্যন্ত তেমনিই ঢেউ-খেলানো। চৌধুরীকর্তা আজ নিঃস্বও বটে, তার উপর হাড়কৃপণও বটে, তবু তিনি বসন্তের মেয়ে পাখীকে মায়া-মমতা করেন। বসন্তের ও-বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ আজও ঘোচে নাই, সে আজও ও-বাড়ি যায়, খোঁজখবর করে, দুধের রোজ দেয়, কিন্তু টাকার তাগাদা করে না।

এই চৌধুরীকর্তার বাবার বাবা ছিলেন সাহেবদের নায়েব। তিনি নাকি ছিলেন লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ, আর তেমনই নাকি ছিলেন জবরদস্ত জাঁহাবাজ বেটাছেলে; তাঁর দাপে নাকি বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খেত। তাঁকেই দয়া করেছিলেন এই বেলবনের মহারাজ—যিনি নাকি এখানে ‘কর্তা’ ব’লে পরিচিত—গেরুয়া কাপড় প’রে, খড়ম পায়ে, দণ্ড হাতে, গলায় রুদ্রাক্ষ আর ধবধবে পৈতের শোভায় বুক ঝলমলিয়ে, ন্যাড়া মাথায় যিনি রাত্রে চারদিকে ঘুরে বেড়ান। চন্দনপুরে ভদ্রলোকেরা বলে—ও-কথাটা নেহাতই কাহারদের রচনা করা উপকথা। আসল কথা নীলকুঠি সব জায়গায় যেমন ভাবে উঠেছে এখানেও তেমন ভাবেই উঠেছে, তবে কোপাইয়ের বান আর কুঠি-ওঠা একসঙ্গে ঘটেছে। সে সময় কুঠিয়াল সাহেবদের চলছিল খারাপ সময়, কারবার উঠিয়ে দেবার কথাই চলছিল, সেই সময় হঠাৎ একদিন রাত্রে কোপাই ভাসল। তেমন ভাসা কোপাই নাকি কখনও ভাসে নাই। সে বান কুঠি-বাড়ি পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছিল। লোকে বলে, সাহেব-মেম সেই বানে ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু স্চাঁদপিসী যে-কথা বললে, সেইটাই হ’ল আসল কথা। সেই কথাটাই বিশ্বাস করে বনওয়ারী। ওই কর্তার কথা অমান্য করতে গিয়েই সাহেব মহাশয় মেমকে নিয়ে তলিয়ে গেল ঘুরনচাকির মধ্যে প’ড়ে। নইলে সাহেব মেম—

যারা সাত সমুদ্দর পার হয়ে ভাসতে ভাসতে আ[illegible]নতে সবিস্তারে কালো-যাবে ম'রে? কর্তার লীলা, কর্তার ছলনা সব। চৌধুরী ক[illegible]। বললে—শুধু যখের ধনই পেলেন না, সাহেব কোম্পানীর তামাম সম্পত্তিও পেয়ে [illegible]'রে জলের দামে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

চৌধুরীকর্তাদের আমলেও কাহাররা বেহারার কাজ করেছে। চৌধুরীদের পাল্কি ছিল দুখানা। ডুলি ছিল খান চারেক। আটপৌরেরা তাঁদের বাড়িতেও আটপৌরের কাজ করেছে।

* * *

পুরানো কথা যাক; আজকের কথাই বলি। বনওয়ারী পরমের বাড়ি এসে দেখলে, এই ভোরবেলাই পরম বেরিয়ে গেছে। পরমের বউ কালোশশী এই গাঁয়েরই দৌহিত্রী। আটপৌরেদের গোরাচাঁদের বেটীর বেটী! এই গাঁয়েই মানুষ হয়েছে কালোশশী। গোরাচাঁদের ছেলে ছিল না—বড় মেয়ের মেয়েকে নিয়ে মানুষ করেছিল। সুতরাং কালোশশীর সঙ্গে কথা বলতে বউ-মানুষের সঙ্গে কথা বলার সঙ্কোচ ছিল না। তার উপর এককালে বনওয়ারীর সঙ্গে তার নাকি মনে মনে 'রঙ ছুঁই ছুঁই' এমন অবস্থা হয়েছিল। সে অনেক কথা। কাহার-কন্যে কালোশশীর জন্যে সেকালে বোধ হয় দেবতারাও পাগল হয়েছিলেন। কিন্তু তার মন কেউ পায় নাই। পেয়েছিল বনওয়ারী। কিন্তু হায় রে 'নেকন'! আটপৌরে-কাহার-কন্যে বেহারা-কাহারের ঘরে আসে কি ক'রে? হায় রে 'নেকন'!

সে-দিনের কথা মনে পড়লে বনওয়ারীর এই বয়সেও বুকের ভিতরটা তোলপাড় ক'রে ওঠে। রাত্রে উঠে দু'জনে গিয়ে মিলত কোপাইয়ের কুলে। গান গাইত কালোশশী। আকাশে উঠত—'চন্দশশী'।

আটপৌরে-পাড়ার ছোঁড়ারা পাহারা দিত; বনওয়ারীকে পাকড়াও করবার জন্যে তাদের সে কি চেষ্টা! কিন্তু লবডঙ্কা! একদিনও ধরতে পারেনি তারা। বনওয়ারী হাসত আর গান করত—সুরুৎ করে চলে যাব গিরগিটির মতন, চোখে চোখে রাখবি কতক্ষণ! ওরা আক্রোশে জ্বলত। ওদের সর্দার পরম

রঙই সেই আমল থেকে ধব র ঝগড়াও করত। কতবার যে দু-চারটে করে কিল বাবার রঙ ছিল এ ন হয়েছে পরমের সঙ্গে তার ঠিক নাই। শেষে পরমের হাতে বয়স্ক খ কালোশশী। কপাল কালোশশীর! পরমের হাতে প'ড়ে ওর আর দুর্গতির শেষ নাই। কালো-বউকে বিয়ে ক'রেও পরম ভালবাসলে এক ভিন-জাতের-কন্যাকে; তার উপর মন্দ সঙ্গে মিশে ধরলে ডাকাতি। কালো-বউ মনের আক্রোশে চন্দনপুরে রেজা খাটতে গিয়ে নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল। পরমের দ্বীপান্তরের সময় চন্দনপুরে বাবুদের বাড়ির ঝি-বৃত্তি করলে, আর বাবুদের চাপরাসী সিংজীর অনুগৃহীতা হয়ে রইল।

পরম দ্বীপান্তর থেকে ফেরার পর কালোশশী গাঁয়ে এসেছে। কালোশশীর অনেক দুর্নাম, অনেক কলঙ্ক,—মানুষটা যত বড়, তার চেয়েও বড় তার কলঙ্ক।

আজ কালো-বউ একগাল হেসে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে বললে—কি ভাগ্যি, সকালেই তোমার মুখ দেখলাম! ব'স।

—পরমদাদা গেল কমনে, তাই কও।

—দাদার তরেই আইছিলা তা হ'লে? হাসলে কালোশশী!—তা সে তো তোমার এই খানিক আগে বেরিয়ে গেল। ওই হুঁকোর মাথায় কল্কিতে আগুনও নেবে নাই এখনও। খাও কেনে তামুক।

—কি বেপদ দেখ দি-নি!

—কেন? বেপদটা কি হ'ল? ব'স, আমার সাথে খানিক গল্প কর নিশ্চিন্দি। মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল কালো-বউ।

—বলি, হাসি তোমার আসছে?

—কেনে? তোমাকে দেখে হাসি আসবে না কেনে?

—বলি কাল 'আতে' সনজে কালে শিস শোন নাই?

কালো-বউ এবার শঙ্কিত হয়ে উঠল।—হাঁ, তা শুনেছি ভাই।

—তবে?

তবের ব্যাপারটা হ'ল—রাত্রির অন্ধকার কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবনাটা কালো-বউ ভুলে গিয়েছে।

বনওয়ারী এবার বসল। হুঁকোটা নিয়ে টানতে টানতে সবিস্তারে কালোশশীকে বললে করালীর কুকুরটার রোমাঞ্চকর ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা। বললে—তোমাকে বলব কি ভাই, একেবারে মুখে 'অক্ত' তুলে মাথা কাছড়ে ম'রে গেল। শেষকালে হ'ল কি—

মুখের কাছ থেকে হুঁকোটা সরিয়ে ধরলে বনওয়ারী—তার চোখে মুখে ফুটে উঠল অপরিসীম আতঙ্ক, গায়ের রোমগুলি কাঁটার মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

কালোশশী মুখ হাঁ ক'রে শুনছিল। হাতে ঝাঁটা নিয়ে সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বনওয়ারী বললে কুকুরটার চোখ ফেটে যাওয়ার কথা। বললে—ফোস্কার মত ফুলে উঠে ফ-টা-স ক'রে ফেটে গেল। আর গলগল ক'রে অক্ত।

শিউরে উঠল কালোশশী।—ওঃ, মাগো!

বনওয়ারী বললে—তাই এয়েছিলাম পরমদাদার কাছে; পিতিবিধেন তো করতে হবে।

—তা হবে বইকি! কত্তার 'আশ্চয়ে' বাস ক'রে কত্তার কোপে প'ড়ে বাঁচব কি ক'রে?

—সেই তো। তা তোমরা করছ কি?

—আমরা? হঠাৎ কালোশশী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল তার স্বামীর উপর।—আমার কপালে ঝাঁটা আর তার কপালে ছাই—বুঝলা দেওর, তার কপালে ছাই। এ পাড়ার অদেষ্টই মন্দ। বুঝলা না? মাতব্বর যদি মাতব্বরের মত হয় তো দশের জন্যে ভাবে। সে কি আর তুমি ভাই! সে হ'ল—'ফরম' আটপৌরে। 'আতদিন' নিজের ভাবনা, জমি-পয়সা আর ওই পয়সা-জমি। কাল 'আতে' সবাই শুনেছে শিস। ভয়ও সবাই পেয়েছে। কিন্তু কি হবে? মাতব্বর গেল চন্ননপুরে, বড়বাবুদের কাছারিতে। তামাম সাহেবডাঙা কিনেছে বাবুরা, শুনেছ তো?

চমকে উঠল বনওয়ারী। কথাটি তার কাছে একটা মূল্যবান কথা। সে প্রশ্ন করলে—সকালে উঠে সেখানেই গিয়েছে বুঝি?

—আবার কোথা? বলব কি দেওর, 'আতে' স্বপন দেখে কথা কয়—বিড়বিড় ক'রে ওই কথা। 'নয়ানজুলি', 'ছেঁচের জল', 'দে কেটে দে', 'কোদালে ক'রে মাথা কুপিয়ে দোব'—এই কথা।

বনওয়ারী অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে গেল। চন্নপুরে বড়বাবুরা রাজাতুল্য লোক, মস্ত কয়লার ব্যবসা। তাঁরা হঠাৎ জমির উপর নজর দিয়েছেন। পতিত জমি যেখানে যা আছে কিনে চলেছেন। জমি কাটাবেন। কতক নিজেরা কাটিয়ে চাষ করবেন, কতক প্রজাবিলি করবেন। পরমদাদা ভারি বুদ্ধিমান লোক। খোঁজখবর অনেক রাখে। সে ঠিক গিয়ে হাজির হয়েছে বাবুদের দরবারে। আর সে কি করছে? নাঃ, ছি ছি ছি!

বনওয়ারীর সমস্ত বৈষয়িক কাজগুলি মনে প'ড়ে গেল। জাঙলে মনিব-বাড়ি যেতে হবে। ধান পিটানো শেষ হয়ে গিয়েছে—এখনও বছরের দেনা-পাওনার হিসাব হয় নাই। সেখানে একবার যাওয়া উচিত। তারপর একবার চন্নপুর যেতেই হবে। হাঁ, যেতেই হবে। কালো-বউয়ের কথাগুলি বনওয়ারীর কানে আর যাচ্ছেই না প্রায়।

কালোশশী ব'লেই চলেছিল—পাশে আমি যে একটা মানুষ শুয়ে থাকি তো অসুখ-বিসুখ কি দেহ খারাপ হ'লে যদি কাতরে কাতরে ম'রেও যাই, তবু তার ঘুম ভাঙে না। বললে বলে কি জান? বলে—নাক ডাকে, তাতেই শুনতে পাই না। সে নাক ডাকা যদি শোন।

কালোশশী মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল।

বনওয়ারী হঠাৎ উঠে পড়ল। হুঁকোটা ঠেসিয়ে রেখে দিয়ে বললে—আমি ভাই তা হ'লে উঠলাম।

—ব'স, ব'স। আর একবার না হয় তামুক সেজে দি।

—আমারও তো কাজকম্ম আছে ভাই। মুনিব-বাড়ি যেতে হবে। তা' পরে—। থেমে গেল বনওয়ারী। চন্নপুর যাওয়ার অভিপ্রায়ের কথাটা আর বললে না সে। হাজার হ'লেও কালোশশী পর।

কালোশশী তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে আক্ষেপের

একটা শব্দ ক'রে বললে—হা-রে, হা-রে! সব পুরুষই এক। ওই কাজ, কাজ আর কাজ! মুখে তার এক বিচিত্র অভিব্যক্তি ফুটে উঠল।

বনওয়ারী একটু অপ্রস্তুত হ'ল। সে হাসতে চেষ্টা ক'রে বললে—তা ভাই, কাজ করলেও সে তো সবই তোমাদের জন্যেই। 'ওজগার' ক'রে 'সমপ্পন' তো তোমাদের হাতেই।

বলতে বলতে সে বেরিয়ে এল পরমের বাড়ি থেকে। নইলে এ কথাতেও কালোশশীর কথায় ছেদ পড়বে না।

কাজ অনেক। বনওয়ারীর কি একদণ্ড ব'সে থাকলে চলে? ভাই কালোশশী, তোমাকে ভাল তো বাসি, কিন্তু উপায় কি? রঙের ছাপ একবার মনে লাগলে কি আর ওঠে? হোক না দেখা এক যুগ পরে, দেখা হ'লেই দুজনের ঠোঁটেই হাসি ফোটে। ওই রঙটার রকমই হ'ল পাকা। একবার ছুঁলে, ঘ'ষে ঘ'ষে 'হিয়ে' ক্ষ'য়ে ফেললেও ওঠে না। কিন্তু যার উপায় নাই, তার জন্যে কেঁদে কেটে মনখারাপ ক'রেই বা লাভ কি? তোমার মায়ের বাপ যে তখন 'বেহারা-কাহার' ব'লে তোমাকে দিলে না বনওয়ারীর হাতে! আর পরমের সঙ্গে যখন তোমার বিয়ে হয়ে গেল, তখন বনওয়ারী আর হেসে দুটো কথা ক'য়ে করবে কি? আর তেমন জাতের মানুষও নয় বনওয়ারী। কর্তব্যধর্ম ব'লে একটা কথা আছে। একটা পাড়ার মাতব্বর সে। হরিবোল! হরিবোল! 'পভু', তুমিই বনওয়ারীকে বাঁচিও। বাঘ-শুয়োর-সাপ-ঝড়-বান—এসব থেকে বাঁচাতে বলে না বনওয়ারী, বনওয়ারীকে তুমি এই সব অন্যায় করণ থেকে বাঁচিও।

কাজ অনেক। পাড়ায় ফিরে সুচাঁদপিসীকে বলতে হবে—যেন প্রতি বাড়ি ঘুরে পূজোর চাঁদা আর চাল তুলে রাখে। যে মেয়েগুলান ঘুঁটে মাথায় ক'রে, দুধ নিয়ে চন্ননপুরে যাবে, দুধ ও ঘুঁটে বেচে তারপর সারাদিনটা সেখানে বাবুদের ইমারতে মজুরনী খাটবে, তাদেরই ব'লে দিতে হবে—অবসর ক'রে কেউ যেন কাছারিতে পরমের সঙ্গে দেখা ক'রে সকাল সকাল তাকে বাড়ি ফিরতে বলে। যদি তার চন্ননপুরে যাওয়া আজ নাই হয়! মুনিব-বাড়িতে যদি আটক পড়েই

যায় কোন রকমে, সেই জন্যই এই ব্যবস্থা ঠাওরালে সে। মুনিব-বাড়িতে তো রকমের অভাব নাই! খামারটা সাফ কর্, নয়তো কাঠের গাদিটা থেকে কতকগুলো কাঠ ছাড়িয়ে দিয়ে যা, নয়তো গরুর জাব-খাওয়া ডাবরগুলোর গায়ে মাটির লেপন দে; নিদেন কলার ঝাড়ের মধ্যে পুরনো 'এঁটে' পচেছে, খুঁড়ে তুলে ফেল্। আর হিসেব? হিসেবে বসলেই তো এক বেলা।

আটপৌরে-পাড়া থেকে নিজেদের পাড়ায় ফিরে প্রথমেই তাকে দাঁড়াতে হ'ল করালীর বাড়ির উঠানে। করালী উঠানেই একটা গর্ত খুঁড়ছে, আর পাখী করালীকে তিরস্কার করছে।

—প'চে গন্ধ উঠবে যে!

করালী মাটি কুপিয়েই চলেছে। ছোঁড়াটার দেহখানা শক্ত বটে। আচ্ছা জোয়ান হয়ে উঠেছে! এরই মধ্যে শরীরের—বিশেষ ক'রে বুকের পিঠের হাতের পায়ের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে, তার উপর ঘেমেছে—চক-চক করছে সর্বাঙ্গ। আজ রবিবার—ছোঁড়ার ছুটি, তাই চন্ননপুর না গিয়ে বাড়িতে কুকুরটার জন্যে সমাধি খুঁড়তে আরম্ভ করেছে।

পাখী চেঁচিয়েই চলেছে—কথা শুনছিস? না, কানে যেছে না?

—চেঁচাস না মেলা বকবক ক'রে। করালী মাটি কোপাতে কোপাতেই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে। কালুয়া কুকুরটাকে সে এইখানেই সমাধি দেবে। কালুয়ার হাড় মাস যে চিল শকুন শেয়ালে ছিঁড়ে খাবে, সে করালীর সহ্য হবে না।

—বাড়িতে টেঁকা দায় হবে। ভাতের গরাস মুখে তুললে বমি আসবে বদ 'ঘেরানে'।

—তা তোর কি? আমার বাড়ি আসিস্ না তুই।

—ওরে মুখপোড়া, ওরে নেমকহারাম! তোর মতন নেমকহারাম বজ্জাত কেউ আছে নাকি? বলে যে সেই—'যার লেগে মরি, তার ঘা সইতে নারি', তাই তোর বিত্তান্ত। তা আমার ঘেরান না লাগুক, আমি তোর বাড়িতে না আসি, নসুদিদিও তো মানুষ। সে থাকতে পারবে কেনে?

বনওয়ারী করালীর বাড়ি না ঢুকে পারলে না। বনওয়ারীকে দেখেই পাখী ব'লে উঠল—এই দেখ মামা; কি করছে দেখ। বাড়িতে কুকুর পুঁতবে—'সামাজ' দেবে। বারণ কর তুমি। নসুদিদি নাই, উ যা-খুশি তাই করছে।

বনওয়ারী বলে—এই, বলি, হচ্ছে কি? বাড়ির উঠোনে ভাগাড় করে কে? তুই কি খ্যাপা, না, পাগল?

করালীর টামনার কোপে মাটিতে একটা ফাট দেখা দিয়েছিল—ফাটলে টামনার চাড় দিয়ে সেই মাটির একটা চাপ ছাড়াবার চেষ্টা করছিল দাঁতে দাঁত টিপে, প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ ক'রে। সে কোনও উত্তর দিলে না। পাখী বললে—আবার বলছে কুকুর পুঁতে যাবে বাঁশবেড় খুঁজতে।

—বাঁশবেড় খুঁজতে! বিস্ময়ের সীমা রইল না বনওয়ারীর।

—হ্যাঁ। কিসে শিষ দেয়, কিসে মেরেছে ওর কালুয়াকে, তাই খুঁজে দেখবে।

সর্বনাশ! হে ভগবান! হে বাবা কত্তাঠাকুর - তোমার লীলাখেলার নিরাকরণ করতে চায় ছোঁড়া! একের পাপে দশ নষ্ট হবে! মুহূর্তে সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

—করালী!

করালী এ আওয়াজ শুনে চমকে উঠল, টামনটা ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে খানিকটা স'রে দাঁড়াল। ঘুরে তাকালে সে বনওয়ারীর দিকে।

বনওয়ারীর এই কণ্ঠস্বরকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। বনওয়ারী সহজে অত্যন্ত ভালমানুষ লোক, পাড়ার মাতব্বর হ'লেও মাতব্বরির কোন ঝাঁজ নাই, কোন অহঙ্কার নাই। হাসি-খুশি নাচ-গান মিষ্টি কথা নিয়েই আছে, কারও সঙ্গে কারও ঝগড়া-বিবাদ হ'লে—দুজনকেই বুঝিয়ে-সুজিয়ে গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দেয়; দেখে মনে হয়, গরজ যেন বনওয়ারীরই। কিন্তু আর এক বনওয়ারী আছে। কালে কস্মিনে সে দেখা দেয়! সে দেখা দেবার আগে প্রথমেই এই আওয়াজ তুলে সে সাড়া দেয়, সেই বনওয়ারী জাগছে।

সে বনওয়ারী জাগলে বিদ্রোহীকে তৎক্ষণাৎ অসুরের মত শক্তিতে আক্রমণ ক'রে মাটিতে ফেলে, বুকে চেপে ব'সে, বাঁ হাতে টিপে ধরে গলা, ডান হাতে টেনে ধরতে চেষ্টা করে জিভ। তখন পাঁচ-সাতজন জোয়ান ভিন্ন সে বনওয়ারীকে টেনে সরানো যায় না।

বনওয়ারীর চোখ লাল হয়ে উঠেছে। সে এগিয়ে আসতে আরম্ভ করলে করালীর দিকে। পাখী এবার সামনে এসে ভয়ার্ত স্বরে বললে—না, মামা, না। ও আর সে সব করবে না।

করালী কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, স্থিরদৃষ্টিতে বনওয়ারীকে দেখছে। মুহূর্তে চোখে ফুটছে শঙ্কা, আবার পর-মুহূর্তে জ্বলে উঠছে বিদ্রোহ!

বনওয়ারী পাখীকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। পাখী পিছন থেকে তার হাত ধরতে চেষ্টা করলে—মামা! মামা! তবু বনওয়ারী নীরবে এগুচ্ছে।

শেষে, নিরুপায় হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল পাখী—ও দিদি, দিদি গো! ও দিদি! দিদি অর্থাৎ সুচাঁদ। এ সময়ে এক সুচাঁদ পারে বনওয়ারীর সামনে দাঁড়াতে।

বনওয়ারী উত্তরোত্তর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে, এমন ভাবে আজও কেউ তাকে অপমান করে নাই। সে এগিয়ে চলল। তবু করালী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

করালীটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, হঠাৎ যেন সাহস তার ভেঙে পড়ল, মুহূর্তে সে লাফ দিয়ে উঠানের বেড়াটা ডিঙিয়ে ওপাশে প'ড়ে ছুটে পালাল মাঠে মাঠে। বনওয়ারীও খানিকটা ছুটল; কিন্তু বয়স হয়েছে বনওয়ারীর, ছুটলে হাঁপ ধরে। এমনি পাল্কি কাঁধে 'সওয়ারী' বহনের অভ্যস্ত চালে কাঁধ বদল ক'রে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম নিয়ে বিশ কোশ হাঁটতে পারে, কিন্তু এমনভাবে ছুটতে আর পারে না। থামতে হ'ল বনওয়ারীকে। ওদিকে গাঁয়ের ধারে দাঁড়িয়ে সুচাঁদপিসী হাঁকছে। মেয়ে ছেলে সব জ'মে গিয়েছে। প্রহ্লাদ রতন এগিয়ে আসছে। বনওয়ারী অগত্যা ফিরল। যাক হারামজাদার বাচ্চা—এখন যাক; কিন্তু যাবে কোথা? ফিরতে হবে, না, ফিরতে হবে না? কার এলাকায় ফিরবে?

* * *

ফাল্গুন মাসের সকালবেলা, তাই কাহারেরা বাড়িতে ছিল। কাহারপাড়ায় কাজকর্মের চাপ এখন কম ; মাঠে ক্ষেতে চাষ-কর্ম এখন বন্ধ, খামারে ধান-মাড়াইও শেষ হয়ে গিয়েছে ; রবি ফসলের পালাও প্রায় শেষ ; গম কারও পেকেছে, কারও পাকতে শুরু করেছে, ছোলা-মসুর-সরষে এ সবেরও ওই অবস্থা। আলুর জমির কাজও আর নাই। কেবল তুলতে বাকি। চৈত্রের প্রথম থেকে এক দফা ভিড় লাগবে আবার। কারও কারও আখ আছে—নাবি চাষের আখ, সেও মাড়াই হবে চৈত্র মাসে। এখন একমাত্র কাজ মুনিব-বাড়ির দেনাপাওনার হিসেব—সে হিসেব মুনিবদের হাতে। কাজেই পুরুষেরাও সকলে বাড়িতেই ছিল। তাই রক্ষা হ'ল।

প্রহ্লাদ রতন বনওয়ারীর সমবয়সী। ওরা এগিয়ে এসে বনওয়ারীর হাত ধ'রে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। প্রহ্লাদ বললে—করালীর বিহিত যদি না হয় অতন, তা হ'লে তো কাণ্ড খারাপ। কেউ আর কাউকে মানবে না।

রতন বললে—তা হ'লে গেরামের 'পিতুল' নাই—এ একবারে 'ধ্রোব' কথা।

বনওয়ারী কোন কথা বললে না।

যে দিক দিয়ে ওরা পাড়ায় ঢুকল, সে দিক দিয়ে নিমতেলে পানুর ঘর সামনেই পড়ল। পানু নিমতলার পশ্চিম দিকে ছায়াটি যেখানে পড়ে, সকালবেলা সেইখানটিতে তালপাতার চাটাই বিছিয়ে তামাক সেজে মাতব্বরদের অভ্যর্থনা করলে।—ব'স বনওয়ারীদাদা, অতনদাদা, পেল্লাদখুড়ো,—ব'স, তামুক খাও।

একে একে জুটল সকলেই। সুচাঁদও এসে দাঁড়াল। বললে—বেশি 'আগ' করিস না বাবা বনওয়ারী, ছোঁড়াকে এনে তোর পায়ে ফেলে দিছি আমি।

বনওয়ারী এতেও কোন কথা বললে না।

সুচাঁদ বললে—আমার হয়েছে এক মরণ, বুঝলি বাবা—এই বুড়ো বয়েসে

হারামজাদী বেটীর বেটীকে নিয়ে এ এক বেপদ। গলায় কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটা ওঠেও না, নামেও না, তাই। সর্বনাশীর করালী ছাড়া সারা 'তিভুবন' খাঁ-খাঁ—খাঁ-খাঁ করছে। বুড়ীর সে হাত নাড়া দেখে এবার সবাই হেসে উঠল। শুধু হাত নাড়াই নয়, খানিকটা নেচেও দিলে। সে দেখে বনওয়ারীর মুখেও এবার অল্প একটু হাসি দেখা গেল। পানু ঘরের ভিতর থেকে একটা পাঁঠার কান ধ'রে টেনে এনে বললে—এই দেখ বনওয়ারীদাদা, এইটি। কাল 'আতে' এসেই আমরা 'স্তি-পুরুষে' এইটিকে কত্তার পূজোয় দোব ঠিক করেছি। এইটিই তোমার সবচেয়ে বড়, আর গায়েও বেশ আছে। বেশ তেজালো পাঁঠা।

বনওয়ারী পাঁঠার গায়ে হাত বুলিয়ে মেরুদণ্ডটা টিপে দেখে বললে, বেশ সাবধানে যতন ক'রে আখিস বাপু দুটো দিন। পূজো পরশু দোবই। শনিবার আছে; বারও পাব।

রতন বললে—আটপৌরে-পাড়ায় বলবে না ?

বনওয়ারী ঘাড় নেড়ে হতাশা প্রকাশ ক'রে বললে—তবে আর 'মেজাপ' খারাপ হ'ল কেনে! সকালে—সেই ধর পেথম—কাক-কোকিল ডাকতে ঘুম ভেঙেছে। সমস্ত 'আত' ভাবনায় ঘুম হয় নাই। ভোর 'আতে' চোখ লেগেছেল খানিক—তা তোমার, সঙ্গে সঙ্গে স্বপন হয়ে গেল। দেখলাম যেন, ঠিক কত্তা এসে দাঁড়িয়েছেন মাথার 'ছিয়রে'। বু-বু ক'রে ঘুম ভেঙে গেল। উঠলাম। উঠেই গেলাম পরমের বাড়ি। তা পরম সেই ভোরেই বেরিয়েছে। তা, ব'লে এলাম কালো-বউকে—বলি, ব'লো পরম এলো।

রতন প্রহ্লাদ দুজনেই একটু হাসলে বনওয়ারীর মুখের দিকে চেয়ে। মজলিসের সকলে—স্ত্রী-পুরুষ সকলেই হাসলে। তারা অবশ্য গোপন ক'রে হাসলে।

বনওয়ারী অনুভব করতে পারলে গুপ্ত হাসির ধারার সরস স্পর্শটুকু! সে কথাটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যই বললে—সে গিয়েছে তোমার চন্ননপুরে বাবুদের বাড়ি। বাবুরা নাকি গোটা সায়েবডাঙা কিনেছে। ডাঙা ভেঙে জমি করবে। 'খানিক আদেক' জমি বিলিও করবে শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে সবার

মন ঘুরে গেল; বনওয়ারী—কালো-বউয়ের কথা থেকে লুব্ধ হয়ে ছুটল জমির দিকে।

এটা একটা খরচ বটে। নীলকুঠি সাহেবদের সেই ডাঙাটা, যেখানে বন্যা থেকে বাঁচবার জন্য তারা ঘর-দোর করেছিল, কুঠি করেছিল, সেই ডাঙাটা ভেঙে জমি হবে। বিলিও করবে কিছু জমি। এবং তাদেরই একজন সে জমি বিলি নেবার জন্য ভোরবেলায় গিয়ে ধরনা দিয়ে ব'সে আছে। মুহূর্তে সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠল। জমি! জমি!

বনওয়ারী বললে, আমি একটা কথা ভাবছিলাম। শুনছ অতন-ভাই, পেল্লাদ-খুড়ো!

রতন প্রহ্লাদ উৎসুক হয়ে বনওয়ারীর মুখের দিকে চেয়ে ব'সে-ব'সেই খানিকটা কাছে এগিয়ে এল।—কি বল দি-নি? কথাটা কিন্তু সকলেই বুঝতে পেরেছে। এক চাপ ছোলা-কলাই যখন ভিজে ফুলে ওঠে, তখন যেমন সবগুলি ছোলা থেকেই অঙ্কুর বার হয়ে মাটি ফাটিয়ে উপরের দিকে একসঙ্গে ওঠে, তেমনিভাবে এই খবরের অন্তর্নিহিত আশার সরসতায় সকল কাহারের অন্তর থেকে একই আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কাছাকাছি ব'সে পরস্পরের মনের খবর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে পরস্পরকে ছুঁয়ে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছে। কিন্তু তবু কথাটা বনওয়ারীর কাছে থেকে আসাই ভাল। বনওয়ারীরও কথাটা বলাই ভাল। কথাটা একদিন প্রকাশ পাবেই, এবং নিজে জমি নিয়ে সে যদি কথাটা কাহারদের কাছে গোপন ক'রে রাখে, তবে সেটা তার অর্ধম হবে এবং মাতব্বরেরও যোগ্য হবে না। সে বললে, আমাদের সব চল কেনে চন্ননপুর। জাঙলের সায়েবডাঙার জমি তো তোমার ধরগা যেয়ে কম লয়; সেরেস্তায় তিন শো বিঘের ডাক। আমরা সবাই মিলে দু বিঘে এক বিঘে ক'রে—। বনওয়ারী সকলের মুখের দিকেই তাকালে।

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে, চোখগুলি জ্বলজ্বল করছে—কয়লার মধ্যে পড়া আগুনের ফিন্‌কির মত।

কি বল ?

সুচাঁদ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে নাই। সে দূরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলে, করালীর আচরণে সকলের মুখে হঠাৎ যেন সকল বিরক্তি এবং রাগ মুছে গিয়ে একটি প্রসন্ন দীপ্তি ফুটে উঠল। কোন্ সে বিস্ময়কর সংবাদ, যার মধ্যে সর্বজনীন প্রসন্নতার কারণ লুকানো আছে ? তার উপর বনওয়ারীর কথা বলবার ভাবের মধ্যে বেশ একটি শলাপরামর্শ করার ভঙ্গিও সে দেখতে পেলে।

এগিয়ে এসে সে বললে—কি ? কি রে বনওয়ারী ? কি বলছিস তোরা ?

প্রহ্লাদ হেসে বললে, লাও ঠ্যালা ! এখন ঢাকঢোল বাজিয়ে পাড়া গোল ক'রে বল।

সুচাঁদ তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—মস্করা করছিস আমার সঙ্গে পেল্লেদে, মুখপোড়া ছুঁচো ?

শুনতে না পেলেও বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখনাড়া এবং মুখভঙ্গি থেকে সুচাঁদ নির্ভুল ধরতে পারে যে, তাকেই তারা ঠাট্টা করছে। এবার নিশ্চয় চীৎকার ক'রে কেলেঙ্কারি করবে বুড়ী। একমাত্র উপায় ব্যাপারটা বলা ; বললে বুড়ী মস্করার জ্বালাটা ভুলতে পারে। সুতরাং কথাটা তাকে বলতে হয় তাই বললে বনওয়ারী। কাছে বসিয়ে চীৎকার ক'রে হাত নেড়ে, বুঝিয়ে বললে সব। সুচাঁদ বললে—হ্যাঁ, তা ভাল যুক্তি বটেন। ওই নদীর উ-পারে বুঝলি কিনা—

বনওয়ারী উঠে পড়ল। সুচাঁদপিসীর 'বুঝলি কিনা' বুঝতে গেলে এ বেলা কাবার হয়ে যাবে। এমনিতেই করালী-শয়তানের পাল্লায় প'ড়ে দেরি হয়ে গিয়েছে।—ভেবে-চিন্তে হঠাৎ সে উঠে পড়ল। তারপর চীৎকার ক'রে সুচাঁদকে বললে—তুমি তা হ'লে পুজোর পয়সা চাল আদায় ক'রো পিসী, বুঝলে ?

—পুজোর ? কত্তার পুজোর ?

—হ্যাঁ গো। না হ'লে কল্যেণ নেই।

—অ্যা—অ্যাই। না হ'লে কল্যেণ নাই সে কথা বুঝবে কে? তা শোন্, আর একটি কথা বলি।

—কি ?

—জমি যদি লিবি, তবে পূজোতে আর একটি পাঁঠা জুড়ে দে। কত্তার আজ্ঞে নিয়ে করবি; আথোঁড়া পিথিবীর অঙ্গে চোটাবি;—কত কি না-জানা না-চেনা না-শোনা 'রোপোদ্দরব' আছে;—বুঝলি কিনা—না, কি বলিস ?

কথাটা মনে নিল সকলের। সকলে বনওয়ারীর দিকে চাইলে। সুচাঁদও চেয়ে রয়েছে তার মুখের দিকে। বনওয়ারীও ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, এ একটা কথার মত কথা। হ্যাঁ। ভাল বলেছ পিসী।

—কি বলছিস ?

চীৎকার ক'রে বনওয়ারী বললে—তাই হবেন গো।

সুচাঁদ খুশি হয়ে বললে—আ-চ্ছা। এই দেখ্, সে তোর বাপের আমলের কথা—

বনওয়ারী চীৎকার ক'রে বাধা দিয়ে বললে—সাতটার টেন পুল পেরিয়ে গেল। উ বেলায় শুনব।

রেলের লাইনটা চ'লে গিয়েছে গাঁয়ের পূবদিক দিয়ে। চন্নপুর স্টেশন ছাড়িয়ে লাইনটা কোপাই নদীর উপরে ব্রিজ বেঁধে পার হয়ে চ'লে গিয়েছে। হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবাঁদির নীলের বাঁধ; ও পুকুরের পাড় থেকে বেশ দেখা যায় ব্রিজটা। ওই ব্রিজে যে গাড়িগুলো পার হয়, তাই ধ'রে চলে কাহারপাড়ার জীবনের ঘড়ি। সকালে ছয়টায় একটা গাড়ি। তারপর সাতটায় গাড়ির সিগনাল পড়লেই পুরুষেরা কাজে বের হয়। আজ তাদের দেরি হয়ে গিয়েছে। তারপর যেই ওই সিগনাল দেখে সাতটার গাড়ি আসে—অমনি মেয়েরা বের হয়, খাটতে যায়, ঘুঁটে বেচতে যায়, দুধ বেচতে যায়।

সুচাঁদ ট্রেনের দিকে চেয়ে রইল। পুলে গাড়ি চাপলে যে শব্দ ওঠে, সে শব্দও তাকে কান পেতে মনোযোগসহকারে শুনতে হয়। গুরুগম্ভীর ঝমঝম শব্দের যে ক্ষীণ ধ্বনি তার কানে প্রতিধ্বনি তোলে, সেটুকু ভারি মিষ্টি ব'লে

মনে হয় সুচাঁদের। সুচাঁদ বলে—আতে যখন গাড়ি পুল পেরোয়, ঘরে চোখ বুজে শুয়ে আমার মনে হয় কেত্তনের দলের খোল বাজছে।

পুরুষেরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

বনওয়ারী ব'লে দিলে সকলকে—পরশু আসতে পারব না, আগাম আজ থেকে ব'লে 'এখো' যেন, হঁ্যা। নইলে আবার মনিবেরা বলবে—আগে বলিস নাই কেনে, আমার কাজ চলবে কি ক'রে?

* * *

জাঙলের ঘোষ-বাড়ির ভাগজোতদার বনওয়ারী। বনওয়ারীর বাপের আমল থেকে দু পুরুষ ধ'রে সম্বন্ধ। জাঙলের ঘোষ-বাড়ির যখন নিতান্তই সাধারণ গৃহস্থের অবস্থা, তখন থেকে বনওয়ারীদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ। বুড়ো ঘোষকর্তা যিনি এই সেদিন মারা গিয়েছেন, তখন তাঁর অল্প বয়স—ছোকরা মানুষ, তখন তিনি সত্ত পিতৃহীন হয়ে বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়াতেন আর ওই চন্ননপুরে বড়বাবুদের নতুন শখের থিয়েটারে মেয়ে সেজে বক্তৃতা করতেন। বাড়িতে ছিল বিধবা মা আর অল্পবয়সী স্ত্রী এবং বিধবা বোন। কিন্তু দিন-গুজরানের কোন উপায় ছিল না। জমি না, জেরাত না, ঘোষের চাকরি না। ছেলে ভাবে না, ভাববার সময় নাই; তাই দিন চালানোর জন্য অনেক ভেবে বিধবা মা বনওয়ারীর বাপের কাছে একটি ঢেঁকি পাতবার কাঠ চেয়ে নেয়। এই হ'ল সম্বন্ধের সূত্র। বনওয়ারীর বাপ সেবার কোপাইয়ের বানে একটা বেশ বড় কাঠ ধরেছিল, তারই একটা অংশ সে দিয়েছিল। বউয়ের কানের মাকড়ি বিক্রি ক'রে ছুতোর ডেকে সেই কাঠে ঢেঁকি পেতে ধানভানার কাজ নিয়েছিল ঘোষগিন্নী। এ কাজেও তাকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করত বনওয়ারীর মা। এই অবস্থায় ছেলেকে বার বার রোজগারে মন দেওদার জন্য অনেক মিনতি ক'রে হতাশ হয়ে অবশেষে তিনি পাগল হয়ে এক কাণ্ড ক'রে বসলেন। একদিন অনেক রাত্রে ওই থিয়েটারের আড্ডা থেকে ছেলে গান গাইতে গাইতে ফিরে এসে যখন ভাত চাইলে, তখন মা একখানা ভাঙা থালায় এক মুঠো সত্যি সত্যি ছাই এনে নামিয়ে দিয়ে বলেছিল—খাও। ছেলে

মায়ের মুখের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর উঠে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

গেল তো গেল পাঁচ বছরের মত। সেই অবস্থায় বনওয়ারীর বাপ মা ঘোষ-সংসারে দুঃখের সঙ্গে আরও জড়িয়ে পড়ে। আগে বনওয়ারীর মা, তারপর স্ত্রীর টানে বনওয়ারীর বাপ। বনওয়ারীর বাপ চন্নপুরের বাবুদের বাড়ি থেকে ধান আনা এবং ঘোষেদের বাড়ি থেকে সেখানে চাল পৌঁছে দেওয়ার কাজে সাহায্য করত। নিতান্তই এক তরফা ব্যাপার। যে কোন দরকারে ঘোষ-মা, ঘোষ-দিদি নিজেই যেত বনওয়ারীর বাবার কাছে। কাঠ তালপাতা মাঠের মাছ ঝুড়ি-ভর্তি গোবর—আর কি দিতে পারে বনওয়ারীর মত লোকেরা? তাই দিত তারা, এবং তাই ছিল ঘোষেদের সংসারের পক্ষে প্রচুর সাহায্য। ঘোষ-মা দিতেন ব্যান্নন। মায়ের হাতের রান্না ছিল 'অম্‌রেতো'। তারপর ঘোষ একদিন ফিরল রোজগার ক'রে। সেই ঘোষেদের ঘরে লক্ষ্মী এলেন। ঘোষ একটি জোত কিনলেন—জাঙলের ওই চৌধুরীদের কাছে। নদীর ধারের জমি, গোপথের ধার; বান এলে তো ডুবে যায়ই, তার উপর গোপথের গরুর পাল নিত্য মুখ দেয় ফসলে। দশ বিঘে জমি, তার দু বিঘে জমির ধান গরুর পেটেই যেত চিরকাল। তবে রক্ষা এইটুকু যে, খাজনাটা ঠাণ্ডা—দশ বিঘে জমির বছরসাল খাজনা সাড়ে বারো টাকা, বিঘা-পিছু পাঁচ সিকি নিরিখ। ঘোষের মা বললেন—তারিণী আমার বড় ছেলে। ওই করবে জমি। ওকেই ভাগে দাও জমি।

বনওয়ারীর বাপের নাম ছিল তারিণী।

সংসারে লক্ষ্মী হ'লেই নাকি সব হয়, শ্রীভ্রষ্ট কুৎসিত মানুষও শ্রীমন্ত হয়—একটা রূপ দেখা দেয় তার চেহারায়, কুমতি ঘুচে সুমতি হয়, বিষমাখা জিভের বিষ ঘুচে মধুর মত অমৃত উথলে ওঠে। মায়ের কথায় ঘোষ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বললে—তোমার কথার কি 'না' হতে পারে? তারিণী আমার দাদা। তারিণীদাদাই আমার জমি করবে। বুঝেছ তারিণী?

তারিণী হেসে বলেছিল—এই দেখেন মা, আমাকে কি 'ফ্যারে' ফেলেছেন

দেখেন! আমার হাল-বলদ কোথা গো? আপনারা বরং হাল-বলদ করেন, আমি কৃষাণ থাকব।

—হাল-বলদ কর। আমি টাকা দিচ্ছি তোমাকে। ভয় কি!—ঘোষ বলেছিলেন।

অবাক হয়ে গিয়েছিল তারিণী। সৎজাতিকে সেবা ক'রে অমন পুরস্কার পেয়ে সে ধন্য হয়ে গিয়েছিল, বাড়িতে এসে কেঁদেছিল সেদিন। সেই অবধি বনওয়ারীদের ঘরে হাল-বলদ। সেই অবধি বনওয়ারীরা ঘোষেদের জমি চাষ করছে। বাপ তারিণী মারা গিয়েছে, ঘোষকর্তাও নাই, ঘোষকর্তার ছেলেদের এখন জমজমাট সংসার। মেজ ছেলে ব্যাবসা ক'রে দেশদেশান্তরে ছুটে বেড়ায়, দু হাতে টাকা রোজগার ক'রে 'বেঙ্কে' জমিয়ে রাখে। ঘোষেদের বাড়িতে বনওয়ারী যে—তারও এখন কেমন ভয়-ভয় ক'রে। এখন আগের মত সরাসরি বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকতে পারে না, বড় ঘোষকে এখন আর তেমন উপদেশ দিতে পারে না। সারের টাকার জন্য সে-ভাবে জোর ক'রে দশটা কথা বলতে পারে না। হিসেবের জন্য তাড়া, তাই বা কেমন ক'রে দেয়? বনওয়ারী সেখানে গিয়ে দেখলে, বড় আর মেজ দুজনে চা খাচ্ছে আর খুব মন দিয়ে শলা-পরামর্শ করছে। সে প্রণাম ক'রে বসল উবু হয়ে দাওয়ার উপর। কিছুক্ষণ পর একটা থামে ঠেস দিয়ে ভাল ক'রে বসল। তারপর ঢুলতে লাগল। সারারাত্রি ভাল ঘুম হয় নাই—সকালের মিঠে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম আসছিল। দক্ষিণ দিক থেকে ভারি আমেজী হাওয়া দিচ্ছে। সকালে সূর্য উঠে এরই মধ্যে ভোরের শীত-শীত ভাবটা কেটে গিয়েছে। পাতলা ঘুমের মধ্যেই নানা এলোমেলো স্বপ্ন দেখছে সে। কালোশশী, করালী, পরম—আরও কত লোক সায়েবডাঙায় জমেছে সব। সায়েবডাঙার কুঠিবাড়ির জঙ্গল থেকে বেরিয়েছে এক মোষের বাচ্চার মত বড় এবং কালো বুনো দাঁতাল শুয়োর, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ ক'রে তীরের মত ছুটে আসছে। দিলে ফেড়ে করালীকে! পরম পালাচ্ছে। বনওয়ারীকে জড়িয়ে ধরেছে কালোশশী। বনওয়ারী কি কালোশশীকে ফেলে পালাতে পারে! খটখট শব্দ ক'রে পিছনে

কে এল? বনওয়ারী বুঝতে পারলে, তিনি কে। কর্তা আসছেন। আর ভয় নাই। ভয়ের মধ্যে আশ্বাস পেয়ে বুনো শুয়োরটাকে ধমক দিয়ে সে বিক্রমভরে হাঁক মেরে উঠল, আ—প্।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের আমেজ ছুটে গেল। সে প্রথমটা ফ্যালফ্যাল ক'রে চারিদিকে দেখে তাল সামলে নিয়ে বসল। ঘোষ-ভাইয়েরা হাসছেন।

—কি রে বনওয়ারী, চেঁচিয়ে উঠলি কেন?

অপ্রস্তুত হয়ে হেসে বনওয়ারী বললে, আজ্ঞে, উ একটো হয়ে গেল আর কি?

—একটো হয়ে গেল আর কি! কি হয়ে গেল?

চুপ ক'রে রইল বনওয়ারী। লজ্জা লাগে বইকি—স্বপ্ন দেখে ভয়ে চীৎকার করেছি এ কথা বলতে।

—কি রে? স্বপ্ন দেখেছিলি বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হা-হা ক'রে হেসে উঠে মেজ জনা। প্রশ্ন করলেন—কি স্বপ্ন রে?

—আজ্ঞে, স্বপ্ন দেখছিলাম, দাঁতাল শুয়োরে তাড়া করেছে।

আবার দুজনে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। বনওয়ারীও হাসতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে মাথা চুলকাতে লাগল। বললে—দাঁতাল বেটারা ভারি পাজী গো! আপনারা জানেন না। তারপর তাঁদের হাসি থামলে সুযোগ পেয়ে বললে—আমার হিসেবটা আজ্ঞে, একবার দেখে মিটিয়ে দ্যান। আবার লতুন চাষকম্ম এসে গেল।

—হিসেব? তা হবে। কাল আসিস। না হয় পরশু।

—কাল পরশু আসতে লারব আজ্ঞে।

—কেন? কাল পরশু কি করবি?

—আজ্ঞে, পাড়াতে চাঁদা তুলে কত্তার পূজো দোব।

—কর্তার পূজো? অসময়ে? কি ব্যাপার?

বনওয়ারী সবিস্তারে বলতে চেষ্টা ক'রে ব্যাপারটা। ইচ্ছে—কিছু চাঁদাও

আদায় করবে মেজ ঘোষের কাছ থেকে। কিন্তু মেজ ঘোষই খানিকটা শুনেই বললেন—তোদের সেই—'অন্ধ জাগো! না, কিবা রাত্রি কিবা দিন!' সেই এক কালই চলেছে রে তোদের। হুঁ, কর্তাবাবা শিস দিচ্ছে! যত সব—হুঁ!

দ'মে গেল বনওয়ারী। কিন্তু সামলে নিয়ে সে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলা হ'ল না, দুই কানের পাশে হাত দিয়ে উৎকণ্ঠ হয়ে উঠে বসল। হঠাৎ দূরে একটা কোলাহল উঠছে ব'লে মনে হ'ল।—আগুন! আগুন!

আগুন! ছুটে বেরিয়ে এল বনওয়ারী। কোথায় আগুন? কোলাহলের দিক লক্ষ্য ক'রে সে ছুটে এল গ্রামের বাইরে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঁশবাদির ওই দক্ষিণ মাথা থেকেই তো প্রচুর ধোঁয়া উঠছে আকাশে। বাঁশবেড়ের বাঁশের মাথাগুলি ঢেকে গিয়েছে কুণ্ডলী পাকানো রাশি রাশি ধোঁয়ার মেঘে; আষাঢ়ের মেঘের মত জমাট ধোঁয়ার মেঘ।

বনওয়ারীর বুকটা তোলপাড় করে উঠল;—'কত্তার কোধ!'

* * *

নাঃ—কাহারদের ভাগ্য ভাল। কোধের মধ্যেও কত্তা কিঞ্চিৎ দয়া করেছেন। গ্রামে আগুন নয়। আগুন লেগেছে বাঁশবেড়ের বাঁশবনের তলায়। মাঘে পাতা ঝরছে বাঁশের। নিবিড় বাঁশবনের অজস্র পাতা স্তূপীকৃত হয়ে জ'মে আছে তলায়। সেই ঝরা শুকনো পাতায় আগুন লেগেছে। কি ক'রে লাগল কে জানে? বেলা প্রখর হয়ে উঠেছে, পাতাগুলির উপরে রাত্রের শিশির শুকিয়ে গিয়েছে; আগুন খোরাক পেয়েছে ভাল। সবুজ দেওয়ালের মত যে বাঁশবন, সে বাঁশবন ধোঁয়ার প্রায় ঢেকে গিয়েছে।

বাঁশবাঁদির ধারে লোকজন স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে ঢুকতে কারও সাহস নাই। নিমতেলে পানু, প্রহ্লাদ জাঙল থেকে বনওয়ারীর আগেই ফিরে এসেছে। তারা ঢুকেছিল, কিন্তু পালিয়ে এসেছে ভয়ে এবং যন্ত্রণায়। ভয়—সেই শিস উঠছে। যন্ত্রণা—ধোঁয়ার।

কর্তার রোষে শেষে আগুন হয়ে জ'লে উঠেছে গাঁয়ের ধারে, সাবোধান

করে দিচ্ছেন! বনওয়ারী থমকে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—কত্তার কোপ! কত্তার কোধ!

প্রহ্লাদ বললে—না, করালী আগুন লাগিয়েছে, বাঁশের পাতায় 'কেরাচিন' তেল ঢেলে আগুন লাগিয়েছে। সে রয়েছে ওই ধোঁয়ার মধ্যে।

মুহূর্তে ক্ষেপে গেল বনওয়ারী, নেমে গেল ধোঁয়ায়-ভরা বাঁশবনের মধ্যে।

হ্যাঁ, শিসও উঠছে। কর্তাও ক্ষেপেছেন। এগিয়ে গেল বনওয়ারী শব্দ লক্ষ্য ক'রে।

যেখানে শব্দটি উঠছে, তারই সামনে দাঁড়িয়ে আছে করালী। বুক চিতিয়ে নির্ভয়ে একদৃষ্টে উপরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মুছছে আর উপরের দিকে চেয়ে দেখছে। নীচে আগুন নাচছে শুকনো পাতার স্তূপে। উত্তাপে বাঁশবেড় যেন অগ্নিগড় হয়ে উঠেছে, আঁচ লাগছে গায়ে, করালীর সেও গ্রাহ্য নাই।

বনওয়ারী এগিয়ে গেল ভয়ঙ্কর মূর্তিতে।—হে কত্তা, মাপ কর তুমি। আমি হতভাগাকে ফেলে দিচ্ছি ওই আগুনে। তুমি নিজের মহিমায় আগুন নিবিয়ে দাও। বাঁচাও তুমি বাঁশবাদিকে, বাঁচাও হাঁসুলীর বাঁককে—বাঁচাও। সে সেই ভয়ঙ্কর কণ্ঠে ডাকলে—করালী!

করালী তার দিকে ফিরে চকিতের মত চেয়ে আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে বনওয়ারীকেই ইশারা ক'রে ডাকলে—এস, এস। এতটুকু নড়ল না। বনওয়ারীর ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। সে অগ্রসর হ'ল, মনে মনে বললে—যাই, যাই, দাঁড়াও।

দূরে পিছন থেকে ভেসে আসছে আর একটা আওয়াজ—মামা! মামা! মামা! পাখীর গলা। আর্ত-উৎকণ্ঠা যেন ফেটে ফেটে পড়ছে কণ্ঠস্বরে। কিন্তু বনওয়ারী আজ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। কাহারপাড়ার বিচারকর্তা সে। ব্রহ্মার পুত্র দক্ষের মত সর্বময় কর্তা—দণ্ডদাতা।

বনওয়ারী দুর্দান্ত ক্রোধে করালীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোশকেঁধের বাড়ির ছেলে, বিধাতার মোটা হাতে পাথর কেটে গড়া বনওয়ারী।

করালী কিন্তু নড়ল না, এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, বনওয়ারীর হাত থেকেও মোচড় দিয়ে ছাড়িয়ে নিলে একটা হাত। সেই হাতে সে দুর্দান্ত বিক্রমে আক্রমণ করলে বনওয়ারীকে। আশ্চর্য, বনওয়ারী অনুভব করছে—করালীর শক্তি তার চেয়ে যেন বেশি। না, বনওয়ারীর পায়ের তলায় বাঁশের পাতাগুলি পিছলে স'রে যাচ্ছে। সেই অসুবিধার জন্যই করালী তাকে বাগে পেয়েছে। হঠাৎ করালী চীৎকার ক'রে উঠল—ছাড়—ছাড়—পড়ছে। ছাড়।

উৎসাহের প্রাবল্যে তার শক্তি যেন শতগুণ বেড়ে গেল। সে অনায়াসে বনওয়ারীকে নীচে ফেলে দিয়ে তাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নাচতে লাগল সে। ওই—ওই—ওই শালা পড়ছে। বনওয়ারী উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে করালী এসে তার হাতে ধ'রে টেনে ঝাঁকি দিয়ে বললে—ওই—ওই দেখ, তোমার কর্তা পড়ছে বাঁশের ডগা থেকে। হুই—হুইয়া!

বাঁশের ঝাড়ের মাথা থেকে আগুনের উত্তাপে ধোঁয়ায় ক্লিষ্ট অবসন্ন হয়ে এলিয়ে নীচে পড়ছে একটা প্রকাণ্ড সাপ। পাহাড়ে চিতির মত মোটা, তেমনই বিচিত্র তার বর্ণ, কিন্তু লম্বা খুব বেশি নয়। পাহাড়ে চিতির সঙ্গে ওইখানেই সেটার পার্থক্য।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে বনওয়ারী বললে—পে-কা-ণ্ড চন্দ্র বোড়া! হ্যাঁ, ওদের গর্জন খুব বটে।

—এটা কত বড় দেখছ না? তাতেই শিসের মত শব্দ হয়। শালা!

আগুনের মধ্যে প'ড়ে সাপটা ছটফট করছে। মরছে। করালী তারই উপর দমাদম ঢেলা ছুঁড়ে মারছে। অব্যর্থ তার লক্ষ্য।

মামা! মামা!—এদিক থেকে পাখী ডাকছে। ধোঁয়ার মধ্যে বুঝতে পারছে না সে, কোন্ দিকে এরা রয়েছে। উৎকণ্ঠিত আগ্রহে সে ডাকছে। ডাকটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখী ওদের খুঁজে ফিরছে।

চীৎকার ক'রে সাড়া দিলে করালী—এই দিকে—এই দিকে। আয়। আয়। ডাক্ সব পাড়ার নোককে। দেখে যা তোদের কত্তা পুড়ছে। দেখে যা। ডাক্ সব নোককে। ডাক্—ডাক্।

ওদিকে সাপটার পেটটার একটা মোটা অংশ ফেটে গেল আগুনের আঁচে। বেরিয়ে পড়ল একটা কি? এগিয়ে গেল করালী, বনওয়ারীও গেল। ঝুঁকে দেখতে লাগল, কি ওটা? ওঃ, একটা বুনো শুয়োরের বাচ্চা। ওটাই কাল রাত্রে সেই তীক্ষ্ণ চীৎকার করেছিল।

পাখী ছুটে এসে করালীর হাত ধরলে। সে হাঁপাচ্ছে।

করালী বললে—ওই দেখ্। সাপটা দেখে পাখী অবাক হয়ে গেল। দেখতে দেখতে ভেঙে এল গোটা কাহারপাড়ার লোক। বিস্ময়ে কৌতূহলে অবাক হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর কলকল ক'রে বাঁশবাঁদি মুখরিত ক'রে তুললে।

করালী হাসতে হাসতে ব'লে উঠল—মুরুব্বি, কত্তার পূজোটা সব আমাকে দিয়ো গো। সে হা-হা ক'রে হাসতে লাগল।

করালী তবুও হাসতে লাগল। সে যেন এক অপার কৌতুক।

পাখী করালীর পিঠে একটা কিল মেরে বললে—ডাকাবুকো, ডারপাড়, লঘুগুরু জ্ঞান নাই তোমার?

তিন

গোটা কাহারপাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা স্তম্ভিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল করালীর কথা শুনে, তার সকৌতুক উচ্চহাসি দেখে। করালী বলে কি? 'কত্তার পূজোটা আমাকে দিয়ো গো!' এতবড় স্পর্ধা তার! হে ভগবান, হে বাবা কালারুদ্র, হে বাবাঠাকুর!

বনওয়ারী স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল করালীকে। আজই যেন সে করালীকে নতুন ক'রে দেখলে। নোড়ার কাজের জন্যে কুড়িয়ে-আনা নুড়িটাকে আলোর ছটায় জ্বলতে দেখে মানুষ যেমন ভাবে সবিস্ময়ে সাগ্রহে সসম্ভ্রমে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, তেমনই ভাবে দেখলে তাকে বনওয়ারী। ছোঁড়ার চেহারাটা ছেলেবেলা থেকেই মিষ্টি চেহারা। আজও তাকে দেখে সেই মিষ্টি চেহারার

আস্বাদই মনে জাগে, আজ বনওয়ারী তাকে দেখে নতুন আস্বাদ পাচ্ছে। গোটা কাহারপাড়াই পাচ্ছে যেন।

লম্বা দীঘল চেহারা, সাধারণ হাতের চার হাত খাড়াই তাতে কোন সন্দেহ নাই, সরু কোমর, চওড়া বুক, গোলালো পেশীবহুল হাত, সোজা পা দুখানি, লম্বা আমের মত মুখ, বড় বড় চোখ, নাকটি খাঁদা; কিন্তু তাতেই চেহারাখানিকে করেছে সব চেয়ে মিষ্টি, তারও চেয়ে মিষ্টি তার ঠোঁট আর দাঁত। হাসলে বড় সুন্দর দেখায় করালীকে।

তরুণের দলের অবশ্য এ চেহারা চোখে ঠেকেছে। পাড়ার ছোকরারা মনে মনে অধিকাংশই করালীর অনুগত। কিন্তু এ চেহারা সকলের চেয়ে ভাল ক'রে দেখেছে পাখী। করালীর দেহের রূপ বীর্য সে দেখে দেখে মুখস্থ ক'রে ফেলেছে। তার কাছে জীবনে সব এক দিক আর করালী এক দিক।

বনওয়ারীও দেখছিল করালীর দেহের শক্তির শোভা। হ্যাঁ, ছোকরা জোয়ান হয়েছে বটে! করালী যখন ঘরে কুকুরটার জন্যে সমাধি খুঁড়ছিল, তখন চকিতের মত যেন চোখে পড়েছিল এ চেহারা। কিন্তু বনওয়ারী তখন দেখেও দেখে নাই। আজ এই মুহূর্তে তাকে না দেখে বনওয়ারীর উপায় নাই। মনে পড়ছে বনওয়ারীর—বাঁশবনে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল করালীর উপর, নিষ্ঠুর ক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ইচ্ছে ছিল—বুকে চেপে ব'সে গলাটা টিপে ধরবে, ম'রে যদি যায় দেবে ফেলে ওই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। কিন্তু—। বনওয়ারীর ভাল মনে পড়ছে না, কি ক'রে হয়েছিল! বাঁশপাতায় পা পিছলে গিয়েছিল? ধোঁয়ায় মাথা ঘুরে গিয়েছিল? হয়েছিল একটা কিছু। করালীই চেপে বসেছিল তার উপর? সে ভাবছিল, করালী হয়তো উচ্চহাসি হেসে এই সমবেত কাহারদের কাছে বলবে, বাবাঠাকুরের চেলা বনওয়ারী মুরুব্বিকেও দেখে নিয়েছি—

পাখী এগিয়ে এল বনওয়ারীর কাছে। ডাকলে—মামা!

বনওয়ারী তার মুখের দিকে তাকালে। তারপর হঠাৎ হেসে বললে—করালীর বুদ্ধি আছে। ও ঠিক ধরেছে।

করালী উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠল—রেল লাইনে আটাশ মাইলে ঠিক এমনি হয়েছিল! বুঝেছ—আটাশ মাইলে—খুব জঙ্গল, সেখানে গেলবারে ঠিক এমনি শিস উঠত। সন্ধ্যাবেলা টলি ঠেলে আসছি, টলিতে আছে সায়েব। হাতে বন্দুক। বুঝেছ, শিস শুনেই বললে—রোখো টলি, তা'পরেতে টর্চ মারতে লাগল, মারতে মারতে এক জায়গায় টর্চ পড়তেই দেখতে পেলে সাপ। বাস্, বন্দুক তুলে গুড়ুম।

প্রহ্লাদ বললে—লে, এখন সাপটাকে ভাল ক'রে পুড়িয়ে দে। খরিস গোখরা লয়, চিতি বটে—তা বড় চিতি। বেরাম্ভন না হোক, বত্তি কায়স্থ টায়স্থ তো বটেই। সৎকার করতে হবে তো!

নিমতেলে পানু বয়সে করালীদের বয়সী হ'লেও জ্ঞানবৃদ্ধ প্রহ্লাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে। সে সর্বাগ্রে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললে—একশো বার। শুধু কি সৎজাত পেহ্লাদদাদা? পবীন, পবীন সাপ। তা বয়স তোমার অনেক হবে গো।

করালী বললে—না। ও আমি নিয়ে যাব। দেখুক, পাঁচজনায় দেখুক। সন্‌জে হতেই সব কিসের ভয়ে জুজুমানা হয়ে ঘরে খিল দিত। দেখুক।—ব'লে আবার সে হেসে উঠল।

নিমতেলে পানু বনওয়ারীর দিকে চেয়ে বললে—মুরুব্বি!

বনওয়ারী বললে—তা—। সে বুঝতে পারলে না, কি বলা উচিত।

—কি? বল? 'তা' ব'লে যে থেমে গেলা!—পানু বিরক্তিভরেই বললে—'শাস্ত' যা বটে, তা করতে হবে না কি?

—তা করবে। মড়া ম'লে সঙ্গে সঙ্গেই তো পোড়ায় না। পাঁচজনা আসে, দেখে। বাসমড়া না হ'লে হ'ল। তা এখন নিয়ে যেয়ে রাখুক—তা'পরে 'আত্তি'কালে নদীর ধারে দেবে পুড়িয়ে।

খুব খুশি হয়ে উঠল করালী। বললে—এই না হ'লে মুরুব্বি বলবে [illegible]

বনওয়ারী বললে—তু তো মানিস না রে মুরুব্বি ব'লে!

করালী এবার লজ্জিত হ'ল। সুন্দর হাসি হেসে সে বললে—মানি গো খুব মানি, মনে মনে মানি। বুঝলে?

নিমতেলে পানু বললে—তা আবার মানিস না। কাহারপাড়ার পিতি-পুরুষের রোপদেশে নাতি মেরে মুরুব্বির মুখের ওপর বুড়ো আঙুল নেড়ে দিয়ে চন্দনপুরে মেলেচ্ছো কারখানায় কাজ করছিস। মেলা রোজগার করছিস—

করালী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল মুহূর্তে। সে চীৎকার ক'রে উঠল—হারাম-জাদা!

বনওয়ারী দুই হাত বাড়িয়ে আগলে বললে—না।

করালী থমকে দাঁড়াল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বনওয়ারীর মুখের উপর রেখে চেয়ে রইল।

বনওয়ারী বললে—মারামারি করতে নাই। পেনোর অন্যায় বটে। ওকে আমি শাসন ক'রে দোব।

করালী তার অনুগতদের বললে—একটা বাঁশ আন্। চাপিয়ে তুলে নিয়ে যাব।

প্রহ্লাদ বললে—বেশ পেশস্ত জায়গায় 'আখ'। অ্যানেক লোক দেখতে আসবে।

এ সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা আছে। দাঁতাল শুয়োর মারা এখানে তো সাধারণ ব্যাপার; এ বিষয়ে শিক্ষাও তাদের পুরুষানুক্রমিক; কখনও কখনও দু-একজন যখমও হয় দাঁতালের দাঁতে। বছরে দু-তিনটে দাঁতাল মারেই, আর এখানকার লোকের স্বভাব হ'ল—খবর পেলেই ছুটে দেখতে আসবে। দাঁতালটাকেও দেখে, আবার জখম মানুষটাকেও দেখে। বাঘ কি কুমীর হ'লে তো কথাই নাই। প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে একটা চিতা এসেছিল, ওই কোপায়ের বানে ভেসে এসে বাঁশবেড়ে আটকে যায়। সেটা ছিল জ্যান্ত। সে বলতে গেলে বনওয়ারীর বাপের আমল। কর্তা ছিল তারাই। বনওয় প্রহ্লাদ—এদের তখন করালীর বয়স, এরা ছিল কর্মী। কর্তাদের পরল—বাঘটাকে তারাই বাঁশের খাঁচা তৈরি ক'রে ধরেছিল। শক্ত পাকা বাঁশ আ

খানা ক'রে চিরে শিকের মত গেঁথে খাঁচা তৈরি করেছিল তারা; লোহার শিক দিয়ে তৈরি খাঁচার চেয়ে সে বেশি শক্ত। সেই খাঁচার মধ্যে পাঁঠার বাচ্চা বেঁধে বাঁশবাঁদির বনে খাঁচা পাতা হ'ল। এক দিন, দু দিন, তিন দিনের দিনই বাঘা বন্দী হ'ল। তখন খুঁচিয়ে মারার ব্যবস্থা। মারার পর ভেঙে এল চাকলার লোক। ঘোষকর্তা আগেই এসে মরা বাঘের উপর মারলেন এক গুলি। রগে নল রেখে গুলি। তারপর লোকের ভিড় দেখে জাঙল থেকে আনালেন একটা উঁচু তক্তাপোশ, সেইটার উপরে রেখে দিলেন। সে কি ভিড়! কেউ বাঘটাকে ঢেলা মারলে, কেউ লাঠি দিয়ে খোঁচালে, কেউ লেজ ধ'রে টানলে, দু-চারজন ছোকরা তো বাই ঠুকে লাফিয়ে উপরে প'ড়ে মারলে দমাদম ঘুষি। কেউ-বা সেটাকে জড়িয়ে ধ'রে শুয়েই পড়ল মনের আনন্দে। সেই সব ভেবেই চিরদিনের চলিত প্রথা অনুযায়ী কথাটা বললে প্রহ্লাদ-রতনের দল। জায়গার জন্য ভাবনারও কোন প্রয়োজন নাই। চিরকাল যেখানে নামানো হয়, সেই বনওয়ারীর খামার প'ড়ে রয়েছে—মস্ত ফাঁকা জায়গা।

কিন্তু করালীর মতিগতিই ভিন্ন। হাত ছয়েক লম্বা একটা বাঁশের উপর সেটাকে ঝুলিয়ে আর একজনের সাহায্যে কাঁধে তুলে ব'য়ে বনওয়ারীর খামার পার হয়ে চলতে শুরু করলে নিজের বাড়ির দিকে। প্রহ্লাদ রতন পানু বললে—নামা এইখানে।

করালী বললে—উঁহু। আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব আমি।

প্রহ্লাদ রতন পানু স্তম্ভিত হয়ে গেল করালীর স্পর্ধা দেখে। তারা বনওয়ারীর মুখের দিকে চাইল।

বনওয়ারী এতক্ষণে হাসলে। তাচ্ছিল্যভরেই বললে—যাক যাক, ছেলে-মানুষ। তা ছাড়া কাণ্ডটি তো ওরই বটে বাপু। তারপর করালীর পিঠে কয়েকটা আদরের চাপড় মেরে বললে,—হ্যাঁ। বীর বেটাছেলে বটিস তুই।

করালী হাসলে। স্মিতমুখে আনন্দের হাসি হাসলে। সঙ্গে সঙ্গে একটু

যেন লজ্জিত হ'ল। মনে হ'ল, বনওয়ারী খুড়োকে খানিকটা সম্মান দেখানোর প্রয়োজন আছে। সে বললে—তুমিও এস কিন্তুক।

—আচ্ছা। যাব, চল্।

বাড়ির উঠানে ফেলে করালী বীরদর্পে সকলের দিকে চাইল। মাতব্বর-মুরুব্বিরা কেউ আসে নাই। অপমান বোধ না করলেও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। করালী এই সুযোগে কৌতুক ক'রে অকস্মাৎ ভান ক'রে চমকে উঠে ব'লে উঠল—ওরে বাবা, লড়ছে যে!

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের দল আতঙ্কে চীৎকার ক'রে ঠেলাঠেলি ক'রে পিছু হঠতে লাগল। পুরুষেরা ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দিলে। করালী অট্টহাসি হেসে উঠল। বললে—যত সব ভয়তরাশের দল—ভয়েই মরবে, ভয়েই মরবে।

তারপর বললে—পালাও সব, পালাও বলছি। নইলে ভাল হবে না। পালাও। পাখী, বার কর্।

অর্থাৎ মদের বোতল। বিজয়ী বীর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মদ্যপান করবে। কাহারপাড়ায় তরুণদের নিয়ে তার একটি দল আছে, যে দল বাইরে বনওয়ারীর মাতব্বরি মেনে চললেও অন্তরে অন্তরে করালীই তাদের দলপতি। এদের মধ্যে রতনের ছেলে নটবরই প্রধান।

নটবর একবার বীরদর্পে সাপটার চারদিক ঘুরে বললে—কই, একটি ক'রে পয়সা আন্ দেখি নি। হুঁ-হুঁ বাবা, তার বেলাতে লবডঙ্কা!

একটি মেয়ে বললে—মরণ! সাপ মেরে গিদেরে যেন কি করেছে! অর্থাৎ অহঙ্কারে।

করালী বললে—ধর্ ওকে নটবরে, আমরা গান করব, ওকে লাচতে হবে। ধর্।

মেয়ের দল এইবার পালাল। চ্যাঙড়ার দলকে বিশ্বাস নাই, তার উপর মদের বোতল বেরিয়েছে। কয়েক ঢোক পেটে পড়লে হয়!

নটবর বললে—আঃ, নসুদিদি নাই রে আজ!

করালী ইতিমধ্যে খানিকটা খেয়েছে। সে বললে—ওঃ, সে নাই, থাকলে মাতন লাগিয়ে দিত। হারামজাদীর কুটুম্বিতে লেগেই আছে।

নসুবালা করালীর পিসতুতো ভাই। আসল নাম নসুরাম। অদ্ভুত চরিত্র নসুরামের। ভাবে ভঙ্গিতে কথায় বার্তায় একেবারে মেয়েদের মত। মাথায় মেয়েদের মত চুল, তাতে সে খোঁপা বাঁধে, নাকে নাকছাবি পরে,কানে মাকড়ি পরে, হাতে পরে কাঁচের চুড়ি লাল রুলি, মেয়েদের মত শাড়ি পরে। মেয়েদের সঙ্গে গোবর কুড়ায়, কাঠ ভাঙে, ঘর নিকায়, চন্ননপুরে দুধের যোগান দিতে যায়, মজুরনী খাটতে যায়। কণ্ঠস্বরটি অতি মিষ্ট—গান গায়, নাচে। গান আর নাচ—এই তার সব চেয়ে বড় নেশা। ঘেঁটুর দলে নাচে, ভাঁজোর নাচনে সেই মেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে সেরা নাচিয়ে। মেয়েদের সঙ্গেই সে ব্রতপার্বণ করে। করালীর ঘরে সেই গৃহিণী। করালী বিয়ে ক'রে বউ তাড়িয়ে দিয়েছে, বউ তার পছন্দ হয় নি, সে আবার বিয়ে করবে। নসুরও বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নসুও বউ তাড়িয়ে দিয়েছে, সে আর বিয়ে করবে না। করালীর ঘরে বোন হয়ে, করালীর বউয়ের ননদ হয়ে থাকবে—এই তার বাসনা। পাড়ার বিয়েতে নসুবালাই বাসরে নাচে, গান গায়। শুধু পাড়ায় নয়, গ্রামে গ্রামান্তরে স্বজাতির ঘরে বিয়ে হলেই নসুকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খবর দেয়। নসু খোঁপা বেঁধে আলতা প'রে, রঙিন শাড়ি প'রে, কপালে সিঁদুর ঠেকিয়ে অর্থাৎ টিপ প'রে রওনা হয়, আবার উৎসব মিটলে ফেরে। করালীর জন্যে কিছু-না-কিছু নিয়ে আসে।

এই নসুবালার অভাবই করালী সব চেয়ে বেশি অনুভব করলে।

নসুদিদি নাই তো পাখী নাচুক কেনে?—কথাটা বললে করালীর অপর অনুগত শিষ্য মাথলা। মাথলার আসল নাম রাখাল বা আখাল, কিন্তু দেহের অনুপাতে মাথাটা মোটা ব'লে কাহারেরা তাদের নিজস্ব ব্যাকরণ অনুযায়ী সম্ভবত ওয়ালা প্রত্যয় ক'রে করেছে—মাথলা।

কথাটা মন্দ বলে নাই মাথলা! কিন্তু তবু ভ্রূ কুঁচকে উঠল করালীর।

পাখী তাকে ভালবাসে, একদিন হয়তো তাকেই সে সাঙা করবে। সে নাচবে এই এদের সামনে ?

পাখীর চোখেও রঙ ধরেছে, সেও খানকটা পাকি মদ খেয়েছে, করালীর গৌরবে তারও নাচতে মন যাচ্ছে ; তবু সে করালীর মুখের দিকে চাইলে। চেয়েই সে বুঝতে পারলে করালীর মন, সে তৎক্ষণাৎ বললে—না।

ঠিক এই সময়েই কাছাকাছি কোথাও সুচাঁদের মোটা কর্কশ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল, মুহূর্তে সমস্ত পাড়াটা চকিত হয়ে উঠল।

—ওরে বাবা রে! ওরে মা রে! আমি কোথা যাব রে!

করালী হা-হা ক'রে হেসে উঠল, বললে—'বিত্যেব' দেখ বুড়ীর! অর্থাৎ ভয়ে চেঁচানি দেখ বুড়ীর! তারপর সকৌতুকে ব'লে উঠল—নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, ওই বুড়ীকে নিয়ে আয়—ওই নাচবে। ভুর্কী নাচন নাচাব বুড়ীকে। ব্যাঙ দেখে নাচে, সাপ দেখে নাচবে না ?

ডাকতে হ'ল না, এক-গা কাদা মেখে খাটো-কাপড়-পরা সুচাঁদ এসে দাঁড়াল করালীর উঠানে। তার পিছনে আরও কয়েকজন প্রৌঢ়া মেয়ে। স্থির দৃষ্টিতে সে মরা সাপটাকে কিছুক্ষণ দেখে হঠাৎ বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল। শঙ্কাতুর অমঙ্গল ঘোষণার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বরে।

—ওগো বাবাঠাকুর গো! ওরে, আমার বাবার বাহন রে! ওরে, কি হবে রে! হায় মা রে!—বলতে বলতে সে থরথর করে কেঁপে মাটির উপর ব'সে পড়ল।

সমস্ত কাহারপাড়ার আকাশে একটা আশঙ্কার আর্তবাণী হায়-হায় ক'রে ছড়িয়ে পড়ল। করালী পাখী নটবর মাথলা সকলেই বেরিয়ে এল। কি হ'ল ?

হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে-ঘেরা আলো-আঁধারির মধ্যে গ্রামখানি। সে গ্রামের উপকথায়—এ দেশের কতকাল আগের ব্রতকথায় আছে, "গাঁয়ে ছিল এক নিঃসন্তান বুড়ী, ব্রত করত, ধর্মকর্ম করত, গাঁয়ের দুঃখে দুঃখ ক'রেই তার ছিল সুখ। কারও দুঃখে কাঁদতে না পেলে বুড়ী পশু-পক্ষীর দুঃখ খুঁজে বেড়াত। এমন দিনের সকালে ব'সে ভাবতে ভাবতে আপন মনেই বলত—

চাদি কাঁদি মন করছে, কেঁদে না আত্মি মিটছে, মহাবনে হাতী মরেছে, যাই; তার গলা ধ'রে কেঁদে আসি।"

হাঁসুলীর বাঁকে সুচাঁদ বুড়ী বোধ হয় সেকালের সেই বুড়ী। সাপটা যখন মরে, তখন বুড়ী বাড়ী ছিল না। থাকলে যে কি করত, সে কথা বলা যায় না। সে গিয়েছিল ঘাস কাটতে। বাঁশবাঁদির কাহার-বুড়ীরা, প্রবীণরা, যারা মজুরনী খাটতে পারে না, তারাও ব'সে খায় না—পিতিপুরুষের নিয়ম এই, যেমন গতর তেমনই খাটতেই হবে। তারা দুপুরবেলা গরু-বাছুর-ছাগলের জন্য ঘাস কাটতে যায়। কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে, কাস্তে নিয়ে চ'লে যায় হাঁসুলীর বাঁকের ওপারে—কোপাইয়ের অপর পারে গোপের পাড়ায় 'মোষ-ডহরী'র বিলে ঘাস কাটতে। মস্ত বিলটার চারিপাশে প্রচুর ঘাস জন্মায়। তার সঙ্গে পানিফল তুলে আনে, কলমী-শুসনি শাক সংগ্রহ করে, আর দু-চারটে পাঁকাল মাছ—তাও ধরে আনে। তাই বুড়ী গিয়েছিল ওই মোষ-ডহরীর বিলে। ফিরে এসে সমস্ত কথা শুনে ছুটে এসেছে সাপটাকে দেখতে। দেখে চীৎকার করে পাড়াটাকে শঙ্কায় সচকিত করে দিলে।

সাপটার সামনে বুড়ী চোখ বিস্ফারিত ক'রে স্তব্ধ হয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বাবা-ঠাকুরের থানের দিকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে বললে—হে বাবা, হে বাবা হে বাবা!

অ্যাই বুড়ী!—চীৎকার ক'রে প্রতিবাদ ক'রে উঠল করালী। পাখী বললে—মরণ! ঢঙ দেখ! দোপরবেলায় কাঁদতে বসল দেখ! সাপ আবার বাবা হয়!

হয় লো, হয়।—বুড়ী কেঁদে উঠল। সুর ক'রে কেঁদে কেঁদে বুড়ী ব'লে গেল—ও যে আমার বাবাঠাকুরের বাহন রে! 'ওরই' মাথায় চ'ড়ে বাবাঠাকুর যে ভেমন করেন। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি রে! দহের মাথায় বাবা-ঠাকুরের শিমুলগাছের কোটরে সুখে নিদ্রে যাচ্ছিলেন রে, আমি যে পরশু দেখেছি রে!

এর পর আর অবিশ্বাসের কিছু থাকে না। বাবাঠাকুরের শিমুলগাছ,

দহের মাথায় প্রাচীনতম বনস্পতি, তারই কোটরে এই আশ্চর্যজনক শিস-দেওয়া বিচিত্রবর্ণ বিষধর যখন থাকত, তখন বাবাঠাকুরের আশ্রিত, তাঁর বাহন—এতে সন্দেহ কোথায়! সমবেত কাহারপাড়ার নরনারী শিউরে উঠল, মেয়েরা সমস্বরে বলে উঠল—হেই মা রে!

করালী শঙ্কিত হয়ে উঠল, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে অনুমান করতে পারছে, এর পর কি হবে। পাড়া জুড়ে হায় হায় রব উঠবে। তার সকল বীরত্ব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু সে ভেবে পেল না, কি করবে! তার সঙ্গীদের মুখ শুকিয়ে গেছে। তারাও যেন ভয় পেয়েছে। তার ইচ্ছে হ'ল, সে ছুটে চলে যায় চন্নপুরে। সেখান থেকে ডেকে নিয়ে আসে তাদের ছোট সাহেবকে, যে সেদিন এমনই একটা সাপ মেরেছে রেল-লাইনের ধারে, যে সায়েব নিজে হাতে কোপ মেরেছে নদীর ঘাটে পেত্নীর আশ্রয়স্থল পুরানো শাঁওড়াগাছটায়; সে এসে মরা সাপটাকে লাঠি দিয়ে খোঁচা মারুক, গোটা কাহারপাড়াকে সায়েস্তা করে দিক।

হঠাৎ পাখী চীৎকার ক'রে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে মাতামহীর সামনে এসে বললে—এই দেখ্‌ বুড়ী, এই ভর তিন পর বেলাতে তু কাঁদতে লাগিস না বললাম।

কালা সুচাঁদ শুনতে পেলে না কথা। সে আপন মনেই আক্ষেপ ক'রে চলল—সব্বনাশ হবে রে, সব্বনাশ হবে। ই গাঁয়ের পিতুল নাই। আঃ—আঃ—হায়—হায় রে!

পাখী এবার আর বৃথা চীৎকার করলে না। এসে বুড়ীর হাত ধ'রে টেনে তাদের ঘরের সীমানা থেকে বার ক'রে এনে চীৎকার ক'রে বললে—এইখানে ব'সে কাঁদ্‌।

হাত ধ'রে টানতেও বুড়ী প্রথমটা বুঝতে পারে নাই পাখীর মনের ভাব। এবার কিন্তু বুঝতে বাকি রইল না। সে মুহূর্তে ভয়ঙ্করী হয়ে উঠল, এবং এক মুহূর্তে সে অলৌকিক লোক থেকে নেমে এল লৌকিক বাঁশবাঁদির ইতিহাসে। তা নইলে যেন পাখীকে ধরা যায় না, পাখী এবং করালীকে দেবতার ভয়

দেখিয়ে মানানো যায় না। তাই সে আরম্ভ করলে পাখীর জন্মকাণ্ডের কাহিনী, অন্যথায় ওর চরিত্র এমন হবে কেন?

চীৎকার ক'রে পাখীর জীবনের জন্মকাণ্ড হতে এ পর্যন্ত যত অনাচারের কথা আছে তাকে সাতকাণ্ড ক'রে আকাশ-লোককে পর্যন্ত শুনিয়ে দিলে। অবশেষে শাসন ক'রে বললে—হারামজাদী বেজাত—বজ্জাত—বদজন্মিত, এত বড় বাড় তোমার? আমার বাড়ি থেকে আমাকে বার ক'রে দাও তুমি?

তারপর সে বললে—তাই বা কেন? এত বড় স্পর্ধা এই পাখী ছাড়া আর কার হতে পারে? বসন্তের এই কন্যাটি ছাড়া আর কার হতে পারে? সুচাঁদের নিজের কন্যা হ'লে কি হয়? সুচাঁদ সত্য ছাড়া মিথ্যা বলবে না। নিজের কন্যা ব'লে সে তার খাতির করে না। বসন্তের যে মতিগতি মন্দ; যখন ওই জাঙলে চৌধুরীবাবুর মাতাল ছেলের সঙ্গে মনে রঙ লাগায়, তখন সে জানে এর দুর্ভোগ তাকেই ভুগতে হবে। আজও পর্যন্ত বসন্ত সেই রঙের নেশায় বিনা পয়সায় বারোটি মাস চৌধুরী-বাড়িতে দুধ জোগায়। তাও কিছু বলে না সে। এই হারামজাদী পাখী যখন বসন্তের পেটে এল, তখন খুঁজে খুঁজে সুচাঁদ নিয়ে এসেছিল এক জরাজীর্ণ খোঁড়া কাহারের ছেলেকে; এনে অনেক ঘুষ দিয়ে পাখীর পিতৃত্বের দায়িত্ব তার উপর চাপিয়ে বসন্ত এবং পাখীকে রক্ষা করেছিল। অন্যায় হয়েছিল—তার অন্যায় হয়েছিল। বসন্তকেই পথে বার ক'রে দেওয়া উচিত ছিল। অথবা এ পাপকে ভ্রূণ অবস্থায় বিনষ্ট করতে বসন্তকে বাধ্য করা উচিত ছিল তার। এ পাপ যে এমন হবে, সে তো জানা কথা। ওই চৌধুরীদের এবং বসন্তের রক্ত তার দেহে, তার রঙের নেশা এমনই হবে যে! করালীর নেশায় পাগল হয়েছে পাপ পাখী। সেই নেশায় অন্যায়কে ন্যায়, ন্যায়কে অন্যায় দেখছে বজ্জাত বেজাত।

পাখী হঠাৎ ফোঁস ক'রে উঠল—হারামজাদী, আমার শরীলে নয় চৌধুরীদের অক্ত আছে, তাতেই না হয় আমার নেশা বেশি। কিন্তুক তোর প্যাটের মেয়ের নেশা কেনে আজও ছাড়লো না শুনি? বলি, তোর বসন্তের শরীরে কার অক্ত আছে তা বল? শুনি?

পাখীর চীৎকার ঠিক মাথার উপরে আকাশে উড়ন্ত চিলটাও বোধ করি চমকে উঠল, অন্তত তাই মনে হ'ল। ঠিক মাথার উপরে যে চিলটা স্থির পাখা মেলে ভেসে চলেছিল ব'লে মনে হচ্ছিল, সেটা এই মুহূর্তেই সজোরে পাখা আন্দোলিত ক'রে দ্রুততর বেগে অতিক্রম ক'রে গেল স্থানটা। সুচাঁদের কানেও একটি কথা অস্পষ্ট রইল না। সুচাঁদ স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে হঠাৎ এদিক ওদিক চেয়ে কিছু যেন খুঁজতে লাগল।

পাখী বললে—আমি জানি না তোমার বেবরণ, লয়? তুমি নিজে মুখে আমাকে বল নাই তোমার অঙের কথা?

সুচাঁদ ছুটে গিয়ে নিমতেলে পানুর নিমতলা থেকে একগাছা ঝাঁটা হাতে নিয়ে ছুটে এল।—তোর বিষ ঝেড়ে দোব আমি আজ।

পাখী ছুটে গিয়ে নিয়ে এল মস্ত লম্বা একখানা বাঁশের লাঠি।—আয়, তু আয়। দেখি আমি তোকে।

হঠাৎ এই সময় এসে পড়ল বনওয়ারী। চীৎকার বেড়ে গেল সুচাঁদের। পাখী চীৎকার বন্ধ করে লাঠিখানা নিয়ে ঘরে ঢুকল। ব্যাপারটা হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়ার অতি সাধারণ ব্যাপার। এমনিই এখানকার ধারা—এমনিভাবেই কলহ বাধে, এমনিভাবেই মেটে। দপ ক'রে আগুনের মত যেমন জ্বলে উঠেছিল, তেমনই খপ ক'রে নিবে গেল। বনওয়ারী এলে এমনি ভাবেই ঝগড়া থামে।

বনওয়ারীর মুখ গম্ভীর। তার ভাবে ভঙ্গিতে একটি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যস্ততা, সে বললে—চুপ, সব চুপ।

সুচাঁদ চীৎকার ক'রে উঠল আবার—ওরে বাবা রে—

বনওয়ারী ঝুঁকে কানের কাছে চীৎকার ক'রে বললে—শুনব ইয়ের পরে।

—ইয়ের পরে?

—হ্যাঁ। মাইতো ঘোষ আসছেন সাপ দেখতে।

—কে আসছে?

—জাঙলের মাইতো ঘোষ। আমার মুনিব।

বুড়িও সন্ত্রস্ত হ'ল। সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে জাঙলের পথের দিকে চেয়ে রইল। পানা পিছন থেকে হাঁকলে—সর্‌, সর্‌, স'রে যাও। পথ দাও।

দু ফাঁক হয়ে গেল জনতা। জাঙলের ঘোষ এসে দাঁড়ালেন।

চার

করালীর চোখ জ্বলে উঠল।

জাঙলের মাইতো ঘোষকে দেখলে যত তার ভয় লাগে, মনে মনে তত তার ক্ষোভ জেগে ওঠে। চন্ননপুরের কারখানায় কাজ করার জন্য তার মনে যত অহঙ্কার, তার অজ্ঞাত কোন গোপন মনে তার চেয়েও বেশি বেদনাও জ'মে আছে। ওই চন্ননপুরের কারখানায় তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন এই মাইতো ঘোষ। ওরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার মায়ের ইতিহাস। লজ্জা এই হাঁসুলী বাঁকের আলো-আঁধারিতে কম! কিন্তু তবুও মায়ের লজ্জাই সব চেয়ে বড় লজ্জা। তার সঙ্গে আরও আছে মা-হারানোর বেদনা। আর আছে এই বাঁশবাঁদি ছেড়ে যাওয়ার প্রথম দিনের বেদনার স্মৃতি।

সে সব অনেক পুরানো কথা। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার একটা টুকরো গল্প, গোটা পাঁচালির মধ্যের কয়েকটা ছড়া। সে ছড়া বলতে বনওয়ারীর মত মাতব্বরেরা লজ্জা পায়। ছোঁড়ারা আনাচে কানাচে বলে। মেয়েরা বলে নিজেদের মধ্যে রঙের কথা উঠলে ফিসফাস ক'রে। কেবল চীৎকার ক'রে বলে সুচাঁদ। সে বলে—আঃ, তার আবার লাজ কিসের? বলে যে সেই 'বেগুনে কেনে খাড়া? না, বংশাবলীর ধারা'। এই তো কাহারদের পুরুষে পুরুষে চ'লে আসছে। তারা অকপটে ব'লেও আসছে এই কাহিনী। করালী তখন ছেলেমানুষ, বাপ মারা গিয়েছিল তিন বছর বয়সে। পাঁচ বছর বয়স যখন তার, তখন তাকে ফেলে তার মা পালিয়ে যায় ওই চন্ননপুরে ইস্টিশানের একজন লোকের সঙ্গে। তখন ওই রেল-লাইন তৈরি হচ্ছে, দেশ-দেশান্তর থেকে লোক এসে লাইন বসাচ্ছে, কোপাইয়ের উপরে পুল তৈরি করছে, সে যেন এক মস্ত

ব্যাপার ক'রে তুলেছে। হাঁসুলী বাঁকের মেয়েরা খাটতে যেত চন্নপুরের বাবুদের বাড়িঘর তৈরির কালে; রেল-লাইনের ওই মস্ত ব্যাপারে যাওয়া ছিল তাদের বারণ। বনওয়ারীই তখন মাতব্বর। বারণ ছিল তার। ওখানে গেলে জাত যায়—ধর্ম থাকে না। চাষ ক'রে খায় যারা, তারা ওই কারখানায় বাতাস গায়ে লাগালে তাদের মঙ্গল হয় না। ওই বাতাস, ওই 'ঘরাণ' অর্থাৎ ঘ্রাণ সহ্য করতে পারেন না চাষীর লক্ষ্মী। যাক সে কথা। করালীর মা বিধবা হয়ে চন্নপুরে বাবুদের বাড়ি মজুরনী খাটতে গিয়ে পয়সার লোভে ইস্টিশানে কারখানার লোকদের সঙ্গে 'গোপ্ত' যোগাযোগ পাতায়। তারপর সে একদিন সন্তানের মায়া পর্যন্ত পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেল কোথায়। কেই বা খোঁজ করবে? আর খোঁজ ক'রেই বা কি হবে? করালী কাঁদতে লাগল। তবে হাঁসুলী বাঁকে এটা কোন নূতন ব্যাপার নয়। এমন অনেক ঘটে, অনেক ছেলে কাঁদে; আত্মীয়স্বজনে টেনে নেয় কাছে। আত্মীয়স্বজন না থাকলে মাতব্বর নেয় টেনে। অনাদরের মধ্যেই কোন রকমে বড় হয়। দশ-বারো বছর বয়স হ'লেই আর ভাবনা থাকে না; সে তখন সক্ষম হয়ে ওঠে, নিজের অন্নবস্ত্র নিজেই রোজগার করতে পারে। জাঙলে সদ্‌গোপদের বাড়িতে ভাত কাপড় আর মাসিক চার আনা মাইনে। গরুর রাখালি কর্মে ঢুকে পড়ে।

করালীর তিনকুলে থাকার মধ্যে ছিল এক পিসী—ওই নসুর মা, সে করালীকে টেনে নিলে। লোকে করালীকে বলত—ভুতুড়ে ছেলে। করালী খুঁজে বেড়াত তার মাকে। খুঁজতে যেত মহিষ-ডহরির বিলে, খুঁজত কোপাইয়ের তীরের বনে বনে, দয়ের ধারে, শিমুলগাছের তলায়, ওই বাবাঠাকুরতলায়; কোন-কোনদিন চ'লে যেত চন্নপুরের আলপথ ধ'রে মাঝ পথে। কাঁদত 'মা মা' ব'লে। তারপর কোন খেলা আবিষ্কার ক'রে তাই নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ত, অথবা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। বাবাঠাকুরতলায় ব'সে ব'সে সে দেখত বেলগাছে পিঁপড়ের সারি, গোড়ায় উইয়ে ঢিপি। বেলগাছ-ঢাকা অপরাজিতার লতা থেকে পাড়ত ফুল। কাহারেরা যেদিন বাবাঠাকুরের থানে পূজো দিত, সে দিন পূজোর পরে সে সেখানে যেত—গিয়ে ভোগ-দেওয়া

বাতাসা পাটালি কুড়িয়ে খেত, পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'ত। ভাঁড়ে দুধ রেখে আসত কাহাররা, সে সেটুকু খেত। ওই দহের শিমুলগাছতলায় ব'সে সে দেখতে ঝাঁকবন্দী টিয়াপাখীর খেলা—লেজ নাচিয়ে তারা উড়ত, রাঙা ঠোঁটে ব'য়ে আনত ধানের শিষ, কত দিন লড়াই করত তারা ছানা-আক্রমণকারী সাপের সঙ্গে। করালী সাহায্য করত টিয়াপাখীদের, সে ঢিল ছুঁড়ে মারত, সাপটাকে বিব্রত করত। দু-একটা সাপকে ঢেলা মেরে নীচে ফেলেও দিয়েছে। হঠাৎ এক সময় খেলার নেশা ছুটত, তখন সে আবার মাকে খুঁজত। ক্রমে বয়স বাড়ল, মায়ের ইতিহাসের লজ্জা তাকে স্পর্শ করল, তখন মাকে খোঁজা ছাড়লে সে। তখন একদিন—বারো বছর বয়স হতেই বনওয়ারী তাকে রাখালি কর্মে ঢুকিয়ে দিলে ঘোষ মহাশয়দের বাড়ি। গরু চরাত, গোবর কুড়াত, ফাইফরমাস খাটত। মধ্যে মধ্যে মেজ ঘোষকে ইস্টিশানে গাড়িতে চড়িয়ে দিলেই প্রতিবারেই মেজ ঘোষ তাকে একটি ক'রে আনি দিত।

করালীর ভারি ভাল লাগত মাইতো ঘোষকে, ভয়ও লাগত তেমনই। এমন যার বাক্সবিছানা, এমন যার সাজ-পোশাক, যে লোক এমন ক'রে অবহেলায় ফেলে দিতে পারে একটা আনি, যে লোক রেলগাড়িতে চ'ড়ে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়, কাহারদের যত ভাল লাগে, তত ভয় লাগে। হঠাৎ একদিন এই ভাল-লাগাটা বিষ হয়ে উঠল।

ঘোষ তাকে জুতোর বাড়ি মারলেন। ঘাড়ে ধ'রে তার মাথাটা নুইয়ে ধরলে বনওয়ারী, আর মেজ ঘোষ মারলেন পিঠে চটাচট চটিজুতোর পাটি। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই। মেজ ঘোষের এক খদ্দের পাঠিয়েছিল এক ঝুড়ি খাস আম। সেই আমের ঝুড়ি করালী আনতে গিয়েছিল চন্নপুর ইস্টিশান থেকে। মাস্টার মশায়ের মত এমন ভাল লোক আর হয় না। এত জিনিস আসে ইস্টিশানে, রাজ্যের সামগ্রী; সব মাস্টারই তার থেকে কিছু কিছু নিয়ে থাকে। কিন্তু সে মাস্টার কখনও কারুর জিনিসে হাত দিতেন না। শুধু মালের রসিদ-পিছু তাঁর যে পার্বণীটি পাওনা—সেইটেই নিতেন। ঘোষের আমের ঝুড়ি বেশ ক'রে চট দিয়ে মুড়ে সেলাই করাই ছিল। কিন্তু উৎকৃষ্ট

জাতের ল্যাংড়া আমের সুগন্ধে মালের ঘরখানা একেবারে মৌ-মৌ করছিল। ঢুকলেই সে গন্ধে মানুষের নাক থেকে বুক পর্যন্ত ভ'রে উঠছিল, জিভের তলা থেকে জল বেরিয়ে মুখটাকে সপসপে সরস ক'রে তুলছিল। মাস্টারের একটি ছোট মেয়ে সেই গন্ধে লুব্ধ হয়ে আম খাওয়ার জন্য বায়না ধ'রে শেষ পর্যন্ত কান্না জুড়ে দিয়েছিল। মাস্টার তবু একটি আমও বার ক'রে নেয়নি। কিন্তু করালী থাকতে পারেনি। সে নিজে দুটি আম বার ক'রে মেয়েটির হাতে দিয়েছিল। বলেছিল—আমার মুনিব তেমন লয়, আস্টার মশায়। তারপর ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে আসতেই জমাদার ধরেছিল করালীকে। সে দুটো আম না নিয়ে ছাড়লে না। শুধু ছাড়লে না নয়, পকেট থেকে ছুরি বার ক'রে একটা আম কেটে খেয়ে আমের প্রশংসায় শতমুখ হয়ে এক চাকা আম করালীকে আস্বাদন করিয়ে তবে ছাড়লে। তাই তার অপরাধ। চারটে আম কম-বেশিতে ঘোষ করালীকে ধরতে পারত না,ধরলে করালীর হাতের ও মুখে গন্ধ থেকে। আমের ঝুড়িটা মেজ ঘোষই ধ'রে তার মাথা থেকে নামাচ্ছিল। নামিয়েই সে করালীর ডান হাতখানা খপ ক'রে ধ'রে নাকের কাছে টেনে নিয়ে শুঁকলে, তারপর বনওয়ারীকে ডেকে বললে—মুখটা শোঁক্ তো বনওয়ারী। হারামজাদা ঝুড়ি থেকে আম বের ক'রে খেয়েছে পথে। বনওয়ারী লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রইল প্রথমটা। এ লজ্জা সে রাখবে কোথায়? করালী তার জাত-জ্ঞাতের ছেলে, সেই তাকে এনে এ বাড়িতে চাকরি ক'রে দিয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা যে পাড়ার সে মাতব্বর, সেই পাড়ার ছেলে করালী। প্রজার পাপ জমিদার-রাজাকে অর্সায়, সেই জন্যই তো জমিদার-রাজার প্রজাকে শাসনের অধিকার। সমাজের পাপ মণ্ডলকে মাতব্বরকে অর্সায়, সেই জন্যই মণ্ডল-মাতব্বরের কাজ হ'ল—অধর্মের পথে পুরুষ-মেয়েকে যেতে 'নেবারণ' করা। ছি-ছি-ছি! দেবতা আছেন, ব্রাহ্মণ আছেন, বাড়ির মালিক আছেন—তাঁরা তোর মনিব, তাঁরা খেয়ে তবে না তোকে প্রসাদ দেবেন! বনওয়ারীর ইচ্ছা হয়েছিল, একটা লোহার শিক আগুনে পুড়িয়ে তার জিভে ছেঁকা দেয়। কিন্তু মেজ ঘোষ নিজেই তাকে সাজা দিলেন। তাকে বললেন—ধর্, বেটার ঘাড়

ধ'রে মাটিতে মাথাটা নুইয়ে ধর্। তাই ধরলে বনওয়ারী। মেজ ঘোষ নিজেই পায়ের চটি খুলে 'পেচণ্ড' পেহার দিলেন। এবং করালীকে তাড়িয়েও দিলেন মেজবাবু। মাইনে কিছু পাওনা ছিল, সেও দিলেন না। কথাটা কানে গিয়েছিল স্টেশন-মাস্টারের। তিনি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেলেন, এবং তিনিই করালীকে ডেকে দিলেন ইস্টিশানের গুদামে কুলীর কাজ। কিন্তু ছোট স্টেশনে এ কাজে উপার্জন নাই। কায়ক্লেশে একটা লোকের পেট চলে। তাই লাইন-ইন্সপেক্টারকে ব'লে শেষে ঢুকিয়ে দিলেন কুলী-গ্যাঙের মধ্যে। সেই জন্যই না করালী আজ এই করালী, এবং এই সবের জন্যই সে অন্য দশজনের মত বনওয়ারীকে খাতির করতেও চায় না এবং ঘোষ-বাড়ির ছায়াও মাড়াতে চায় না। হোক না কেন এসব অনেক দিনের কথা, এবং দশে বিচার ক'রে বলুক না কেন অন্যায় তারই, তবু করালী সে কথা ভুলতেও পারে না, এবং অন্যায় তার ব'লে মানতেও পারে না।

মেজ ঘোষকে দেখে করালীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল প্রথমে। কিন্তু পরক্ষণেই মনটা নেচে উঠল। বনওয়ারী তার ঘাড় ধরেছিল, মেজ ঘোষ তাকে মেরেছিল। আজ বনওয়ারী তাকে তারিফ করছে, মেজবাবু এসেছে তার মারা সাপটা দেখতে। মেজ ঘোষ কি বলে, কি রকম ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে প্রশংসা-ভরা দৃষ্টিতে, সে আজ তা একবার দেখবে।

উঠানে নেমে সে সত্যই বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। ঘোষ দাঁড়িয়ে ছিলেন সাপটার কাছেই। বনওয়ারী সামনের ভিড় সরিয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলে। করালী কিন্তু এগিয়েও এল না, প্রণামও করলে না। সে নটবরের সঙ্গে কি একটা কথা নিয়ে হাসাহাসি শুরু ক'রে দিলে। বনওয়ারী বার কয়েক চোখের ইশারায় তাকে এগিয়ে এসে ঘোষ মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ করতে ইঙ্গিত করলে। করালী দেখলে, কিন্তু দেখেও যেন দেখতে পেলে না, এই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। কান কিন্তু তার খুব সজাগ ছিল, কে কি বলছে, তার প্রতিটি কথা সে শুনছিল। অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিল মেজ ঘোষের মুখে কি কথা বার হয়—সেইটুকু শুনবার জন্য। সকলেই খুব বিস্ময় প্রকাশ করলে, করালীর

বীরত্বের তারিফ করলে। কিন্তু কিছুক্ষণ দেখে শুনে একটু হেসে মেজ ঘোষ বললেন, নাঃ, খুব বড় না। এর চেয়ে অনেক বড় পাহাড়ে চিতি চিড়িয়াখানাতেই আছে। আসামের জঙ্গলে তো কথাই নাই। সেখানে এত বড় সাপ আছে যে, বাঘের সঙ্গে লড়াই হ'লে বাঘ মেরে ফেলে। রেল-লাইনের উপর যদি কোন ট্রেন যাবার সময় পড়ে তো ট্রেন আটকে যায়।

বনওয়ারী সায় দিলে কথাটায়, বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। মাঝারি সাপ।

করালী এবার উদ্ধতভাবেই এগিয়ে এল। সাপটাকে এখনই এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে সে। নিয়ে যাবে চন্নপুর স্টেশনে, সেখানে বাবুদের দেখাবে, সায়েবকে দেখাবে। তাদের কাছে ঘোষের দাম কানাকড়ি। জাঙলের একজন ভদ্রলোকের ছেলে বললে—কিন্তু এ তো পাহাড়ের চিতি নয়—এ হ'ল চন্দ্রবোড়া। চন্দ্রবোড়া এত বড় কিন্তু কেউ কখনও দেখে নি। আর সাপও ভীষণ সাপ।

ঘোষ একটু হেসে বললেন—জাত ওই একই হে, চিতির জাত। তারপর করালীর দিকে চেয়ে দেখে বললেন—হুঁ। জোয়ান তো হয়েছিস বেশ। বুদ্ধিরও একটু ধার আছে মনে হচ্ছে। কি করিস এখন ?

করালী বেশ মাথা উঁচু ক'রে গম্ভীরভাবেই জবাব দিতে চেষ্টা করলে, অ্যাল-লাইনে কুলী-গ্যাঙে কাজ করি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, গম্ভীর আওয়াজ তার গলা দিয়ে একেবারেই বার হ'ল না। উত্তর দিতে গিয়ে বার দুই ঢোক গিলে সে চুপ ক'রে রইল। বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। উত্তর দিলে বনওয়ারী, বললে—এ এখন অ্যাল-লাইনের কুলী খাটে।

ও! আচ্ছা। তা হ'লে তো অনেক দূর এগিয়েছিস রে! আর কি করছিস? রাত্রে চুরি? যে রকম শরীরটা বেঁধেছে আর বুদ্ধিতে যেমন বঁড়শীর মত বাঁকা ধার, তাতে তো ও-বিদ্যেটায় পণ্ডিত হতে পারবি।

করালীর শরীরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। মাথা হেঁট ক'রে রইল সে। কথা বলার ভঙ্গিই এমন মেজ ঘোষের যে, সকলেই মুখ টিপে হাসতে লাগল। বনওয়ারী হেসে বললে—আজ্ঞে না, চুরি-টুরি করে না, সে সব আমার আমলে

হবার জো নাই কাহারপাড়ায়। সে যিনি করবেন, তাকে গাঁ থেকে উঠে যেতে হবে। তবে করালী বজ্জাত খুব। যত বজ্জাত, তত ফিচলেমি বুদ্ধি।

মেজ ঘোষ হাসতে হাসতে বললে—তা হ'লে চোর হওয়া ওর অনিবার্য। যদি চোর না হয় তবে পয়লা নম্বরের লোচ্চা হবে—এ আমি বলে দিলাম বনওয়ারী। তারপর পকেট থেকে চামড়ার বাহারে মনিব্যাগ বার ক'রে একটা সিকি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—নে।

সঙ্গে সঙ্গে মেজ ঘোষ সমস্ত লোকের কাছে আশ্চর্য রকমের সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। তারপর বললেন—উঠিয়ে নিয়ে যা ওটা। গন্ধ উঠছে এর মধ্যে। সকলেই জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে লাগল কথাটা শুনে। গন্ধ উঠছে নাকি? গন্ধ? বনওয়ারীও নিশ্বাস টানলে জোরে জোরে। করালী একটা রুদ্ধ অথবা ক্ষুব্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেও সিকিটাকে উপেক্ষা করলে না, সিকিটা তুলে নিয়ে কোঁচড়ে গুঁজে সঙ্গীদের বললে—লে, তোল্। নিয়ে যাব চন্নপুর ইস্টিশান। তোল্।

আজ এই মুহূর্তটিতে আবার করালীর আক্ষেপ হ'ল—নসুদিদি নাই, সে থাকলে জবাব দিতে পারত ঘোষকে। সে থাকলে কোমরে কাপড় বেঁধে মেজ ঘোষকে দেখে মাথায় একটু ঘোমটা দিয়েও ঘোষের কথার উত্তর না দিয়ে ছাড়ত না।

ঘোষ বললে—নাঃ, খুব বড় না।

নসু সঙ্গে সঙ্গে গালে হাত দিয়ে জবাব দিত—হেই মাগো! বড় তবে আর কাকে বলে মাশায়?

ঘোষ বললে আসাম না কোথাকার জঙ্গলের পাহাড়ে চিতির কথা।

নসু হাত নেড়ে ব'লে উঠত—গোখুরা কোথা পাব বাবা? আমাদের এই হেলেই গোখুরা। আসাম না বেলাত কোথাকার কথা বলছেন, সেথাকার রজগর সেথাকেই থাকুক। আমাদের এই রজগর, এই আমাদের খুব বড়। লঙ্কায় বলে সোনা সস্তা, সেখানকার নোকের সব্ব অঙ্গে সোনা, আমাদের হ্যাশে কাঁচের চুড়ি রুপদস্তার চুড়িই সোনার চুড়ি।

আরও কত ছড়া কাটত। করালীর বার বার মনে হ’ল নসুবালার কথা। আর, আজ নসুদিদি থাকলে বড় ভাল হ’ত। এতবড় একটা কীর্তির গৌরব-উৎসাহ ম্লান ক’রে দিলে মেজ ঘোষ! ঘোষ চোখের অন্তরাল হতে তবে তার সাহস খানিকটা ফিরে এল। সে মাথলাকে ধমক দিয়ে বললে—কি রে, কানে কথা যায় না, লয়? লে, তোল্। সাপটাকে ব’য়ে নিয়ে যাবার বাঁশের এক দিকে কাঁধ দিয়েছিল মাথলা, অন্য দিকে ছিল ‘লটা’ অর্থাৎ নটা, মানে নটবর।

ঘোষ বাড়ি থেকে চ’লে গেলে কোঁচড় থেকে সিকিটা বার ক’রে করালী বললে—দেখ্ দি-নি রে—সিকিটা আবার চলবে তো? মেকি-ফেকি লয় তো? মাথলা এবং নটবর সাপটাকে বাঁশে ঝুলিয়ে ব’য়ে নিয়ে যাবে, তাদেরই বললে সে। তারা কেউ বলবার আগেই এগিয়ে এল নিমতেলে পানু। বললে—কই, দে দেখি।

দেখে বললে—না, চলবে। ভালই বটে। তা ছাড়া মাইতো ঘোষ মাশায়ের বেগের সিকি। লতুন চকচকে ছাড়া রাখেই না তিনি টাকা পয়সা।

করালী বললে—হুঁ।

পানু বললে—আমাকে সেবার পয়সা দেবার তরে বেগটা ঢাললে তক্তপোশের ওপর। একেবারে সোনার পয়সার মত চকচকে লালবন্ন পয়সা—সে এই এত।

পানুও তাদের সঙ্গ নিলে বেহায়ার মত, সেও যাবে চন্ননপুর ওদের সঙ্গে। চন্ননপুরে যে অনেক পয়সা মিলবে তাতে সন্দেহ নাই। করালী তাতে আপত্তি করে নাই। আসুক বেটা ছুঁচো। পানুই দিলে একটা কাঁধ। অজগর চললেন চন্ননপুর।

কয়েক মুহূর্ত পরেই হঠাৎ করালী ঘুরে দাঁড়িয়ে পানুর গালে ঠাস ক’রে এক চড় বসিয়ে দিলে আচমকা।—শালো, কানার মত চলছ যে বড়? কানার মত চলছ যে? পায়ে পায়ে টক্কর দিলি যে বড়? আমাদের আর চোখে দেখতে পাও না, লয়? শালো! সোনার পয়সার মত চকচকে ‘লালবন্ন! শালো, যাও না কেনে, সেইখানে যাও না। আমার সাথে কি বটে তোমার?

মাথলা বললে—ঠিক বলেছে করালী। আজ আমাদের সাথে কি বটে হে তোমার? মুরুব্বির কাছে তো সাতখানা ক'রে লাগাও তুমি। আজ কি বটে আমাদের সাথে?

নটবর তাকে সাবধান ক'রে দিলে—অ্যাই, চুপ কর। মুরুব্বি আসছে কিনা দেখ্ আবার।

ওদের দুজনের ঘাড় ফেরাবার উপায় ছিল না, একে আলপথ, তার উপর কাঁধে সাপ-ঝুলানো বাঁশ।

মাথলা তবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বললে—না। কই? আসে নাই সে।

করালী বললে তার বিদ্যাসম্মত হিন্দীতে—যে আসেঙ্গা সে আসেঙ্গা, হাম কেয়ার করতা নেহি হ্যায়। হুঁ। তারপর হঠাৎ বললে—কাহারদের ছেলে পাল্কি বওয়ার হাঁক ধর্ না কেনে শালোরা। হাঁক ধর্ কেনে। কথাটা ভারি মনে লাগল মাথলাদের। মরা সাপটাকে পাল্কির আরোহী ধ'রে নিয়ে তারা হাত দুলিয়ে হাঁক ধরলে—প্লো হিঁ—প্লো হিঁ—প্লো হিঁ। হঠাৎ পিছন থেকে বনওয়ারীর মোটা গলার হাঁক তারা শুনতে পেলে, দাঁড়া—দাঁড়া। এ-ই! দাঁড়া। থেমে গেল সকলে। থেমে যেতে হ'ল। পা আর উঠল না। শুধু করালী উঠল অধীর হয়ে। এ কি কাণ্ড! এ কি জুলুম!

বনওয়ারীর মুখটা হয়ে উঠেছিল হাঁড়ির মত। সে এসে দাঁড়াল। বললে —ফের্।

—ফিরব? কেনে?

—দাহ করতে হবে।

—সে তো 'আস্তে' করব বলেছি।

—না। এখুনি হবে দাহ। গোটা কাহারপাড়াকে চান করতে হবে। তারপর হঠাৎ আক্ষেপভরা আক্রোশভরা কণ্ঠে সে ব'লে উঠল—তুই গাঁয়ের সব্বনাশ করবি রে—তুই সব অনথের মূল।

করালী স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে—ফিরে আয়। যা করেছিস, তার পিতিবিধেন করতে হবে।

করালী বললে—না। ওঠা রে সব, ওঠা।

কিন্তু কেউ ওঠাতে সাহস করে না। দাঁড়িয়ে রইল মাটির পুতুলের মত।

করালী আবার বললে—শুনছিস ? ওঠা।

কেউ যেন শুনতেই পাচ্ছে না। বনওয়ারী বললে—মুখ দিয়ে 'অক্ত উঠে যদি মরতে না চাস তবে ফেরা।

এবার সাপ উঠল। চলল সকলে সাপ কাঁধে ক'রে বাঁশবাদিতে ফিরে। ফিরল না শুধু করালী। সে হনহন ক'রে চলতে শুরু করলে চন্নপুরের দিকে।

বনওয়ারী ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ফিরল।

কাহারপাড়ার আদ্দিকালের যত বিধান সুচাঁদের কাছে। সেই বিধানই চিরদিন বলবতী হয়েছে এখানে, আজও হ'ল।

মেজ ঘোষকে বিদায় ক'রে বনওয়ারী বাড়ি ফিরে দেখলে, সুচাঁদ ব'সে আছে। সুচাঁদ পাখীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছে। পাখীকে ব'লে এসেছে—এ বাড়িতে যদি আর ফিরি, তোর মায়ের গতরের ওজকারের রন্ন যদি খাই, তবে আমার জাত নাই, আমি বেজাত। আমি বনওয়ারীর বাড়িতে থাকব।

বনওয়ারী সম্মান করতে জানে। সে বললে—বেশ তো পিসী। ছেলেকালে অ্যানেক দোগ্ধ তুমি দিয়েছ আমাকে। তুমি থাকবে সে তো ভাগ্যি আমার গো। কি, হ'ল কি ?

সুচাঁদ সবিস্তারে সমস্ত বর্ণনা ক'রে বললে—বনওয়ারী, উনি যদি কত্তার বাহন না হন, কি মা-মনসার বেটী না হন, তো আমি কি বলেছি।

বনওয়ারীর—কাহারপাড়ার মাতব্বরের দৃষ্টি যেন এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, এবার জেগে উঠল। খুশিও হ'ল সে। অত্যন্ত খুশি হ'ল। মনের মধ্যে সাপ মারার সেই স্মৃতির বেদনা যেন ঘন হয়ে উঠছে। সে পিসীর পায়ের ধুলো নিলে।

পিসী আশীর্বাদ করলে—ছেরায়ু হ বাবা। আমার মাথার চুলের মতন তোর পেরমাই হোক। তারপর কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে বললে—আহা, রাগুনে দগুধে গিয়েছেন মা আমার, তবু কি বন্নের বাহার, কি গড়ন! আঃ—আঃ! সব্বনাশ ক'রে দিলে বাবা!

বনওয়ারীর মন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিধানের জন্যই বেশি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে। প্রতিবিধান—বাবাঠাকুরের পূজা। মদে-মাংসে ঢাকে-ঢোলে আতপে-চিনিতে বস্ত্রে-সিঁদুরে পূজা। সকল কর্মের উপরে হ'ল তার মাতব্বরির দায়িত্ব, গ্রামের ভাল আগে দেখতে হবে তাকে। হে বাবা কর্তা! গ্রামের মঙ্গল কর তুমি। সাজা নিতে হয়, যে দোষ করেছে তাকে দাও। করালীকে কিন্তু শাসন করা দরকার হয়েছে। বড়ই বৃদ্ধি হয়েছে। জোয়ান বয়সের রক্তের তেজ। হঠাৎ ক্রোধে ফুলে উঠল বনওয়ারী। আজও ওই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বাঁশবনের মধ্যে—। আফসোসের সঙ্গে মনে করতে চেষ্টা করলে বনওয়ারী বাঁশপাতার উপর অসাবধানে কেমন ক'রে তার পা পিছলে গিয়েছিল। কিন্তু তবু সে তার অপমান। সে তার পরম লজ্জার কথা।

বনওয়ারী মাতব্বর কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলে বাবাঠাকুরকে। উপরের দিকে চাইলে একবার, তারপর মনে মনে মানত করলে ঠাকুরকে—হে ঠাকুর, পূজো দেবার কথা তো হয়েই আছে। আবারও মানত করছি—এর জন্যে একটি নতুন পাঁঠা দেব আমি। তুমি কাহারদের রক্ষা কর।

সুচাঁদ প্রশ্ন করলে—কি করছিস তা বল্?

বনওয়ারী বললে—এর তরে আমি পূজো দোব পিসী, আলাদা পাঁঠা মানত করছি।

—কি করেছিস?

—আরও একটা পাঁঠা?—স্থিরদৃষ্টিতে বনওয়ারীর মুখের দিকে চেয়ে সুচাঁদ প্রশ্নচ্ছলে কথাটার পুনরুক্তি করলে।

বনওয়ারী আবার বুঝিয়ে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, মানত করছি—মানত।

—মানত?

হ্যাঁ। দুটো পাঁঠা দিয়ে কত্তার পূজো দোব।

আঙুল দেখিয়ে সুচাঁদ বললে—দুটো পাঁঠা দিবি?

—হ্যাঁ।

—বেশ বেশ। কিন্তুক, অ্যানেক কল্যেণ করতেন উনি বাবা—ওই উনি। আঃ, কি শিস!

বনওয়ারী বললে—দাহ হবে বাবার বাহনের। কাহারপাড়ার সবাইকে চান করতে হবে। ব'লে দাও সব। আমি চললাম ডাকতে। সে ছুটল।

কোপাইয়ের তীরে চিতা সাজিয়ে দাহ হ'ল বাবার বাহনের। গোটা কাহারপাড়া চান ক'রে ফিরল। বনওয়ারী প্রণাম ক'রে এল বাবার থানে।—হে বাবা! রক্ষা কর বাবা! পাষণ্ডকে দলন কর বাবা! কাহারদের মালিক, কাহারদের রক্ষা কর।

পাঁচ

ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং—ড্যাড্যং-ড্যাড্যং— এর্‌-র্‌-র্‌-র্‌-র্‌-র্‌-র্‌ —ড্যাং-ড্যাং—ড্যাডং-ড্যাং—

বাবাঠাকুরতলায় ভোরবেলায় 'ঝুঁজকি' থাকতে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই ঢাকী ভোরের বাজনা ধুমুল বাজাতে শুরু করলে। রবিবার অমাবস্যা—ক্ষণ মিলেছে ভাল, বাবাঠাকুরের পূজো হবে। ফুলে বেলপাতায়, তেলে সিঁদুরে, ধূপে প্রদীপে, আতপে চিনিতে, দুধে রম্ভায়, মদে মাসে, কাপড়ে দক্ষিণায়—সমারোহ ক'রে পূজো।

ঢাক বাজবার আগেই ওঠে কাহারপাড়া—মেয়ে পুরুষে। ঘুমিয়ে থাকে শুধু ছেলেরা। তারাও আজ উঠে পড়ল। কলরব ক'রে তারা যেতে চায় বাবাঠাকুরের থানে। সুচাঁদ চোখ বড় বড় ক'রে বললে—না। খবরদার, এ তো বছরশালি পূজো নয়,—আমোদ নেই এতে। অপরাধের পূজো, একেই বাবা মুখ ভার ক'রে আছেন, তারপর ছেলেরা যাবে, চেঁচামেচি করবে। ল্যাই

কলহ্ করবে, ধূলো ছিটোবে, অবলার জাত—নোংরা ময়লা করবে—অপরাধের ওপর অপরাধ হবে। খবরদার! আগে পাঁঠা ছুটি নির্বিঘ্নে কাটা হোক, বাবাঠাকুর পূজো লেন হাসিমুখে ; তা'পর লাচন কোদন, গান বাজেনা, মাল —সব হবে।

বনওয়ারী পাড়ায় পাড়ায় ব'লে এল—সাবধান, সব সাবধান! করালীর অপরাধের সাজা গোটা পাড়াকে ভুগতে হচ্ছে বাবা সকল, আর অপরাধ বাড়িয়ো না। অনেক মাশুল লাগল। আর না।

প্রহ্লাদ বললে—সোজা খরচ!

বনওয়ারী খরচ করছে, পানু মনে করে হিসেব রাখছে। এ সবে নিমতেলে ছোকরা খুব লায়েক। দেহখানি—ওরা বলে, সরিঙ্গী অর্থাৎ কাঠির মত ; কিন্তু মাথা নাকি খুব। মনে রাখতে পারে খুব। পানু মুখে মুখে হিসেব দিলে—খরচ তোমার অনেক। লগদ তিন টাকা বারো আনার ওপর ছ পয়সা।

এর উপরে আরও খরচ আছে, ঘর থেকে দ্রব্যসামগ্রী দেওয়া হয়েছে, তার দামই বেশি। ছটো পাঁঠা, একটা ভেড়া, বারোটা হাঁস, দশ-বারো সের চালও দিতে হয়েছে—বায়েন কর্মকার পুরোহিত মহাশয়দের সিধার জন্য। এ সবের দাম অনেক। সকালবেলা থেকে তিন প্রহর বেলা পর্যন্ত মজুরি খেটে যারা পাঁচ আনা রোজ পায় অর্থাৎ মাসিক ন টাকা ছ আনা মাত্র যাদের আয়, তাদের কাছে অনেক বইকি! সুতরাং কাহারদের জীবনে এ একটা সমারোহ এবং রোমাঞ্চকরও বটে।

রোমাঞ্চটা আরও প্রবল হয়ে উঠল বাবাঠাকরের থান পরিষ্কারের সময়। সেয়াকুলের ঝোপ কাটবার সময়, ওই ঝোপগুলির ভিতরের উইঢিপি থেকে বেরিয়ে পড়ল তিন-তিনটে আল-কেউটে। কেউটেকে ওরা খুব ভয় করে না। কোপাইয়ের তীরে, জাঙলের মাঠে আল-কেউটের বাস চিরকাল। ওদের সঙ্গেই এক রকম বাসই করে কাহারেরা। কেউটেরাও ওদের মধ্যে মধ্যে তাড়া করে, ওরাও কেউটেদের তাড়া ক'রে পাঁচন-লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে।

তবে জাত-সাপ নাকি ব্রাহ্মণ, ওদের মেরে তাই সম্মান ক'রে আগুনে 'ডাহ' অর্থাৎ দাহ করে। বাবাঠাকুরের থানে কেউটের কিন্তু অন্য অর্থ হ'ল। বিশেষ ক'রে এই অজগরতুল্য চন্দ্রবোড়াটিকে বাবার বিবিত্র বর্ণ বাহন ব'লে জানার পর, এই কেউটেগুলিকে তার সঙ্গী সাথী না ভেবে পারলে না বনওয়ারী। সে বললে—খবরদার! হাত দিয়ো না গায়ে।—ব'লে নিজেই সে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করলে। সাপ তখন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ফোঁসাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে মাটিতে ছোবল মারছে। কিন্তু এগিয়ে আসতে তাদেরও সাহস নাই। বেদে জাতের গায়ের গন্ধে সাপ তাদের বেদে ব'লে জানতে পারে, ভয় পেয়ে ছুটে পালায়; কাহারদের গায়ের গন্ধে ওরা তেমনিই বোধ হয় ভয় পায়, এগিয়ে আসতে চায় না সহজে।

বনওয়ারী সাপদের বললে—যা, যা, যা বাবারা, চ'লে যা। খানিকটা স'রে যা। লরে-লাগে অর্থাৎ নরে-নাগে বাস করতে নাই, এখন তোরা স'রে যা। তোমাদের প্রভু, আমাদের বাবাঠাকুর, তাঁর পুজোটি সেরে লি, তা'পরেতে তোমরা আবার স্বস্থানে পরমেশ্বরী হ'য়ো না কেন!

সাপগুলো স'রেই গেছে। কাহারেরাও সাবধান হয়ে রইল। কি জানি, হোক না কেন বাবাঠাকুরের বাহনের সঙ্গী সাথী, তবু ও-জাতকে বিশ্বাস নাই।

তবে ওই যে ঢাকের শব্দ—ড্যাডাং-ড্যাডাং-ড্যাডাং, ওতেই ওরা স'রে যাবে অনেক দূর। তার উপর ধূপ-ধুনো, অনেক মানুষের আনাগোনা।

নগদ খরচের মধ্যে পুরুত মহাশয় নিলেন আট আনা; কাপড় একখানা সাত হাত—দাম পাঁচ সিকে জোড়া হিসেবে দশ আনা; পাকি 'কারণ' সওয়া পাঁচ আনা; বাতাসা কদমা মণ্ডা ও অন্যান্য জিনিস—বনওয়ারীরা এ ক্ষেত্রে জিনিসকে বলে 'দব্য', তার দাম সওয়া পাঁচ আনা; বলিদানের ছেত্তাদার ছ আনা; দেড় গোলা মদ আটারো আনা; এবং ঢাকী নিয়েছে চার আনা। বাকি চার আনায় তেল সিঁদুর ধূপ তিল ধুনুচি প্রদীপ ইত্যাদি। ছাগলের দুটো মুড়ির একটা নিয়েছে পুরুত, একটা ছেত্তদার, ঢাকী নিয়েছে ভেড়ার মাথাটা। কাপড়খানা পুরুত নিয়েছে। সকলেই খুশি হয়ে গিয়েছে, ব'লে

গিয়েছে—পূজো নিখুঁত হ'ল মুরুব্বি। শুধু একদিন দেরি হয়ে গেল এই যা। শনিবারটা পাওয়া গেল না। তা হোক। পুরুত বললেন—রবিবার অমাবস্তে—খুব ভাল। অমাবস্তে রবিবার, মৎস্য খাবে তিনবার। কত্তা খুশি হয়ে মদ মাংস খাবেন।

তা বাবাঠাকুর খুশি হয়ে পেসন্ন মনে দু হাত ভ'রেই মদ-মাসের পূজো নিলেন। বলিদানে একটু খুঁত হ'ল না। তিন প্রহরের সময় বলিদানের ঢাক বাজল—ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং—ডেনাক-ড্যাড্যাং—লাগ-ড্যাং-ড্যাং-ড্যানা—

কাহারদের মাতব্বরেরা তখন বাবার পেসাদী 'কারণের' প্রসাদ নিয়েছে—উপোস-করা পেটে অল্প 'কারণেই' বেশ জমিয়ে তুলছে; মাথা ঝিমঝিম করছে। তারা সব জোড় হাত ক'রে দাঁড়াল। সুচাঁদ রাঙা আঁটির মত চোখ বিস্ফারিত ক'রে চেয়ে চেঁচাতে লাগল—হে মা—হে মা—হে মা!

ছেলেরা মুখে বাজনার বোল বলতে লাগল—খা-জ্যিং-জিং জিনাক জিজিং লাগ জিংজিং জিনা—

বলির সঙ্গেই পূজা শেষ। দেখতে দেখতে বলি হয়ে গেল—নিখুঁত বলি।

পানুর পাঁঠা তো ছিলই, বনওয়ারী নিজে একটা পাঁঠা দিয়েছে। রতন দিয়েছে ভেড়াটা। বনওয়ারী দিলে ওই সাপটিকে মারার অপরাধের জরিমানা। করালী করলে পাপ, সে করলে প্রায়শ্চিত্ত। না করলে কে করবে? করালীর যা হবে হোক, কিন্তু পাড়ার মঙ্গল—গাঁয়ের মঙ্গল তাকেই দেখতে হবে যে। সমস্ত পাড়ার লোক বনওয়ারীকে এর জন্য প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দিয়েছে। রতন ভেড়াটি দিয়েছে নিজের অবাধ্য সন্তানের জন্য—লটা করালীর সঙ্গী, সেই হতভাগাই বাঁশে ঝুলিয়ে ওই অলৌকিক সাপটিকে ব'য়ে নিয়ে গিয়েছে। সুচাঁদ দিয়েছে একটি হাঁস। নিছক ভক্তির বশবর্তী হয়েই সে দিয়েছে। বসন্তও দুটি হাঁস দিয়েছে, ডাইনে বাঁয়ে বলি দেবার মত দু পাশে দুটো হাড়কাঠ ছিল না—তবু ওই মানসেই সে দুটি হাঁস দিয়েছে। পাখী করালীকে সমর্থন করে। বসন্তের গোপন মানস ছিল একটি হাঁস পাখীর জন্য, অন্যটি করালীর জন্য। একটি পাঠিয়েছে কালোশশী—গোপনে পাঠিয়েছে। এ পূজোয় আটপৌরে-

পাড়ার সকলে যোগ দিলেও পরম মাতে নাই এতে। বনওয়ারীর সঙ্গে তার সৌহার্দ্য নাই। বনওয়ারী মাতব্বর হয়ে যা করে, তাতে পরম যোগ দিতে দেয় না আটপৌরেদের। এ ক্ষেত্রে আটপৌরেরা পরমের কথা মানে নাই। কিন্তু পরম যোগ দেয় নাই। তবে নিজের পাড়ার লোকেরা যখন তার কথা না শুনেও যোগ দিলে, তখন নেহাত পাড়ার মাতব্বরি করতে উপস্থিত হয়েছিল মাত্র। বাকি আটটা হাঁস আর আট ঘর থেকে এসেছে। যার হাঁস ছিল, সে না-দেওয়া হয় নাই। যার নাই, সে কি করবে? কত্তাকে পুজো দিতে সাধ কার না হয়, প্রসাদ পাওয়ার ভাগ্য কে চায় না? সকল বাড়ি থেকেই মণ্ডা বাতাসা পাঁচ পয়সা হিসেবে দিয়েছে। এ ছাড়া মদ। ঘোষ মহাশয় তিন গোলার দাম দিয়েছিলেন, কিন্তু বনওয়ারী দেড় গোলার বেশি কেনে নাই। দেড় গোলা কিনে তারই আবরণে ভেণ্ডরকে ফাঁকি দিয়ে গ্রামেই তারা আরও তিন গোলা মদ নিজেরাই ক'রে নিয়েছে।

পুজো হয়ে গেল। এইবার নিশ্চিন্ত। চল সব, চল, বাবাঠাকুরের বাতাসা পেসাদ লাও, জল খাও, রান্নাবান্না কর। জয় বাবাঠাকুর! হে ভগবান! মঙ্গল কর তুমি।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়ালে করালী। তার হাতে তিনটে হাঁস। পিছনে নসুবালা আর পাখী।

—মাতব্বর, আমি তিনটে হাঁস বলিদান দোব।

বনওয়ারী দুঃসহ ক্রোধে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। এ কি উৎপাত! এ কি বিঘ্ন! রাগে তার মুখে কথা ফুটল না, গোটা কাহারপাড়াই স্তব্ধ হয়ে রইল। এগিয়ে এল পানু। সে তার শীর্ণ লম্বা হাতখানা লম্বা ক'রে বাড়িয়ে রাস্তা দেখিয়ে বললে—ভাগো।

—ভাগো?—করালী প্রশ্ন করলে।

—হ্যাঁ। লিয়ে যাও তোমার হাঁস। তোমার বলি লেয়া হবে না।

—লেয়া হবে না?

—না।

করালী চীৎকার ক'রে উঠল—মাতব্বর!

বনওয়ারী এগিয়ে এল এবার। বললে—চিচ্‌কার কিসের? চিচ্‌কার কিসের?

—পানার মুখ ভেঙে দোব আমি। কি বলছে, শুনছ?

—কি বলছে?

—আমার হাঁস লেবে না। বলি দিতে দেবে না।

—হ্যাঁ, লেবে না—আমার হুকুম।

—কেনে? লেবে না কেনে?

—না, না। লেবে না। তোমাকে নাকে খত দিতে হবে—

বাধা দিয়ে বলল করালী—নাকে খত দিতে হবে?

—হ্যাঁ। জরিমানা দিতে হবে। সকলের ছামনে—

—থাক্, থাক্। এই করলে তবে লেবে আমার হাঁস?

—হ্যাঁ।

—লইলে লেবে না?

—না।

করালী আর কোন কথা না ব'লে পট পট ক'রে হাঁস তিনটের মুণ্ডু দু হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—কত্তা, খাবে তো খাও, না খাবে তো খেয়ো না, যা মন তাই কর। আমাদের হাঁস খাওয়া নিয়ে কথা, আমাদের বলিদান হয়ে গেল।—ব'লে মুখে বলিদানের বাজনার বোল আওড়াতে আওড়াতে চ'লে গেল—খা—জ্যিং জিং—জেনাক পূজো—

মুণ্ডুগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁসগুলোকে নিয়ে সে চ'লে গেল। গোটা পাড়াটা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শুধু বনওয়ারী হেঁকে উঠল—যাক, যেতে দাও ওকে। চল সব, বাড়ি চল জল খাও। একবার বাবাকে ডাকো। ব'লেই সে ডেকে উঠল, ব-লো শি-বে—ধর্ম রক্ষো।

সবাই সমবেত কণ্ঠে হেঁকে উঠল।

ঢাক বাজতে লাগল পূজো শেষের—ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং—ড্যাং ড্যাং—। লম্বা ক'রে বাজনা। শেষ হ'ল। পূজো শেষ।

অশুভক্ষণে করালী, অশুভক্ষণে ওর জন্ম; এমন পূজোটিতে কেমন অস্বস্তি এনে দিলে। দিক। সে ভাববার অবকাশ নাই বনওয়ারীর। পূজো শেষ হ'লেই কাজ শেষ হয় না। অনেক কাজ। মাতব্বরি সহজ নয়। অনেক বিবেচনা করতে হয়। অনেক ভাবতে হয়। প্রসাদ বিলি করতে হবে। মিষ্টির প্রসাদ, বলিদানের প্রসাদ, কারণের প্রসাদ। যে সব লোকের বাড়ি থেকে হাঁস অথবা অন্য বলি যায় না, তাদের বাড়িতে দেবার জন্য প্রত্যেক বলি থেকে দুটি ক'রে পা কেটে নিয়ে একত্র ক'রে কুটে তাই ভাগ ক'রে পাঠিয়ে দাও তাদের বাড়ি বাড়ি। নিজের বলিটির আর দুটি পা ছাড়িয়ে ঘোষ মহাশয়ের বাড়ি পাঠাতে হবে। নিজেই সে চলল সে দুটি নিয়ে। তার আগে নিজের পোশাক-পরিচ্ছদটি সে ভাল ক'রে দেখে নিলে। বাঃ, বেশ হয়েছে! ঠিক আছে। পরনে আজ তার পরিষ্কার একখানি হাঁটু-বহরের কাপড়, তার কোঁচাটি উল্টে নিয়ে কোমরে গুঁজেছে, কাঁধে পরিষ্কার করা গামছাখানি পাট ক'বে ঝুলিয়েছে, কপালে পরেছে সিঁদুরের ফোঁটা। মাংস পেয়ে ঘোষ খুশি হলেন খুব, একটা সিগারেট দিলেন বনওয়ারীকে। বললেন—হ্যাঁ, আজ একটা মণ্ডল মাতব্বর ব'লে মানাচ্ছে বটে। তা এর সঙ্গে একটা সিগারেট না হ'লে চলবে কেন?

বনওয়ারী সেটিকে কানে গুঁজে ভক্তিসহকারে প্রণাম ক'রে বাড়ি ফিরল। দু বাটি মদ সে এর আগেই খেয়েছিল। একটু বেশ নির্ভয়-নির্ভয় ঠেকছিল দিন-দুনিয়া; সে বললে—আশীর্ব্বাদ—সব আপনকারদের আশীর্ব্বাদ। ঘোষ-বাড়ির 'নক্ষীর' এঁটো-কাটায় বনওয়ারীর পিতিপুরুষের 'জেবন'। আবেগে কেঁদে ফেললে বনওয়ারী।

সান্ত্বনা দিতে গেলে ফ্যাসাদ বাড়বে—এ অভিজ্ঞতা মেজ ঘোষের স্বোপার্জিত; ধমক দিলেও ওদের মনে বড়ই লাগে তাও অজানা নয়। সুতরাং তিনি সংক্ষেপে বললেন—সে হবে বনওয়ারী, কাল হবে সে সব কথা। ওদিকে

তোমার পাড়ায় আজ অনেক কাজ। দেখো, যেন কোন অঙ্গহীন না হয়।

বনওয়ারীকে এখন বিদেয় করতে পারলেই বাঁচেন ঘোষ। একে কাহার, তাতে মাতাল হয়েছে; গায়ে দুর্গন্ধ উঠছে। কিন্তু মাতাল বনওয়ারীর কথা সহজে শেষ হবে কেন, সে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ,। একশো বার। জ্ঞানবানের কথা। তবে বনওয়ারীর জেবন থাকতে সেটি হবেন না। খুন-খারাবি হয়ে যাবে? ওই করালী—ওই যে হারামজাদা বদমাস—অক্তের ত্যাজে মেরে ফেলালে দেবতুল্য সপ্যটিকে, ওর আমি কি করি দেখেন। তাড়াব—ওকে আমি এখান থেকে তাড়াব।

বড় ঘোষবউ বললেন—বেশ বেশ, এখন বাড়ি যাও। সন্ধ্যে হয়ে গেল, আজ পূজো দিয়েছ, কত্তার ওখানে আজ একটা পিদীম দিয়ো, ঢাকীটাকে একবার ধুমুল দিতে ব'লো যেন। যাও। এখন ব্যবস্থা কর গিয়ে।

বনওয়ারী এবার তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। এ কটি ব্যবস্থা তার ভুল হয়ে গিয়েছে। ঠিক কথা, ওঁরা জ্ঞানবান লোক, অনেক বিদ্যা, ওঁদের 'ওদেরে'র মধ্যে আছে, এমন প্রয়োজনীয় কথা ঠিক ওঁদের মনে পড়বেই তো। সে হাত জোড় ক'রে বললে—আজ্ঞে, আমি আজ যাই।

হ্যাঁ, এসো।—এমন ক্ষেত্রে গম্ভীর ভাব রক্ষা করতে মেজ ঘোষ অদ্বিতীয়। অন্য সকলেই অল্প অল্প হাসছিল, কিন্তু ঘোষ একেবারে গম্ভীর, যেন কোন সম্পত্তি নিলামে ওঠার সম্পর্কে চিন্তান্বিত মুখে আলোচনা করছেন তাঁর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সঙ্গে।

বনওয়ারী চ'লে গেল, খুব দ্রুতপদে হনহন ক'রে চলল। প্রদীপ দিতে হবে, বাবার স্থানে ঢাকীকে বলতে হবে ধুমুল দেওয়ার জন্য। তার হয়েছে এক মরণ। এই যে মাতব্বরি, এর চেয়ে ঝকমারির কাজ আজ আর কিছু নাই। রাজার দোষে রাজ্য নাশ, মণ্ডলের দোষে গ্রাম নাশ; প্রজার পাপে রাজ্য নষ্ট, গ্রামের পাপে মণ্ডলের মাথায় বজ্রপাত। হে ভগবান।

পাড়ায় এসেই হাঁকডাক শুরু ক'রে দিলে, পিদীম—পিদীম চাই একটা।

কাচা কাপড়ের সলতে দে। ভাঁড় ছেকে ত্যাল দে, অন্নশালের ত্যাল দিস না যেন।

পানুকে সে পাঠালে বায়েনপাড়া। ধুমুল দিতে হবে।

প্রদীপটি নিয়ে সে দু পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। বাতাস দিচ্ছে। তার স্ত্রী গোপালীবালা এগিয়ে এসে একটি 'টোকা' অর্থাৎ চুপড়ি হাতে দিলে। বনওয়ারী বললে—বাঃ! হ্যাঁ, এ সব কাজে মেয়েদের বুদ্ধিই খেলে ভাল। ঠিক হয়েছে। প্রদীপটিকে টোকার আড়াল দিয়ে সে চলল। কত্তার থানে যেতে হ'লে পথে আটপৌরেপাড়ার উত্তর প্রান্তের ঝাকড়া বটগাছতলাটা পার হতে হয়। বড়ই অন্ধকার স্থান। টোকার আড়ালে প্রদীপের আলো ঢেকে গেছে। গাছতলাটা থমথম করছে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে বনওয়ারী থমকে দাঁড়াল। কে ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদছে যেন?—কে?—কে গা?

গাছতলায় সাদা মূর্তি একটা ব'সে রয়েছে। এগিয়ে গেল বনওয়ারী।

—কে?

প্রদীপটার উপর থেকে টোকাটা সরিয়ে নিয়েই সে চমকে উঠল।—কালোবউ? কালোশশী? এ কি? এ কি? হ্যাঁ, সে কালোশশীই বটে। বুকের ভিতর যেন ঢাক বেজে উঠল। অন্ধকার এই গাছতলায় একা কালোশশী!

মনের দুঃখে ঘর ছেড়ে এসে কালোশশী কাঁদছিল। পরম তাকে বেশ ঘা কতক দিয়েছে। গোপনে সে যে হাঁসবলি পাঠিয়েছিল বনওয়ারীর কাছে, সে কথাটা পরমের কাছে গোপন থাকে নাই। কেউ ব'লে দেয় নাই, কিন্তু পরম নিজেই ধ'রে ফেলেছে। কত্তার ওখানে পরম একবার গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, পূজো না দিলেও প্রণাম জানাবার জন্য গিয়েছিল, সেই সময় বলি দেবার জন্য যখন হাঁসটার মাথায় সিঁদুর দিচ্ছিল পুরুত, তখনই তার সন্দেহ হয় হাঁসটা তার বাড়ির হাঁস ব'লে। কিন্তু সেখানে সে গোল করে নাই। বাড়ি এসে হাঁসের হিসেব ক'রে দেখেছে একটি হাঁস কম। অমনই বাক্যব্যয় না ক'রে কালোশশীকে ঘরে পুরে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে, এবং এই গোপন পূজো দেওয়া যে কালোশশীর কর্তার প্রতি ভক্তির জন্য নয়, পূজোর উদ্যোক্তা

প[illegible]য়ারীর প্রতি প্রীতির আতিশয্যের নিদর্শন, সেই কথাটা অত্যন্ত কুৎসিত স[illegible] ক'রে পরম তাকে বার বার ক'রে বলেছে—আমি কবে মরব তাই জানি [illegible]লইলে সব জানি, সব বুঝি, বুঝেছিস ? পরিশেষে কয়েকটা কুৎসিত অশ্লীল '[illegible]াধনে সম্বোধিতও করেছিল কালোশশীকে। ও সম্বোধনের জন্য অপমান বোধ করে নাই কালোশশী ; ওদের কাছে কদর্য বা অশ্লীল ব'লে ভাষার মধ্যে কিছু নাই। প্রহারের বেদনার জন্যই সে রাগ করেছে, এবং সেই ক্ষোভের মধ্যেই সুযোগ পেয়ে তার অভিমান জেগে উঠেছে তার অদৃষ্ট এবং বিধাতার উপর। তাই ঘর ছেড়ে গ্রামের বাইরে গাছতলায় ব'সে সে কাঁদতে এসেছে।

বনওয়ারীর সঙ্গে সে কিন্তু ছলনা করলে। আসল কথা গোপন করলে, বললে—এসেছিলাম কত্তাকে পেনাম করতে। মানত করলাম একটা।

বনওয়ারী বললে—তা কাঁদছিলা কেনে ভাই ?

—কাঁদছিলাম মনের বেথায়।

—মনের বেথায় ?—কেঁদে ফেললে বনওয়ারী। কালোশশীর মনের ব্যথা! সে ব্যথা সঙ্গে সঙ্গে বনওয়ারীর মদ্যসিক্ত নরম মনকে ব্যাকুল ক'রে তুললে।—কি তোমার মনের বেথা ভাই ?

—আমার বেথা আমার কাছে ভাই ; যাকে বলবার, যে বুঝবে, তাকেই বললাম। বললাম—আমার যেন 'মিত্যু' হয়।

—কেনে ভাই ? এমন মানত কেনে করলে ভাই ? কি তোমার বেথা, কি তোমার অভাব—আমাকে বলবে না ?

—কি হবে বেঁচে ? ছেলে নাই, পুলে নাই। সোয়ামী, না, কসাই—

বনওয়ারী তার মাথায় হাত দিয়ে বললে—হবে—হবে। আমি বলছি, তোমার সন্তান হবে। দেখো তুমি।

হঠাৎ প্রদীপের আলোটা নিবে গেল। চুপড়িটার আড়ালের মধ্যে থেকে প্রদীপটার বাইরের বাতাসে নেববার কথা নয়। বাতাস নয়, ফুঁ দিয়ে প্রদীপটা নিবিয়ে দিলে কালোশশী। ব্যাকুলভাবে সে বনওয়ারীর খালি হাতখানি জড়িয়ে ধরলে। কালোশশীর মুখেও মদের 'বাস' উঠছে।

হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবনের তলায় পৃথিবীর আদিম কালের অন্ধকার
দিন
বেঁধে থেকে। সুযোগ পেলেই দ্রুতগতিতে ধেয়ে ঘনিয়ে আসে সে অন্ধ
বাঁশবন থেকে বসতির মধ্যে। প্রদীপটা নিবে যেতেই সে অন্ধকার ছুটে
কোপাইয়ের বুক থেকেই যেন হড়পা বানের মত। সেই তমসার মধ্যে ম
নেশায় উত্তেজিত বনওয়ারী এবং কালোশশী বিলুপ্ত হয়ে গেল। এতক্ষণে কালোশশী সব কথা বললে বনওয়ারীকে। বনওয়ারী অনেক কাঁদলে। তার ব্যথার কথাও সে বললে। তারও সন্তান নাই। সে জানে সন্তানহীনতার দুঃখ। এত বড় সে মাতব্বর, দু বিঘে জমি, খানিকটা ঘাসবেড়, এতগুলি গরু হাল বলদ, এ সব কি হবে? কি দাম এ সবের? কিন্তু আজ আর তার কোনও উপায় নাই। তা ছাড়া আজ এই এমন মুহূর্তে কালোশশীর কাছে সত্য গোপন করবে না; তার স্ত্রীকে সে কখনই কালোশশীর মত ভালবাসে না। কিন্তু কি করবে সে? তাদের মধ্যে সাঙার রেওয়াজ আছে, কিন্তু তার পক্ষে—ঘাড় নাড়লে বনওয়ারী। অন্য কেউ হ'লে তার পক্ষে সম্ভব ছিল এমন কাজ। সে বনওয়ারী—পাড়ার মাতব্বর।

কালোশশী বললে—আমারই কি আর তাই সাজে ভাই! সে কথা আমি বলি নাই। হঠাৎ কালোশশী চমকে উঠল। বললে—কে যেন গেল! আমি বাড়ি যাই। তুমি যাও, ঠাকুরতলায় পিদীম দিয়ে পাড়ায় যাও।

—দাঁড়াও, পিদীম আবার জ্বেলে আনি।

এইবার কালোশশীই বললে—পিদীম নিয়েছ, ধূপ কই? শুধু পিদীমে সনজে দেওয়া হয় নাকি?

ঠিক কথা। ঠিক বলেছে কালোশশী। কালোশশী যে চন্ননপুর-ফেরতা মেয়ে, এ কথা কালোশশী ছাড়া আর কে বলতে পারবে?

চন্ননপুরে বাবুদের বাড়িতে কালোশশী অনেকদিন 'ছোটলোক' ঝিয়ের কাজ করেছে। বাবুরা বলে—ছোটলোক ঝি। এদের মেয়েরা এঁটো-কাঁটা আঁস্তাকুড় ধোয়, বাসন মাজে, ছেলেপিলের ময়লা কাপড় সাফ করে, দু বেলা খেতে পায়, বছরে দুখানা কাপড়ও মেলে, মাইনে চার আনা থেকে এক টাকা

পর্যন্ত—যার যেমন বাড়ি, যেমন কাজ। কাহারপাড়ার মেয়েরা জাঙলে সদ্‌গোপদের বাড়িতে ভোরবেলায় গিয়ে কাজ ক'রে বাড়ি ফেরে। চন্নপুর এখান থেকে অনেকটা দূর, সেখানে যাওয়া চলে না, এবং সেখানেও অনেক 'ছোটজাত' আছে, তারাই করে সেখানকার কাজ। কেবল কালোশশীই চন্নন-পুরে বড়বাবুদের বাড়ি কাজ করেছে বছর দুয়েক। সেবার একটা ডাকাতির মকদ্দমায় পরমের আড়াই বছর জেল হয়েছিল। সেই সময় কালোশশীকে চন্নপুরে বড়বাবুদের বাড়িতে কাজ ঠিক ক'রে দিয়েছিল বড়বাবুদের হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ ভূপসিং মহাশয়। সেইখানেই থাকত তখন কালোশশী। ভূপসিং মহাশয় তখন কালোশশীর মালিক হয়েছিলেন। ব্যাপারটায় নিন্দা অবশ্যই আছে, নিন্দাও হয়েছিল; কিন্তু নিন্দনীয় কর্মমাত্রই অমার্জনীয় অপরাধ নয় সমাজে। ওদের সমাজে এটা এমন নিন্দনীয় কর্ম নয়, যার মার্জনা নাই। কারণ ভূপসিং মহাশয় জাতিতে উচ্চবর্ণ, ছত্রী, গলায় পৈতে আছে, তা ছাড়া তিনি বাবুদের বরকন্দাজ। যাক সে কথা। পরম ফিরে এসে কালোশশীকে ঘরে এনেছে। এ সব রীতিনীতি কালোশশী সেখানেই শিখে এসেছে।

বনওয়ারী আবার পাড়ায় ফিরে ধূপ নিয়ে এল।

* * *

প্রদীপটা কয়েক মুহূর্তে জ্ব'লেই নিবে গেল বাতাসে।

ধূপটা পুড়তে লাগল, কর্তাতলার সরীসৃপসঙ্কুল প্রান্তরের মধ্যে বাতাসের সঙ্গে ঘুরতে লাগল। ওদিকে গ্রামের মধ্যে তখন মাতন লেগেছে, ঢোলক বাজছে, গান চলছে সমবেত কণ্ঠে। আঃ, তবু আজ পাগল কাহার নাই! পাগল কাহার বাঁশবাঁদির গায়েনদার, গান বাঁধে, গান গায়, সে থাকলে আরও জমত। এও বেশ জমেছে। বয়স্কদের মোটা গলার সঙ্গে ছেলেদের মিহি জোরালো মিঠে গলার সুর, শিঙের সঙ্গে সানাইয়েয় মত মিহি-মোটা সুরের শিল্পময় বুনন চলেছে। মেয়েরাও মদ খেয়েছে। তাদেরও বসেছে স্বতন্ত্র আসর। সে আসরের মূল গায়েন সুচাঁদ; সে খুব খুশি। কত্তার পুজো হয়ে গিয়েছে, পুজোর মত পুজো, বলিদান, ঢাক, মদ—কোন খুঁত নেই। পাকি

আধ সের দুধ ধরে, এমন বাটির তিন বাটি মদ খেয়েছে সে। সুচাঁদ নাচছে কখনও, গান গাইছে কখনও, কখনও বলছে সেকালের রোমাঞ্চকর গল্প। তাদের আমলের মনে মনে রঙ-ধরাধরির কথা, কে কার ছিল ভালবাসার মানুষ—উচ্চ হাসি হেসে সেই সব কথা ব'লে যাচ্ছে। কখনও বলছে, নীলকুঠীর আমলের সাহেবদের গল্প, কুঠী উঠে গেলে কাহারদের কষ্টের কথা।

—কাহারপাড়ায় সে এক 'মনন্তরা'। আমার মা বলত, বাবার মা বলত, সে এক 'ভেষণ' অবস্থা। হাড়ির ললাট—ডোমের দুগ্‌গতি। বান এল, সেই বানে কুঠী ভাসল—তা কাহারপাড়া! কাহারপাড়ায় সাগর জল। সে জলের 'সোরোত' কি! ঘর-দুয়োর প'ড়ে গেল। গরু-বাছুর-ছাগল ম'রে ঢোল হয়ে ফুলে বাঁশবনে আটকে থাকল কতক, কতক ভেসে গেল। লোকেরা গাছে উঠে ব'সে থাকল চি-পুত্ত-মা-বুন নিয়ে। মায়ের কোল থেকে কচি ছেলে ঘুমের ঘোরে হাত থেকে খ'সে টুপুস ক'রে প'ড়ে গেল বানের জলে। আমাদের বনওয়ারীর এক জ্যেঠা ছিল—বাবার বড় ভাই, সে তখন দু বছরের ছেলে—সে প'ড়ে যেয়েছিল। আরও যেন কার কার ছেলে যেয়েছিল প'ড়ে। গাছের ডালেই ঠুকুস ক'রে ঘাড় লটকে ম'রে গেল পেহ্লাদের কত্তাবাবা! ওই হারামজাদা করালীর কত্তাবাবা ছিল তখন মায়ের প্যাটে। ভর্তি-ভর্তি দশ মাস। গাছের ডালেই পেসব হ'ল ছেলে। তাতেই নাম হ'ল—ষষ্ঠীদাস। গাছটি ছিল ষষ্ঠীগাছ। ডাকত নোকে 'গেছো-ষষ্ঠী' ব'লে। ওই হারামজাদা করালী এমন ডাকাবুকো কেন? গেছো-ষষ্ঠীর ঝাড় ব'লে।

তারপর সে হা-হা ক'রে হাসতে লাগল।

বসন বললে—মরণ, এর আবার হাসি কিসের?

পাখী নেশায়-রঙিন চোখ বিস্ফারিত ক'রে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে, বাইরে সে মজলিসটিকে লক্ষ্য করছে, মনে মনে স্বপ্ন রচনা করছে। ওর কান রয়েছে—করালীর বাড়ির আসরের ধ্বনির দিকে। করালীর বাড়িতে করালী আলাদা আসর বসিয়েছে। করালী কাউকে ভয় করে না, সে কারও কাছে হার মানে না, ঘোষকেই সে আজ প্রণাম করে নাই, তো বনওয়ারী! সেই

মুণ্ডু-ছেঁড়া হাঁস তিনটে রান্না হয়েছে। চন্ননপুর থেকে বোতলবন্দী পাকি মদ এনেছে। নসুবালা নাচছে। জ'মে উঠেছে তাদের আসর। পাখীর মন নাচছে। আষাঢ় মাসে ঘনঘটা ক'রে মেঘ এলে তালচড়ুইগুলি যেমন নেচে নেচে ওড়ে, তেমনই ভাবে উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে। তার মনে রঙের সঙ্গে মদের নেশায় উত্তেজনা যোগ দিয়েছে। সে যাবেই করালীর বাড়ি। এদের মজলিসটা ভাঙলে হয়, কি নেশাটা আরও খানিক জ'মে উঠলে হয়! ওদিকে সেই ডাকাবুকোর অর্থাৎ করালীর মজলিস ভাঙলে হয়! তার সংকল্প আজ দৃঢ়।

সুচাঁদ গাল দেবে—দিক। বনওয়ারী শাসিয়েছে—শাসাক। সে মানবে না কারও শাসন। সে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার বুকে।

বনওয়ারী আজ পাড়ার মজলিসে ব'লে দিয়েছে—যদি আপন আপন থাকতে চাও তো সে ভাল কথা ; যার যা খুশি কর ; কেউ কারু দায় হয়ে নাই, কে মরল, কে থাকল দেখাদেখি নাই ; বাস্, ভাল কথা ; আমি বাঁচি—মাতব্বরি আমি চাই না, করব না। আর তা যদি না হয়, দায় যদি পুরতে হয় আমাকে, তা হ'লে আমার কথা মেনে চলতে হবে। ওই করালীর মতন চাল-চলন—এ চলবে না। কথাটা সে বলবার সময় দু-তিনবার পাখীর দিকে চেয়ে কথা বলেছে। বলুক।

নিমতেলে পানু—ওই লিকলিকে চেহারা, ধূর্ত চাউনি-ভরা চোখ—ওই দুষ্টটাই সর্বাগ্রে সমর্থন করেছে বনওয়ারীকে। যত নষ্টের মূলে হ'ল ওই। করালীর নামে ও-ই সাতখানা ক'রে লাগিয়েছে। সেদিন চন্ননপুরে সাপটা নিয়ে যাবার সময় কি সব কথা করালী বলেছিল, তা-ই একটাকে সাতখানা ক'রে লাগিয়েছে। ওই নষ্টই তুলেছিল পাখীর কথা।

কুট কেটে বলেছে—বসন আর পাখীকে শুধাও কথা। তারা আমার কথা মানবে তো? করালীর উঠনে পাখীর যে ফাঁদ পাতা আছে। হি-হি ক'রে সে হেসেছে।

পাখী পাখা ঝাপটে নখ-ঠোঁট মেলে আক্রমণ করত পানুকে, কিন্তু তার

আগেই বসন্ত তাকে থামিয়ে দিয়েছে। পাখীর ওই একটা দুর্বলতা। মাকে সে দুঃখ দিতে পারে না। কি ক'রে দেবে? মা তো তার শুধু মা নয়—তার পরাণের সখী। এমন মা কারও নাই। পাখী অকপটে বলে সকল কথা তার মাকে। বসন কখনও মেয়েকে তিরস্কার করে না। সে তার চুল বেঁধে মুখ মুছিয়ে দেয়। ঠাট্টা ক'রে বলে—ভাল হয়েছে কি না করালীকে শুধাস। এই মায়ের অপমান সে করতে পারে, না, তাকে দুঃখ দিতে পারে?

সে জানে, করালীর ঘরে সে গেলে কেউ তাদের কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তার মা বসনকে সবাই বিঁধে মারবে। সেই ভয়েই এতদিন সে কিছু করে নাই। তবে আজ আর নয়। আজই সে যাবে, আজ যেন মন বলছে, যেতেই হবে।

ওঃ! কি আষাঢ়ে এক গল্প ফেঁদেছে দিদি-বুড়ী অর্থাৎ সুচাঁদ, তার আর শেষ নাই! টুকরো টুকরো ক'রে এই গল্প—এই আঠারো বছর বয়সের গোটা জীবনটাই শুনে আসছে পাখী। অরুচি ধরেছে তার ওই গল্পে, বিশেষ ক'রে আজ এই মুহূর্তে।

হা-হা ক'রে হাসছে সুচাঁদ—সে হাসি আজ রাত্রে আর থামবেই না বোধ হয়। করালীর বাবার বাবা বন্যার সময় গাছের উপর জন্মেছিল, সেই নিয়ে বুড়ী হাসছে। তা নিয়ে এত হাসি কিসের? বুড়ী ডাইনি ডাকিনী, করালীকে দু চক্ষে দেখতে পারে না।

সেজন্য কিন্তু হাসে নাই সুচাঁদ। বন্যার দুর্যোগে—গাছের ডালে জীবন বাঁচাতে মানুষ যখন বিব্রত, তখনও কিনা কাহার-কাহারনীর মন-মাতানো রঙের খেলা! সেই কথা বলতে গিয়ে সুচাঁদ না হেসে পারে! হায় হায় রে! কাহার-কুলের মনের রঙের খেলার বিরাম নাই! কি মনই তাদের দিয়েছিল বাবাঠাকুর! বলতে বলতে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করে সুচাঁদ। গাছের ডালে ব'সে মানুষ অনাহারে রয়েছে, শীতে কাঁপছে, হু-হু ক'রে বাদলের বাতাস বইছে, নীচে পাথার বান, কোপাইয়ের বুকে গোঁ-গোঁ ক'রে ডাক উঠেছে, সেই সময়ে কিনা ওই নিমতেলে পানুর ঠাকুরদাদার বাবার তৃতীয় পক্ষের পরিবার

রঙ লাগালে—আটপৌরেদের পরমের কত্তাবাবার সঙ্গে! ওরা ছিল এক গাছে, এরা ছিল এক গাছে। চোখে চোখে কি খেল হ'ল, কখন হ'ল দুজনার, কে জানে! সেই দুর্যোগে—কেই-বা উদিকে মন দেয়! পরমের কত্তাবাবার তখন ছোকরা বয়েস। তার উপর কুঠীর সায়েবদের আটপৌরে; খাতির যত, হাঁক-ডাক তত। আর ছুঁড়ীরও তখন অল্প বয়েস, বুড়ো স্বামী—ইংলি-বিংলি সতীনপোর ঝাঁক, সে থাকবে কেনে তার ঘরে? এমুনিতেই থাকত না। আশ্চর্যের কথা মা, দুদিন তর সইল না, ওই গাছের উপর ব'সেই চোখে চোখে অঙ খেললে! ভোরবেলা সবাই ঢুলছে; শব্দ উঠল—ঝপ। বাস্। কেবল বনওয়ারীর কত্তামা—ছেলের 'শোগে' ঘুমোয় নাই, সে চেঁচিয়ে উঠল। সবাই জাগল।—দেখ্ দেখ্, কে পড়ল! নিমতেলে বুড়ো কেঁদে উঠল—ও মাতব্বর, আমার বউ পড়েছে। পড়েছে তো পড়েছে, যে গেল সে যাক। কি করবি বল্? আর করবেই বা কি? বুড়ো কাঁদতে লাগল। ওমা! সকাল হ'লে লোকে দেখলে, আটপৌরেদের গাছে পরমের কত্তাবাবার ডালে ব'সে আছে সে মেয়ে।

আবার হাসতে লাগল সুচাঁদ।

রতনের স্ত্রী বললে—তা হ'লে মজার 'মনস্তরা' বল?

সুচাঁদ এক মুহূর্তে হাসি থামিয়ে মদের নেশায় লাল চোখ বিস্ফারিত ক'রে মুখ তুলে চাইলে, মাঝ-উঠানে জ্বলছিল যে কাঠের পাতার ধুনিটা তার ছটা পড়ল মুখে; হাঁড়ির মত বুড়ীর মুখখানা কেমন হয়ে উঠেছে যেন। সে বললে—মজা! হ্যাঁ, সে মজা যেন আর কখুনও না হয়। মজা হ'ল তা'পরে। বান নেমে গেল। ভিজে দেয়াল 'ওদ' আর বাতাস পেয়ে হুড়দাড় ক'রে ধ্বসতে লাগল। গাঁয়ের মাটি ভিজে সপসপ করছে, চার আঙ্গুল ক'রে পলি পড়েছে, দাঁড়াবার থান নাই। গরু মরেছে, বাছুর মরেছে, ছাগল মরেছে, শুয়োর মরেছে, মানুষ মরেছে; চারিদিকে পচা দুগ্‌গন্ধ। ধান চাল ভেসে গিয়েছে, কাঁথা-কানি ভিজে ডবডব করছে। কুঠীর সায়েবের চাকর ছিল বেয়ারারা, সায়েব মেম মরেছে, কুঠী ভেসে গিয়েছে। কে গুরু, কে গোঁসাই তার ঠিকেনা

নাই। মুনিব নাই। মুনিব নাই, ‘অক্ষে’ করবে কে? আগের কালে বান আসত, কাহারপাড়া ডুবত, সায়েবরা ছিল—তারা বড় বড় তক্তা বেঁধে ভেলা ক’রে কাহারদের নিয়ে যেত কুঠীবাড়িতে। চাল দিত, আলি হুকুম দিত—খিচুড়ি রাঁধ, খাও। ঘর ভাঙলে ঘরের খরচ দিত, খোরাক দিত। কাহারেরা ছিল পাহাড়ের আড়ালে। ঝড় আসুক, ঝাপটা আসুক, বান আসুক, কাহারদের ভাবনা ছিল না। আর এবার কাহারদের পিথিমী অন্ধকার হয়ে গেল। সায়েব ম’ল, মেম ম’ল, কুঠী বিকিয়ে গেল। তার ওপর সেবার সে কি ‘ওগ’! সে এক মহামারণ। জ্বরজ্বালা, প্যাটের ব্যামো; কে কার মুখে জল দেয়—এমুনি হাল। দু-তিন ঘর ‘নিব্ব্যনেদ হয়ে গেল। তখন সব যে যার পরাণ নিয়ে পালাতে আরম্ভ করলে। কেউ গেল কুটুমবাড়ি, কেউ গেল ভিখ করতে হেথা-হোথা। বিদেশ-বিভুঁয়ে কত জনা যে ম’ল তার ঠিকানা নাই। তা’পর দেশ ঘাট শুকুলো, মা দশভুজার পুজোর সময় যারা বেঁচে ছিল একে একে ফিরল গাঁয়ে। ফিরল যদি তো—সে আর এক বেপদ! সে বেপদের কাছে বানের বেপদ কোথা লাগে! সায়েবদের কুঠী উঠে যেয়েছে, বেবাক জমিদারি হকহুকুম কিনেছে চৌধুরী। সেই যে যখের ধন দিয়েছিলেন কত্তা, সেই টাকায় সায়েবদের সব কিছু কিনেছে তখন চৌধুরী। ঘর নাই, দুয়োর নাই, ‘আশ্চয়’ নাই, চাকরি নাই, কাহারেরা এসে ‘অতান্তরে’ পড়ল, চোখে পিথিমী অন্ধকার হয়ে গেল। কি হবে? কোথা যাবে? কে চাকরি দেবে?

সায়েবদের আমলে দুখানা পাল্কি, কুঠীতে চব্বিশ ঘণ্টা হাজির থাকতে হ’ত, ষোলো জন বেহারা মোতায়েন থাকত। সায়েবরা ফি বেহারাকে জমি দিয়েছিল দশ বিঘে ক’রে আর বাস্তুভিটে। জমি চাষ কর, খাও দাও, আর সায়েব-মেমকে নিয়ে সওয়ারী কাঁধে বেড়াও। তার ওপর ‘বশকিশ’ ছিল, হেথা-হোথা বিয়ে-সাদীর বায়না ছিল। আরও ছিল তোমার নীলের চাষ। তাও সবাই খানিক আধেক দুবিঘে পাঁচবিঘে করত। তা’পরে তোমার সায়েবদের যখন দাঙ্গা হ’ত—এই ধর কোন ‘ভদ্দ-শদ্দদের’ জমির ধান ভেঙে নীল বুনতে

হ'ত, কি পাকা ধান কেটে নিতে হ'ত তখন কাহারেরা ছিল সায়েব মশায়দের ডান হাত। সায়েবদের লেঠেল যেত, ওই আটপৌরেরাও লেঠেলদের সঙ্গে লাঠি নিয়ে যেত। তারা পাহারা দিত, আর বেহারা-কাহারেরা হাল গরু নিয়ে দিত পোতা জমি ভেঙে, চ'ষে-ম'ষে তছনছ ক'রে নীল বুনে দিত, পাকা ধান হ'লে কেটে-মেটে ছিঁড়ে-খুঁড়ে তুলে নিয়ে চ'লে আসত বাড়ি। ধান যে যা আনত স তো পেতই, তার ওপর ছিল লগদ লগদ 'বশকিশ'। সে ছিল কাহারদের সোনার আমল। সায়েবরা গেল, কাহারদের কপাল ভাঙল। চোখে অন্ধকার দেখবে না কাহারেরা? আমলই পালটিয়ে গেল। চৌধুরী বেবাক চাকরান জমি খাস ক'রে নিয়েছে এখন। বললে—আমার তো পাল্কি বইতে হবে না বাবো মাস, বেহারাদের চব্বিশ ঘণ্টা হাজির থাকতেও হবে না—চাকরান জমি আমি দোব কেনে? কেড়ে নিলে মা জমি। জমি বাড়ি ঘর সব গেল। অন্ধকার, তিভুবন অন্ধকার মা। বুক চাপড়িয়ে কেঁদেছিল কাহারেরা। আমার মা বলত, তখন আমার মা ভরাভরতি সোমথ মেয়ে; তার এক বছর পরে আমি প্যাটে হই। মা বলত—কাহারেরা বুক চাপড়িয়ে কেঁদেছিল, সে কান্নায় পূজো-বাড়ির ঢাকের বাদ্যি ঢাকা প'ড়ে যেয়েছিল। যে প্যাটের জ্বালায় গাঁ ছেড়ে দিয়ে ভিখ মাগতে গিয়েছিল কাহাররা, কুটুমবাড়িতে 'নেনো' হয়ে ছিল এতদিন মা, সেই প্যাটের জ্বালা পাসরণ হয়ে গেল। হাঁড়ি চড়ালে না; 'আন্না-বান্না' দূরে থাক্, পূজো-বাড়ির পেসাদ—সেও কেউ মাগতে গেল না। তা'পরে হ'ল কি মা, শেষকালে 'নউমী' পূজোর দিনে সে এক অবাক কাণ্ড! হঠাৎ চৌধুরী বললে—যা ভিটেগুলো তোদের ছেড়ে দিলাম, ভিটে থেকে তোদের বাস তুলে দোব না, সে বজায় রাখলাম। ওই চাকরানটুকু রইল, কালে-কস্মিনে পাল্কির দরকার হ'লে বইতে হবে। তবে জমি পাবি না। হ্যাঁ, কৃষাণ মান্দেরী কর্—থাক্। কাহাররা তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পিতিপুরুষদের ভিটে থাকল 'মনস্তরায়' এই ভাগ্য। চৌধুরীকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ ক'রে বিজয়া দশমী থেকে ঘর তুলতে লাগল সব প'ড়ো ভিটেয়। সেও তোমার ওই কত্তামশায়ের দয়া। চৌধুরীকে তিনি স্বপন দিয়ে দিয়েছিলেন অষ্টমীর

'আতে'—মানুষকে ভিটেছাড়া করতে নাই, কাহারদিগে তুলে দিলে আমার 'ওষ' হবে তোর ওপর। তাতেই 'নউমীর' দিন সকালে উঠে চৌধুরী ভিটে ছেড়ে দিলে।

থামল সুচাঁদ। সমস্ত মজলিসটা হাঁসুলীর বাঁকের উপকথা শুনে অবাক-বিস্ময়ে স্তম্ভিতের মত ব'সে আছে, মদের নেশায় আবেগপ্রবণ মস্তিষ্কে সেকাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথার মধ্যে নেশার স্রোত ছুটছে কোপাইয়ের হড়পা বানের মত। সেই বানের উপর কল্পনায় সেকাল ভেসে বেড়াচ্ছে। ভেসে বেড়াচ্ছে চৌধুরী-বাড়িতে-ভেসে-আসা সেই যক্ষের নৌকোর মত। পঞ্চ-শব্দের বাজনা বাজিয়ে আলো ঝলমল হয়ে যেন ঢেউয়ে ঢেউয়ে নড়ছে। সব ভাম হয়ে ব'সে আছে। কেউ কেউ ঢুলছে, কার যেন নাক ডাকছে। শব্দ উঠছে নানা রকমের, হাসি আসে শুনে।

বসন বড় ঠাণ্ডাপ্রকৃতির মেয়ে, সে মদও কম খেয়েছে—মৃদু হেসে রতনের স্ত্রী কুসুমকে বললে—মরণ, নাক ডাকছে কার লো?

কুসুমও চারিদিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—কে লো, কার নাকে শুয়োর ঢুকল লো? ঘোঁত ঘোঁত করছে কে লো?

সুচাঁদ ওদের মুখ নড়া দেখতে পেয়ে মুখটা এগিয়ে এনে প্রশ্ন করলে—অ্যাঁ?

পাখী এবারে উঠে পড়ল বিরক্ত হয়ে। নাঃ, এরা আর ঘুমোবে না! ওদিকে করালীর ঘরেও মজলিসে তেহাই পড়বে না! সে উঠে মাকে বললে—আমি শুতে চললাম মা।

—খেয়ে শুবি। আর খানিক ব'স।

—না।

কুসুম চিমটি কাটলে বসনের পায়ে। কুসুম বসন্তের সখী, সে সবই জানে ভিতরের কথা। বসন্ত একটু হেসে বললে—যা তাই। ঘুমোস না যেন।

সুচাঁদ একটু বিরক্ত হয়ে বললে—কি বলছিস লো? অ্যাঁ?

চীৎকার ক'রে বসন্ত বললে—পাখী শুতে চলল। তাই বলি—ঘুমোস না যেন।

সুচাঁদ সর্বাঙ্গ দুলিয়ে দু হাত নেড়ে একটা ছড়া কেটে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা জোর হাঁক জেগে উঠল কোথা থেকে। হাঁসুলীর বাঁকের অন্ধকার চমকে উঠে সতর্ক হ'ল; ওঃ, চৌকিদার হাঁক দিচ্ছে! সুচাঁদও চমকে উঠেছিল—পাখীকে কথাটা তার বলা হল না, তার বদলে বিস্মিত হয়ে বললে—ও মা গো! থানদার হাঁক দিছে? ইয়ের মধ্যে? বলি হা বসন, ট্যান পুল পেরিয়ে গেল কখন? কই বাম্ভির মত শব্দ তো ওঠে নাই?

সত্যই ট্রেন যাওয়ার শব্দ এখনও ওঠে নাই।

পাখী যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে ব'লে গেল—মদ খেয়ে মেতে আনন্দের আর সীমে নাই। আজ অবিবার তা মনে আছে? আজ সেই ভোরবেলাতে গাড়ি।

তাই বটে, সে কথা কারও খেয়াল নাই। রবিবার সন্ধ্যার ট্রেন যায় না, যায় ভোর রাত্রে।

—কি?

—আজ 'অবিবার'।

হ্যাঁ, মনে পড়ল সুচাঁদের। পরক্ষণেই ভুরু কুঁচকে বললে—তা শ্যাল ডেকেছে পহরের? শুনেছিস?

—কই, না যে গল্প তুমি বলছিলে!

ঠিক এই সময়েই খানিকটা দূরে শোনা গেল কার খুব গম্ভীর গলার আওয়াজ—পরম! পরম! পরম আটপৌরে! সঙ্গে সঙ্গে একটা জোরালো টর্চের আলোর লম্বা ফালিতে আটপৌরেপাড়ার অন্ধকার চিরে ফেললে। সকলে আশ্বস্ত হ'ল। না, রাত্রি বেশি হয় নাই। থানার বাবুরা কেউ এসেছে 'দাগী' দেখতে। মধ্যে মধ্যে সপ্তাহে একদিন ক'রে আসে থানার বাবুরা। ওরা এই সকালে সকালেই আসে। পরম আটপৌরে দাগী। এই জাঙলে

সদ্‌গোপ- বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল কয়েক বছর আগে। পরম ডাকাতির দলে অবশ্য ছিল না, কিন্তু শুলুক-সন্ধান সে-ই দিয়েছিল। মালও বেরিয়েছিল তার ঘরে। জেল হয়েছিল পরমের। পরম দাগী আসামী।

সকলেই ভাল হয়ে বসল। পুরুষদের মজলিসে গান বাজনা গোলমাল সংযত হ'ল। করালীর বাড়ির মজলিসের বাজনা একেবারে থেমে গেল। থানার বাবু এ পাড়া পানেও আসবে একবার। আটপৌরেপাড়ায় এলে এ পাড়াও ঘুরে যায়। এ পাড়ায় দাগী এমন কেউ নাই, কিন্তু এককালে ছিল। কাহারপাড়ার সকলেই দাগী ছিল বললেই সত্য কথা বলা হবে। সে কারণেও বটে, তা ছাড়া—অজ্ঞান 'ছোটলোক' জাত, কার কখন মতিভ্রম হয় কে বলতে পারে? তাই বোধ হয় বাবুরা দেখে যান। বনওয়ারীও বলে—ওঁরা যে আসেন, তাতে আমি খুশি। নিজের চোখে দেখে যান রীতকরণ আমাদের, আর আমাদের মধ্যে যারা মনে মনেও 'চুলবুল' করে তারাও জ্ঞান পাক, 'সতর' হোক, মনকে সামাল দিক।

এই যে করালীর মত বেয়েড-বেতরিবৎ ছোকরা, এদের শাসন কি শুধু মাতব্বর থেকে হয়? বনওয়ারী ঠিক ক'রে রেখেছে আজ বলবে—দারোগা হোক, ছোট দারোগা হোক, যে আসবে তাকেই বলবে করালীর কথা। রতনকে সে বললে—তোর সেই বড় 'কুকুড়ে'টা ঠ্যাঙে বেঁধে নিয়ে আয় দিনি।

বাবুরা যেদিন আসেন, সেই দিন মুরগী আর হাঁস—কিছু না হ'লে কয়েকটা ডিম কাহারেরা ভেট দিয়ে থাকে। আজ বড় মুরগী একটা দিতে হবে ঠিক করলে বনওয়ারী। রতন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে গেল। উপায় নাই, মাতব্বরের কথা, তা ছাড়া তার ছেলে লটা লচ্ছার করালীর দলে জুটেছে। লটা শাসনের বাইরে; বাপের সঙ্গে ভিন্নই হয়েছে তো শাসন! কিন্তু তবু তো তার বাপের পরাণ! কি জানি, কখন কুদৃষ্টিতে পড়বে বাবুদের! আগে থেকে একটু বলে রাখা ভাল।

বনওয়ারী হাঁকলে—শিগগির কর্। বাবু আসছে।

নীলের বাঁধের উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবর টর্চের আলোর ছটা উঠে হেঁড়ে

তালগাছটার মাথায় গিয়ে পড়েছে। হুটো প্যাঁচা ছটা পেয়ে ক্যাঁ-চ শব্দ ক'রে উড়ে গেল। বাবু মাঠ থেকে পাড়ের উপর উঠছে। জুতোর শব্দ বাজছে পাষাণের মত কঠিন মাটিতে। এইবার সামনাসামনি আসছে টর্চের আলো। বাবু এসে পড়েছেন।

বাবু এসে দাঁড়ালেন। প্রণাম করলে সব। নিমতেলে পানু ছুটে গিয়ে একটা মোড়া নিয়ে এল। বাবু বসেন না ওটাতে, পা দিয়ে দাঁড়ান। বাবু হেসে বললেন—কি রে, আজ যে খুব ধুম দেখি!

নতির স্বীকৃতি জানিয়ে বনওয়ারী একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে মুখের সামনে বাঁ হাতের আড়াল দিয়ে জবাব দিলে—পাছে মুখের 'আব' অথবা গন্ধ গিয়ে লাগে তাই সতর্কতা; বললে—আজ্ঞেন হুজুর, আজ কত্তার থানে পূজো দিলাম কিনা।

বাবু বললেন,—আচ্ছা, ভাল।

রতন বড় মুরগীটা এনে নামিয়ে দিলে সামনে। টর্চের আলোটা সেটার উপর ফেলে বাবু খুশি হয়ে বললেন—বেশ বড় জাতের যে রে, অ্যাঁ?

—আজ্ঞেন হ্যাঁ। আজ কত্তার পূজো দিলাম; আপনাকে কি আর যা-তা 'দব্য' দিতে পারি?

—বেশ। বেশ। তা, তোদের মধ্যে করালী কার নাম?

মনে মনে বিস্মিত হ'ল সকলে। বনওয়ারী চকিতে অনুভব করলে বাবা-ঠাকুরের অদ্ভুত মাহাত্ম্য। ওঃ! এরই মধ্যে করালীর বদ রীতি-চরিত্রের কথা দারোগাকে তিনি জানিয়েছেন! মনে মনে বাবাকে প্রণাম ক'রে বনওয়ারী বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোঁড়াটা বড়ই আজ্ঞেন—বেজায় আজ্ঞেন—

করালীকে অভিযুক্ত করার মত বিশেষণ খুঁজে পেলে না বনওয়ারী।

কিন্তু দারোগা বললেন উল্টা কথা—হ্যাঁ, বাহাদুর ছোকরা। ছোকরাকে পাঠিয়ে দিবি থানায়। বকশিশ পাবে কিছু। গোটা পাঁচেক টাকা পাবে।

—বশকিশ পাবে?

—হ্যাঁ। আমরা শিসের কথা ডায়েরি করেছিলাম, ওপরেও গিয়েছিল খবর।

এখন সাপটা শিস দিচ্ছিল, আর সেই সাপ ছোকরা মেরেছে—সে খবরও পাঠিয়েছি। পাঁচ টাকা বকশিশ ও পাবে।

বাবু চ'লে গেলেন। মুরগীটা নিয়ে গেল চৌকিদার।

কাহারপাড়াটা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তাদের বিস্মিত মনের দৃষ্টির সামনে করালী যেন নতুন মূর্তিতে দাঁড়িয়ে হাসছে। গোলালো বুক ফুলে উঠেছে, গালে টোল খেয়েছে, মুখের মিষ্টি হাসিতে সুন্দর সাদা দাঁতগুলি ঝিকমিক করছে।

মেয়েদের মজলিসে হঠাৎ গোল উঠল।

করালীর বকশিশের ব্যাপার নিয়ে কথা হচ্ছিল, হঠাৎ তাদের সুমুখ দিয়ে কে ছুটে চ'লে গেল।

হাতের চুড়ি রিনরিন শব্দে বেজে উঠল।

—কে? কে?

—পাখী! পাখী! একজন জবাব দিলে—পাখী ছুটে চ'লে গেল।

পাখী! পাখী! ও পাখী!—বসন্ত ডাকলে তারস্বরে।

পাখী শুতে যাবার জন্য উঠছিল, এই সময়েই এলেন ছোট দারোগা। সে দরজার মুখে ঢুকছিল, ছোট দারোগা করালীর নাম করতেই থমকে দাঁড়াল। ব্যাপারটা শুনে সেও অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ দাওয়া থেকে লাফিয়ে নেমে মজলিসকে পাশ কাটিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, সাদা কাপড়ের দোলায় বাতাসে খানিকটা ঝলক তুলে।

বসন্ত ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এল—পাখী, শোন্। পাখী!

দূর অন্ধকারের ভিতর থেকে জবাব এল—না। আমি চললাম।

পাখী বললে—যার ওপর আমার মন পড়েছে, আমি তারই ঘরে চললাম।

হাঁসুলীর বাঁকের উপকথায় তুফান বানে ঝাঁপ খেয়ে যুবতী বউ পালায় যার উপরে মন পড়ে তার কাছে, তারই গাছের উপরে পাতা সংসারেই গিয়ে উঠে বসে। পাখীর মা বসন্ত যৌবনে নিত্য রাত্রে বেশভূষা ক'রে একাই চ'লে যেত চৌধুরীবাবুদের গাঁয়ের ধারের বাগানে, কোনদিন ফিরত গভীর

রাত্রে, কোনদিন ভোরবেলা। পাখীও আজ চ'লে গেল ছুটে করালীর বাড়ি।

এর পর আসছে একটা কুৎসিত ঝগড়ার পালা। তারপর হয়তো লাঠি—মারপিট—মাথা-ফাটাফাটি! করালী তো হটবার পাত্র নয়!

ঝগড়ার পালাটা জমিয়ে তুললে সুচাঁদ। কর্কশ কণ্ঠে উচ্চ কণ্ঠে সে গালিগালাজ আরম্ভ করলে। করালীর নিজের মা বোন কি কোন স্ত্রীলোক আত্মীয়া নাই। কিন্তু নসুদিদি আছে। নসুদিদি এতক্ষণ নাচছিল, পায়ে নূপুর বেঁধেই সে বেরিয়ে এল ঝগড়া করতে। মেয়েদের মত কোমরে কাপড় জড়িয়ে দুই হাতের বুড়ো আঙুল দুলিয়ে, নেড়ে, অঙ্গ দুলিয়ে সুচাঁদের সঙ্গে সমান জোরালো ভাষায় ঝগড়া জুড়ে দিলে।

সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ ক'রে নিমতেলে পানু। হঠাৎ সকলে চমকে উঠল। একটা কঙ্কালসার মানুষ টলতে টলতে এসে দাঁড়িয়েছে মজলিসের সামনে। এখনও টলছে। কে?—কে?—ও, নয়ান এসেছে। হেঁপো রোগী নয়ান। ওই নয়ানের সঙ্গেই ছেলেবেলায় পাখীর বিয়ে হয়েছে। তখন অবশ্য নয়ান হাঁপানীর রোগী ছিল না, এবং নয়ান তখন ছিল পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে ভাল পাত্র। নয়ানের ঠাকুরদাদা ছিল সে আমলে কাহার-পাড়ার মাতব্বর। সেই আমল থেকেই চৌধুরী-বাড়ির ভাগজোতদার নয়ানেরা। দু বিঘা নিজের জমিও আছে নয়ানের। সেই সব দেখেই বিয়ে দিয়েছিল সুচাঁদ। হঠাৎ নিউমোনিয়া হয়ে নয়ান ঘায়েল হয়ে গেল প্রথম যৌবনেই। নিউমোনিয়া সারল, কিন্তু হাঁপানী ধ'রে গেল। পাখী বলে—যে গন্ধ ওর 'নিশেষে' আর যে বুকের ডাক! সে সহ্য করতে পারে না, তার ভয় লাগে। সে কিছুতেই যাবে না তার বাড়ি। আজ দু বৎসর ধ'রেই এই বিরহের পালা চ'লছে, কিন্তু আজও পর্যন্ত বিচ্ছেদ হয় নাই। আজ হয়ে গেল। মৃতপ্রায় নয়ান এমন ক্ষেত্রে না বেরিয়ে পারলে না। টলতে টলতে এসে ব'সে পড়ল, তারপর হাঁপাতে হাপাতে মাটিতে চাপড় মেরে বনওয়ারীকে বললে—তুমি এর বিচার কর। বিচার কর তুমি।

কিন্তু বনওয়ারী ব'সে রইল মাটির পুতুলের মত। সে যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। করালী এবং পাখীর ঘটনায় তার বার বার মনে পড়ছে সন্ধ্যার কথা; মনে পড়ছে কালোশশীকে। সে উৎসাহ পাচ্ছে না। সে যেন মাথা তুলতে পারছে না।

নয়ান কান্নার সুরে চীৎকার ক'রে উঠল—মাতব্বর!

বনওয়ারী হতভম্বের মত বললে—কি বলব?

রতন বললে—না না। এ ভারি অন্যায়। তুমি চুপ করে থাকলে হবে না বনওয়ারী। গাঁ সুদ্ধ ছেলে মাটি হ'ল ওই হারামজাদার সঙ্গে জুটে।

বনওয়ারী তবু স্তব্ধ।

ওদিকে হঠাৎ মেয়েদের ঝগড়ার আসরের সুর পালটে গেল। অকস্মাৎ সুচাঁদ আর্তনাদ ক'রে উঠল—মর্মান্তিক আর্তনাদ। কি হ'ল? নসু মারলে নাকি ধ'রে? প্রহ্লাদ, রতন, নিমতেলে পানু ছুটে গেল। কি হ'ল?

সুচাঁদ আর্তনাদ করে লাফাচ্ছে। মুখে একটা ভয়ার্ত শব্দ শুধু। চোখের দৃষ্টিতে বিভীষিকার ছায়া। সে যেন মৃত্যুকে দেখছে চোখের সম্মুখে।

বুঝতে বাকি রইল না কারও কিছু।

ব্যাঙ দেখেছে সুচাঁদ। ব্যাঙকে সুচাঁদ মৃত্যুদূতের মত ভয় করে। ব্যাপারটা ঘটেছে এই—

সুচাঁদ প্রচণ্ড চীৎকারে গালিগালাজ করছিল। করালী হঠাৎ এসে শাসিয়ে তাকে বলে—চুপ কর্, নইলে দোব ছেড়ে।

অর্থাৎ ব্যাঙ ছেড়ে দেবে।

সুচাঁদ মানে নাই সে কথা। ব্যাঙ যে কেউ তার গায়ে ছেড়ে দিতে পারে —এ তার ধারণার অতীত ছিল। চন্ননপুরে বাবুদের ছেলেরা কখনও কখনও এমন ঠাট্টা করে; কিন্তু এ গাঁয়ে এমন সাহসই বা কার, হৃদয়হীনই বা কে? করালীর যে সেই সাহস সেই হৃদয়হীনতা আছে, তা সে জানত না। কিন্তু করালী সত্যিই একটা ব্যাঙ ধ'রে এনেছিল। সুচাঁদ ক্ষান্ত হ'ল না দেখে, সেটাকে সে তার উপর ছুঁড়ে দিয়ে নসুকে টেনে নিয়ে বাড়ি চ'লে গিয়েছে।

পাখী খিলখিল ক'রে হাসছে করালীর বাড়িতে।

এদিকে বসন্ত দুই হাতে জাপটে ধরেছে মাকে। সুচাঁদ তবু লাফাচ্ছে। মেয়েরা সব মুখে কাপড় দিয়ে হাসছে। প্রহ্লাদ ব্যাঙটা ফেলে দিয়ে এক বাটি মদ এনে সুচাঁদের মুখের কাছে ধরলে।—খাও পিসী। চোখ বন্ধ ক'রে তৃষ্ণার্তের মত পান ক'রে নিলে সুচাঁদ, তারপর বুকে হাত দিয়ে প্রহ্লাদের কোলের মধ্যেই নিজেকে এলিয়ে দিল।—আঃ—আঃ! তারপর হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

প্রহ্লাদ বললে—ভয় নাই, ফেলে দিয়েছি, ফেলে দিয়েছি ব্যাঙ।

ওদিকে করালী পাখীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাঁশবাঁদি থেকে। এই রাত্রির অন্ধকারেই তারা যাবে চন্ননপুরে। নসুদিদিও চলল। বনওয়ারীর সঙ্গে বিবাদ ক'রে কাহারপাড়ার সকলকে বিরোধী ক'রে থাকতে তার সাহস হ'ল না।

দূরে রেল-লাইনের উপর সিগ্‌নালের লাল আলো জ্বলছে। ওই চন্ননপুর। করালীর দুর্গ ওইখানে। ওখানে যেতে কাহারদের সাহস নাই। নসুবালা হঠাৎ গান ধরলে। করালী ধমক দিয়ে বলল—চুপ কর্‌। সে ভাবতে ভাবতে চ'লছে, কেমন ক'রে এর শোধ তুলবে সে? শোধ তাকে তুলতেই হবে।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

কয়েক দিন পর।

হাঁসুলী বাঁকে রাত্রি প্রভাত হয় পৃথিবীর সঙ্গেই যথানিয়মে। গাছে গাছে পাখী ডাকে, ঘাসের মাথায় রাত্রের শিশিরবিন্দু ছোট ছোট মুক্তার দানার মত টলমল করে। বাঁশবনের মাথা থেকে, বনশিরীষ নিম আম জাম কাঁঠাল শিরীষ বট পাকুড়ের মাথা থেকে টুপটাপ ক'রে শিশিরবিন্দু ঝ'রে পড়ে মাটির বুকে। যে ঋতুতে যে ফুল ফোটার কথা সেই ফুল ফোটে। পূর্ব দিকে নদীর ধার পর্যন্ত অবারিত মাঠের ওপারে—কোপাইয়ের ওপারের গ্রাম গোপগ্রামের চারিপাশে গাছপালার মাথায় সূর্য ওঠে। কিন্তু কাহারেরা জাগে সূর্য ওঠার অনেক আগে। পূর্বের আকাশে তখন শুধু আলোর আমেজ লাগে মাত্র, পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শুকতারা জ্বলজ্বল করে। কাহাররা সেই সকালে ওঠে। আপন আপন প্রাতঃকৃত্য সমাধা ক'রে মেয়েরা ঘরে দোরে জল দেয়, মাড়ুলি দেয়, সামান্য যে বাসন কয়েকখানি রাত্রে উচ্ছিষ্ট হয়ে থাকে—সেগুলি মাজে। গরু ছাগল বার করে তাদের জায়গায় বাঁধে। হাঁসগুলিকে ছেড়ে দেয়, কলরব ক'রে তারা ছুটে গিয়ে নামে নীলের বাঁধের জলে, নেমেই ছুটে আসে ঘাটে, এঁটো বাসনের খাদ্যকণাগুলো মুখ ডুবিয়ে খুঁজে খুঁজে খায়। মুরগীগুলোকে ছেড়ে দেয়, তারা ছুটে যায় আঁস্তাকুড়ে, সারের গাদায়। পুরুষেরা প্রাতঃকৃত্য সেরে এই সকালেই ঘরে দোরে যে মাটির কাজগুলি থাকে, কোদাল নিয়ে সেই কাজগুলি সেরে ফেলে। পাষাণের মত মাটি—মেয়ে-পুরুষে আগের দিন সন্ধ্যায় কলসীতে ভ'রে জল তুলে ভিজিয়ে রাখে, সকালে কাহার মুনিষ তার উপর কোদাল চালায়। মাটির কাজ কিছু-না-কিছু থাকেই। পুরানো দেওয়াল মেরামত চলতে থাকে ধীরে সুস্থে। নূতন ঘর যদি কেউ করে,

তার কাজ চলে দীর্ঘদিন ধ'রে। কিছু না থাকলে বাড়ির ধারে শাক-পাতার ছোট ছোট ক্ষেত কোপায় তারা। বাড়ির গাছা পেটের বাছার মতই গেরস্থের সহায়।

এই সব সেরে তারপর কাজে বার হয়।

সুচাঁদ ভোরে উঠে ঝাঁটা দিয়ে উঠোন পরিষ্কার করতে করতে তারস্বরে গাল দিচ্ছে। আজ আর তার ভাষা অশ্লীল নয়—মর্মান্তিক অভিশাপ-তীক্ষ্ণ, এবং সে অভিশাপের মধ্যে দুঃখ লাঞ্ছনা, নিয়তির নিপুণ বিধানের মত স্তরে স্তরে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজানো।

—যে 'অক্তের' 'ত্যাজে' এমন বাড় হয়েছে, সে অক্ত জল হয়ে যাবেন তোমার। 'গিহিনী' 'ওগ' হবে, 'ছেলউগী' হয়ে প'ড়ে থাকবে, ওই পাথরের মত ছাতি ধ্বসে যাবে, হাড় পাঁজর ঝুরঝুর করবে। যে গলার ত্যাজে হাঁকিয়ে চেঁচিয়ে ফিরছ, সেই গলা তোমার নাকী হয়ে পাখীর গলার মত চি-চি করবে। যে হাতে তুমি আমাকে ব্যাঙ দিয়েছ, যে হাতে তুমি বাঁশবনে আগুন লাগিয়ে মা-মনসার বিটীকে পুড়িয়ে মেরেছ, সেই হাতদুটি তোমার প'ড়ে যাবে, কাঠের মত শুকিয়ে যাবে। দেবতাকে যদি আমি পূজো ক'রে থাকি, অতিথকে যদি আমি সেবা ক'রে থাকি, তবে আমার কথা ফলবে—ফলবে—ফলবে। হে বাবা কত্তা, হে মা মনসা, হে বাবা জাঙলের 'কালারুদ্দু', হে মা চন্ননপুরের চণ্ডী, হে মা বাকুলের বুড়ীকালী, হে বাবা বেলের ধম্মরাজ, তোমরা এর বিচার ক'রো—বিচার ক'রো।

বোধ করি হঠাৎ সুচাঁদের মনে প'ড়ে গেল চোখের কথা—চোখ নিয়ে তো কোন অভিশাপ দেওয়া হয় নাই! সঙ্গে সঙ্গে চোখ নিয়ে অভিশাপ দিতে আরম্ভ করলে। ওই যে তোমার ড্যাবা চোখ, ওই চোখ তুমি হারিও। দিন 'আত' জল ঝ'রে ঝ'রে ছানি পড়ুক। কানা হ'য়ো তুমি—কানা হ'য়ো তুমি—কানা হ'য়ো। ওই ড্যাবা চোখ, তোমার 'আঙা' 'অক্তের' ডেলার মতন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসে 'বিভীষকার' হয়ে যায় যেন।

এটি একটি বিশেষত্ব হাঁসুলী বাঁকের কাহারপাড়ার। ঝগড়া হ'লে সে

ঝগড়া এক দিনে মেটে না। দিনের পর দিন তার জের চলতে থাকে, এবং প্রাতঃকালে উঠেই এই গালিগালাজের জেরটি টেনে তারা শুরু ক'রে রাখে। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে থামে। আবার জিরিয়ে নিয়ে অবসর-সময়ে নিজের ঘরের সীমানায় দাঁড়িয়ে বিপক্ষ পক্ষের বাড়ির দিকে মুখ ক'রে এক-এক দফা গালিগালাজ করে। এবং কাহার-বাউরীদের ঝগড়ায় এই গালিগালাজের এমন বাঁধুনিটি পুরুষানুক্রমে চ'লে আসছে,—কলহ-সংস্কৃতি বলা চলে। তবে সাধকভেদে মন্ত্রের সিদ্ধি—এই সত্য অনুযায়ী সুচাঁদ এই বৃদ্ধ বয়সেও সর্ব-শ্রেষ্ঠা। ওদিকে আরও একজন গাল দিচ্ছে করালীকে—সে হ'ল নয়ানের মা। সে গাল দিচ্ছে করালীকে একা নয়, পাখীকেও শাপ-শাপান্ত করছে।

হাঁপানীর রোগী নয়ান উঠে ব'সে কাশছে আর হাঁপাচ্ছে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বুকের উপর ধর্মরাজের একটা মোটা মাদুলি—হাঁপানীর আক্ষেপে চামড়া-ঢাকা পাঁজরার সঙ্গে সঙ্গে উঠছে আর নামছে। তার বাড়ির সামনেই একই উঠানের ওদিকে রতনের বাড়ি। রতন কোদাল চালানো শেষ ক'রে হুঁকো টানছিল ব'সে আর গালাগালি শুনছিল।

হাঁপানীটা একটু থামতেই নয়ান দাওয়ার বাঁশের খুঁটিটা ধ'রে উঠে দাঁড়াল। চোখের দৃষ্টিতে তার অমানুষিক প্রখরতা ফুটে বেরুচ্ছে। এই সব দীর্ঘ দিনের রোগীর চোখের রঙ বোধ হয় একটু বেশি সাদা হয়। নয়তো জীর্ণ দেহ এবং কালো রঙের জন্যই নয়ানের চোখ দুটো বেশি সাদা দেখাচ্ছে।

রতন বললে—উঠলি যে?

—হুঁ।

—কোথায় যাবি?

—যাব একবার মুরুব্বির কাছে।

—যেতে হবে না। ব'স্।

—না। এর একটা হেস্তনেস্ত—

—মুরুব্বি বেরিয়ে যেয়েছে।

—বেরিয়ে যেয়েছে! তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে রতনের দিকে, যেন

অপরাধটা রতনেরই। নয়ান আবার প্রশ্ন করলে—এই 'সোমকালে' গেল কোন্ ভাগাড়ে? কেউ তো এখনও যায় নাই?

রতন বললে—মাইতো ঘোষ এই সকালের 'ট্যানেই' কোথায় যাবে; ঘোষেদের চাকর এয়েছিল, ভারী মোট আছে—নিয়ে যেতে হবে চন্নপুরের ইস্টিশান।

—তা হ'লে? হতাশ হয়ে পড়ল এবার নয়ান।

—তা হ'লে আর কি করবি? বাড়িতে ব'সে আগে জল গরম ক'রে আরসোলা 'সিজিয়ে' খা। হাঁপটা নরম পড়ুক।—হাজার হলেও রতনের বয়স হয়েছে, মাতব্বরের বয়সী, বন্ধুলোক; খোদ মাতব্বর না হলেও মুরুব্বি। স্নেহবশেই সে উপদেশ দিলে। নয়ানের মা বাসন মাজতে মাজতে গাল পাড়ছিল, সে হঠাৎ ছাইমাখা হাতে এগিয়ে এসে হাত দুটো রতনের মুখের কাছে নেড়ে বললে—তুমি তো মাতব্বরের ডান হাত। সলা-শুলুক-গুজগুজ তো খুব! বলি, মাতব্বরের এ কোন্ দিশী বিচার, এ কোন্ ঢঙের মাতব্বরি, শুনি? এ অন্যায়ে একটি কথাও বললে না তোমার মাতব্বর? বিচার করবার ভয়ে সকালে উঠে পালাল?

রতন বললে—তা আমি কি বলব? তোমরাই তাকে ব'লো।

—বলব বইকি, একশো বার বলব। ছাড়ব আমি? জমিদারের কাছে যাব, থানা পুলিস করব।

—তা যা খুশি তুমি করতে পার। তবে সকালে উঠে বিচারের লেগে মাতব্বর ব'সে থাকবে—এ তোমাদের ভাল 'নেকরা' বটে।

নয়ানের মা বললে—মাতব্বর তোমার যে খুব 'আঁতের' নোক—তুমি বল কেনে, শুনি।

বিরক্ত হয়ে রতন হুঁকাটি রেখে গামছাখানি টেনে গায়ে চাদরের মত ফেলে বেরিয়ে পড়ল। সূর্য উঠে পড়ছে গোপগ্রামের গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে। রোদ এসে বাঁশবাঁদির ঘরগুলির চালের উপর পড়েছে; বনওয়ারীর সদ্য-ছাওয়া চালের নতুন খড়ের উপর যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে।

একা রতন নয়, গ্রামের পুরুষেরা সকলেই বেরিয়েছে—নীলের বাঁধের উত্তর পাড় থেকে সরু আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে নামছে জাঙলে যাবার মাঠের পথে।

মেয়েরাও সব এর পর বার হবে। সাতটার ট্রেন তাদের নিশানা।

হাঁসুলীর বাঁকের এই জীবনই স্বাভাবিক জীবন। মন্থর গতিতে পায়ে হাঁটা আলপথে পদাতিকের জীবন তাদের। কথাটার মধ্যে একবিন্দু অতিরঞ্জন নাই। হাঁসুলী বাঁকে গরুর গাড়ির পথ পর্যন্ত নাই। জাঙল গ্রাম পর্যন্ত গরুর গাড়ির পথ এসে শেষ হয়েছে। বহু আগে এগুলি ছিল চারণভূমিতে গরু নিয়ে আসবার পথ। 'নিয়ে আসবার' বলছি এই জন্য যে, বহু প্রাচীন ভদ্র মহাশয়দের গ্রাম—ওই চন্দনপুর থেকে সেকালে গরু চরতে আসত এই হাঁসুলীর বাঁকের চরে। জাঙল পর্যন্ত ছিল রাস্তা—গো-পথ, তারপরই ছিল হাঁসুলীর ঘেরের মধ্যে গোল তক্তির মত চারণভূমি। তারপর নীলকুঠীর সাহেবেরা এসে জাঙলের ডাঙায় কুঠী ফাঁদলে, গো-চরভূমি ভেঙে জমি ক'রে সেচের পুকুর কাটিয়ে বাঁশবাঁদির মাঠে নীল-চাষ ও ধান-চাষের পত্তন করলে, এই পুকুরপাড়ে কাহার-বসতি বসালে। যে পথে চন্নপুরের গরুর পাল আসত, সে পথে গরু আসা বন্ধ হ'ল। ওই পথকে মেরামত ক'রে তার উপর চলতে লাগল নীলকুঠীর মালের গাড়ি এবং সাহেবদের পাল্কি ও ঘোড়া। চন্নপুরের ভদ্র মহাশয়দের জাঙলের মাঠে জমিজেরাত আছে চিরকাল, তাঁদের গরুর পালের সঙ্গে গাড়ি যাতায়াত করত এই পথে—মাঠের ধান ঘরে নিয়ে যেত, সেই গরুর গাড়ির যাতায়াত বজায় রইল শুধু। আজও সে পথে তাঁদের ধান-কলাই-গুড়-বোঝাই গাড়ি চলে। বাঁশবাঁদির কাহারদের পায়েচলা পথের চেয়ে ভাল পথের দরকারও ছিল না কোন কালেই। তারা পায়ে হেঁটেই চলে, সে হিসাবে পদাতিক, কিন্তু সেকালে তারা পদাতিক ছাড়া আরও কিছু ছিল; পেশা হিসাবে ছিল বাহক, কাঁধে পাল্কি ব'য়ে সাহেব-মেমদের বইত, বর-কনে বইত। কখনও কখনও জ্ঞানগঙ্গা নিয়ে যাবার জন্য বায়না আসত। সকলের আগে যে বেহারা থাকত, সে সুর ক'রে বলত সওয়ারীর ছড়া, অন্য সকলে সমস্বরে হাঁকত—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। চারিদিক গমগম ক'রে তুলে

তারা চলত দ্রুতবেগে। আজকাল তাদের পেশাটা গৌণ হয়েছে। বিয়ে ছাড়া ওদের আর ডাক পড়ে না এই কর্মের জন্য। তবে বহনের কাজটা বজায় আছে, পাল্কি-বহা কাঁধে ভার বয়। সে দেড় মণ বোঝা নিয়ে যায় দশ ক্রোশ পর্যন্ত। বিশ ক্রোশও যায়, তবে পথে এক রাত্রি বিশ্রাম করতে হয়। মাথায় বোঝা বইতে হয় আজকাল বেশি। বাহকত্ব ছাড়া চালকত্ব-গৌরবও আছে; হালের বলদ চালায়, গরুর গাড়িও চালায়। সুতরাং সে গতি আরও মন্থর, তাই পায়ে-চলা পথ ছাড়া অন্য পথের অভাব তারা অনুভব করে না।

পথ চলতে চলতে হুঁকো টানে, মধ্যে মধ্যে হাত বদল ক'রে গল্প হয়। এই মন্থর জীবনের গতানুগতিক কথাই হয় পরস্পরের মধ্যে। রোমন্থন বলা যায়। আজ কিন্তু সকলেই একটু উত্তেজিত। আজ কথা চলছে—গত কয়েক দিনের ঘটনার আলোচনা। তার মধ্যে বনওয়ারীর ব্যবহারের সমালোচনাই বেশি। বনওয়ারীর অন্যায় হয়েছে—এ কথা সকলেই একবাক্যে বলছে। নিমতেলে পানু বেশ গুছিয়ে এবং চিবিয়ে কথা বলতে পারে। সে-ই বলছিল—

—মাতব্বর যদি শাসন করতে 'তরাস' করে, তবে দুষ্ট নোকে 'অল্যায়' করলে তার শাসন হবে কি ক'রে? 'আজা' হীনবল হ'লে 'আজ্য' লষ্ট। এতবড় 'অল্যায়ে' মুরুব্বি বাক্যিটি বার করলে না মুখ থেকে!

—'নিচ্চয়'। তবে চলুক এই করণ কাণ্ড; তোমার 'পরিজনকে' আমি টেনে নিয়ে যাই। আমার পরিজন গিয়ে উঠুক 'অতনার' ঘরে। —কথাটা বললে প্রহ্লাদ।

রতন পিছন থেকে প্রতিবাদ ক'রে উঠল—আমার নাম মাইরি ক'রো না বলছি। আলি কাল 'সব্বাগ্যে' মাতব্বরকে বলেছিলাম, এ 'অল্যায়' হচ্ছে মাতব্বর। তবে নিজের নিজের বউ বিটী নিজে নিজে না সামলালে মাতব্বরই বা করবে কি? মাতব্বর পাহারা দিয়ে ব'সে থাকবে?

প্রহ্লাদ চীৎকার ক'রে উঠল—বলি হ্যা শালো, মাতব্বর করালীকে শাসন করতে লারত?

সকলের পিছনে নীলের বাঁধের পাড়ের উপর থেকে চীৎকার ক'রে কেউ

বললে—কার দশ হাত ল্যাজ গজালছে রে শুনি, করালীকে শাসন করবে তার নাম কি ?

শব্দ লক্ষ্য ক'রে সকলে চকিত হয়ে তাকিয়ে দেখলে, বক্তা করালী নিজে।

নীলের বাঁধের উত্তর-পূর্ব কোণের পথটা বেয়ে পাড় থেকে করালী উঠছে। চন্ননপুর থেকে আসছে নিশ্চয়। সেই সেদিন রাত্রে পালিয়েছে পাখীকে নিয়ে, ফিরছে আজ সকালে। সম্ভবত কোন জিনিসপত্র নিতে এসেছে। দাঁড়িয়ে হাসছে। সঙ্গে তার পাখী ও নসুদিদি।

রতন প্রহ্লাদ পানু এবং অন্য সকলেই করালীর কথায় ফিরে দাঁড়াল।

তবু তাচ্ছিল্যভরে হাসছে করালী। পানু বললে অন্য সকলকে—দেখ্‌ দেখ্‌, একবার ভাল ক'রে দেখ্‌। পিতিকার করতে না পার, তোমরা গলায় দড়ি দাও গা।

চীৎকার ক'রে উঠল প্রহ্লাদ—কিলিয়ে তোমার দাঁত ভেঙে দোব গা।

করালী হা-হা ক'রে হেসে বললে—এস কেনে একা একা, কেমন মরদ দেখি!

পাড়ের উপর থেকে পানুদের দলের অনুসরণ ক'রে নেমে এল মাথলা এবং নটবর। ওদেরও গন্তব্যস্থল জাঙল, ওরাও সেখানে কৃষাণি করে।

রতন বললে—চল্‌ চল্‌। এখন আর পথের মাঝে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের 'খিটকাল' করতে হবে না।

সে ব্যাপারটাকে চাপা দিতে চায়। করালীর দলে রতনের ছেলেও রয়েছে যে।

করালী কিন্তু অকুতোভয়, কারও ভয়ে কিছু সে চাপা দিয়ে রাখতে চায় না। সে চেঁচিয়েই ব'লে দিলে—তোমাদের মাতব্বরকে দেখেছি সেদিন। তোমরাও দেখতে চাও তো এস।

ঘাড় নেড়ে ভুরু নাচিয়ে সে বললে—সেদিন একহাত মুরুব্বির সঙ্গে হয়ে যেয়েছে।

সকলের কাছে এ উক্তিটা একটা অসম্ভব সংবাদের মত। বনওয়ারী কোশকেঁধেদের বংশের ছেলে, পাকা বাঁশের মত শক্ত মোটা হাড়ের কাঠামো

তার। কাহারপাড়ায়—শুধু কাহারপাড়ায় কেন, কাহারপাড়া, আটপৌরেপাড়া, জাঙল তিন জায়গায় তার মত জোয়ালো মুনিষ নাই; বনওয়ারী শক্ত মুঠোয় লাঙল ক'ষে টিপে ধরলে টানতে মাঝারি বলদের পিঠ ধনুকের মত বেঁকে যায়, ঘাড় লম্বা হয়ে যায়। তার সঙ্গে একহাত হয়ে গিয়েছে করালীর? বলে কি শয়তান ডাকাত? শুধু তাই নয়, শয়তানের কথার ভঙ্গির তাচ্ছিল্যের মধ্যে যে ফলাফলের ইঙ্গিত রয়েছে, সে কি কখনও হতে পারে—না, হয়? কিন্তু সকলের মধ্যে মুখের সামনে জোর গলায় যে একটা স্পষ্ট সত্যের ঘোষণা রয়েছে তাও তো মিথ্যে ব'লে মনে হচ্ছে না। সকলে অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে চাইলে।

করালীকিঙ্কর এতেও ক্ষান্ত হ'ল না: সে আরও একদফা হেসে নিয়ে বললে—তোদের মাতব্বর তো মাতব্বর, তোদের কত্তার বাহনকেই দেখে লিলাম—

সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে শাসন ক'রে পাখী বললে—আবার! আবার! আবার!

হি-হি ক'রে হাসতে লাগল করালী। নসুদিদি তো হেসে উল্টে পড়ল। পাখীকে সে বললে—দে বুন দে, কারও ঘা কতক দে। আমি লারলাম ওকে বাগ মানাতে—আমি লারলাম। তু দেখ্ বুন এইবার। গদাগদ কিল মারবি, আমি ব'লে দিলাম।

করালীর এই চরম স্পর্ধিত উক্তিটি প্রত্যক্ষ সত্য। কত্তার বাহন অর্থাৎ ওই চন্দ্রবোড়া সাপটাকে মারার কথা তো সকলে চোখে দেখেছে। কিন্তু সে কথাটাকে এমন স্পর্ধায় শাণিত ক'রে বলায় সকলে আশ্চর্য রকমে সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

করালী পাখী নসু কিন্তু উল্লাস করতে করতেই চ'লে গেল। কোন কথা না ব'লে মাথলা নটবরও মাঠে নেমে পাশ কাটিয়ে তাদের অতিক্রম ক'রে চ'লে গেল। ওরা নীরবেই গেল—নটবর হুঁকোটা টানছিল, বাপকে দেখে একটু খাতিরই দেখালে, কাছ বরাবর এসে নামালে হুঁকোটা একবার। ওরা

চ'লে যেতেই রতনের দলের চমক ভাঙল। সে-ই ছিল সর্বাগ্রে—সে চলতে আরম্ভ করলে, সকলেরই পা চলল সঙ্গে সঙ্গে। চলল কিন্তু নীরবে। খবরটা শুনে কথা যেন সকলের হ'রে গিয়েছে।

হঠাৎ একটা ডাক এল সামনে থেকে। জাঙলের আমবাগান পড়ে সর্বাগ্রে। ওই বাগানের মধ্যে দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথ। পথের উপর দাঁড়িয়ে হেদো মোড়ল তার খুব মোটা গলায় ডাকছে—অ্যাই! অ্যাই বেটা রতনা! হারামজাদা! ও-রে—গু-খোর বেটা!

রতন জোরে হাঁটতে শুরু করল। প্রহ্লাদ বললে—ওরে বাকা রে, মোড়ল 'এগে' যেয়েছে লাগছে!

রতন বললে—পাঁচিল দেবার 'জাওন' খারাপ হয়ে যেছে, কাল দিন যেয়েছে পাঁচিল দেবার।

পানু ব'লে উঠল—আমার মুনিব মশায় আবার কি করলে কে জানে? আলু তুলতে হবে; পরশুই লাগবার কথা। তা পূজোর 'পাট' পড়ে গেল। বললাম তো ব'লে দিয়েছে—উ সব আমি জানি না। আলু খারাপ হ'লে আমি নগদা মুনিষ লাগাব। তোমার ভাগ থেকে কাটব।

প্রহ্লাদ পানুকে বললে—হা রে পানা, তোর মুনিবের পাল-বাছুরটার ক দাঁত হ'ল রে।

—দু দাঁত।

—এবারে জোঁয়াল গতাবে?

—তা খানিক-আধেক ক'রে না গতিয়ে রাখলে, চার দাঁত হ'লে তখন কি আর উ জোঁয়াল লেবে ঘাড়ে?

—ত্যাজ কেমন হবে বুঝছিস?

—ওঃ, বেপয্যয় ত্যাজ। 'লেঙুড়ে' হাত দেয় কার সাধ্যি! পাঁচন পিঠে ঠেকলে চার পায়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ঘুরবে। মুনিব পিটবে একহাত।

প্রহ্লাদ বললে—আমার মুনিবকে আমি বলছিলাম বাছুরটার কথা।

—লতুন গরু কিনবে নাকি তোর মনিব?

—হঁ্যা। এবারে কিনবে। তিন বছর ব'লে ব'লে এ বছর আজী করালছি।

—অ্যানেক টাকা লেবে আমার মুনিব। মাটি থেকে তুলতে হবে টাকা তোর মুনিবকে।

—ওরে না। আমার মুনিব মাটিতে পুঁতলে আর তোলে না; আধ 'বাখার' ধান ছেড়ে দেবে। ধানও ছাড়তে হবে না, আলুর টাকাতেই হয়ে যাবে, লাগবে না। তিন বিঘে আলু রে! সোজা কথা! কাঠা-ভুঁই দু পস্থরি খোল দিয়েছে, 'সাল্‌পেট আলুমিনি' দিয়েছে। কাঠাতে ফলন—দু মণ, তা হেসে খেলে—হঁ্যা, তা খুব।

ওরা অ্যামোনিয়াকে বলে—'আলুমিনি', অ্যালুমিনিয়মকে বলে—'এনামিলি'।

—অতনকাকার মুনিবের আলু কেমন গো? গাছ তো হলছিল বাহারের!

রতনের উত্তর দেবার অবসর নাই। খুব দ্রুতপদেই সে হেঁটে চলেছে। ইচ্ছে হচ্ছে এক লাফ দিয়ে গিয়ে মনিবের সামনে হাজির হয়। সত্যিই তার মনিবের ক্ষতি হয়েছে। মাটির 'তাক' ভারি হিসাবের জিনিস। তা ছাড়া পরিশ্রমই কি কম? গোটা একদিন মাটি কেটে, তাতে জল দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরের দিন ফের দুপুর কি তিন পহরের সময় আবার একদফা জল ঢালা হয়েছে, পরের দিন ফের কাটা, জল দেওয়া এবং পায়ে খুব ক'রে ছাঁটা হয়েছে—তার উপর আবার জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে। সেই জল শুষে, সেই জলে ভিজে মাটি তৈরি হয়। বেশি নরম থাকলে চলে না, বেশি শুকিয়ে গেলে তো 'কাজ খারাবি' হয়ে গেল। সেই আবার নতুন ক'রে পাট করতে হবে। নিজের হয় তো সে কথা আলাদা, এ হ'ল মনিবের কাজ। খারাপ হ'লে মানবে কেন মনিব? তার উপর তার মনিব যে লোক! একবারে মোষের 'কোধ'। রাগ হ'লে আর নিজেকে সামলাতে পারে না। প্রকাণ্ড পাথুরে গড়নের ভারী চেহারা, মোটা গলা, থ্যাবড়া নাক, কোঁকড়া চুল, আমড়ার আঁটির মত চোখ—তাও আবার 'লালবন্ন', মোটা বেঁটে আঙুল, বাঘের মত থাবা, বুনো দাঁতাল শুয়োরের মত গোঁ। রাগ হ'লেই গাঁ-গাঁ শব্দে

চীৎকার ক'রে দমাদম কিল মারতে আরম্ভ করবে। ঠিক যেন মা-দুর্গার অসুর।

রতনও বেশ মজবুত মুনিষ। লম্বা চেহারা—লম্বা ঢঙের ইস্পাতে গড়া মানুষ। বয়স কম হয় নাই, দু কুড়ি পার হয়ে গিয়েছে—আড়াই কুড়ি হবে, কি হয়ে গিয়েছে। তবু এখনও পর্যন্ত গায়ের চামড়া কেউ চিমটি কেটেও ধরতে পারে না। সকাল থেকে হালের মুঠো ধরে, দুপুরবেলা হাল ছেড়ে কোদাল ধরে—সাড়ে তিনটের ট্রেন কোপাইয়ের পুলে উঠলে তবে ছাড়ে। ধান রোঁয়ার সময় হ'লে কোদাল ছেড়ে তখন নামে বীজের জমিতে। সন্ধ্যে পর্যন্ত বীজ মেরে তবে ওঠে। দেড় মণ বোঝা ভার চাপিয়ে বেশ সোজা হয়েই কাঁধ দুলিয়ে দোলনের তালে তালে একটানা চ'লে যায় ক্রোশখানেক রাস্তা। এই রতনও মনিবের কিলকে ভয় করে। মনিব রাগে, চীৎকার করে আর কিল মারে। চীৎকার ক'রে যতক্ষণ কাশি না পায়, গলা না ভাঙে, সে ততক্ষণ এই কিল চালায়। সে কিল আস্বাদন করা আছে রতনের, একটি কিলেই পিঠখানি বেঁকে যায়, দম আটকে যায়। এর ওষুধও কিন্তু ওই দম বন্ধ ক'রে থাকা আর চুপ ক'রে থাকা। কিল খাবার আগে থেকেই দমটি বন্ধ ক'রে রাখতে হয়। তা হ'লে আর কিল খেলে দম আটকায় না এবং লাগেও কম। ঘোষ মহাশয়ের ছেলেদের একটা বল' আছে, পিতলের পিচকারি দিয়ে বাতাস ভ'রে দেয়, ইটের মত শক্ত হয়ে ওঠে বলটা, তাতে কিল মারলে যেমন বলটার কিছু হয় না, লাফিয়ে ওঠে—তেমনি হয় আর কি! আর কিল খেয়ে যত চুপ ক'রে থাকবে, মনিব তত চীৎকার করবে রাগে। এতে সহজেই গলা ভাঙে, কাশি পায় মনিবের। কাশি পেলেই মনিব ছেড়ে দিয়ে নিজের গলায় হাত দিয়ে কাশতে শুরু করবে।

রতন কাছে আসতেই মনিব হেদো মণ্ডল মহাশয় বললেন—ওরে বেটা গুয়োটা কাহার, বেলা কত হয়েছে রে বেটা? কত্তার পুজো দিয়ে মদ মেরে তুই হারামজাদারা 'কেড়ামাতন' করবি—আমার 'জাওন' শুকিয়ে কাঠ হবে না কি?

রতন ঘাড় হেঁট ক'রে কান টানতে লাগল। এটা কাহারদের সবিনয় অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গি। মুখে একটু হাসিও থাকা চাই এর সঙ্গে—নিঃশব্দ দন্তবিকাশ। তাও অবশ্যই ছিল রতনের মুখে। ওই হাসিটুকুর অর্থ হ'ল এই যে, মনিবের তিরস্কারের অন্তর্নিহিত সদুপদেশ এবং স্নেহ সে অনুভব করতে পারছে।

তা, মনিব মহাশয়েরা 'স্নেহ' করেন বইকি! তা করেন। বিপদে আপদে মনিবেরা অনেক করেন। কাহারেরা স্বীকার করে মুক্ত কণ্ঠে—অ্যানেক, অ্যানেক করেন। অসুখ-বিসুখে খোঁজ করেন, কিছু হ'লে দেখতে পর্যন্ত আসেন, পয়সাকড়ি ধার দেন, পথ্যের জন্য পুরনো মিহি চাল, আমসত্ত্ব, আমচুর এমনই দেন; বিঘটন কিছু ঘটলেও তত্ত্বতল্লাস করতে আসেন। রতনদের দুঃখে নিজেও হেদো মণ্ডল মহাশয়েরা কাঁদেন, আপ্তবাক্য বলেন, মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেন, তাতে সত্যই অন্তর জুড়িয়ে যায় রতনদের। আবার অন্য কোন ভদ্র মহাশয় যদি কোন কারণে-অকারণে রতনদের উপর জুলুমবাজি করতে উদ্যত হন, তাতেও মনিব মহাশয়েরা আপন আপন কৃষাণদের পক্ষ নিয়ে তাদের রক্ষা করেন, প্রতিপক্ষের সঙ্গে দরকার হ'লে ঝগড়াও করেন, প্রতিপক্ষ তেমন বড় কঠিন লোক হ'লে অর্থাৎ চন্নপুরের বাবুরা হ'লে তখন মনিবেরা রতনদের পিছনে নিয়ে বাবুদের কাছে গিয়ে মিটিয়ে দেন হাঙ্গামাটা। ভদ্র মহাশয়দের বলেন—আপনার মত লোকের ওই ঘাসের ওপর রাগ করা সাজে? ঘাসও যা, ও-বেটাও তাই।

কখনও বলেন—পিঁপড়ে। ও তো ম'রেই আছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কি আপনার সাজে?

তারপর রতনদের ধমক দিয়ে বলেন—নে বেটা উল্লুক কাহার কাঁহাকা, নে, ধর্, পায়ে ধর্। বেটা বোকা বদমাস হারামজাদা!

পায়ে ধরিয়ে বলেন—নে, কান মল্, নাকে খত দে।

তাতেও যদি না মানেন—বড় কঠিন লোক বাবু মহাশয়, তবে মনিব নিজেই হাত জোড় ক'রে বলেন—আমি জোড়হাত করছি আপনার কাছে।

আমার খাতিরে ওকে ক্ষমা-ঘেন্না করতেই হবে এবার। 'না' বললে শুনব না। মোট কথা, যেমন ক'রে হোক রক্ষা করেন রতনদের।

সেই মনিব মহাশয় 'আগ' করেছেন। আজ রাগ খুব বেশি। হবারই কথা। দু দিন কামাই, তার উপর মাটি খারাপ হয়ে গিয়েছে; আজও দেরি হয়েছে খানিকটা। রতন খুব দ্রুতপদেই চলল। মাঠ পার হয়েই কুঠীর সাহেবদের আমবাগান—সেই পুরানো কালের আমবাগানের মধ্য দিয়ে জাঙলে ঢুকতে হয়। বাগানের ভিতরে ঢুকতেই মাথার উপরে আমগাছের পাতার মধ্য থেকে অজস্র পোকা উড়ে মাথায় মুখে লাগল। এবার আমগাছের মুকুলও বেশি, মধুর গন্ধে চারিদিক ভুর-ভুর করছে, পোকাও হয়েছে অসম্ভব রকমের বেশি।

হেদো মোড়ল চীৎকার করতে করতেই চলল—হারামজাদা, নেমখহারাম ছোটলোক জাতেরই দোষ—তোর আর দোষ কি?

পানু বললে প্রহ্লাদকে—খুব বেঁচে গেলছে অতনকাকা, আমি বলি—লাগালে বুঝি 'আষিড়ে' কিল গদাম ক'রে।

প্রহ্লাদ বললে—কিল খেয়ে অতনার অভ্যেস হয়ে যেয়েছে। মারলেও কিছু হত না।

আমবাগান পার হয়ে অপর প্রান্তে জাঙলের বসতি আরম্ভ হয়েছে। বালি-প্রধান একটা পথ। বর্ষায় হুড়-হুড় ক'রে জল যায় রাস্তা বেয়ে, তখন এটা নালা। জল চলে যায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, তখন এটা পথ। পথটা এসেছে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের কুঠীডাঙা থেকে। থমকে দাঁড়াল প্রহ্লাদ। পানু বললে—দাঁড়ালে যে গো?

প্রহ্লাদ বললে—উটো কে রে? পরমের পারা লাগছে না?

দূরে সায়েবডাঙার উপরে দুটি লোক ঘুরছে—প্রহ্লাদ দেখালে।

—তেমুনি তো লাগছে।

—সাথে কে বল দিনি?

—বড়বাবুদের সেই মোচাল চাষবাবু লয়? সেই যে গো, চুল কোঁকড়া—মিচ্ছি মাশায়।

প্রহ্লাদ বললে—পরমা আমাদের তক্কে তক্কেই আছে। কোথা জমি, কোথা পয়সা—

—জমি ?

—সেদিন মাতব্বরের কাছে শুনিস নাই ? চন্নপুরের বড়বাবুরা কুঠী-ডাঙা কিনেছে, জমি করবে। বন্দোবস্তও করবে খানিক। পরম সেই তক্কে ঘুরছে।

পানু হেসে বেশ রসিয়ে বললে—ঘুরুক শালো তক্কে-তক্কে পরের দুয়ারে, উদিকে শালোর ঘরে কুত্তা ঢুকে—

হাসতে লাগল পানু, যে হাসির অনেক অর্থ এবং সে অর্থ কাহারেরা বেদের সাপের হাঁচি চেনার মতই চেনে।

—কে ? বাবুদের চাপরাসী মাশায় এসেছিল ? তা, ও তো জানা কথা।

পানু ঘাড় নেড়ে বললে—সিংয়ের কথা বলছি না। সে পুরানো কথা। সে আর কে না জানে ? ভূপ সিং মাশায় ছত্তিরি বেরাম্ভন, সে কি আর কুত্তা হয় ? সে হ'ল বাঘ। বাঘে ধান খেলে তাড়ায় কে ? হুঁ-হুঁ, অন্য লোক। কাল সনজে বেলাতে—। সে এক মজার কথা।

সে হাসতে লাগল।

ভুরু নাচিয়ে প্রশ্ন করলে প্রহ্লাদ—কে ? কে ? কে রে ?

খুব হাসতে লাগল পানু।

—কে রে ?

—সে বলব মাইরি উ বেলাতে। অ্যানেক সময় নাগবে। গতকাল সন্ধ্যায় আটপৌরেপাড়ার বটগাছের তলায় সেই অন্ধকারের মধ্যেও পানু আবিষ্কার করেছে মাতব্বর এবং কালো বউকে একসঙ্গে। সে ঠিক সেই সময় ওই দিকে গিয়েছিল আটপৌরেপাড়ায় তার এক ভালবাসার লোকের সন্ধানে।

বাঁশবাঁদির বাঁশবনে আজও জমে আছে আদিম কালের অন্ধকার। সে অন্ধকার রাত্রে এগিয়ে এসে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়াকে আচ্ছন্ন ক'রে। সেই অন্ধকারের মধ্যেও কাহারদের দৃষ্টি কিন্তু ঠিক চলে, ওদের চোখেও তখন জেগে

ওঠে সেই আদিম যুগের অর্থাৎ অগ্নি-আবিষ্কারের পূর্বযুগের মানুষের চোখের অন্ধকার-ভেদী আরণ্য-জন্তুর দৃষ্টিশক্তি।

মাতব্বরের রঙের খেলা দেখে পানু অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করেছে। কৌতুকেরও বেশি একটু কিছু আছে। অন্য লোক হ'লে ওই কৌতুকের বেশি কিছু হ'ত না। কিন্তু বনওয়ারী মাতব্বর, তা ছাড়া মানুষটাও যেন একটু অন্য ধরনের। কৌতুকের সঙ্গে জেগেছিল বিস্ময়। তাই সে কথাটা গোপন ক'রে রেখেছিল। প্রকাশ করতে সাহস পায় নাই। এবং গতকাল হঠাৎ পাখী ও করালীর কাণ্ডটা ঘটায় এ কাণ্ডটার কথাটা মনেই ছিল না বলতে গেলে। হঠাৎ পরমকে দেখে মনে প'ড়ে গেল তার আজ। আজও তার বলতে গিয়েও বলতে সাহস হ'ল না। তা ছাড়া, পানু কথাটা বলবে কি না তাও ভাবছে মাঝে মাঝে। ওটাকে নিজস্ব ক'রে রাখলে ভাঙিয়ে কিছু কিছু আদায় করতে পারবে মাতব্বরের কাছে।

পানু দল ছেড়ে গলি-পথে ঢুকল। গলির ও-মাথায় তার মুনিববাড়ি।

প্রহ্লাদ প্রমুখ কজন কিন্তু মনে মনে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

কি মজার কথা! কি মজার কথা! পরমের ঘরে কে ছিল?

কথাটার কল্পনাতে সারাটা দিনের কাজ হালকা হয়ে গেল কাহারদের।

প্রহ্লাদ, ভূতো প্রভৃতি এরা কজন গম ঝাড়াই করলে। শীষ পিটিয়ে স্তূপ ক'রে তুললে। জলখাবার নিয়ে আসবে মেয়েরা, কুলো দিয়ে পাছড়ে, খোসা ঝেড়ে গম বার করবে।

জলখাবার—অন্তত দু সের মুড়ি, খানিকটা গুড়, পেঁয়াজ, লঙ্কা আর এক ঘটি জল।

পানা তুললে আলু। খুব মোটা আলু হয়েছে পানার মনিবের। পানার স্ত্রী জলখাবার নিয়ে আসবে, সেও আলু তুলবে। চারটে মোটা আলু পানা খোঁড়া-মাটি চাপা দিয়ে একটা চিহ্ন দিয়ে রেখে দিলে। পরিবারকে বলবে, পেট-আঁচলে পুরে নিয়ে যাবে। মোটা আলু বেছে মনিবই নিয়ে থাকে। মোটা আলুও খাওয়া হবে ভাত দিয়ে, নিজের ভাগের চেয়ে বেশিও কিছু পাওয়া

হবে। এই বেশি পাওয়ার অনন্দটাই এ ক্ষেত্রে বেশি। আর প্রহ্লাদকে দেখাতে হবে। প্রহ্লাদ বলে, বিঘে ভুঁই দু পনুরি খোল, 'আলুমিনি' সার দিয়েছে ওর মনিব, আলু ইয়া মোটা হয়েছে। গল্প করা প্রহ্লাদের স্বভাব। পানুর মনিবের বাছুরটা কিনবে নাকি প্রহ্লাদের মনিব! আলুর টাকা থেকেই নাকি তার টাকা হয়ে যাবে! তাই দেখাবে ওকে ওর কৃষাণির জমির আলু—মনিবের সম্পদ।

নিজের মনিবকে বললে পানু—মুনিব মাশায়, পল্লাদে আজ আমাদের পাল বাছুরটার কথা শুধাচ্ছিল। বলে—কত দাম? ওর মুনিব এবার গরু কিনবে।

পানুর মনিব লগন্দ অর্থাৎ নগেন্দ্র মণ্ডল মহাশয় বিচক্ষণ হিসাবী লোক; নাক মুখ চোখ বেশ পাতলা পাতলা চোখা গড়নের, মানুষটিও পাতলা ছিপছিপে; বেশ বাবু-মহাশয়ী ছাপ আছে। মনিব মহাশয় কিন্তু পানার কথার জবাব না দিয়ে উঠে এলেন জমিতে। যেখানটায় পানা আলুগুলি মাটি চাপা দিয়েছিল, সেখানকার মাটি খুঁড়ে আলু চারটে তুলে গামছায় বেঁধে বললেন—ভাল ক'রে দেখে খোঁড়্ রে বেটা, দেখে খোঁড়্, বাদ দিয়ে চললি যে, তাতে তোরই লোকসান। আমার আলু তো আমার জমিতেই থাকবে, সে তো আমি মাটি সরালেই পাব। হঁ্যা, এ আলু কটির ভাগ তুই পাবি না, বুঝলি? তোর নজরের দোষের জরিমানা।—ব'লে জমি থেকে উঠে আলের ওপর ব'সে আবার হুঁকো টানতে লাগলেন নিশ্চিন্ত হয়ে। ভাবটা যেন কিছুই হয় নাই। পানার বুকটা গুরগুর ক'রে উঠল। তেষ্টা পেয়ে গেল।

ওই জলখাবার আসছে। কোপাইয়ের পুলের ওপর দশটার ট্রেন শব্দ ক'রে পার হয়ে গেল। বেশ শব্দ। ঝমর-ঝম, ঝম-ঝম!

ইচ্ছে ছিল জলখাবার নিয়ে গাঁয়ের বাইরে আমবাগানে সকলে ব'সে জমিয়ে গল্প করবে। বনওয়ারী-কালোশশীর কথাটা সকলে শোনবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। তারও ইচ্ছে খুব। কিন্তু মনিবের কাছে ধরা প'ড়ে পানুর সব উৎসাহ নিবে গেল। মাঠে ব'সেই জল খেতে লাগল সে। হঠাৎ বউটার উপর পড়ল তার রাগ। পানুর সন্দেহ হয়, বউটা করালীর দিকে তাকিয়ে থাকে ঘোমটার মধ্যে দিয়ে। সে তাকে রূঢ় ভাষায় গাল দিতে লাগল।

দুই

বনওয়ারী গিয়েছিল চন্দনপুর ইস্টিশানে মনিবের সঙ্গে।

মাইতো ঘোষ ট্রেনে চাপলেন! বনওয়ারীকে চার আনা বকশিশ ক'রে বললেন—খুব ট্রেন ধরিয়েছিস। ও, বুড়ো বয়সে এখনও খুব জোর তোর! প্রশংসা করলেন তিনি।

বনওয়ারী হেঁট হয়ে প্রণাম করে হাসতে লাগল। বললে—তা আজ্ঞেন, আরও কোশখানেক এই গমনে যেতে পারি আজ্ঞেন।

ঘোষ বললেন—বাপ রে বাপ, ছুটতে হয়েছে আমাকে।

—কি করব আজ্ঞেন! চা খেতে দেরি ক'রে ফেলালেন আপুনি। সতর গমনে না এলে এনারে ধরতে লারতেন। উনি তো দাঁড়ান না। টায়েন হ'লেই ছেড়ে দেবেন।

হাসতে লাগলেন ঘোষ। বনওয়ারী গামছা দিয়ে কপালের শরীরের ঘাম মুছলে। স্থূল গড়নের পাথরের মূর্তির মত শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছে। কানের পাশ দিয়ে জুলপী বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে সভ্যস্নান-ক'রে-উঠা মানুষের মত।

ট্রেন ছেড়ে দিলে, বনওয়ারী আবার প্রণাম ক'রে বললে—আমার 'নেবেদনটা' তা হ'লে—

—হবে। দাদাকে ব'লে দিয়েছি। আমগাছ কটা আর বাঁশঝাড় পাঁচটা লিখে দিস।

—তা দিতে হবে বইকি আজ্ঞেন।

—বেশ।

গাড়ি চ'লে গেল। বনওয়ারী ইস্টিশানের নিমগাছতলাটায় ছড়ানো ইট-গুলোর মধ্যে দুখানা টেনে উপরে উপরে রেখে একটু উঁচু ক'রে নিয়ে বসল। আর তাড়া নাই। জিরিয়ে নিয়ে একটি কাজ আছে সেই কাজটি সেরে তবে

ফিরবে। বেশ ফুর ফুর ক'রে হাওয়া দিচ্ছে; হাওয়ার সঙ্গে রয়েছে মিঠে গন্ধ —বন-আউচ ফুলের সুবাস। এখানকার মাঠের আলের উপর, রাস্তার ধারে অনেক বন-আউচের গাছ। ইস্টিশানের দক্ষিণ দিকটা একেবারে জাঙল-বাঁশবাঁদি পর্যন্ত খোলা। চন্দনপুরের মাঠ একেবারে খালি—কাটা ধানের গোড়া ছাড়া আর কিছু নাই। খাঁ-খাঁ করছে বাবুলোকের গ্রাম। এ গ্রামের মাঠে অন্য ফসল হয় না এমন নয়—হয়, তবু বাবু মহাশয়দের ওদিকে খেয়াল নাই। ধান ছাড়া আর সবই তাঁরা খরিদ ক'রে খান। মেলা পয়সা, বিস্তর টাকা—কেনই-বা এই সব চাষের হাঙ্গামা তাঁরা করবেন! এই যে চন্দনপুরের বড় বাবুরা জাঙলের কুঠীডাঙাটা কিনলেন, ওখানে কি ওঁরা এই সব চাষ করবেন ব'লে কিনলেন? চৌধুরীদের অবস্থা খারাপ হয়েছে—মা-লক্ষ্মী ছেড়েছেন, ওরা সবই বিক্রি করছে, পতিত ডাঙাটাও বিক্রি করলে। মাইতো ঘোষ নিজে ব'লে গেলেন—ঘোষেরা কিনতে চেয়েছিলেন ওটা। কিন্তু ঘোষেদের কাছে বিক্রি করতে চাইলে না চৌধুরীরা। হাজার হ'লেও জাতজ্ঞাত তো। শেষে সেধে দিয়ে এল চন্দনপুরের বাবুদের; এখন বাবুরা যে অংশটার মাটি ভাল, অল্পসল্প বানে ডোবে, মানে—পলি পড়ে অথচ ফসল নষ্ট হয় না, সেই অংশটা কাটিয়ে জমি করবেন, বাকিটা বিলি করবেন; কতক কতক প্রজাবিলি করবেন, সেলামী নেবেন, খাজনা নেবেন। সে সব নেবেন জাঙলের মোড়ল মহাশয়েরা বাকি যা থাকবে তাই পাবে—পরম, বনওয়ারী, জাঙলের হাড়ীরা, চন্দনপুরের শেখেরা। তাদের বন্দোবস্তের সর্ত আলাদা; সর্ত হ'ল সন-কড়ারী খাজনার সর্ত। সেলামী নেবেন না। তবে তারা পতিত ভেঙে যে জমি করবে দশ বছর পরে সে জমি জমিদারের হবে। খাজনার সর্ত হ'ল—প্রথম দু বছর বা তিন বছর খাজনা নেবেন না, তারপর এক বছর সিকি খাজনা, তার পরের বছর আধা খাজনা নেবেন, তারপর চলবে পুরো খাজনা। এগারো বছরের বছর জমি হবে জমিদারের। কারণ, বারো বছর হ'লেই নাকি তার স্বত্ব হয়। এগারো বছরের পরে আর-একটা বন্দোবস্ত হবে আর দশ বছরের জন্য। বিক্রি করতে পাবে না, করলেও তা আইনে টিকবে না, জমিদার কেড়ে নেবেন। তবে বিক্রি

না ক'রে চাষ ক'রে যাও, খাজনা দাও, জমিদার মহাশয়ের সঙ্গে বনিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে চল, কেউ কিছু বলবে না—যতদিন খুশি ভোগ ক'রে যাও। বাস্। সেইজন্যই তো 'পিতিপুরুষে' ব'লে গিয়েছেন—'আশ্চয়' করবি লক্ষ্মীমন্তকে, মালক্ষ্মী মনিবের ঘরে ঢুকবেন, মনিবের উঠানে মায়ের পায়ের ধুলো অবশ্যই পড়বে, তাই কুড়িয়ে মাথায় ক'রে আনবি, তাতেই তোর 'গৌঁগুষ্ঠীর' 'প্যাট' ভরবে। এতটুকু মিথ্যে নয় পিতিপুরুষের কথা। এই বনওয়ারীদের কথাই ধর না! ঘোষ মহাশয়ের ঘরে লক্ষ্মী এলেন। বনওয়ারীদের বাপ তাকে আশ্রয় করলে—সেই কল্যাণেই বনওয়ারীর বাবা হ'ল কাহারপাড়ার মাতব্বর। ঘোষ বাড়ির লক্ষ্মীর পায়ের ধুলোয় বনওয়ারীর বাপের অবস্থা স্বচ্ছল হ'ল। নইলে তখন তো মাতব্বর ছিল ওই হেঁপো রোগী নয়ানের বাবা। নয়ানের কর্তাবাপের নিজের দু বিঘে জমি, চৌধুরীবাড়ির 'আশ্চয়ে' বাস, তাদের সোনা-ফলানো জমি তারা ভাগে করে। নয়ানের ঠাকুরদা মরদও ছিল জব্বর, হাঁকডাকও খুব। 'ঘরভাঙারাই' তখন মাতব্বর। নয়ানদের বংশটার নাম সেকালে ছিল 'ঘরভাঙাদের গুষ্ঠী'। আগের আমলে ওদের ঘর ছিল নীলের বাঁধের দক্ষিণ পাড়ে সব থেকে নীচু জায়গায়; আশ্চর্যের কথা, গোটা ঘরে বাস করা ওদের কখনও ঘটত না, প্রতি বছরই বর্ষার সময় ঘর ভাঙত। কোন বার পুরো ঘরটাই ভাঙত, কোন বার একটা দেওয়াল, কোন বার বা আধখানা দেওয়াল; এ ভাঙতেই হ'ত। সেই অবধি ওদের বাড়ির নাম—ঘরভাঙাদের বাড়ি। তারপর যখন নয়ানের কত্তাবাবা জাঙলের চৌধুরী মহাশয়দের 'আশ্চয়ে' এল—চৌধুরী-বাড়ির মা-লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো কুড়িয়ে এনে নতুন ঘর করলে তখন আর মায়ের কৃপায় সে ঘর ভাঙল না। তবে নয়ানের ঠাকুরদাদা পিতিপুরুষের কথা মেনেছিল, ঘরখানা গোটা ক'রেও দেওয়ালের মাথায় হাত-চারেক লম্বা হাত-খানেক চওড়া জায়গা দেওয়াল সম্পূর্ণ না ক'রে মজবুত বাঁখারির বেড়া দিয়ে রেখেছিল। ভাগ্যমন্তের 'আশ্চয়'—চৌধুরীবাড়ির মা-লক্ষ্মীর পায়ের ধুলোর কৃপা ছাড়া সেটা আর কি? চৌধুরীবাড়ির পতন হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরভাঙা কাহারবাড়ির মাতব্বরি গেল। মাতব্বর হ'ল বনওয়ারীর বাপ।

বাপের পর বনওয়ারী মাতব্বর হয়েছে। ঘোষেদের 'আশ্চয়ে' রয়েছে, ঘোষেদেরও চলছে বাড়বাড়ন্ত, বনওয়ারীরও যে বাড়বাড়ন্ত চলবে তাতে বনওয়ারীর সন্দেহ নাই। এখন সেদিন ওই কালো বউয়ের কাছে সায়েবডাঙা বন্দোবস্তির কথা শুনে ওই জমি খানিকটা নেবার মতলব হয়েছে, সেই কথা ভাবতে ভাবতে আর-একটা কথা তার মনে হয়েছে। চন্ননপুরের বড়বাবুদের এখন এ চাকলার মধ্যে বাড়বাড়ন্ত, বাবুদের 'আশ্চয়' যদি একটু পায়, যদি ওঁদের মা-লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো আঙুলের ডগায়ও একটু তুলে আনতে পারে, তবে তো তার ঘরে মা-লক্ষ্মী উথলে উঠবেন।

বনওয়ারীর মনের এটি অতি গোপন কথা। এ কথা কাউকে বলতে পারে না। ঘোষ মহাশয়রা জানতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তবে ভাগ্যটা ভালই মনে হচ্ছে। মাইতো ঘোষ সাধারণত ইস্টিশানে যেতে তাকে ডাকেন না। মাল তো তাঁর বেশি থাকে না। কি বলে 'বেগ' না 'সুটক্যাস' আর তেরপলের মত মোটা কাপড়ের খোলে বাঁধা 'বেছ্না'। এবার মাল নিয়েছেন বেশি। তাই ডাক পড়েছে 'কোশকেঁধে' বাড়ির বনওয়ারীর। ভালই হয়েছে, চন্ননপুরে যে কালে এসেছে, সে কালে বড়বাবুদের কাছারি হয়েই যাবে। বনওয়ারী উঠল। মাইতো ঘোষ যে সিগারেটটি দিয়েছিলেন, কানে যেটি গোঁজা ছিল, সেটি হাতে নিয়ে ইস্টিশানের বাইরে পান-বিড়ি-চায়ের দোকানের দড়ির আগুনে ধরিয়ে নিয়ে চন্ননপুর গ্রামের পথ ধরলে। প্রথমেই ইস্টিশান এলাকা। পথে পা বাড়িয়েও সে থমকে দাঁড়াল। মনে প'ড়ে গেল তার খুড়তুত বোন সিধুকে। ঘুরল সে।

ইস্টিশানের এলাকাটি বেশ বড়।

ছোট 'নাইন' হ'লে কি হয়, চন্ননপুরের ইস্টিশানের সীমানা-সহরদ্দ মস্ত। লাইন তো তৈরি হয়েছে সেদিন—বনওয়ারীর চোখের সামনে হ'ল এসব। এই লাইনে খাটতে এসে কজন মেয়ে ঘর ছেড়েছে—পাঁচী খুকী বেলে চিত্ত নিম্মলা। খুকী আর বেলে গিয়েছে দেশ ছেড়ে—দুজন মুসলমান রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে। আর চিত্ত পাঁচী গিয়েছে একজন হিন্দুস্থানী-লাইন-মিস্ত্রীর সঙ্গে।

নিম্মলাও গিয়েছে একজন মিস্ত্রীর সঙ্গে। ওই নিম্মলারই ছেলে করালী। ছোট পাঁচ বছরের করালীকে পর্যন্ত ফেলে হারামজাদী চ'লে গিয়েছে। ও, রঙের নেশার কি ঘোর, সন্তান পর্যন্ত ভুলে যায়! সিধু আর 'জগধাত্তি' এরাও দুজনে ঘর ছেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের ভালবাসার লোক তাদের সঙ্গে নিয়ে যায় নাই। তারা এখনও রয়েছে চন্ননপুরে, এই ইস্টিশান এলাকাতেই থাকে। মাস্টারদের বাড়িতে ঝিয়ের 'পটকাম' করে, ইস্টিশানে পোড়া কয়লা কুড়োয়, কয়লা-চুনের ডিপোতে কামিনের কাজ করে। আবার রাত্রিকালে অন্য রূপ ধরে। বনওয়ারীই আর তাদের গাঁয়ে ঢুকতে দেয় নাই। সিধু তার নিজের খুড়োর কন্যে; সিধুকে সে ভারি ভালবাসত। এই সিধুর জন্য আজও তার মন 'বেথা' পায়। আপন খুড়োর মেয়ে, কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। হঠাৎ এখানে এসে আজ তার ইচ্ছে হ'ল, একবার সিধুকে দেখে যাবে। সিধুর ওখানে করালী-পাখীর খবরও পাবে।

ঘুরল বনওয়ারী। ইস্টিশানের এলাকার মধ্যে ঢুকল। লম্বা—এই এখান থেকে সেখান পর্যন্ত চ'লে গিয়েছে সারি সারি ঘর। পাকা ঘর, পাকা মেঝে, সামনে খানিকটা উঠান; এক এক ঘরে এক এক সংসার বেশ আছে। থাকবে না কেনে? সায়েবসুবার কারখানা, তাদের 'আশ্চয়ে' আছে। কিন্তু বড় ঘুপচি। পাকা ছাদ, পাকা দেওয়াল, পাকা মেঝে হ'লেও এর মধ্যে থাকতে হ'লে বনওয়ারীর হাঁপ ধ'রে যায়। তাদের ঘর এর চেয়ে অনেক খারাপ, কিন্তু উঠানটি খোলা। তা ছাড়া এদের সংসারের ঘরদোরের গন্ধ যেন কেমন কেমন। এলেই নাকে লাগে। তাদের ঘরের গন্ধটির মধ্যে গোরব-মাটির গন্ধ, গরুর গায়ের গন্ধ, ধানের গন্ধ, কাঠ-ঘুঁটে-পোড়ার গন্ধ, সারগাদার গন্ধ, পচাই মদের গন্ধ, বাড়ির আশপাশের বাবুরি গাছের গন্ধ মিশে সে এক ভারি মিষ্টি প্রাণ-জুড়ানো গন্ধ। আর এখানকার গন্ধ আলাদা, ভারি কটু গন্ধ, ইঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা আর জলে মিশে একটি ভাপানী তেজিয়ান গন্ধ এসে নাকে ঢোকে। ডাক্তারখানায় তেজী ওষুধের গন্ধ ছাড়া আর কোথাকারও গন্ধ এমন তেজী নয়।

সিধু এই সকালবেলাতেই চুল আঁচড়াচ্ছে। যে অন্ন গেঁজে প'চে যায়, সে অন্নের গন্ধ সকাল-বিকেল সব সময়ে এক। বনওয়ারী মনে মনে দুঃখের হাসি হাসলে। সকালবেলাতেই 'ব্যাশ' করতে বসেছে! বনওয়ারীকে দেখে সিধু ব্যস্ত হয়ে চুল আঁচড়ানো বন্ধ ক'রে হেসে বললে—এস, দাদা এস। কি ভাগ্যি আমার!

—এলাম একবার। মাইতো ঘোষের মোটঘাট নিয়ে এসেছিলাম। তা বলি, একবার সিধুকে দেখে যাই।

সিধু উঠে তাড়াতাড়ি একখানি বস্তা পেতে দিলে—ব'স।

চন্নপুরে থেকে সিধু তরিবৎ শিখেছে। আসন পেতে দিতে হয়—সভ্যতার এ রীতি জেনেছে। তাদের পাড়ায় আগন্তুকেরা নিজেরাই ফুঁ দিয়ে অথবা গামছা দিয়ে ধুলো-কুটো ঝেড়ে নিয়ে মাটিতেই বসে। গণ্যমান্য কেউ এলে বনওয়ারীর ঘরে দুটো মোড়া আছে, তাই এনে পেতে দেয়—যেমন দারোগাবাবু কি জাঙলের মনিব মহাশয়েরা কেউ। বনওয়ারী বসল বস্তাখানার উপর। বললে—তারপরে ভাল আছিস?

ভাল আর মন্দ!—হেসে উঠল সিধু।—যেদিন খাটি সেদিন খাই, যেদিন খাটতে নারি সেদিন পেটে আঁচল বেঁধে প'ড়ে থাকি। জগ কি কেউ যদি এক মুঠো দেয় তো খাই। আপনজন কে আছে যে, তাব উপর দাবি করব, বল?

বনওয়ারী চুপ ক'রে রইল। সিধুর কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অভিযোগ রয়েছে, তার সমস্তটাই এসে পড়ছে বনওয়ারীর উপর।

সিধু আবার বললে—তবু তোমার করালী ছোঁড়া লাইনে কাজ করা অবধি খোঁজখবর করে। পিসী ব'লে এসে বসে। তোমাদের খবর তার কাছেই পাই।

এতক্ষণে বনওয়ারী বললে—তা তুইও তো মধ্যে-মাঝে যেতে পারিস উদিক পানে!

সিধু বললে—কে জানে বাপু, ভয় তো আর কাউকে নয়, ভয় তোমাকেই।

বনওয়ারী দুঃখের হাসি হেসে মাথা নামিয়ে রইল। সিধু হেসে বললে—তোমাকে বাপু বড় ভয় লাগে।

বনওয়ারী বললে—ছোটকালে বডা মারতাম তোকে, লয় ?

সিধু হেসে বললে—বাবা রে ! তারপর গম্ভীর হয়ে বললে—তার লেগে নয়, তুমি বাপু ভারি কড়া নোক। কি ব'লে দেবে কে জানে ? হয়তো বলবে—সিধুকে কেউ বাড়িতে ঢুকতে দিয়ো না।

বনওয়ারীর চোখে হঠাৎ জল এসে গেল। মাথা হেঁট ক'রে মাটির দিকে চেয়ে কোনরকমে আত্মসম্বরণ ক'রে সে উঠে পড়ল। ঘোষ যে চার আনা পয়সা তাকে দিয়েছিলেন, তারই একটি দুয়ানি সিধুকে দিয়ে সে বললে—রাখ্, মিষ্টি কিনে খাস।

সিধু বললে—দাঁড়াও। ব'লে ঘরে ঢুকে একটি পাকি মদের বোতল এনে বললে—খানিক আছে, খাও।

বনওয়ারী একবার ভাবলে, তারপর বোতলটি নিয়ে গলায় ঢেলে দিলে।

সিধু বললে—সে দিনে করালী সাপ মেরেছিল, মেরে এখানে অনেক খরচ করেছিল। দু বোতল এনে সবাই মিলে খেলাম। ওইটুকুন ছিল। তারপর হঠাৎ তার একটা সরস কথা মনে প'ড়ে গেল, সে বেশ কৌতুক-পুলকিত স্বরে ব'লে উঠল—ওই দেখ,আসল কথাই শুধাতে ভুলে গিয়েছি—করালী-পাখীর রঙের কথা !

—হ্যাঁ, সে এক কাণ্ড হয়ে যেয়েছে। ছোঁড়াকে শায়েস্তা না করলে হবে না।

সিধু বললে—তারা এখানে পালিয়ে এসে দিব্যি রয়েছে। করালী তো লাইনে কাজ করে, একখানা ঘর পেয়েছে, সেইখানে রয়েছে। কি আর সায়েস্তা করবা তুমি ? সে বলছিল—যাবেই না আর তোমার এলাকাতে।

চমকে উঠল বনওয়ারী।

সিধু বললে—ওই সব-শেষের ঘরখানায় রয়েছে তারা। এর পরে মুখে কাপড় দিয়ে হাসি ঢেকে বললে, ওদের রঙ দেখলাম খুব জমজমাট। করালী

বলে—গাঁয়েই যাব না, লাইনে খাটব, এইখানেই থাকব; কারুকে গেরাহ্যি করি না আমি। নতুন নোয়া এনে পরিয়ে দিয়েছে পাখীকে। ঘর পেতেছে, ধুম এখন চলছেই—চলছেই।

চন্ননপুরে এসে সিধুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রঙকে সে অঙ বলে না, নতুনকে লতুন বলে না। চলকো ক'রে চুল বাঁধে।

বিড়ি লাও একটা, বিড়ি।—সিধু বললে।

থাক্। বনওয়ারী হঠাৎ উঠে পড়ল।

বেরিয়ে এসে সে থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ পাখী এবং করালীর ব্যাপারটা নিয়ে সে খুব চিন্তিত হয়ে উঠেছে। ভাল কথা নয়, গ্রামেই যাবে না—এ মতলব ভাল নয়। বদমাস হোক, দুষ্টু হোক, পাপী হোক—ছোঁড়া এখনও এমন অন্যায় কিছু করে নাই, যাতে তাকে গাঁ থেকে দূর ক'রে দিতে হবে। পাখীর সঙ্গে ব্যাপারটার মত ব্যাপার তো চিরকাল ঘ'টে আসছে। তা রঙ যখন পাকা, তখন নয়ানের সঙ্গে পাখীর ছাড়পত্র হয়ে যাক, সাঙা হোক করালীর সঙ্গে। গাঁয়ে-ঘরেই থাকুক। এখানে সর্বনাশ হবে। পাখী-করালী জানে না, বুঝতে পারছে না, কিন্তু চোখ তো আছে—চেয়ে দেখুক ওই সিধুর দিকে, জগদ্ধাত্রীর দিকে।

খুব জমিয়ে বসেছিল ওরা। পাখী করালী নসুদিদি জগদ্ধাত্রী আর করালীর লাইনগ্যাঙের দুজন সঙ্গী। মধ্যে একরাশ তেল-মাখানো মুড়ি-লঙ্কা-পেঁয়াজ, কতকগুলো বেগুনি ফুলুরি আর মদের বোতল। খুব গরম গরম কথা চলছে। পাখী কলরব করছে বেশি। দরজার মুখ থেকে তারই কথা শুনতে পেলে বনওয়ারী। পাখী বলছিল জগকে—'যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপন জন'—ইয়ের আবার শাসনই বা কি মাতব্বরিই বা কি! ওই হেঁপো উগীর ঘরে আমি থাকব না, পালিয়ে এসেছি আজ ছ মাস। এখন একজনার সাথে আমার মনে অঙ ধরল, আমি তার ঘরে এলাম। এ কি লতুন নাকি কাহারদের ঘরে? না, কি বল জগমাসী?

জগ বললে—ইয়ের আর বলব কি লো?

করালী বললে—মামলা যদি থাকে তো আমার সাথে ওই নয়না শালোর। তা আসুক নয়না, তার সাথেই বোঝাপড়া হোক। ঠেঙা আসুক, লাঠি আসুক, নিয়ে যাক পাখীকে কেড়ে।

পাখী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—মর্‌ মুখপোড়া, তোকে লাঠি-সোঁটা মেরে আমাকে লিয়ে যেতে চাইলেই আমি যাব নাকি?

নসুদিদি ব'লে উঠল—তা ব'লো না হে, তা ব'লো না, সেই 'কিল্‌ ধমাধম পড়ে সই—কিল ধমাধম পড়ে গো', লাঠি-সোঁটা মেরে নিয়ে যেতে ক্ষ্যামতা থাকলে চুলের মুঠোতে ধ'রে নিয়ে যাবে। তুমি হাত পা ছুঁড়ে বড় জোর চেঁচিয়ে 'রবশ্যাষে' গলা ধরিয়ে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে ভাত রাঁধতে বসবা, 'হেনসেলে' যাবা। মরদের কিলে বাবা ভুলে যায়, তা অঙের নোক!

পাখী বললে—না, হে না। অঙ যার পাকা হয়, তার অঙের নোকই পিথিমীর মধ্যে 'ছেষ্ট'।

হি-হি ক'রে হেসে উঠল নসুদি।

এ কি পাকা অঙ লাগল মনে মনে—ও সজনি!

এই সময়ে ঘরে ঢুকল বনওয়ারী। এক মুহূর্তে আসরটা স্তব্ধ হয়ে গেল। করালীর মুখ পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। শুধু পাখী বার বার ঘাড় নেড়ে ব'লে উঠল—আমি যাব না, আমি যাব না। সঙ্গে সঙ্গে উঠে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা সশব্দে বন্ধ ক'রে দিলে।

বনওয়ারী ডাকলে করালীকে—শোন।

করালী এতক্ষণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে বুকটা ফুলিয়ে নিয়ে উঠে এসে উদ্ধতভাবেই বললে—কি?

বনওয়ারী বললে—ছুটি হ'লে বাড়ি যাস পাখীকে নিয়ে। এখানে থাকার মতলব ভাল লয়। উ সব ছাড়্‌। বাড়ি যাস; সাঙার ব্যবস্থা ক'রে দেব। বুঝলি?

করালী অবাক হয়ে চেয়ে রইল বনওয়ারীর মুখের দিকে। বনওয়ারী আবার তাকে বললে—বুঝলি ?

করালী শান্ত শিষ্ট ছেলেটির মতই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

বাড়ির বাইরে এসে আবার করালীকে ডাকলে বনওয়ারী, আর একটা কথা মনে পড়েছে—থানায় গিয়েছিলি ? বশকিশটা এনেছিস ?

—না।

—আয় আমার সাথে। দারোগাবাবুর কাছে তোকে সনাক্ত দিয়ে যাব।

—সনাক্ত ?

—হ্যাঁ রে। তুই যে করালী, দারোগা তা জানবে কি ক'রে ? সেই সনাক্ত দিয়ে যাব। তা'পরে আপনার বশকিশ তুই লিস যবে দেবে। আয়।

তিন

দারোগার কাছে করালীকে সনাক্ত ক'রে দিয়ে সে বড়বাবুদের কাছারি হয়ে বাড়ি ফিরল। বেলা তখন দুপুর গড়িয়েছে। ঘোষের বাকি দু আনা পয়সা—ছ পয়সার মুড়ি, দু পয়সার পাটালি কিনে গামছায় বেঁধে বাবুদের কেষ্ট দীঘির জলে ভিজিয়ে আমগাছের ছায়ায় ব'সে খেয়ে নিয়েছে, আঁজলা ভ'রে জল খেয়েছে। সিধুর পাকি মদের বোতলটিতে নেহাত কম 'বস্তু' ছিল না, জিনিসটাও ছিল খাঁটি—এখনও পর্যন্ত অল্প অল্প নেশায় বেশ স্ফূর্তি রয়েছে বনওয়ারীর। তার উপর মনটাও খুব খুশি রয়েছে। দিনমানটা আজ ভালই বলতে হবে। পুজোটি কর্তা প্রসন্ন হয়েই নিয়েছেন মনে হচ্ছে তার। করালীর ব্যাপারটা মিটে গিয়েছে, ভালই হয়েছে। তার মনের মধ্যে ভারি একটা অশান্তি ছিল। 'কোধ' অবশ্য খুবই হয়েছিল তার। গুরুবলে খুব সামলে গিয়েছে। নইলে হয়তো কাণ্ডটা একটা 'বেপয্যয়' ঘটিয়ে ফেলত। ছোঁড়াটার গায়ে ক্ষমতা হয়েছে, হ্যাঁ, তা হয়েছে, মানতেই হবে বনওয়ারীকে। বাঁশবনে সে তার নীচে পড়েছিল—এজন্য বলছে না, ওটা একটা বেকায়দায়

প'ড়ে হয়ে গেল, ঝরা বাঁশপাতার গাদায় পাতা স'রে গিয়ে পিছলে প'ড়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু বনওয়ারীর বুকে যখন উঠে বসেছিল করালী, তখন তার ক্ষমতার আঁচটা পেয়েছে সে। 'ডাঁটো মরদ' হবে ছোঁড়া। তবে মদে—বদ খেয়ালীতে না মাটি হয়ে যায়! সেই জন্যই তো বনওয়ারী তাকে নষ্ট হতে দেবে না। এ কদিন কয়েকবারই তার মনে হয়েছে, ছোঁড়াকে ফেলে বুকে চেপে বসে। বসলে হয়তো মেরে ফেলত তাকে। তা, তা থেকে রক্ষে করেছেন গুরু আর কর্তা। আজ ওই সিধুকে দেখে পাখীর জন্য তার মন কাঁদল। করালী আর পাখীকে ফিরিয়ে আনাই 'কত্তব্য' মনে হ'ল। তার মত লোকের কি ওই ছেলেমেয়ের উপর রাগ করা ভাল দেখায়? রাম, রাম, লোকের কাছে সে মুখ দেখাত কি ক'রে? যাক, ছোঁড়াও শেষটা বুঝতে পেরেছে, পাখীকে নিয়ে ফিরে যাবে বলেছে। থানায় ছোঁড়া পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। হতভাগা, বদমাস কোথাকার! হতভাগা যে শেষে বুঝেছে, এতেই বনওয়ারী খুব খুশি। নিমতেলে পানু প্রহ্লাদ নয়ান এরা খানিকটা মাথা নাড়বে, তা নাড়ানাড়ি করুক। বুঝিয়ে দিতে হবে। বড় ঝঞ্ঝাটের কাজ এই মাতব্বরের কাজ। দশজনের মাথার উপর বসার ভারি আরাম—এই ভাবে সবাই। ওরে বাবা, এ দশের মাথায় বসা নয়—এ হ'ল লোহার গজাল-বসানো গাজনের পাটায় গজালগুলোর স্থচালো মাথায় ব'সে থাকা। হে ভগবান! মতি ঠিক রেখো বাবা, মতিভ্রম হ'লেই ওই গজালে চেপে বিঁধে মারবে দশে। বুকের ভিতর রাগ অশান্তি হ'লেই বুঝতে হবে—গজাল বিঁধছে। করালীর ব্যাপারটা নিয়ে মনে যখন অশান্তি ছিল, তখন ওই গজালই বিঁধছিল। মিটে গেল—যাক। ভারি আনন্দ।

চন্দনপুরের বাবুদের ওখানে সে সুফল পেলে। জয় বাবাঠাকুর! বাবু শুনলেন তার কথা। বাবুর সেরেস্তার কর্মচারী—কোপাইয়ের অপর পারের গোপের পাড়ার দাসজী মহাশয়ের ছেলে—বনওয়ারীর খুব সুখ্যাতি করলে বাবুর কাছে। পরমের নিন্দেই করলে। বললে—ওই তো আসল মাতব্বর কাহারপাড়ার। পরম তো আটপৌরেপাড়ার। আটপৌরেরা মোটে ছ-সাত

ঘর। তাও সকলে পরমকে মানে না। তা ছাড়া পরম লোকও ভাল নয়। ডাকাতিতে জেল খেটেছে এবং যত কুড়ে তত মাতাল। বনওয়ারীর স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল।

বাবু মন দিয়ে শুনলেন সব। বললেন—আচ্ছা, দেব তোমাকে জমি।

চন্দনপুরের বড়বাবুর চার মহলা বাড়ি, গাড়ি ঘোড়া লোকলস্কর, যাকে বলে—'চার চৌকস' কপাল। ওঁর বাড়ির মা-লক্ষ্মী—সাক্ষাৎ 'আজলক্ষ্মী'। ওই মায়ের পায়ের 'পাঁজের' ধূলো যদি বনওয়ারী পায়, তবে কি আর দেখতে আছে? আর ওই রকম মনিব নইলে কি মনিব? ওই মনিবের চাকর হ'লে এক হাত ছাতি দশ হাত হয়ে ওঠে। লোকের কাছে ব'লে সুখ কত? তা ছাড়া কত দুর্লভ জিনিস চার পাশে? মেলাখেলায় ঝকমকে আলোর তলায় সারারাত ব'সে নয়ন ভ'রে দেখে যে সুখ, ওই রাজবাড়িতে চাকর হয়েও ঠিক সেই সুখ। বনওয়ারীর মন কল্পনায় পুলকিত হয়ে উঠল।

হঠাৎ দাঁড়াল বনওয়ারী। ডাইনে জাঙল—সামনে বাঁশবাদি; বাঁয়ে পূবে মা-কোপাইয়ের 'পলেনের' অর্থাৎ পলি-পড়া মাঠে রাখাল ছোঁড়ারা গরু ছাগল ভেড়া ছেড়েছে। সকলে দিব্যি নিশ্চিন্তে হয়ে গাছতলায় কড়ি খেলছে। এদিকে ওই একটা আলের পাশে একটা শেয়াল মুখ বাড়িয়েছে দেখা যাচ্ছে; ছাগলগুলো চীৎকার ক'রে ছুটছে, দেখেছে তারা; কিন্তু ভেড়াগুলো একজায়গায় জমাট হয়ে গায়ে গায়ে বেঁধে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা জাত! চোখ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছে। নিলে বোধ হয় একটা! বনওয়ারী হাঁকলে—লিলে রে—লিলে রে! এই ছোঁড়ারা!

রাখালেরা চকিত হয়ে খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই শেয়ালটাকে দেখতে পেলে, সঙ্গে সঙ্গে তারা হৈ-হৈ ক'রে ছুটল।—লে—লে—লে—লে। বনওয়ারী ভারি বিরক্ত হ'ল। বেকুবের দল! সব একদিকে ছুটল! কাহারের ছেলে হয়ে ধূর্ত্ত শেয়ালের ফন্দি জানে না হতভাগারা! হায় হায় হায়! করালীর আড্ডায় দিনরাত গিয়ে গিয়ে ওদের এই দশা, সেখানে দিনরাত দ্যাশ-বিদেশের রাজা-উজীরের গল্প! এসব কুলকর্ম্মের কথা তো হয় না, শিখবে কি ক'রে?

ওই একটা শেয়াল ছুটে পালাচ্ছে। তা হ'লে আসল শিকারী পিছন দিকে কোথাও আছে নিশ্চয়। এই ফাঁকে সে এসে একটা ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে পালাবে। আচ্ছা ধূর্তের জাত! রাখাল থাকলে ধূর্তেরা এই ভাবে একটা এক দিকে দেখা দেবে—উলটো দিকে লুকিয়ে থাকবে আর একটা কি দুটো। রাখালেরা যেমনই ছুটবে দেখা-দেওয়া ধূর্তটার দিকে, অমনই পিছন দিক থেকে সেটা বার হয়ে ঝপ ক'রে ভেড়া ছাগল যা সামনে পাবে মেরে টেনে নিয়ে পালাবে। 'পণ্ডিত মহাশয়' বলে শেয়ালকে। কিন্তু এদিকের ধূর্ত পণ্ডিতটি কই? কোথায়? যেখানেই থাক্, বনওয়ারী ভেড়ার পালের দিকে ছুটতে লাগল।

সামনে একটা নালা। প্রচণ্ড একটা লাফ দিয়ে সশব্দে পার হ'ল বনওয়ারী। সঙ্গে সঙ্গে একটা 'খ্যাক' ক'রে শব্দ হ'ল, তারপরই নালার কুল-ঝোপ থেকে সড়াৎ ক'রে বেরিয়ে পালাল একটা শেয়াল। ছুট—ছুট—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে শেয়ালটা। হরি হরি, পণ্ডিত মহাশয় এইখানেই নালাকে পেছনে রেখে কুলবনের ঝোপে ঝোপে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ভেড়াগুলোর দিকে! বনওয়ারী ঠিক হাত পাঁচেক দূরে লাফিয়ে পড়েছে। ঘাড়ে পড়লে ঠিক হ'ত। ওঃ—ওঃ—এখনও ছুটছে পণ্ডিত! ধর্—ধর্—ধর্, ধূর্তকে ধর্! পণ্ডিতকে ধর!

খুব এক চোট হেসে ছোঁড়াগুলোকে পণ্ডিতদের ধূর্ত বুদ্ধির কৌশল বুঝিয়ে দিয়ে বললে—খবরদার, সবাই মিলে কখনও ছুটে যাবি না, একজনা থাকবি ছাগল-ভেড়ার কাছে—বড় দেখে একজনা থাকবি। তা লইলে পণ্ডিত দাঁত মেলে খ্যা-খ্যা ক'রে তেড়ে এসে ছেলেমানুষকে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল ক'রে পালাবে। তারপর বললে—কল্কেটায় আগুন আছে? ট্যাঁক থেকে বিড়ি বার করলে সে। ধরিয়ে নিলে।

ওই কত্তার 'থান' দেখা যাচ্ছে। প্রণাম করলে বনওয়ারী। বাড়ি ফিরতে গিয়ে গাঁয়ের ধারে এসে মনে পড়ল—বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। বউ বলেছিল—চার পয়সার পোস্তদানা আনতে। ভুলে গিয়েছে। জাঙলে পানার মনিবের দোকান থেকে নিয়ে গেলে হ'ত। কিন্তু, না, থাক্। ধার সে নেবে না।

চার আনা পয়সার দু আনা নিজে খেয়েছে, দু আনা দিয়েছে সিধুকে। মনটা তার আবার খুশি হয়ে উঠল—সিধুকে পয়সা দিয়েছে, এতে তার মন ভারি খুশি হয়েছে। আহা, 'দুভ্যাগা মেয়ে'! সিধু এখন আস্তাকুড়ের অন্নের সমান। আস্তাকুড়ে যে অন্ন পড়ে, সে অন্ন আর তুলে নেবার উপায় নাই। কিন্তু সে অন্নও তো লক্ষ্মী! তার জন্য মন না কেঁদে তো পারে না!

আর কয়েকদিন পরেই হাঁসুলী বাঁকে কাহারপাড়া বাঁশবাঁদিতে আবার একবার বাদ্যি বেজে উঠল। এবার বাজল ঢোল কাঁসি সানাই—কুরুতাক-কুরুতাক-কুরুম-কুরুম। বায়েন এসেছিল একদল, ঢোল কাঁসি সানাই। মেয়েরা এবার দিচ্ছে উলু—উলু—উলু - উলু—লু—লু—লু। তারই সঙ্গে ঢুলী বাজাচ্ছে—কুরুর—কুরুর—কুরুর—তাক—তাক—তাক। কাঁসিতে বাজল—কাঁই—কাঁই—কাঁই। সানায়ে সুর উঠল—আহা—মরি—মরি—মরি রে মরি, শ্যামের পাশে রাইকিশোরী। বাঁশবাঁদির বাঁশবনে-বনে চঞ্চল হয়ে উঠল ঝাঁক; তলায় আদ্যিকালের পচা এবং শুকনো পাতার মধ্যে থেকে দু-চারটে খরগোশ বার হয়ে ছুটে পালাল নদীর ধারের জঙ্গলের দিকে; শিয়ালগুলি এত ভীরু নয়, তারা প্রথমটা একবার চঞ্চল হয়েই স্থির হ'ল। সাহেবডাঙার দিকে বুনো-শুয়োরগুলো নিজেদের আড্ডায় বার কয়েক গোঁ-গোঁ ক'রে উঠল। শীতকালের আমেজ এখনও আছে, সাপেরা এখনও মাটির তলায় না-খেয়ে 'ছ-মেসে' দম নিয়ে অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে—তারা মাথা তুলতে চেষ্টা করলে; কিন্তু পারলে না। পাখী ও করালীর বিয়ে।

কাহারপাড়ায় মাতন লাগল! তেল হলুদ রঙ নিয়ে মাতামাতি। করালীর সঙ্গে পাখীর সাঙা, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহ। নসুরাম—করালীর নসুদিদি—গাছকোমর বেঁধে তেল-হলুদ মেখে, কাপড়ে রঙ নিয়ে হা-হা ক'রে হাসছে আর গাইছে—"আমার বিয়ে যেমন তেমন—দাদার বিয়ের রায়বেঁশে—আয় ঢকাঢক্ মদ খেসে।"

প্রচুর মদ, বড় বড় হাঁড়ি থেকে বাটি ভ'রে তুলে ঢেলে দিচ্ছে একজন, সকলে আকণ্ঠ পান করছে। করালী দরাজ হাতে খরচ করছে। তার সঙ্গে

কাহারপাড়ার কার সঙ্গ ? সে হ্যাট-হ্যাট ক'রে তাড়িয়ে লাঙল চ'ষে, হিম্-প্লো হাঁক হেঁকে পাল্কি ব'য়ে খায় না, সে 'অ্যাল' কোম্পানিতে চাকরি করে, নগদ 'ওজকার'। সে সেটা দেখিয়ে দিতে চায়, বুঝিয়ে দিতে চায় এই সুযোগে। সে দেড় কুড়ি টাকা নগদ খরচ করেছে। খাসী কিনেছে, ছোলার ডাল কিনেছে—জ্ঞাতিভোজনে সে চুনোপুঁটির অম্বল আর কাঁচা কলাইয়ের ডাল দিয়ে ভাত দেবে না। পাখীকে শাঁখা-শাড়ি-সিঁদুর-নোয়া ছাড়াও দেবে অনেক জিনিস, অনেক গয়না ; রূপদস্তার নয়, রূপোর গয়না। হাতে চারগাছা ক'রে আটগাছা চুড়ি, গলায় দড়ি-হার, কোমরে গোট। এ ছাড়া একপ্রস্থ গিল্‌টির গয়না—সুতহার, পাশী মাকড়ি, হাতে বাজু অনন্ত বালা। পাড়ার ঝিউড়ী-বউড়ীরা ধন্য ধন্য করছে করালীকে। ছেলে-ছোকরারাও বাহবা দিচ্ছে। মনে মনে ঠিক করছে, রেল কোম্পানির ওই আজব কারখানায় চাকরির চেষ্টা ওরাও অতঃপর করবে। পরক্ষণেই দ'মে যাচ্ছে। যে মাতব্বর আছে, সে কি ও-মুখে কাউকে হাঁটতে দেবে ? করালীর মত বুকের পাটা তাদের নয়, তারা বনওয়ারী মাতব্বরকে অমান্য ক'রে রেল কোম্পানিতে খাটতে যেতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে মনের সামনে ভেসে ওঠে বনওয়ারীর মূর্তি। চোখ বড় ক'রে হাত তুলে বলছে, পিতিপুরুষের বারণ। সাবোধান !

কিন্তু বনওয়ারী মাতব্বর হয়তো করালীকেও এবার কায়দা করলে। তাকে বার বার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে, পঞ্চায়েতের হুকুম অমান্য করা চলবে না। দেবতা-গোঁসাইকে মানতে হবে, অনাচার অধর্ম করবে না। পাকাচুলের কথা না-শোন নাই শুনবে, কিন্তু প্রবীণ মুরুব্বির 'রপমান' কখনও করবে না। করালী সে প্রতিজ্ঞা করেছে।

এই বিয়ের খরচ নিয়ে বনওয়ারী তাকে বলেছিল—এত ভাল লয় করালী। যা রয় বয় তা করতে হয়। এত খরচ করতে তু পাবি কোথা ?

করালী অন্য সময় হ'লে বলত—আজারা মানিক কোথা পায় ? নিশ্চয় বলত এ কথা, এবং মুখ টিপে হেসে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলত কথাটা। কিন্তু এবার সে হাত জোড় ক'রে বনওয়ারীকে বললে—হেই কাকা, তোমাকে

জোড় হাত ক'রে বলছি, এবার কিছু ব'লো না। বিয়ে আমার পাখীর সঙ্গে।

বনওয়ারী পরিতুষ্ট হয়ে হেসে বললে—আচ্ছা আচ্ছা। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে করালীকে একটু আড়ালে ডেকে প্রশ্ন করলে—কিন্তুক বাবা, একটি কথা বল্ দেখি নি—এত টাকা তু পেলি কোথা? কোম্পানির কিছু চুরি-চামারি করিস নাই তো? দেখ্? ফেসাদ হবে না তো ইয়ের পরে?

করালী তার গায়ে হাত দিয়ে বললে—এই তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি। সে সব ভেবো না তুমি। মাইরি বলছি।

বনওয়ারী চ'লে গেল বসনের বাড়ির দিকে। করালীর কাকা, পাখীর মামা সে, পাড়ার মাতব্বর—তার দায়িত্ব কত!

করালী হলুদ তেল মেখে স্নান ক'রে টেরি কাটতে বসল। নতুন আয়না-চিরুনি কিনেছে। গোলাপী রঙের বুকে-ফুল-কাটা গেঞ্জি গায়ে দেবে। নতুন একখানা মিহি ধুতি হলুদ রঙে রাঙিয়েছে; সেগুলো নসুদিদি সামনে রাখলে পাট ক'রে। আর রাখলে নতুন একখানা বাহারের 'থইলো' অর্থাৎ তোয়ালে; করালী বলে—তইলা, নসু বলে—থইলা। কাহারপাড়ার উপকথায় বরের সাজসজ্জায়—করালী কলিযুগ এনেছে, কলিযুগের ছেলেছোকরা ঝিউড়ী-বউড়ীরা এ সব দেখে মোহিত হ'লেও প্রবীণেরা এটা বরদাস্ত করতে পারছে না। তারা সবাই একটু ভুরু কুঁচকে এড়িয়ে চলছে। আপনাদের মধ্যে বলছে, এতটা ভাল লয়। মদের গন্ধেও তাদের মন খুব সরস হয়ে উঠছে না। অবশ্য দু-এক পাত্র ক'রে সবাই খেয়েছে; কিন্তু ছোকরা এবং মেয়েদের মত মাতনে মন মেতে উঠতে চাচ্ছে না তাদের। তবে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে করালীকে। যেমন জোয়ান, তেমনই সুন্দর, তেমনই পোশাক! কাহারপাড়ায় ও যেন মোহন সাজে এক নতুন নটবর এসেছে।

প্রহ্লাদ হ'ল বনওয়ারীর পরই মান্যের লোক। সে সব চেয়ে বেশি বিরক্ত। সে বললেই মুখ খুলে—কাজটা ভাল করলে না বনওয়ারী ভাই। মাতব্বরের

মতন কাজ হ'ল না। করালীকে শাসন না ক'রে তার দণ্ড না ক'রে এই 'পেকার' 'অসকারা' দিলে, এর ফল ভাল হবে না। তাও একজনার ঘর ভেঙে—

গুপী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—ভাই রে, ওই নয়ানের বাপের 'পেতাপ' কত ভেবে দেখ। 'মানুষের দশ দশা—কখনও হাতী কখনও মশা'। মাতব্বরের এ বিচার ভাল হ'ল না।

রতন—লটবরের বাপ; অবাধ্য ছেলে লটবর—করালীর অনুরক্ত ভক্ত। অবাধ্য ছেলের দায়ে রতনকে করালীর অর্থাৎ লটবরের দলের টান টানতে হয়, সে বললে—তা ছোকরা বাহাদুর বটে। করলে খুব।

নিমতেলে পানু অল্পবয়সী হ'লেও প্রবীণদের দলেই চলে ফেরে, সে কুট কাটতে অদ্বিতীয়, সে বললে—লুট—লুট—পুটের পয়সা, বুঝলে? আমাদের মত চাষে খেটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলায়ে এই ধুম করতে পারত, তবে বুঝতাম। বুল্লে কিনা, অ্যালের পুরনো 'সিলপাট' কাঠ চুরি ক'রে চন্ননপুরে কতজনকে বিক্কি করেছে—সে আমি জানি।

বনওয়ারী চুপ ক'রে ভাবছে। মনে পড়ছে আগুনের আঁচে-ভরা বাঁশতলা, মনে পড়ছে বটতলায় কালো বউয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা।

করালী এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। তার বগলে দুটো পাকি মদের বোতল। নামিয়ে দিলে প্রহ্লাদ-রতনের সামনে।—নাও কাকা, আরম্ভ কর, আরও আছে।

গাল দিচ্ছে নয়ানের মা।

নয়ান চুপ ক'রে ব'সে আছে নিজের দাওয়ায়। বুকটা 'দুঁপছে', পাঁজরাগুলো উঠছে নামছে, কালো কঙ্কালসার তোবড়ানো মুখের মধ্যে সাদা চোখ দুটো হাঁসুলী বাঁকের মাথায় কত্তাবাবার থানের দিকে চেয়ে রয়েছে—স্থির নিষ্পলক হয়ে। সে মনে মনে বাবাকে ডাকছে। আর কল্পনা করছে—ভীষণ কল্পনা।

নয়ানের মা তারস্বরে গালাগাল দিচ্ছে, অভিসম্পাত দিচ্ছে করালীকে এবং পাখীকে। কত্তাবাবাকে, কালরুদ্রকে ডাকছে বিচার করবার জন্য। সমস্ত সমাজের প্রবীণদের উদ্দেশে বনওয়ারীর আচরণের প্রতিবাদ করবার জন্য বলছে—মঙ্গল নাই, মঙ্গল নাই—এমন মাতব্বর যেখানে। মধ্যে মধ্যে তাদের অর্থাৎ ঘরভাঙাদের পূর্বগৌরব স্মরণ ক'রে বিলাপ করছে।—বনওয়ারী মাতব্বর! মাতব্বরের এই কি বিচার? এমন মাতব্বর যেখানে, সেখানের মঙ্গল নাই। একজনের ঘর ভেঙে দিয়ে আর একজনের ঘর গড়ার নাম মাতব্বরি? শত্তুর, চিরকালের শত্তুর ওই কোশকেঁধেরা এই ঘরভাঙাদের বাড়ির। এই বাড়ি ছিল একদিন মাতব্বরের বাড়ি, এই বাড়ির উঠানে উবু হয়ে ব'সে লোকের বাপ-ঠাকুরের হাঁটুতে পাছায় কড়া পড়েছে। তারপর অনাথা ছেলের কালে উড়ে এসে জুড়ে বসল। হালে উঠতি ঘোষবাবুদের দেমাকে বড়কে বড় মানলে না, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' হয়ে পড়ল। বিধেতা এর বিচার করবেন।

নয়ান ব'সে ব'সে ওই ন্যাড়া মাথা, গলায় রুদ্রাক্ষ, ধবধবে পৈতে, পরনে গেরুয়া, পায়ে খড়ম—কত্তাঠাকুরকে যেন মনশ্চক্ষে দেখছে। বেলগাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন—একটি কুটিল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে। চেয়ে আছেন তিনি করালীর ঘরের দিকে। পায়ের তলায় প'ড়ে আছে—সেই বিরাট চন্দ্রবোড়া, করালী যাকে মেরে বাহাদুরি নিয়েছে। সে কি মরে? বাবার সাপ সে! কত্তার বাহন। সে বেঁচে উঠেছে। লক লক ক'রে জিব নাড়ছে। বাসরঘরে ওই সাপ ঢুকবে।

বসনের বাড়িতেও অনেক মদ, অনেক নেশা, অনেক নাচ, অনেক গান। সুচাঁদ বলে—সিঁদুরের মত 'অঙ' লাগবে চোখে, তবে তো বিয়ের মাতন। চারিদিক 'আতদিন' অক্তসন্ধ্যে নেগে থাকবে।

সুচাঁদের সে রঙ চোখে লেগেছে।

প্রথমটায় সে কিছুটা মদ্য পান ক'রে ব'সে ব'সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে;

তারপর একটা বাটিতে মদ আর আঁচলে মুড়ি লঙ্কা নিয়ে বাঁশবনের ধারে ব'সে কেঁদেছে। কেঁদেছে তার মরা বাপের জন্য, মরা মায়ের জন্য, মরা জামাই অর্থাৎ পাখীর বাপের জন্য—আঃ, এমন দিনে তারা বেঁচে নাই। মধ্যে মধ্যে চোখ মুছে কান্না বন্ধ ক'রে মুখে মুড়ি চিবিয়ে, লঙ্কার ঝাল জিভে ঠেকিয়ে, মদ খেয়ে নিচ্ছিল।

তাকে ডেকে নিয়ে গেল বসন। তখন সুচাঁদ কাঁদছিল মরা জামাইয়ের জন্য। বসনও কাঁদলে। সে কাঁদলে শুধু মৃত স্বামীর জন্যই নয়, জাঙলের চৌধুরী-বাড়ির ছেলের জন্যও কাঁদলে। 'তিনি' যদি আজ বেঁচে থাকত। পাখীর মুখ অবিকল তার মত। তেমনই তারই মত গোরা রঙ। রঙ-কালো বসনের কোলে ছেলেবেলায় ফরসা-রঙ পাখীকে যা চমৎকার মানাত! যেন সবুজ গাঁদা গাছে হলুদ রঙের গাঁদা ফুল ফুটেছে। এই কথাটি বলত চৌধুরীবাবুর ছেলে নিজে। তিনি থাকলে কত ধুম করত বসন!

সুচাঁদ উঠে আবার মদ্য পান ক'রে এবার উঠানে ব'সেই হঠাৎ কাঁদতে লাগল। মেয়েরা গান করছিল। রঙের গান। কান্না শুনে সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল; সুচাঁদ এবার ভয়ঙ্কর নাম ধ'রে কাঁদছে। বাবার নাম ধ'রে।

—ওগো কত্তাবাবা গো, ওগো কত্তাঠাকুর গো! মতিচ্ছন্ন ধরেছে। সবার মতিচ্ছন্ন ঘটেছে বাবা; তোমার বাহন মারার পিতিবিধেন হ'ল না বাবা! তোমার মহিমে তুমি পেচার কর বাবা। তোমার বাহনকে বাঁচাও তুমি বাবা।

বাবার বাহন! সেই চন্দ্রবোড়া সাপটি! বসন থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। পাখী চমকে উঠল।

বনওয়ারী বসনদের বাড়ি থেকে ফিরে যাবার পথে একটা গাছতলায় থমকে দাঁড়িয়ে শুনছিল নয়ানের মায়ের গালিগালাজ। ওরই সঙ্গে সুচাঁদের বিলাপ তার কানে যেতেই সে বিস্ফারিত চোখে ঘুরে দাঁড়াল। করালী সাপটিকে মেরেছে। এ বিরাট অজগর তার প্রথম অস্তিত্ব জানিয়েছিল ওই বাবার 'থান' থেকে। সে যে বাবার বাহন, তাতে তো তারও সন্দেহ নাই। সেও থরথর ক'রে কেঁপে উঠল।

—হে বাবা! হে কত্তাঠাকুর! হে কাহারদের মা-বাপ! মাজ্জনা কর বাবা, মাজ্জনা কর। অবোধ মুখ্যু করালীকে মাজ্জনা কর। বনওয়ারীকে মাজ্জনা কর। পুজো দোব বাবা, পুজো দোব।

সন্ধ্যার আঁধার তখন ঘনিয়ে আসছে। বাঁশবনের তলায় জমেছে অপদেবতার ছোঁয়াচ-লাগা থমথমে ভর-সনজের মুখ-আঁধারি। সেই অন্ধকারের মধ্যে চুপি চুপি বনওয়ারী এসে উঠল বাবার থানে। বেলগাছতলায় হাঁটু গেড়ে ব'সে হাত জোড় ক'রে চোখ বুজে মনে মনে বাবাকে প্রার্থনা জানাতে লাগল। অতি সাহসী বনওয়ারী। কতবার কত অপদেবতার অস্তিত্ব সে অনুভব করেছে, ভয় পায় নাই। একবার মনে আছে—সন্ধ্যার পর মাছ নিয়ে আসছিল ওপারের মহিষডহরির বিল থেকে! দু পাশে দুজন এল শেয়ালের রূপ ধ'রে। এপাশে ওপাশে ঘুরে ঘুরে কত ফাঁদই তারা পেতেছিল! বনওয়ারী কৌতুক অনুভব করেছিল। কত সন্ধ্যায় বাবার থানে এসে সে প্রণাম করেছে। রাত দুপুরেও এসেছে। গা কাঁপে নাই। আজ চোখ বুজতেই মনে হচ্ছে, বাবা যদি ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন! করালী মেরেছে বাবার বাহনকে, সেই করালীকে সে ফিরিয়ে এনেছে স্নেহ সমাদর ক'রে। বাবার ক্রুদ্ধ মূর্তি তার মুদিত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই চিত্রবিচিত্র শিস-দেওয়া চন্দ্রবোড়া দেখতে দেখতে ফুলে ফুঁসে মাথা তুলে উঠতে থাকে—মাথা ওঠে তালগাছের ডগায়, চোখের দৃষ্টিতে ধ্বক-ধ্বক করে আগুন, গায়ের চিত্রবিচিত্র দাগগুলি বাড়তে থাকে, জিভ ওঠে লকলকে—কামারের আগুনে তাতানো আগ্ন 'বন্ন' ইস্পাতের পাতের মত; সেই অজগরের মাথায় খড়ম পায়ে দিয়ে, গেরুয়া প'রে, ন্যাড়া-মাথা বাবাঠাকুর ভেসে ওঠেন। বাবার গলার রুদ্রাক্ষগুলি হয়ে ওঠে মড়ার মাথা, বুকের ধবধবে পৈতে হয়ে উঠে দুধে-গোখরোর পৈতে।

বনওয়ারী থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে।

বহুক্ষণ পর সে কোনক্রমে শান্ত হয়ে মনে মনে বলে—বাবা, পুজো দোব, মাজ্জনা কর তুমি। তারপর বলে—যদি মাজ্জনা না কর বাবা, তবে জানিয়ে

দাও। পড়ুক, তোমার গাছ থেকে একটি বেল খ'সে পড়ুক। আমি মনে মনে পাঁচ কুড়ি গুনছি।

সে গুনতে থাকে। এক দুই তিন চার···এক কুড়ি। আবার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট···

পাঁচ কুড়ি শেষ হ'ল।

বেল পড়ল না। বনওয়ারী এবার উঠল সেখান থেকে।

পাড়ায় তখন পরিপূর্ণ মাতন। মুরুব্বিরা ভরপেট পাকি খেয়েছে, টলছে। মেয়েরা নাচছে। আঁধার রাত্রিতেও চারিদিকে যেন রক্ত সন্ধ্যার রঙ লেগে রয়েছে। সুচাঁদের ঊর্ধ্ব অঙ্গে কাপড় নাই। সে নাচছে। কাপড় ধূলোয় লুট্‌চ্ছে।

বসন করালীও ঠিক করেছে, পূজো দেবে। বনওয়ারী খুশি হ'ল। পূরো বোতল পাকি মদ নিয়ে সে বসল। খেতে খেতে হঠাৎ উঠল। বায়েনদের বাজনা ঠিক হচ্ছে না। হাতে তাল দিয়ে সে বললে—বাজাও বাবা—বর আসলো বর আসলো, ও বউ, তুমি অঙ্গ তোল। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা, বর নামলো বউ নামলো, ও বর, বউয়ের সান খোল।

কাঁসি-বাজিয়ে ছোকরা নিজেই বলছিল—কাঁই-কাঁই-কাঁই—কিটি—কিটি—কাঁহ—কাঁই।

বনওয়ারী তাকে বাহবা দিলে—আচ্ছা, আচ্ছা। সঙ্গে সঙ্গে কে চাপা হাসি হেসে উঠল। কে রে? কে? কোন্ মেয়ে? কার এত বাড়? বনওয়ারী ঘোর-লাগা চোখ তুলে চাইলে। চোখ তুলেই কিন্তু তার রাগ প'ড়ে গেল।—ওরে বাপ রে! তুমি কখন হে? কি ভাগ্যি আমাদের, কি ভাগ্যি! আটপৌরেপাড়ার মাতব্বরের গিন্নি—কালো বউ! কালোশশী! কালো বউয়ের চোখ যেন কোপাই নদীর দহ। তলাতে কিছু যেন খেলা করছে, উপরে তার ঝিলিক দেখা যায়, কিন্তু ঠিক কিছু বুঝতে পারা যায় না।

কালো বউ তাকাচ্ছে—বটতলার দিকে। বনওয়ারী চারিদিক চেয়ে দেখলে, চারিদিকে মাতন।

শেষ রাত্রে মাতন স্তব্ধ হ'ল। ভোরবেলা কাহারপাড়ায় সেদিন অগাধ ঘুম। বনওয়ারীকে কে ঠেলে জাগিয়ে দিলে। বনওয়ারী উঠে বসল। বটগাছতলায় ঘুম ভাঙল তার। সামনে রোদের চিকচিকে ছটা যেন হাসছে। বনওয়ারীও হাসলে। কালো বউ নাই।

চার

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় দিন গেলে যে রাত্রি নেমে আসে, তার সঙ্গে জাঙলচন্দনপুরের রাত্রির অনেক তফাত। বাঁশবন জোগান দেয় তার তলায় লুকিয়ে-থাকা আদ্যিকালের অন্ধকার রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে। তার মধ্যে ঝিঁঝিঁ ডাকে, হরেক রকম পোকা ডাকে, তক্ষক ডাকে টক্-টক্ শব্দ ক'রে, প্যাঁচা ডাকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে আবার গভীর রাত্রে ডাকে হুম-হুম পাখী। বাঁশবনে পাতা উড়িয়ে নেচে বেড়ায় 'বা-বাউলী' অর্থাৎ অপদেবতা। নদীর ধারে ধারে 'দপদপিয়ে' অর্থাৎ দপ-দপ ক'রে জ্বলে বেড়ায় 'পেত্যা' অর্থাৎ আলেয়া। মধ্যে মধ্যে শাঁকচুন্নির মত ডাক শোনা যায় শ্যাওড়া-শিমুলের মাথা থেকে। বাঁশবনে ক্যাঁ-ক্যাক ক্যাঁ-ক্যাক ডাক ওঠে, কাহারেরা মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পায়—গেছো পেত্নী কি কোন ছোকরা ভূত বাঁশের ডগাটা একবার মাটিতে ঠেকাচ্ছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে—সেটা উঠে যাচ্ছে সোজা উপরে।

হাঁসুলী বাঁকের কাহারেরা তারই মধ্যে কেরোসিনের ডিবে জেলে কত্তাঠাকুরের নাম নিয়ে কোন মতে জটলা পাকিয়ে ব'সে থাকে। ছেলেছোকরারা ঢোল বাজিয়ে কখনও গায় ধর্মরাজের বোলান, কখনও গায় মনসার ভাসান, ভাদ্র মাসে ভাদু-ভাঁজোর গান, আশ্বিনে মা-দশভুজার পূজোয় গায় পাঁচালী, কাত্তিক থেকে মাঘ ফাল্গুন পর্যন্ত শীত—তখন গানবাজনার আসর আসে ঢিমিয়ে, চৈত্রে আবার নতুন ক'রে আসর বসে—ঘেঁটুর গান, সংক্রান্তির কাছাকাছি বসে গাজনের বোলানের গানের পালা।

মাঝে মাঝে এরই মধ্যে আসে দু-দশটা রাত্রি, যার সঙ্গে অন্য সকল রাত্রির

কোন মিল নাই। বিয়ে-সাদীর রাত্রি আর বারো মাসে বারোটা পূর্ণিমা কি 'চতুকদশী'র রাত্রি, তার মধ্যে আষাঢ়-শাওন-ভাদরের 'ভাউরী' অর্থাৎ বাদল-লাগা পূর্ণিমা 'চতুকদশী' বাদ। বাকি পূর্ণিমায় জোৎস্নার আলো ঝলমল করে। সেই কয়েকটা রাত্রে আমোদ লাগে, এক দিকে আলো অন্য দিক অন্ধকার—বাঁশবনের আদ্যিকালের অন্ধকার সেই কয়েকদিন ঘুমিয়ে থাকে বাঁশতলার জট-পাকানো শিকড়গুলোর মধ্যে, কত কালের ঝরা বাঁশপাতার বিছানায়।

করালী ও পাখীর বিয়েতে বাঁশবনের অন্ধকার ঘুঁটে-কেরোসিনের লালচে আলোর ছটায় ঘুমিয়ে থাকল কদিন। ঢোল কাঁসি সানাইয়ের বাজনা আর মেয়েলী মিহি গলার গানের কাছে হার মানলে ঝিঁঝিঁ, প্যাঁচা, তক্ষক, পোকা-মাকড়, এমন কি অপদেবতারা পর্যন্ত।

বিয়ে চুকে গেল। কেরোসিন-ভেজানো ঘুঁটের ছাইগুলি পর্যন্ত সাফ ক'রে সারকুড়ে ফেলে দেওয়া হ'ল, মদের হাঁড়িগুলির কতক ফেরত গেল আবগারির দোকানে, কতক খালি হয়ে প'ড়ে রইল উঠানের পাশে। কাহারপাড়ার লোকদের শরীর থেকে তেল হলুদ মিলিয়ে গেল—আবার অঙ্গে লাগল মাঠের ধুলো, মাথায় লাগল খড়ের কুটো। শুধু কাপড়ে এখনও ধুলো-ময়লার মালিন্যের মধ্যেও হলুদ ও লাল রঙের ছোপ লেগে আছে। বায়েনরা সঙ্গে সঙ্গেই বিদেয় হয়েছে; কাহারপাড়া প্রায় নিঝুম। শুধু নয়ানের মা আজও থামে নাই, সে গালিগালাজ দিয়েই চলেছে। তার আক্রোশ যেন বনওয়ারীর উপরেই বেশি। সে অভিসম্পাত দেয়—যে 'ঘরভাঙাদের' মাতব্বরি ঘুচিয়ে তাদের বউ কেড়ে অন্য জনাকে দিলে, পাতা ঘর ভেঙে দিলে, তার ঘরও ভাঙবে—ভাঙবে—ভাঙবে। হে কত্তাঠাকুর! হে বাবা গোঁসাই! বিচার কর, তুমি এর বিচার কর।

মধ্যে মধ্যে বলে—মনে পড়ে না। সে সব দিন মনে পড়ে না! বলতে বলতে নয়ানের মা কেঁদেও ফেলে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। জল মুছে সে আগুনের মত তপ্ত গলায় বলে—আমার সব্বনাশ ক'রে আজ সাধু সেজেছে!

তা দিক! কাহারেরা পুরনো গালাগালিতে কোন কালে কান দেয় না।

তার উপর এসে পড়েছে কাজ। উদয়াস্ত কাজ। গম কাটা, সরষে কাটা আরম্ভ হ'ল। ওদিকে জাঙলে শাল শাল আখ কেটে মাড়াই ক'রে গুড় তৈরি করার আয়োজন। জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়দের চাকর কাহারেরা, তারাই লাগিয়েছে আখ। দিন রাত্রি আখ কাটা চলেছে, খোসা ছাড়াচ্ছে, বোঝা বাঁধছে, মাথায় ব'য়ে এনে ফেলছে মাড়াই-কলের সামনে। পেল্লাদ বসেছে কলের সামনে—সে-ই কলে জুগিয়ে দিচ্ছে আখ। হুঁশিয়ারির কাজ, একটু বেহুঁশ হ'লেই কল আঙুল টেনে নেবে; গরু থামাতে থামাতে গোড়া পর্যন্ত আঙুল চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে কেটে প'ড়ে যাবে। ওই রতনের বাবার নাম ছিল 'কলকাটা'; কলে তার চারটে আঙ্গুল কেটে গিয়েছিল। শুধু বেঁচেছিল বুড়ো আঙুলটি। রসিক লোক ছিল রতনের বাপ। সে বলত—আঃ, বুড়ো আঙ্গুলটা আমাকে লবডঙ্কা দেখাতে বেঁচে গেল! চার-চারটে আঙ্গুল গেল, ডান হাতটি খোঁড়া হ'ল—বেঁচে রইল বুড়ো আঙুলটি! হে কত্তাঠাকুর! 'শ্যাষ-ম্যাষ' এই কল্ল্যা বাবা!

তবে কিনা মনিব মহাশয়েরা দয়ালু, ওই কত্তাঠাকুরের পরই যদি কেউ জগতে 'রাখলে রাখতে মারলে মারতে' পারেন, সে ওই মনিব মহাশয়েরা। দয়ালও বটেন আবার দণ্ডও দেন। রতনের বাপের মনিব দয়া করেছিলেন, ছেরজনম রতনের বাপকে মাসে পাঁচ শলি অর্থাৎ আড়াই মণ ধান আর এক টাকা 'ব্যতনে' গরু-বাছুরের সেবার তদ্বির আর চাষবাসের দেখাশুনা করতে চাকর রেখেছিলেন। রতনের বাপ অবিশ্যি ক্রমে ডান হাতের ওই বুড়ো আঙুলের জোরেই কায়দা ক'রে কাস্তে ধ'রে খড়ও কাটত, অল্পস্বল্প সময়ের জন্য কোদালও চালাত; লাঙলের মুঠো বাঁ হাতেই ধরে, তবে ডান হাত দরকার গরু চালাবার জন্য, তাও সে সুকৌশলে ওই লবডঙ্কা দেখিয়েই চালিয়ে নিত। মনিব রতনকেও রেখেছিলেন রাখাল, ক্রমে রতন বড় হয়ে সেই বাড়িতেই কৃষাণি করেছে। রতনের বাপ রতনকে কলের মুখে যেতে 'নেষেধ' ক'রে গিয়েছে, কত্তাঠাকুর নাকি স্বপ্নে তার বংশকে কলের কাছে যেতে বারণ করেছেন; বিশ্বকর্মাঠাকুর লোহা-লক্কড়ের দেবতা—তার স্থানে অপরাধ করেছিল রতনের বাপ, সে পাপে তার এই শাস্তি; কবে কামারশালায় ফাল মেরামত করাতে

গিয়ে মদের ঘোরে অশুদ্ধ করেছিল বিশ্বকর্মার আটন। তার শাস্তিতেই রেহাই নাই—বংশের উপরেও শাপমন্যি প'ড়ে আছে।

রতন আছে গুড় তৈরির কাজে। গুড় তৈরির ভিয়েনে সকলের উপরে বনওয়ারী; এক হেদো মণ্ডল মহাশয় ছাড়া—জাঙল, বাঁশবাদি, কোপাইয়ের ওপারে গোয়ালপাড়া, রাণীপাড়া, ঘোষগ্রাম, নন্দীপুর, কর্মমাঠ এই সাতখানা গ্রামে গুড় তৈরির কাজে বনওয়ারীর জুড়ি কেউ নাই। বনওয়ারীর 'হাতে-তোলা' গুড় ঠাণ্ডা হতে হতে জমতে থাকে—ঢেলা বেঁধে হয় মিছরির চাঁইয়ের মত, দানা হয় মোটা, স্বাদে এমন মিঠা যে চিনি ফেলে সে গুড় খেতে হয়; সব চেয়ে বড় গুণ—বছর ধ'রে রেখে দিলেও গন্ধ হয় না।

মস্ত বড় চুলোয় দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে, মাথার উপর বাঁশের কাঠামো ক'রে তালপাতা দিয়ে আচ্ছাদন করা হয়েছে একটা। চুলোর সামনে ঢিপির উপর বসেছে বনওয়ারী। চুলোর মুখে আখের খোসা দিয়ে জ্বাল দিচ্ছে রতনের ছেলে লটবর। প্রকাণ্ড কড়াইটার মধ্যে আখের রস জ্বাল খেয়ে উথলে উথলে উঠছে। বনওয়ারী ছাঁকনায় ভ'রে 'গাদ' অর্থাৎ ময়লা তুলে একটা টিনে জমা ক'রে রাখছে। ওগুলো খাবে গরুতে। রতন আছে বনওয়ারীর পাশে। মধ্যে মধ্যে বনওয়ারী উঠে স'রে দাঁড়ালে সে বসছে তার জায়গায়। মণ্ডল মহাশয়রা এক পাশে ব'সে আছেন। হেদো মণ্ডল আছেন, আরও আছেন জন কয়েক। এবার মণ্ডল মহাশয়দের কড়া নজর গুড়ের উপর। পিথিমীতে যুদ্ধ বেধেছে। যুদ্ধ চলছে—সাহেব মহাশয়দের মধ্যে। জিনিসপত্রের নাকি দর চড়বে! ধান চাল গুড় কলাই সমস্ত কিছুরই দর উঠবে। তাই মণ্ডলেরা 'সতর' হয়েছেন, একটি ভাঁড় গুড় যেন না সরে। সরাবে আর কে? সরাতো তো কাহাররাই। বনওয়ারী মনে মনে একটু 'বেথা' পেয়েছে এতে। অবিশ্যি কাহারেরা সাধু নয়, সবাই অবিশ্যি বনওয়ারী অতন পেল্লাদ নয়; চুরি 'খানিক আদেক' করে আর সকলে। কিন্তু যতক্ষণ বনওয়ারী হাজির আছে শালের চালায়, ততক্ষণ কারুর ক্ষমতা নাই এক হাতা গুড় চুরি করে। এ কথা সবাই জানে। তবু বনওয়ারী থাকতে এমন নজর রাখার মানে তো বনওয়ারীকেও

অবিশ্বাস করা। তা করুন। বনওয়ারী আপন মনেই গুড় তৈরির কাজ ক'রে যায়। সে ভাবে যুদ্ধের কথা।

এ দুনিয়া আজব কারখানা! বৈষ্ণব ফকির গান করতে আসে, তাদের গানে শুনেছে বনওয়ারী—এ দুনিয়া আজব কারখানা। ফকিরেরাও কাহার-পাড়াতে আসে। তারা বলে—আল্লা-তালার আজব কারখানা। তাই বটে। বনওয়ারী মনে মনে স্বীকার করে সে কথা। বাউল আসে, বৈষ্ণব আসে, সন্ন্যাসী আসে, সবাই ওই এক কথাই শুনিয়ে যায়। কাহারেরা শোনে, ভাবে। আগে দেহের খাঁচায় অদেখা অচেনা পরান-পাখীর কথা ভেবে কথাটা স্বীকার করত। মায়ের 'গভ্যের' মধ্যে ব'সে কারিগর খাঁচা তৈরি করে—হাড়ের শলা দিয়ে খাঁচা তৈরি ক'রে পরিপাটি চামড়ার ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে দেয়, তার মধ্যে সুড়ুৎ ক'রে এসে ঢোকে একটি পরান-পাখী। সে পাখী নাচে, বুলি বলে, কত রঙ্গ করে! তার পরে আবার একদিন ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে পালায়। ভেবে ভেবে কূলকিনারা মিলত না, কাহাররা 'পিতিপুরুষ'—ক্রমে নীলবর্ণ আকাশের দিকে চেয়ে 'পরান-পাখী'র আনাগোনার পথের দাগ আর সব কারিগরের শেষ কারিগরের আস্তানা খুঁজত; খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে বাবাঠাকুরের বেলতলায় এবং 'কালারুদ্দে'র দরবারে লুটিয়ে প'ড়ে বার বার বলত—অপরাধ মাজ্জনা কর বাবা! কোলের কাছে অন্ধকারে, তুমি 'অইচ' পক্ষ দিয়ে ঢেকে, বক্ষ দিয়ে আগুলে,—আর তোমাকে আমরা খুঁজে মরছি কোথা কোন্ বেহ্মাণ্ডে বেহ্মাণ্ডে! এখন কিন্তু কোম্পানির কলের গাড়িতে, 'অ্যালের' পুলে, তারে তারে টেলিগেরাপে, হাওয়া-গাড়িতে—দুনিয়ার আজব কারখানা তারা যেন চোখে দেখছে! তার উপরেও আজবকাণ্ড এই যুদ্ধ! অবাক রে বাবা! কোথা কোন্ 'দ্যাশে' সাত সমুদ্দুর তেরো 'লদী' পারে কে করছে কার সঙ্গে যুদ্ধ, এখানে চড়বে ধানের দর, চালের দর, আলু গুড় কলাই তরিতরকারির দর! জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়রা কোমর বাঁধছে—টাকা জমাবে; বলাবলি করছে —কাপড়ের দর চড়বে। আবার নাকি কোম্পানিতে যুদ্ধের জন্য চাঁদা আদায় করবে! তবে কাহারপাড়ায় হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের মধ্যে যারা ছায়ার

ঘেরায় বাস করে, তাদের ভাবনা নাই। ধান চাল গুড়ের দর বাড়লে তাদের কিছু লাভ নাই। তারা মনিবের ক্ষেতে খেটে খায়, ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ পায়, তাও ছ-মাস খেতে খেতেই ফুরিয়ে যায়—বাকি ছ-মাস মনিবের কাছে 'দেড়ী'তে ধান নেয়, বেচবার মত ধান চাল তাদের নাই। বেচেও না, কেনেও না। বাড়ির কানাচে শাকপাত হয়, পুকুরে বিলে নালায় নদীতে শামুক গুগ্‌লি আছে—ধ'রে নিয়ে আসে। কয়লার দাম চড়ে; কাহারেরা জীবনে কখনও কয়লা পোড়ায় না, নদীর ধারে ঝোপজঙ্গল থেকে কাঠকুটো কুড়িয়ে আনে; গরুর গোবর ঘেঁটে ঘুঁটে দেয়, তার দুচারখানা নিজেরা পোড়ায় —বাকি বিক্রি করে চন্ননপুরে জাঙলে। কাপড়ের দর চড়লে কষ্ট বটে। তাই বা কখানা কাপড় তাদের লাগে? পুরুষদের তো চাষের সময় ছ মাস অর্ধেক দিন গামছা প'রেই কাটে। বাকি অর্ধেক দিন—ছ-হাত মোটা কাপড় পরে। বছরে চারখানাতে 'ছচলবছল' অর্থাৎ স্বচ্ছল, তিনখানা হ'লেও চ'লে যায়। মেয়েরা 'একটুকুন' সাজতে গুজতে ভালবাসে, কোপাই নদীর 'আলবোডেমি' তাদের চিরকাল আছে, তাদের দু-একখানা মিহি ফুলপাড় শাড়ি চাইই। দুখানা হ'লেই খুব। বাইরে যাবার সময় পরে। ঘরে মোটা খাটো কাপড়েই চলে। তার জন্যেও খুব বেশী ভাবতে হয় না। ফুলপাড় মিহি শাড়ির দাম জোগাতে হয় না ঘরের কর্তাকে, মেয়েরা ও নিজেরাই রোজকার ক'রে নেয় —চন্ননপুর জাঙলের ভদ্রজনের বাবুভাইয়ের কাছ থেকে। আর একটা যুদ্ধ দেখেছে বনওয়ারী। তেরশো বিশ একুশ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছিল— কয়েক বছরই ছিল; বেশ মনে আছে বনওয়ারীর। ছ টাকা জোড়া কাপড় হয়েছিল। ধানের দর হয়েছিল চার টাকা। চন্ননপুরের এই মুখুজ্জেবাবুরা কয়লার কারবারে ফেঁপে উঠল। বনওয়ারীর মনিব মাইতো ঘোষ পাট কয়লা বেচে কম টাকা করে নাই। অনেক টাকা। আবার চন্ননপুরের চার পাঁচ ঘর জমিদার-বাড়ি ভেঙে গেল, মহাল বিক্রি করলে; জাঙলের চৌধুরী-বাড়ি একেবারে 'নাজেহাল' হয়ে ফেল প'ড়ে গেল। জাঙলের সদ্‌গোপদের বৃদ্ধি ওই যুদ্ধের সময়। আগে সবাই ছিল খাঁটি চাষী, কাহার-কৃষাণদের সঙ্গে তারাও

লাঙলের মুঠো ধরত, কোদাল ধরত, খাটো কাপড় পরত ; যুদ্ধের বাজারে ধান চাল কলাই গুড় বেচে সবাই ভদ্রলোক হয়ে গেল। এবার আবার সবাই কোমর বেঁধেছে, এযুদ্ধে যে তারা কি হবে, কে জানে! তবে তাদের মঙ্গলই কামনা করে কাহাররা। তাদের লক্ষ্মীর বাড়-বাড়ন্ত হ'লেই কাহারদের মঙ্গল, তাদের মা-লক্ষ্মীর 'পাঁজের' অর্থাৎ পদচিহ্নের ধূলো কুড়িয়েই কাহারদের লক্ষ্মী। কাহারদের যুদ্ধে কিছু আসে যায় না।

সদ্‌গোপ মহাশয়রা চট বিছিয়ে ব'সে যুদ্ধের কথাই বলছেন। কথা হচ্ছে —মস্‌নের চাষে এবার জোর দিতে হবে। চন্ননপুরের বাবুদের 'গ্যাজেটে' অর্থাৎ খবরের কাগজে নাকি বেরিয়েছে—মস্‌নের তেলের দরকার হবে যুদ্ধে, ওর দরটা খুব বেশি চড়বে।

বনওয়ারী আপন মনেই সবিস্ময়ে ঘাড় নাড়তে থাকে।

আজব কারখানাই বটে রে বাবা! ধান-চাল, কলাই-পাকড়, গুড়-আলু, এ সবের চেয়েও দর বাড়বে মস্‌নের! 'প্যাটের' খাদ্য নয়, গায়ের মাখবার 'ত্যাল' নয়, পরবার কাপড়ের তুলো নয় ; মস্‌নের পুলটিস দিতে হয় এই জানে বনওয়ারী,—তার ত্যাল, এ লাগবে কিসে ?

ঝম্‌-ঝম্‌—গম্‌-গম্‌—ঝম্‌-ঝম্‌—গম্‌-গম্‌।

দশটার ট্রেন চলেছে কোপাইয়ের পুল পার হয়ে। মণ্ডল মহাশয়রা এইবার গা তুলবেন, বাড়ি যাবেন খেতে। খেয়ে-দেয়ে আসবেন হেদো মণ্ডল আর যাঁর গুড় হচ্ছে তিনি, আরও একজন। হেদো মণ্ডল পড়বেন চিত হয়ে—নাক ডাকবে কামারের হাপরের মত, মুখ হাঁ হয়ে যাবে, মুখ দিয়ে ফর্‌র্‌ ফর্‌র্‌ শব্দ হবে।

এই মণ্ডলেরা যখন থাকবেন না, তখন একবার তাদের আরামের সময়। প্রাণ খুলে তারা দু-দশটা রসবিলাসের গালগল্প করবে।

মণ্ডলেরা চ'লে যেতেই বনওয়ারী উঠল। উঠে এসে আরাম ক'রে পা ছড়িয়ে ওই চটের উপর ব'সেই বললে, লটবর, একবার ভাল ক'রে তামাক সাজ্‌ তো। আর অতনা, 'রসির' ভাঁড়টা একবার দিস। জল আনিস খানিক হাত মুখ ধুতে হবে।

কাহারপাড়ায় এইবার ঢোলের বাজনা থামবে। এ ঢোল বায়েনদের বাজনা নয়। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে আদ্যিকালের অন্ধকার মিশে যে অন্ধকার নামে কাহারপাড়ায়—তার প্রভাব থেকে বাঁচবার জন্য যে একঘেয়ে গানবাজনার আসর বসে ওদের, সেই গানবাজনার আসরের ঢোল। চৈত্র মাসে আসছে ঘেঁটুগানের পালা। তারই উদ্যোগপর্ব চলছে। একটা ঢোল থামল। এখনও দুটো ঢোল বাজছে। বাঁশবাঁদিতে তিনটে ঘেঁটুর দল। একটা কাহারপাড়ার পুরানো দল, একটা আটপৌরেপাড়ার, এর উপর বছর দুই হ'ল করালী একটা নতুন দল করেছে। করালীর দলে নসুদিদি আছে—সে নাচে কোমর ঘুরিয়ে ঝুমুর দলের মেয়ের মত। করালী একটা বাঁশের বাঁশি কিনেছে, সে সেটা বাজায়। ও দলের এখন চলতি খুব। গান বেঁধে নিয়ে আসে চন্নপুরের মুকুন্দ ময়রার কাছ থেকে। নতুন রকমের গান। এবার নাকি যুদ্ধ নিয়ে গান বেঁধেছে ময়রা মহাশয়।

"সায়েব লোকের লেগেছে লড়াই।
ষাড়ের লড়াইয়ে মরে উল্‌খাগোড়াই—
ও হায়, মরিব মোরাই উল্‌খাগোড়াই।"

বনওয়ারীর আর মনে নাই। তবে শুনেছে একদিন সমস্তটা। ময়রা জানে অনেক। হাজার হ'লেও চন্নপুরের ময়রা। চন্নপুরে ডাকে 'গ্যাজেট' আসে, আবার ট্রেনে গ্যাজেট আসে। রোজ বেলা দুটোর সময় ছেলেছোকরারা ভিড় ক'রে ইস্টিশানে আসে, গার্ড সাহেব কাগজের বাণ্ডিল নামিয়ে দিয়ে যায়, বনওয়ারী স্বচক্ষে দেখেছে। মুকুন্দকেও 'গ্যাজেট' পড়তে দেখেছে সে। গানের মধ্যে অনেক কথা দিয়েছে সে। গান্ধীরাজার কথা পর্যন্ত আছে। মন্দ লাগে নাই বনওয়ারীর ; ভালই লেগেছে। করালী ছোকরার নতুন দলের বিরুদ্ধে বনওয়ারীর আপত্তি অনেক দিনের। ছোকরা রেলে চাকরি ক'রে সেখান থেকে অনেক খারাপ ব্যাপার নিয়ে আসে। এবার কিন্তু গানটি ভাল এনেছে। অনেক কথা শুনবে লোকে। ছোকরাও এবার বাগ মেনে এসেছে। ভাল ক'রে বাগ মানাতে হবে ওকে। করালী যদি 'ধরম' তাকিয়ে ইজ্জত রেখে সোজা রাস্তায়

চলে, তবে করালী হতে কাহারপাড়ার অনেক ‘হিতমঙ্গল’ হবে ব’লেই বনওয়ারীর বিশ্বাস। নইলে ও-ই উচ্ছন্ন দেবে কাহারপাড়াকে। টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে ওই কলকারখানার তেলকালি-ভরা আলক্ষ্মীর পুরী ধরমনাশা এলাকায়। ছেলেগুলো চাষ ছাড়বে, পাল্কিবহন ছাড়বে, পিতিপুরুষের কুলকর্ম জলাঞ্জলি দেবে। মেয়েগুলোও যাবে পিছনে পিছনে। বনওয়ারী তা হ’তে দিতে পারবে না। কখনও না। তাই সে করালীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে আদর ক’রে তার আবদার রেখে কোলগত ক’রে নিতে চায়। তাই তার মন খুঁতখুঁত করলেও সে নয়ানের ঘর ভেঙেও পাখীর সঙ্গে করালীর বিয়ে দিয়েছে। অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। সে কারণটা তার মনই জানে, আর কেউ জানে না। কালোশশীকে সে যে ভালবাসে, সে ভালবাসা তার মনের মধ্যে কুলকাঠের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছেই—জ্বলছেই। ওদেরও তো সেই ভালবাসাই।

রতন ‘রসি’ মদের ভাড়টা নিয়ে এসে কাছে বসল।

বনওয়ারী বললে, পেহ্লাদকে ডাক্।

প্রহ্লাদও এসে বসল। বনওয়ারী প্রশ্ন করলে, রস ক পাতনা হ’ল রে?

প্রহ্লাদের হাতে ছটা আঙুল—সে বললে, এক হাত। তারপর হেসে আবার বললে, ছ পাতনায় পড়ল।

ওরে বাপ রে! আটপৌরেপাড়ায় এবার ঘেঁটুর ধুম দেখা যায় খুব! ঢোলের শব্দ এই রাত্রিতে জোরালো হয়ে উঠল। করালীর দলের ধুমের কথা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু আটপৌরেপাড়ায় হঠাৎ এত ধুমের কারণ কি?

হবে। পরম এবার জমি নিয়েছে চন্নপুরের বাবুদের কাছে, এবার ওর শরীরে বল বেঁধেছে, মনে-মনে তেজ হয়েছে। হাসলে বনওয়ারী। জমি সেও নিয়েছে। পরমের চেয়ে বেশি জমি নিয়েছে সে।

প্রহ্লাদ হেসে বললে—আটপৌরেপাড়ায় এবার ঘেঁটুর ধুম বটে। ওদের গান শুনেছ?

না।—হাসলে বনওয়ারী!

শুনো একদিন। প্রহ্লাদ উঠে গেল। কলের দাঁতওয়ালা চাকায় ক্যাঁ-কটো-কটো শব্দ উঠেছে, তেল দিতে হবে।

আটপৌরেপাড়ার গান! বনওয়ারী আবার হেসে বললে, ওদের তো সেই পুরানো গান! ওর চেয়ে আমাদের পুরানো গান অনেক ভাল। সে গান বনওয়ারীরই বাঁধা।

"তাই ঘুনাঘুন—বাজেলো নাগরী—
ননদিনীর শাসনে,—চরণের নূপুর থামিতে চায় না।
ঘরে থাকেতে মনো চায় না। ও—তাই—তাই ঘুনাঘুন।"

রতন চুপ ক'রেই ছিল, সে এতক্ষণে বললে—এবার ওরা লতুন গান গাইছে।

—লতুন গান? বাঁধলে কে?

—তা জানি না। তবে—

—কি তবে?

—তবে, গানে করালীকে তোমাকে শাপ-শাপান্ত করেছে। মধ্যে মাঝে—

—কি মধ্যে মাঝে?

মৃদুস্বরে রতন বললে—বাপু, গজু-গজু ফুসু-ফুসু চলছে, ওই পানা হারামজাদা নাকি উ-পাড়ায় শুনেছে, কালোশশীকে নিয়ে—

চমকে উঠল বনওয়ারী।

একটু পর সে বললে—একটুকুন দেখিস তু। আমি একবার শুনে আসি কি গাইছে শালোরা।

পাঁচ

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় বাঁশবনের অন্ধকার রাজ্যিময় ভিতরে বাইরে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে– বাঁশবনের গোড়ায়, অদিমকাল থেকে ঝ'রে-পড়া পচা বাঁশপাতার নীচে, ঝোপ-ঝাড়ের ঘন আবরণের মধ্যে, বটগাছের কাণ্ডের গহ্বরে, কাহারপাড়া-আটপৌরেপাড়ার ঘরের কোণে কানাচে থেকে মানুষগুলির মনের কোণে কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

অন্ধকারের মধ্যে বাঁশবাঁদির লোকেরা বেশ দেখতে পায়। দু-চারজনের 'হাসা' অর্থাৎ বিড়ালের মত কটা চোখ অন্ধকারের মধ্যে জুগু জুগু ক'রে জ্বলে। বনওয়ারী অন্ধকারের মধ্যেই এসে দাঁড়াল কালোশশীর সঙ্গে যে বটতলায় দেখা হয়েছিল, সেই বটতলার নীচে। একটু সতর্ক হয়েই দাঁড়াল। পরমের চোখ কটা। আটপৌরেপাড়ার আরও কজনের চোখ কটা। সাহেবডাঙার কুঠীর আমলে আটপৌরেপাড়ার মেয়েরাই সাহেবদের কুঠীতে বেশি মেয়ে-খানসামার কাজ করত ওদের পাড়াতেই সে আমলে বাউরীদের গায়ের ও চুলের রঙ ফিরতে আরম্ভ করে। তাদের পাড়াতেও এসেছিল, কিন্তু আটপৌরেপাড়ার মত নয়। এখন গায়ের রঙ চুলের রঙ কালো হয়েছে, চোখে কিন্তু এখনও তার জের আছে; চোখ নীলচে ঘুচে হয়েছে কটা। তাদের পাড়ার মধ্যে নিমতেলে পানুর চোখ কটা। কটা-চোখো লোক বিড়ালের মত 'ধুত্তু'।

আটপৌরেদের ঘেঁটুগানের জোর সত্যিই এবার খুব বেশি। লহর ছুটিয়েছে। বনওয়ারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলে।

"হায় কলিকালে, কতই দেখালে—
দেবতার বাহন পুড়ে ম'ল অকালে তাও মারলে রাখালে।
ও তার বিচার হ'ল না বাবা, তুমি বিচার কর।
অতি বাড় বাড়িল যারা তাদের ভে-ঙে পাড়ো।"

ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল বনওয়ারীর বুকটা। সেই সাপ নিয়ে ঘেঁটুগান বেঁধেছে আটপৌরেরা! অভিসম্পাতটা অবশ্যই করালীকে, কিন্তু তবু তার খানিকটা অংশ বনওয়ারীর উপরেও এসে পড়েছে ব'লে তার নিজেরই মনে হ'ল! ছমছম ক'রে উঠল চারিদিক, মনটা কেঁপে উঠল।

"বিচার নাহিক বাবা পুরিল পাপের ভারা
সাঁজের পিদীম বলো ফুঁ দিয়ে নিভালে কারা
ও বটতলাতে বাবা বটতলাতে
সাধু জনের এ কি লীলা সন্‌জে বেলাতে

মিহি গলাতে মোটা গলাতে হায় হায় কি গলাগলি
কত হাসিখুশি কত বলাবলি কত ঢলাঢলি !
সেই কাপড়ে বাবা তোমায় সন্‌জে দেখালে
হায় কলিকালে—”

বনওয়ারীর হাত পা যেন অসাড় হয়ে গেল।

কালোশশীর সঙ্গে তার এই বটতলাতে দেখা হওয়ার কথা তা হ'লে কেউ নিশ্চয় দেখেছে। যেই দেখুক, কিন্তু সত্যই তো এটা তার অপরাধ। কাপড় সে ছেড়েছিল। বাড়ি ফিরে প্রদীপ জেলে ধূপ নিয়ে আসবার সময় কথাটা তার মনে হয়েছিল, কিন্তু স্নান তো করে নাই ! স্নান করা তার উচিত ছিল। তা ছাড়া আজ মনে হচ্ছে, বাবার বাহনকে মেরেছে যে করালী, তাকে শাস্তি না দিয়ে এমন ভাবে সমাদর করা তার অপরাধ হয়েছে—একশো বার অপরাধ হয়েছে। কিন্তু দেখলে কে ? পরম নিশ্চয় নয়। পরম দেখলে কখনই চুপ ক'রে থাকত না। কালোশশীর মতিগতি সবাই জানে ; মধ্যে মধ্যে ভূপ সিং মহাশয় এখনও আসেন, চন্ননপুরে গেলে কালোশশী এখনও অনেক জনের সঙ্গে ঢ'লে প'ড়ে কথা বলে, সে সব কথার মানে দু রকম হয়। জাঙলেও সদ্‌গোপ মহাশয়দের মধ্যে আধাবয়সী যাঁরা, তাঁদের দিকেও বাঁকা চোখে তাকিয়ে কালোশশী মুচকে হাসে। সবিই সত্যি, সবই জানা কথা, তার সঙ্গেও এককালে মনে মনে 'অঙ' ধরেছিল এও জানে লোকে ; কিন্তু এমন ঘটনা পরম চোখে দেখে কখনও সহ্য করতে পারত না। তখনই 'হাঁকার' মেরে সে লাফিয়ে এসে পড়ত। বনওয়ারীর সঙ্গে এক হাত হয়ে যেত। হয়তো দুজনের একজন শেষ হয়ে যেত সেই দিনই—তখনই। কাহারপাড়া এবং আটপৌরেপাড়ায় রেষারেষি আছে একটা—চিরদিন 'পপতিপুরুষ' ধরে। আটপৌরেরা বলে, আমরা পাল্কি বহন করি না, আমাদের ঘোড়া 'গোত্ত' নয়। তাদের গোত্র ঘোড়া গোত্র নয়, 'বাহন গোত্র' , ওরা ঠাট্টা ক'রে বলে, ঘোড়া গোত্র। ঘোড়া গোত্র হোক আর বাহন গোত্রই হোক, সে করেছেন ভগবান—ওই বাবাঠাকুর ! আটপৌরেরা কি ? লাঠি কাঁধে দিয়ে ভগবান পাঠিয়েছেন, ঠেঙাড়ে ডাকাত

গোত্র যে তোদের। দূত গোত্তও যা, ও ডাকাত-ঠেঙাড়ে গোত্তও তাই। এখনও পর্যন্ত বেটারা থানার খাতায় দাগী, হাজ্‌রে দিতে হয়, চৌকিদার রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে ডাকে। কোন বেটা আটপৌরের ঘরের চালে খড় নাই ভাল ক'রে, হাঁড়িতে অর্ধেকের বেশি চাল নাই। এই নিয়ে ওদের সঙ্গে কাহারদের ঝগড়া চিরকালের। এককালে অবিশ্যি ওদের প্রতাপই ছিল বেশি। সে আমলটা হাঁসুলী বাঁকের চুরি-ডাকাতির আমল। এখন সকলে চুরি ছেড়ে চাষবাস করছে, এখন কাহারদের চলতির কাল। আগে আটপৌরেরা কাহারদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত, আজ হিংসে করে। এ গান কোন্ বেটা হিংসুটে আটপৌরের বাঁধা! ব্যাপারটা জানতে হবে বনওয়ারীকে।

বলতে পারে একমাত্র কালোশশী। কালোশশীর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে তাকে। কিন্তু ভয় হয়। কালোশশীর মধ্যে নেশা আছে, সে নেশার ঘোর কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। ক্ষিদের সময় মুখের অন্ন ছেড়ে উঠে আসা যায়, কিন্তু কালোশশীর কাছে গিয়ে মাতাল না হয়ে ফিরে আসা যায় না। এ মদ তার খাওয়ার উপায় নাই। তার সে দিন ফুরিয়ে গিয়েছে। কাহারপাড়ার সে মাতব্বর। মাতব্বরের নিন্দে হ'লে মাতব্বরী থাকে না, লোকে মুখ টিপে হাসে—শাসন মানে না। তার পাপে জাতজ্ঞাতের অকল্যাণ হয়। যে পাপ সে করেছে, তার প্রায়শ্চিত্তই তাকে করতে হবে।

গাছতলা থেকে আবার সে বেরিয়ে সন্তর্পণে চলল আখের শালের দিকে। শালে হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত মণ্ডল মহাশয় এসে গিয়ে থাকবেন। বনওয়ারীকে গরহাজির দেখে হয়তো গাঁ-গাঁ শব্দে চীৎকার করতে আরম্ভ করছেন। বনওয়ারী একটু দ্রুতপদেই চলল। কতকগুলি গালিগালাজ শুনতে হবে আর কি! বনওয়ারী না হয়ে অন্য কেউ হ'লে তার অদেষ্টে নির্ঘাত 'পেহার' জুটত। বনওয়ারীর গায়ে হাত তুলতে কেউ সাহস করে না। সাহস ক'রে হাত তুললে বনওয়ারীও তার হাত ধ'রে ফেলবার সাহস রাখে। অবিশ্যি এক চন্দনপুরের মুখুজ্জেবাবুরা ছাড়া। বাপ রে, বাপ রে, কি ধনদৌলত চারিদিকে! যাকে বলে, মা-রাজলক্ষ্মী অষ্টাঙ্গে অলঙ্কার প'রে 'বানারসী'

কাপড় প'রে বিয়ের কনেটির মত গয়নার ঝুম-ঝুম-ঝুম-ঝুম ঠিন-ঠিন শব্দ ক'রে বানারসী কাপড়ের খসখস শব্দ তুলে অহরহ বেড়াচ্ছেন। কাহার বনওয়ারী পাল্কি ব'য়ে বুড়ো হ'ল, এ অঞ্চলে কত বড় বড় বাড়ির বিয়ের কনেকে পাল্কি ব'য়ে শ্বশুরবাড়ি এনেছে, বনওয়ারী বলে—'লক্ষ্মীকে এনেছি নারায়ণের বৈকুণ্ঠে। গয়না কাপড় সে অনেক দেখেছে, অনেক সুবাস শুঁকেছে, অনেক গয়নার বাজনা শুনেছে।

খুব 'ত্বরিত গমনে' চলতে চলতে হঠাৎ বনওয়ারী যেন আপনিই থেমে গেল। পা যেন আটকে গেল। পশ্চিম দিকে বাঁ পাশেই বাবাঠাকুরের থান। ডান দিকে দূরে দোয়েম জমির মাঠে আখ কাটছে কাহাররা, ঝুপঝাপ খসখস শব্দ উঠছে। কথাবার্তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। সামনে জাঙলের আমবাগানে গান চলছে, আলোর ছটা আসছে। কিন্তু সমস্ত কিছু ভুলে গেল বনওয়ারী। সে ধীরে ধীরে চলল বাবাঠাকুরের থানের দিকে। অপরাধ—অপরাধ হয়েছে বনওয়ারীর। হে বাবাঠাকুর, ক্ষমা কর, মার্জনা কর। আঃ, কি মতিভ্রমই হ'ল করালীর। হায়, হায়, হায়! ধর্মনাশা করালী। বাবার বাহনটিকে হত্যা করলে পুড়িয়ে? কি 'বিচিত্য বন্ন', কি বাহার, কি শিস, কি 'পেকাণ্ড' বড়! তা ছাড়া কালো বউকে নিয়ে তার যে কি মতিভ্রম হ'ল এই 'পবীণ' বয়সে! হে বাবা, হে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তুমি এ দোষটি নিয়ো না বনওয়ারীর। করালীকেও ক্ষমা ক'রো বাবা। আর বনওয়ারীর একটি দোষ ক্ষমা ক'রো, ওই কালোশশীকে নিয়ে দোষটি তুমি ধ'রো না। কালো বউয়ের সঙ্গে তার ছেলেবয়সের 'অঙ'। এই বয়সে এতকাল পরে সে 'অঙ' মনের বাবুদের সঙ্গে মিশে তুবড়িবাজির 'অঙিন' ফুলঝুরি হয়ে বেরিয়ে আসছে। আগুন লেগেছে, আর তাকে চাপা দেবার উপায় নাই। কালো বউ—কালোশশী যদি আটপৌরেপাড়ার মাতব্বর পরমের বউ না হ'ত, তবে হয়তো বনওয়ারীর 'হিয়ের' তাপ এতখানি হ'ত না, আগুন লাগত না মনের বারুদে।

বাবার থানের প্রান্তভাগে বনওয়ারী দাঁড়াল। ওখানটিতে এই 'সনসনে' 'আত্তিকালে' হঠাৎ গিয়ে ঢুকতে নাই। বাবা খেলা করেন এখন, কখনও

তপজপ করেন, কখনও খড়ম প'রে খট খট ক'রে বেড়ান, কখনও বেলগাছের ডালটি ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকেন 'কালারুদ্দু' বাবার দরবারের দিকে চেয়ে।

হাততালি দিয়ে বাবাকে নিজের আগমনের কথা জানিয়ে সে আরও খানিকটা অগ্রসর হ'ল। কিছুদিন আগেই বাবার থান পূজো দেবার জন্ তারা পরিষ্কার করেছিল! হাঁসুলী বাঁকের পাষাণ মাটিতে এখন শীতের টান পড়েছে, আস্তে আস্তে তার উপর খরার অর্থাৎ গ্রীষ্মের রোদের আমেজ লাগছে. জল নাই; পরিষ্কার বাবার থানটি তাই এখনও পরিষ্কারই আছে। বনওয়ারী সেইখানে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। মনে মনে মানসিক করলে—বাবা, ক্ষম কর তুমি, তোমার বেলতলাটি আমি বাঁধিয়ে দেব।

ঠিক সেই ক্ষণটিতেই একটা গোলমাল উঠল কাহার পাড়ায়।

ছয়

হাঁসুলী বাঁকে কাহারপাড়ায় সনসনে রাত্রিতে গোলমাল চিরকাল ওঠে. এই সময়ে পুরনো ঝগড়া নতুন ক'রে বাধে। সকলে ঘুমোয়, সেই সময়ে কেউ ঘুম ভেঙে বাইরে এসে নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে সাধ মিটিয়ে গাল দিতে আরম্ভ করে। যদি প্রতিপক্ষটিও সেই সময়ে ভেগে ওঠে দৈবক্রমে, তবে লে যায় চুলোচুলি। তা ছাড়া হঠাৎ লোকের সাড়ায় গোলমাল ওঠে কাহার-পাড়ায়। জাঙলের চন্দনপুরের ছোকরারা এসে এই সময়ে শিস দেয়, সিটি দে উঠানে টুপটাপ ক'রে ঢেলা ছুঁড়ে ইশারা জানায় কাহার-বাউড়ীর আ মেয়েদের। মায়েরা পিসীরা মাসীরা শাশুড়ীরা শুনতে পেলে গোল হয় না. বাপেরাও বড় কিছু বলে না; কিন্তু ননদ কি স্বামী কি ভাই শুনলে গোলযো বাধবেই। চোর কাহারপাড়াতে আসে না; এসে নেবে কি? তা ছাড় কাকের মাংস কাকে খায় না, কাহারেরা একদিন নিজেরাই চোর ছিল; আ চুরি ছাড়লেও চোর নাম আছে, চুরির হদিসও ভুলে যায় নাই। বনওয়া কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলে গোলমালের মধ্যে কার কার গলার 'র

অর্থাৎ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হাঁসুলী বাঁকের এই একটি মজা আছে। কোপাইয়ের ধারের বাঁশবনে ধাক্কা খেয়ে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়ার চেঁচামেচি স্পষ্ট হয়ে ফিরে আসে।

গলা শোনা যাচ্ছে নসুবালার। ওঃ, পুরুষের মেয়েলী ঢঙ হ'লে সে পুরুষ ঝগড়ায় মেয়ের বাড়া হয়ে ওঠে। নসুকে নিয়ে আর পারা গেল না। হুঙ্কার দিচ্ছে করালী। তারস্বরে মেয়ের গলায় চীৎকার করছে কে ?—ওগো, 'অক্ষে' কর গো, বাঁচাও গো!

নিশ্চয় মারপিট করছে করালী। কাকে ? সুচাঁদ পিসীকে ? পাখীর সঙ্গ বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও সুচাঁদ করালীকে ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু সুচাঁদের গলা হেঁড়ে গলা ; হাড়ির ভেতর মুখ ভ'রে মেয়েতে কথা বললে যেমন আওয়াজ বের হয় তেমনিই,—এ তো সে গলা নয়! তবে পাখীকে ঠ্যাঙাচ্ছে নাকি ? কিছু বিশ্বাস নেই করালীকে।

আর্তনাদ কিন্তু ক্রমশই বাড়ছে।

হাঁসুলীবাঁকের চারিদিকে বাঁশবন—'অরুণ্যের' অর্থাৎ অরণ্যের মত, সেখানে ডাল পড়লে ঢেঁকি না হোক, পাতা পড়লে কুলো না হোক, লড়াই লাগলে টুঁটি-ছেঁড়াছেঁড়ি হয়। 'অরুণ্যে' বাঘ-ভালুকে আপন আপন এলাকায় থেকে চেঁচায়, কাহারপাড়ায় আপন আপন আঙন থেকে গাল পাড়ে। তারপর এক সময় লাগে হাতাহাতি। তখন এ ওর টুঁটি টিপে ধরে, ও এর টুঁটি ধরতে চেষ্টা করে। এদের যে মাতব্বর, মরণ তারই। মরণ বনওয়ারীর। ছুটল বনওয়ারী।

করালীই বটে। করালী নির্মমভাবে প্রহার করছে রুগ্ন নয়ানকে। চারি-পাশে মেয়েরা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। নসুবালা হাতে তালি দিয়ে বলছে—লাক ছিঁড়ে দে, লাক ছিঁড়ে দে ছুঁচো কুকুরের।

সুচাঁদের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। এই দৃষ্টিতেই কাহারদের মেয়েরা পুরুষদের লড়াই দেখে চিরকাল। সুচাঁদের দৃষ্টির মধ্যে খানিকটা ভয়ের আভাস দেখা দিয়েছে।

সুচাঁদ এ গল্প চিরজীবন করবে। ঠিক এমনই দৃষ্টি তখন ফুটে উঠবে চোখে। বলবে—বাবা রে, সে কি 'লড়ন'! সে যেন মহামারণ! করালীর সে কী 'মূর্ত্তি'! সম্ভবত মনে মনে সে ভয় পায়, করালী যদি তাকে এমনই ক'রে মারে!

বসন চেষ্টা করছে করালীকে ছাড়াতে!—উঠে এস করালী; ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ওগা মানুষ নয়ান। করালী—করালী!

পাখী ফোঁসফোঁস ক'রে কাঁদছে।

আর্ত্ত চীৎকার করছে নয়ানের মা। সে প'ড়ে আছে উঠানের ওপর। মাথার চুল খুলে গিয়েছে, 'রঙ্গে'র কাপড় খসে গিয়েছে; বুকে পিঠে ধুলোর চিহ্ন; কেরোসিনের ডিবের লালচে আলোয় তাকে মনে হচ্ছে রাস্তার পাগলিনীর মত। হারামজাদা নিশ্চয় তাকেও মেরেছে; ঠেলে মাটিতে ফেলে দিয়েছে, এতে আর সন্দেহ নাই। কী নিষ্ঠুর, কী দুর্দান্ত!

বনওয়ারী গিয়ে করালীর ঘাড়ে হাত দিয়ে ধ'রে দাঁতে দাঁত টিপে বললে—ছেড়ে দে।

বনওয়ারীর গলার আওয়াজের মধ্যেও বনওয়ারী আছে। চমকে মুখ তুলে তাকালে করালী।

—ছেড়ে দে।

ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েও করালী বললে—ছেড়ে দোব? ওকে আমি মেরে ফেলাব।

—মেরে ফেলাবি?

নসু হাত-পা নেড়ে অঙ্গ দুলিয়ে ব'লে উঠল—ফেলাবে না? মেরে ফেলাবে না কেনে, শুনি? তোমার পরিজনের লাকে যদি কামুড়ে ধ'রে লাক কেটে দিতে যায়, তবে তুমি তাকে মেরে ফেলাবে না? ছেড়ে দেবা? গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সন্দেশ খেতে দেবা?

নয়ানের মা ছেলের কাছে এসে ছেলেকে তুলতে চেষ্টা করছিল, সে ব'লে উঠল—কার পরিবার? লয়ানের বিয়েলো বউ লয় উ? যে পরিবার স্বামীর ওগ দেখে ফেলে চ'লে যায়, সাঙা করে, তার লাক কেটে দেবে না?

বনওয়ারী বুঝে নিলে ব্যাপারটা। পাখী এসে সামনে দাঁড়িয়ে আরও পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিলে ব্যাপারটা। সে নিজের নাকটা দেখিয়ে বললে —দেখ।

নসুবালা একজনের হাত থেকে কেরোসিনের ডিবেটা প্রায় কেড়ে নিয়ে পাখীর নাকের সামনে ধ'রে বললে—বলি, চোখ তো আছে, মাতব্বর মানুষ, বিচারও আছে, বলি একবার দেখ। লাকে কামুড়ে কি করেছে দেখ। 'সব পুত থাকতে লাতির মাথায় হাত'! হাত গেল, আঙুল গেল, পিঠ গেল, কাঁধ গেল, গিয়ে লাকে কামড় ?

সত্যই নাকে দাঁতের দাগের ঘের জুড়ে লালচে রক্তাভ দাগ হয়ে গিয়েছে। নয়ানের দিকে তাকালে বনওয়ারী। হাঁপানীর রুগী বেচারা, নির্জীবের মত প'ড়ে আছে, যে শাসন তার হয়েছে তার উপর শাসনের আর উপায় নাই। তা ছাড়া নয়ানের উপর যে আঘাত দিয়েছে, তার জন্য বনওয়ারীর মনে যে অন্যায়-বোধটুকু খচখচ করছিল, সেটাও এই সুযোগে বড় হয়ে উঠল। সে কিছুতেই মানতে পারলে না, শাসনটা ন্যায্য শাসন হয়েছে। বনওয়ারী বললে—বোঝলাম, সব বোঝলাম। কিন্তু তবু অল্যায় হছে। নিশ্চয় অল্যায় হছে। ওগা মানুষটা যদি ম'রে যেত ? মুখ এখে বাক্যি আর ঠাঁই দেখে মার—পিতিপুরুষে ব'লে যেয়েছেন।

করালী ব'লে উঠল—কোম্পানির আইনে মেয়েমানুষকে এমন ক'রে কামুড়ে দেওয়ার জন্যে জ্যাল হয়।

বনওয়ারী গর্জে উঠল—করালী!

—কি! আমি অল্যায় কি বললাম ?

—এই দেখ্! চন্নপুরে পালাতে হয়েছিল তোকে গাঁ ছেড়ে। আমি তোকে সব ক্ষমা-ঘেন্না ক'রে আবার এনেছি গেরামে। যখন আনি, তখন কি বলেছিলাম মনে কর্। আমার কথা শুনে চলতে হবে, পবীণদের অমান্য করবি না, অধম্ম অনাচার করবি না। তু স্বীকার করেছিলি কি না ?

করালী জবাব দিলে না কথায়। পাখীকে টেনে বললে—চ'লে আয়।

চ'লে গেল তারা। নসুবালা কোমর ঘুরিয়ে হঠাৎ ব'লে উঠল—আঃ ম'রে যাই! চল্ গো চল্। ঘর চল্ সব। সেই যে বলে—

"চোখের জলে নরম হ'ল মাটি—
সেই মাটিতে কুড়িয়ে পেলাম হারানো পিরিতি!"

ব'লেই সে ঠোঁটে পিচ কেটে সঙ্গে সঙ্গে চ'লে গেল।

হয়তো সেই মুহূর্তে বনওয়ারী একটা কাণ্ড ক'রে বসত। কিন্তু তখন নয়ানের মা তার পায়ের কাছে মাথা রেখে পায়ে হাত দিয়ে কেঁদে বলছিল—বিচার কর, তুমি বিচার কর, মাতব্বর তুমি, বিচার কর।

বনওয়ারী মাথা হেঁট করলে, অবিচার সে করেছে। পরক্ষণেই সে নয়ানকে দুই হাতে তুলে নিয়ে দাওয়ার উপর এনে সেখানে পাতা তালপাতার চ্যাটাই-য়ের উপর শুইয়ে দিয়ে বললে—জল আন দেখি। মুখে কপালে জল দাও। ছেলেকে সোস্থ কর আগে।

সকলেই প্রায় চ'লে গিয়েছিল। নয়ানের মা এককালে ছিল মাতব্বরের পরিবার, ঘরভাঙাদের ঘরের গিন্নী, তার অহঙ্কার ছিল বেশি, সেই অহঙ্কার তার ভেঙে গেল যখন থেকে, তখন থেকে সে অত্যন্ত কটুভাষিণী। তাই তার প্রতি কারু সহানুভূতি নাই। কাহারপাড়ার লোকে শুধু ঠোঁটে হাসতে জানে না; ওদের সহজ কথা; ওরা বলে—আকাশের তারা জলে ফোটে, আকাশে ম্যাঘ থাকলে কি পুকুরে পানা থাকলে সে হবার জো নাই। 'তোর সঙ্গে ভাব নাই তো হাসলে হবে কি?'

ব'সে ছিল কেবল সুচাঁদ।

সে আক্ষেপ করছিল—আঃ, 'মানুষের দশ দশা, কখনও হাতী কখনও মশা' সেই ঘরভাঙাদের আজ এই অ্যাবস্থা!

সে ব'সে ব'সে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ব'লে যায়।—ঘরভাঙাদের 'পবল পেতাপ' জাঙলের চৌধুরীরা বাবাঠাকুরের 'কিপায়' যখের ডিঙির ধনে বড়লোক, সায়েবডাঙার নীলকুঠীর সায়েবদের বার-বাগিচা ক্ষেত-খামার জমিদারির মালিক। সেই চৌধুরীদের জোতদার—'পেধান' জোতদার ঘরভাঙারা।

নয়ানের কত্তাবাবার গলার হাঁকার কি! 'মোচের' 'বেক্কম' কি! আঙা চোখের তারার ঘুরণ কি! বাবা,আজ নয়ানের বউকে কেড়ে নিয়ে তোমরা দিলে করালীকে। সেকালে চৌধুরীবাবুর ছেলের কামরায় নয়ানের বাবা দিতে আসত কাহারপাড়ার বউ বিটী। বসনকে আমার সেই তো ধরেছিল বাবুর লজরে। শুধু কি বাবুই ভোগ করত? নয়ানের বাপ বাবুর মদের পেসাদ পেত, মাসের পেসাদ পেত, সকল ভোগের পেসাদ পেত।

নয়ান এতক্ষণে সুস্থ হয়েছে। চোখ মেলে চাইলে সে! বনওয়ারীকে দেখে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বনওয়ারী তার কপালে হাত বুলিয়ে বললে—ঘুমো। তু টুকচে সেরে ওঠ্, তোরও সাঙা দিয়ে দোব আমি। করালী তোর বউকে সাঙা করেছে, বলিস তো—করালী যে বউকে ছেড়েছে সেই বউকে সাঙা দিয়ে দোব তোর।

সুচাঁদ বললে—কি বলছিস ব্যানো? অ্যাঁ! কি অল্যায় আমি করলাম রে? আজ মাতব্বর হয়েছিস। তোর গায়ে লাগছে ঘরভাঙাদের মাতব্বরির কাহিনী, সে আমি জামি। কিন্তুক লয়ানের বাবার পাশে পাশে তোর ঘোরা তো আমার মনে আছে। লয়ানের বাপ চৌধুরীবাবুর কামরাতে থাকত, আমোদ করত। তু ঘরভাঙাদের পাঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরঘুর ক'রে বেড়াতিস, সে কথা ত ভুলতে পারিস, আমি তো ভুলতে পারি না। তু আজ হারামজাদা করালীর পক্ষ নিয়েছিস! লয়ানের মা আজ না হয়—

বনওয়ারী বেশ উঁচু গলায় ধমক দিয়ে উঠল—পিসী!

সুচাঁদ শুনতে পেলে এবং তিরস্কারের স্বর বুঝতেও পারলে। সেও চীৎকার ক'রে উঠল—কেনে রে? তোকে ভয় ক'রে বলতে হবে নাকি কথা? লয়ানের মায়ের সঙ্গে তোর গুজু-গুজু আর কেউ না-জানুক আমি জানি। লদীর ধারে একদিন পায়ে ধরেছিলি, আমি দেখেছিলাম।

বনওয়ারী এসে দাঁড়াল সুচাঁদের সামনে।

সুচাঁদও উঠে দাঁড়াল। সে ভয় পেয়েছে। কাহারদের মাতব্বর বড় ভয়ঙ্কর। সে সঙ্গে সঙ্গে বনওয়ারীর কথা ছেড়ে করালীকে গাল পাড়তে

লাগল।—করালীকে গাঁয়ে আনলি, ও থেকে গাঁয়ের সব্বনাশ হবে। বাবার বাহন মেরেছে ও। চন্ননপুরে লেলেচ্ছ কারখানায় কাজ ক'রে মেলেচ্ছ হয়েছে ও। আমার গায়ে ব্যাঙ দিয়ে দেয়। ওর সঙ্গে পাখীর বিয়ে ?

বলতে বলতেই সুচাঁদ চ'লে গেল।

বনওয়ারী উঠানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে চ'লে যাচ্ছিল শালের দিকে। মৃদু কণ্ঠে কে ডাকলে—শোন।

নয়ানের মা দাঁড়িয়েছে এক দাওয়ার ধারে খুঁটিটি ধ'রে।

বনওয়ারী একটু বিব্রত হ'ল।

নসুবালার ছড়ার ইঙ্গিত সত্য, সুচাঁদের কাহিনীও সত্য। নয়ানের মায়ের কাছে আজ মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে। অন্যায়—অনেক অন্যায় হয়ে গিয়েছে। বনওয়ারীর এ অন্যায় ইচ্ছাকৃত অন্যায়। সে-আমলের কথা সে-সব। নয়ানের বাপ দাঁতাল কুঞ্জ তখন মাতব্বর, বনওয়ারী ছিল কুঞ্জর বন্ধু, কিন্তু তাকে ঈর্ষা না ক'রে পারত না। মাতব্বরির উপর দৃষ্টি পড়েছিল। বনওয়ারীর বাপ তখনও বেঁচে। কুঞ্জ তখন চৌধুরীবাবুর ছেলের সঙ্গে ঘোরে। সেই সময় বনওয়ারী প্রতারণা করেছিল নয়ানের মায়ের সঙ্গে।

নয়ানের মা কাছে এসে দাঁড়াল। বনওয়ারী বললে—লয়ানের আমি সাঙা দিয়ে দোব বাসিনীবউ, পিতিজ্ঞে করেছি আমি।

নয়ানের মা কাঁদছিল।

বনওয়ারী বললে—লয়ান সেরে উঠুক, আনন্দে ঘর সংসার কর। আর—আর যদি লয়ান ভাল ক'রে না সারে, তবে বউকে নিয়ে খেটে-খুটে খাবে। আর—। সে চুপ ক'রে গেল, কথাটা উচ্চারণ করতে পারলে না। মাতব্বর হয়ে কথাটা উচ্চারণ করা উচিত নয়।

বউয়ের রোজকার, বিটীর রোজকার কাহারপাড়ায় 'শাক-ঢাকা মাছ'। জানে সবাই। বনওয়ারী বলতে চেয়েছিল সেই কথা।

বনওয়ারী বললে—আমি তবে যাই। শালে গুড় ফুটছে।

পিছন থেকে টান পড়ল তার কাপড়ে। চকিত হয়ে বনওয়ারী ফিরল।

অন্ধকারের মধ্যেও কাহারদের দৃষ্টি প্রখর। তা ছাড়া কাহারদের বুকের কথাও জানে কাহার মাতব্বর। কোপাই নদীর পাগলামির ছোঁয়াচ কাহার-মেয়েদের জীবনে ঘোচে না।

বিশ বছরের সন্তানের জননী নয়ানের মা। তার চোখের দিকে বনওয়ারী চেয়ে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল। নয়ানের মা বললে—মনে আছে? পায়ে ধরেছিলে নদীর ধারে?

—লয়ান রয়েছে ঘরে, বাসিনীবউ।

—সে ঘুমিয়েছে। জান, তখনও মাতব্বরি ঘরভাঙাদের। আমি তখন ঘরভাঙাদের বউ।

—বাসিনীবউ, আমি তো তোমার অসম্মান করি নাই ভাই।

বাসিনীবউ তার হাত চেপে ধরেছে। চোখ জ্বলছে। ভয় পেলে বনওয়ারী। বাসিনীবউ ভয়ঙ্করী হয়ে উঠেছে।

বনওয়ারী মনে মনে বাবা-ঠাকুরকে স্মরণ করলে। সে দাঁড়াল বাবার থানের দিকে মুখ ক'রে। বাঁশবনে অন্ধকারে ভয়-ডর লাগলে বাবার থানের দিকে তাকালে সে ভয় কেটে যায়। বাবার থানে গভীর রাত্রে আলো জ্বলে।

সুচাঁদ পিসী বলে—আমার বাবার বাবা দেখেছেন, ঘরভাঙাদের কত্তা দেখেছেন, আমাবস্যের 'এতে' বাবার থানে আলোয় 'আলোককীত্তি'। সেই জন্যই কাহারপাড়ার প্রতি ঘর ওই বাবার থানে প্রতি অমাবস্যায় একটি ক'রে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আসে।

বাবার থানে অমাবস্যায় পিদীম দিলে, বাবা তার মঙ্গল করেন; তার ঘরে নিত্যি 'সনজেতে' আলো জ্বলবে, গভীর 'অরুণ্যে' তেপান্তরে পথ হারালে পথ খুঁজে পাবে—ওই আলো কাহারদের চোখে ফুটে উঠবে। যমপুরীতে 'অন্নকারে' থাকতে হবে না, বাবার থানে যতগুলি পিদীম দেবে, সেখানে ততগুলি পাবে। তবে এড়া কাপড়ে, পাপের কথা মনে ভাবতে ভাবতে পিদীম দিলে তার ফল—'আগড়া ধানের মত' খোসার মধ্যে শাঁস থাকে না, তুষের মধ্যে চাল থাকে না,

—তেলকালির দাগ-ধরা মাটির 'ডেলুই' অর্থাৎ প্রদীপ শুকনো আধ-পোড়া শলতে নিয়ে প'ড়ে থাকে, পিদীমে শীষ জ্বলে না।

বনওয়ারী এই একটু আগে বাবার থানে গড়াগড়ি দিয়ে এসেছে। মানত ক'রে এসেছে। ব'লে এসেছে, যে পাপ সে করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করবে। সে মাতব্বর ;—রাজার পাপে রাজ্যনাশ, মণ্ডলের পাপে 'গেরাম' নাশ, কত্তার পাপে গেরস্ত ছারখার, 'পিতের' অর্থাৎ পিতার পাপে পুত্রের দণ্ড। সে মাতব্বর হয়ে গেরামের সব্বনাশ ডেকে আনবে না। বাবার কাছে তবু সে বলেছে কালোশশীর কথা, আর তার সঙ্গে রঙের খেলার 'রন্থমতি' অর্থাৎ অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু আর না। তা ছাড়া 'নোকসমাজে' নিন্দে হয়, চিলোকে' অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা করে হাসাহাসি, পুরুষে করে কানাকানি, উঁচু মাথা হেঁট হয়, মাতব্বরি আসন করে টলমল, শেষ পর্যন্ত মা-বসুন্ধরা ফেটে গিয়ে সে আসন 'গেরাস' করেন। সে বাবার থানের দিকে চেয়ে বাবাকে মনে মনে ডাকলে।

সত্যিই আলো চমকে উঠল। বাবার থানে নয়, আকাশে। চমকে উঠল দুজনেই। কখন আকাশ ঘিরে মেঘ জ'মে উঠেছে। বিদ্যুৎ দিলে এই প্রথম। মেঘ ডেকে উঠল গুর-গুর ক'রে।

বনওয়ারী এবার ভয়ে চমকে উঠল।

বাবার থানের আলো আকাশে বিদ্যুৎ হয়ে 'ললপাচ্ছে' অর্থাৎ চমকাচ্ছে। বাবার হাঁক আকাশে আকাশে বেজে উঠেছে। কিন্তু পর-মুহূর্তে সামলে নিলে নিজেকে। ওদিক থেকে কে হাঁকছে—মুরুব্বি, মুরুব্বি! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, শালে কড়াইয়ে গুড় ফুটছে। জল পড়লে সব খারাপ হবে। সে ছুটল। নয়ানের মা সেই দুর্যোগ-ভরা আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে চীৎকার ক'রে উঠল হঠাৎ—বাহনের মাথায় চেপে নাচ বাবা। নকনক করুক তোমার বাহনের জিভ! হে বাবা! হে বাবা!

হে বাবা, হে দয়াময়, খুব রক্ষে করেছ বাবা। খুব রক্ষে করেছ।

শালে তখন হুড়োহুড়ি প'ড়ে গিয়েছে। উপরের ছাউনিতে খড় দিতে

হবে। হেদো মণ্ডল খুব হাঁকডাক করছেন। অতনার বেটা লটবর উঠেছে ছাউনির উপর। মধ্যে মাঝে বাবা কালারুদ্রের নাম নিচ্ছে।

—শিবো হে। জয় বাবা কালারুদ্দু! তিশূলের খোঁচায় 'ম্যাঘ' উড়িয়ে দাও বাবা। জল হ'লে গুড় মাটি হবে বাবা। আমের মুকুল যাবে বাবা। 'ফাগুনের জল আগুন'। ম্যাঘ উড়িয়ে দাও, এবার গাজনে আধ মন গুড়ের শরবৎ মানত রইল। জয় বাবা কালারুদ্দু, গাজনে এবার পাঁচ পো তিল-ত্যালের পিদীম দোব বাবা। শিবো হে, খাস আমের গুটি তোমার ভোগে দোব বাবা।

বনওয়ারী আকাশের দিকে চেয়েছিল।

বিদ্যুতের আলোয় সে দেখছিল, মেঘ যেন কড়াইয়ের ফুটন্ত গুড়ের মতই উথলাচ্ছে। সাদায় কালোয় ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ দিকে দিকে। জল 'অনিবায্য'। সকালের মেঘ ডাকলে নামে না, কিন্তু অকালের মেঘ নামবেই। বর্ষণের কাল আষাঢ় শাওন ভাদ্দ আশ্বিন। বাকি সকল মাস অকাল। বর্ষার সময় মেঘ ডাকলেও অনেক সময় বৃষ্টি নামে না। এ মেঘ অকাল মেঘ, বিশেষ মাঘ-ফাগুনের মেঘ, সাড়া দিলে অঙ্গ নাড়া দিয়ে ঝরবেই। ফাগুনের জল আগুক, আমের পক্ষে তো নির্ঘাৎ আগুন। সমস্ত মুকুলে ঝাঁই লেগে যাবে। আম হবে না। আঃ—'আমে দেখে ধান'। আম না হ'লে ধানও হবে না। তবে বৃষ্টি হ'লে সায়েবডাঙায় কাজ লাগবে। কাঁকর মাটি ভিজে নরম হবে। জমি তৈরির একটা 'বাত' অর্থাৎ সময় পাবে। সায়েবডাঙায় জমি অনেকটা পেয়েছে বনওয়ারী।

নামল বৃষ্টি ঝম্ ঝম্ ক'রে। বাবা কালারুদ্দু কান দিলেন না ওদের প্রার্থনায়। রতন তার মুনিব হেদো মণ্ডল মহাশয়কে বললে—মুনিব মশায়, আধ মণ গুড়ের মানতে বাবার মন উঠল না। এক মণ মানত করেন।

হেদো মণ্ডল পুরানো কালের লোক, কিন্তু তিনি কাহার নন। জলের ছিটে থেকে বাঁচবার জন্য বুড়ো বটগাছটার কাণ্ডের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হুঁকো টানতে টানতে বললেন—ভাগ্ বেটা কাহার কোথাকার, মানত করলে জল থামে!

—তবে গুড়টা মাটি হবেন মাশায়!

গাছের কাণ্ড বেয়ে কয়েকটা মোটা ফোঁটার জল মণ্ডল মহাশয়ের কল্কের উপর প'ড়ে ফঁ্যাস শব্দ ক'রে কল্কেটা নিবিয়ে দিলে, মণ্ডল মশায় ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকালেন, বললেন—অ-হ্-হ্!

রতন বললে—মুনিব মশায়!

—নিকুচি করেছে বেটা কাহারের—মুনিব মাশায়, মুনিব মাশায়! হুঁকোটা ফেলে দিয়ে হেদো মণ্ডল খপ ক'রে ধরলেন রতনের মাথার চুল, দমাদম কষিয়ে দিলেন কয়েকটা কিল। ছাড়া পেয়েই রতন বললে—দ্যান, কল্কেটা খসিয়ে দ্যান, আগুন ক'রে নিই।

ওদিকে শালের কড়াইয়ের পাশে বনওয়ারী অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। কড়াইয়ের ফুটন্ত রসে খড়ের পাতার ছাউনি ভেদ ক'রে জল পড়ছে। আঃ, এমন যত্ন ক'রে গুড় তুলছিল সে, সব মাটি হয়ে গেল। গন্ধ হবে, স্বাদ নষ্ট হবে। হায়! হায়! হায়!

পানু দূরে গাছের তলায় জল বাঁচিয়ে ব'সে কয়েকজন অন্তরঙ্গের সঙ্গে এরই মধ্যে সরস রসিকতায় মজলিস জমিয়ে তুলেছে। রসটা জমিয়ে তুলেছে সে হেদো মণ্ডলের গুড় নষ্ট হওয়ায় আনন্দ অনুভব ক'রে।—বেশ হচ্ছে, আচ্ছা হচ্ছে, লাগাও বাবা লাগ্ ঝমাঝম! যাক বেটার গুড় খারাপ হয়ে। ভারি বজ্জাত বেটা। মা-দুগ্গার অসুর!

হঠাৎ সেখানে এসে বসল মাথলা। তার সঙ্গে এল প্রহ্লাদ। জলে তাদের সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে। প্রহ্লাদ ব'সেই বিনা ভূমিকায় বললে,—পানা তু কিন্তুক সাবধান!

—কেনে?

—কেনে? বনওয়ারী এতক্ষণ কোথা যেয়েছিল জানিস?

—কোথা?

আটপৌরেপাড়ায় খেঁটুর গান শুনতে।

মুখ শুকিয়ে গেল প্রাণকৃষ্ণের। বনওয়ারীর প্রতিহিংসা বড় ভীষণ। মাতব্বর রাগে না তো রাগে না, রাগলে কিন্তু রক্ষা নাই।

প্রহ্লাদ বললে—ওদের ঘেঁটুগান এবার তু করেছিন!

পানু এতক্ষণে নিজেকে নামলে নিয়েছিল, এবার সে তার স্বভাবগত চাতুর্যের সঙ্গে ব'লে উঠল—মাইরি না, মাইরি বলছি, ছেলের দিব্যি ক'রে বলতে পারি, কিছুই জানি না আমি। তারপর সে বিপুল বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলে—আটপৌরেওলারা এবার লতুন গান বেঁধেছে নাকি ঘেঁটুতে? কি গান? মজার গান না কি? ব'লে সে অকারণে হো-হো ক'রে হাসতে লাগল।

প্রহ্লাদ বললে—বুঝবি মজা, এইবার বুঝবি। মুরুব্বির সঙ্গে কালোশশীকে জড়িয়ে গান! ঠেলা বুঝবি এইবার।

পানু বললে—মুরুব্বির সঙ্গে কালোশশীকে জড়িয়ে? তা হ'লে নিশ্চয় ওই করালীদের কাণ্ড! ওই নসুবালা-হারামজাদী—

—কে রে? কে? কি কাণ্ড করালীর?—বলতে বলতে পিছন থেকে এসে দাঁড়াল কে একজন। লোকটার গায়ে একটা আলখাল্লা, মাথায় প্রকাণ্ড একটা বোঝা। মুখটাও দেখা যাচ্ছে না। শুধু গলার আওয়াজে বুঝা গেল, সে করালী। মাথায় ওটা কি?

প্রহ্লাদ প্রশ্ন করলে—করালী? মাথায় কি রে?

—তেরপল গো কাকা।

—তেরপল?

—হ্যাঁ। ইস্টিশান থেকে এনেছিলাম একটা। তা জল দেখে মনে হ'ল, তোমাদের গুড় লষ্ট হবে। তাই নিয়ে এলাম, দাও চাপিয়ে চালের ওপর। এক ফোঁটা জল পড়বে না। একটা তেরপলের জামা গায়ে দিয়ে সে তেরপলটা মাথায় ব'য়ে এনেছে। অদ্ভুত লাগছে ওকে। ঠিক সায়েবের মত!

প্রহ্লাদ লাফিয়ে উঠল।—বনওয়ারী! ব্যানো!

করালীকে প্রায় টানতে টানতেই সে নিয়ে গেল শালের উনোনের কাছে।

হতাশভাবে সকলে উপরের চালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জন দুয়েক ছোকরা মুনিষ কোদাল ধরেছে, উনোনের মুখটার চারিদিক ঘিরে বাঁধ তৈরি করছে, জল যেন গড়িয়ে এসে উনোনের ভিতরে না ঢোকে, উনোন যেন নিবে না যায়। হেদো মণ্ডল হাউহাউ ক'রে চীৎকার করছেন—ছাতা নিয়ে আয়, ছাতা এনে কড়াইয়ের ওপরে ধর্। মণ্ডল মশায়ের বুদ্ধি 'হ'রে যেয়েছে' অর্থাৎ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ছাতা ধ'রে মাথাই বাঁচে না, তা শালের কড়াই!

প্রহ্লাদ কলরব ক'রে ব'লে উঠল—হইছে বনওয়ারী, হইছে। করালী কৃপায় করেছে, ত্যারপল নিয়ে আইচে। দাও চাপিয়ে চালে।

তেরপল! রেল-ইস্টিশানের তেরপল! চাল-ধানের বস্তার উপর বর্ষার সময় চাপিয়ে দেয়, একটি ফোঁটা জল পড়ে না—সেই তেরপল!

হেদো মণ্ডল হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর আর তর সইছে না।

—দে দে, চাপিয়ে দে। ওঠ্! উঠে পড়্।

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—তা ভালই হইছে—হ্যাঁ, ভালই হয়েছে। দে, তা চাপিয়ে দে।

করালী বললে—তোমার জিম্বা রইল কিন্তু মুরুব্বি। তুমি অইচ ব'লেই আনলাম আমি, লইলে লাখ টাকা দিলে দিতাম না আমি—তা সে আজাই হোক আর রুজীই হোক, হ্যাঁ।

হেদো মণ্ডল কথাটা শুনে একটু হেসে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—বলিহারি রে বলিহারি! খুব বলছিস যে! অ্যাঁ? আবার একটু হেসে বনওয়ারীর দিকে তাকিয়ে মণ্ডল বললেন—তা বাহাদুর বলতে হবে বেটাকে—হাঁ, বেট খুব বাহাদুর।

করালীর ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। ঘোষ মশায় হ'লে হয়তো ভুরু কুঁচকে মাথা হেঁট ক'রে চ'লে যেত, কিন্তু হেদো মণ্ডল মাইতো ঘোষ নয়। সে মুহূর্তে জবাব দিয়ে উঠল—উ কি? বেটা-কেটা বলছেন কেনে? ভদ্দনোকের উ কি কথা।

এক মুহূর্তে শালের সমস্ত কাহারেরা হতভম্ব হয়ে গেল। বনওয়ারী

শঙ্কিত হয়ে উঠল। হেদো মণ্ডল সাক্ষাৎ দুর্গা মায়ের অসুর, এইবার হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে পড়বেন করালীর উপর। কিন্তু আশ্চর্য, হেদো মণ্ডল কেমন যেন হয়ে গিয়েছেন, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন—তেরপলের জামা-পরা করালীর দিকে চেয়ে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে হেদো মণ্ডল শুধু বললেন—ক্যানে, অন্যায় কি বললাম আমি? কি রে বনওয়ারী, কি অন্যায়টা বলেছি, তুই বল্ দেখি?

বনওয়ারী উত্তর দেবার পূর্বেই করালী বললে—মুরুব্বির কাছে উ সব তো অন্যায় লাগবে না, উ সব ওদের গা-সওয়া হয়ে যেয়েছে। বলি—বেটা কিসের মশায়, বেটা? ব'লেই সে হনহন ক'রে চ'লে গেল। বলতে বলতে গেল—বেটা শালা হারামজাদা গুখোরবেটা লেগেই আছে—ভদ্দনোকের মুখে লেগেই আছে। ভদ্দনোক! মাথা কিনেছে। অ.—

সে এসে দাঁড়াল সেই গাছতলায়। কই, পানা কই? সে 'যেল' অর্থাৎ গেল কোথায়?

যারা ব'সে ছিল তারা হতভম্ব হয়ে গিয়েছে করালীর কাণ্ড দেখে। ভাবছে, করালী করলে কি? এও কি সম্ভব হয়? অবাক ক'রে দিয়েছে করালী। ছোকরার বুকে পাটা বটে! সঙ্গে সঙ্গে এও তাদের মনে হচ্ছে যে, করালী কথাটা কিন্তু ঠিক বলেছে। ওই বাক্যগুলি মণ্ডল মশায় বাবু মশায়ের মুখে লেগেই আছে। রাগ হ'লে কথাই নাই, আদর করবেন, তাও বলবেন—হারি রে শালো! আদর ক'রে 'কেমন আছিস' শুধাবেন, তা বলবেন—রে হারামজাদা, রইছিস কেমন? কথাটি করালী বলেছে ঠিক। তবে—। [illegible] এমন চ'ড়ে উঠে না বললেই হ'ত।—লঘু-গুরু তো মানতে হয়। ভগবান [illegible] কালারুদ্দের বিধানে তো এ সব লেখাই আছে, পায়ে মাথায় সমান নয়।

করালী আবার প্রশ্ন করলে—বলি, সে শালো গেল কোথা রে? আ কাড়িস না যে? অ্যাঁ!

মাথলা বললে—সে পালালছে কোথা।

—পালালছে! শালো খ্যাঁকশ্যাল। পেলে হয় শালোকে।—করালী আর

দাঁড়াল না। তেরপলের জামাটা পরে লম্বা লম্বা পা ফেলে চ'লে গেল, যেন সাপের পাঁচ-পা দেখেছে !

তেরপলের তলায় একটি ফোঁটা জল পড়ে না। নির্বিঘ্নে চলছে গুড় তৈরির কাজ। উনোনের পাশে লম্বা বাঁখারিতে নারকেলের মালা-গাঁথা হাতা দিয়ে গাদ অর্থাৎ ময়লা তুলতে তুলতে বনওয়ারী ভাবছিল ওই করালীরই কথা। ছোকরা অসম্ভব কাণ্ড ক'রে তুলেছে। যা-খুশি তাই করছে। কোন বিধি-বিধান মানছে না, শাসনের বাইরে গিয়েছে, কথায় কথায় ঝগড়া, পদে পদে বিপদ বাধিয়ে তুলছে।

আজই যদি তেরপলটার নেহাত দরকার না থাকত, তবে হেদো মণ্ডল ছাড়তেন না। কাণ্ড একটা ঘ'টে যেতই। নাঃ, বনওয়ারীর এ বড় খারাপ লাগছে। কাঁটাগাছ—করালী সেই কাঁটাগাছের চারা, তুমি আদর ক'রে কোল দিতে যাও, বুকে তোমার বিঁধে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দেবে। তবে বেটা-ফেটা কথাগুলি খারাপ বটে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বনওয়ারী। আঃ, ছোকরাটি যদি ভাল হয়ে চলত, 'শলা-সুলুক' নিত, মানত। ওই চন্দনপুরের কারখানাতেই ওর মাথা খারাপ ক'রে দিলে।

বৃষ্টি আরও জোরে এল। সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাস। বৃষ্টির জলের ঢল নামছে, গ্রাম থেকে বেরিয়ে মাঠের দিকে চলেছে। ওঃ, তেরপলটা না হ'লে আজ সব মাটি হ'ত। সব বরবাদ যেত। ওঃ, ঝম-ঝম ক'রে জল ! কাহার-পাড়ায় মেয়েছেলেগুলো কলকল করছে। ফাগুন মাস, চালে এখনও নতুন খড় পড়ে নাই, পুরানো খড় পচেছে, উড়ে গিয়েছে, দেবতার জল সবটুকুই ঘরে পড়ছে আজ। আহ-হা, সমস্ত রাত্রি ঘুমুতে পাবে না।

ছেড়ে দাও বাবা, দেবতা, হে কালারুদ্দু, ক্ষান্ত দাও বাবা ! কাহারদিগে আর মেরো না। মাইতো ঘোষ বলেন—এল ডাউরী ম'ল বাউরী। বাদলা বর্ষা হ'লে কাহারদেরই মরণ।

বাতাসে গাছপালার মাথা দুলছে। বাঁশবাঁদির বাঁশবনে মাতন লেগেছে।

ঝরঝর শব্দে বৃষ্টি পড়ছে বাঁশের পাতায়, ক্যাঁ-কট-কট-কট শব্দ উঠছে দোলন-লাগা বাঁশে বাঁশে ঘষা খেয়ে। মাঠ থেকে ভিজে মাটির গন্ধ ভেসে আসছে।

হঠাৎ প্রহ্লাদ কোদালখানা হাতে নিয়ে উঠল।

—কোথা যাবি?

ওই দেখ।—প্রহ্লাদ দেখাল, গ্রাম-গড়ানি জলের ধারার মধ্যে এক পাশে কষের কালির মত একটা জলের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে। কার সার-ডোবা ভেসেছে। সার-ধোয়া জলের ওই রঙ, ওই ধারা। কিছুতেই জলের সঙ্গে গুলে এক হয়ে যাবে না, এক পাশ ধ'রে চলবে। আর ওতে পা দাও, দেখবে ফুটন্ত জলের মত গরম। পাশে মাটি-রঙের জলে পা দাও, দেখবে ঠাণ্ডা।

প্রহ্লাদ বললে—আমার আউশের ভুঁইখানা ছামনেই, দিই কেটে ঢুকিয়ে, একবারে জমির সালসা।

দে, ঘুরিয়ে দে। বনওয়ারীর জমি দূরে। আর সায়েবডাঙায় কোদাল চলবে এইবার।

ওঃ, বুনো শুয়োরগুলো চীৎকার করছে সায়েবডাঙায়। বেটারা ভিজে মাটি খুঁড়ে কন্দ খেতে বেরিয়েছে। সায়েবডাঙার মাটি নরম হয়েছে।

সাত

সায়েবডাঙা, কেউ বলে—কুঠিডাঙা।

পাথুরে মাটির ঢলন একটা—খানিকটা উঁচু—খানিকটা নীচু, আবার নিকটা উঁচু—লাল কাঁকরে ভরা—ঢেউ খেলানোর ভঙ্গিতে একটা ঢলন যেন মে এসেছে সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের দেশ থেকে। পশ্চিম থেকে পূবে লে এসেছে একটা ব-দ্বীপের চেহারা নিয়ে। এই ঢলনের আশেপাশে বাংলা শের মাটি। সেখানেই দেশের চাষের মাঠ, সে সব মাঠে নানা ফসল ফলে। সুলীর বাঁকে—এই লাল মাটির একটা ফালি এসে শেষ হয়েছে হাঁসুলীর কের পশ্চিম-উত্তর মাথায়। এইখানে নীলকর সায়েবেরা তাদের কুঠি তুলে-

ছিল। এই মাটিতে আট মাস ঘাস জন্মায় না, আষাঢ় থেকে আশ্বিন পর্যন্ত কঠিন রোগে চুল-উঠে-যাওয়া মানুষের মাথায় সদ্য-গজানো রোগা চুলের মত পাঙাশ-সবুজ রঙের ঘাস গজায়। উঁচু সায়েবডাঙায় ঢলন ক্রমশ নীচু হয়ে কোপাইয়ের চরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। কোপাইয়ের বন্যার ভয়েও বটে, এবং বন-জঙ্গল কাদা নাই—ঝকঝকে তকতকে ব'লেও বটে, সাহেবেরা এইখানে কুঠি তুলেছিল। সাহেবদের আমলে এই ডাঙা ছিল রাজপুরী। সুচাঁদ বলে—বাবারা বলত, অ্যাই বড় বড় ঘোড়া, এই ঝলর-দেওয়া সওয়ারী অর্থাৎ পালকি। এই সব বাংলা-ঘর, ফুল বাগিচা, বাঁধানো খেলার জায়গা, কাঠ-কাঠরার আসবাব ; সে ঐশ্বর্যের কথা এক মুখে বলা যায় না। এক দিকে কাছারি গমগম করত, বন্দুক নিয়ে পাহারা দিত পাইক আটপৌরেরা—মাথায় পাগড়ী বেঁধে লাঠি নিয়ে ব'সে পাহারা দিত। জোড়হাত ক'রে ব'সে থাকত চাষী সজ্জনেরা—ভয়ে মুখ চুন! দু-দশজনাকে বেঁধে রাখত। কারুর শুধু হাতে দড়ি, কারুর বা হাত-পা দুইই বাঁধা। সায়েব লোক, রাঙা রাঙা মুখ, কটা কট চোখ, গিরিমাটির মত চুল, পায়ে অ্যাই বুট জুতো—খট মট ক'রে বেড়াত পিঠে 'প্যাটে' জুতো সুদ্ধ লাথি বসিয়ে দিত, মুখে কটমটে হিন্দী বাত—মারডালো, লাগাও চাবুক, দেখলাও শালোলোগকো সায়েব লোকের প্যাঁচ কখনও হুকুম হ'ত—কয়েদ করো। কখনও হুকুম হ'ত—ভাঙ দেও শালে-লোকের ধানকো জমি। লয়তো, কাটকে লেও শালোকে জমির ধান। সে তোমার বামুন নাই, কায়েত নাই, সদ্গোপ নাই—সব এক হাল। 'আতে সারি সারি বাতি জ্বলত—টুং-টাং—ক্যাঁ-কোঁ—ভ্যা-পো ভ্যাঁ-পোঁ বাজনা বাজত, সায়েব মেম বিলিতি মদ খেত, হাত ধরাধরি ক'রে নাচত, কয়েদখানায় মানুষ চেঁচালে হাঁকিড়ে উঠত বাঘের মত—মৎ চিল্লাও। বেশি 'আত' হ'লে সেপাইরা বন্দুকের রজ করত—দুম-দুম-দুম-দুম। হাঁক দিত—ও—হো—ই তফাৎ যাও—তফাৎ যাও—চোর বদমাস হুঁশিয়ার! চোরই হোক আর সাধুই হোক এতে ওদিকে হাঁটলে অক্ষে থাকত না ; দুম ক'রে গুলি ক'রে দিত।

সেই ডাঙা এখন ধূ-ধূ করছে। নীলকুঠির চিহ্নের মধ্যে আছে কেবল

সাহেবদের লাগানো আমবাগানের মধ্যে ভাঙা নীলের হ্রদগুলো, আর বাংলার কিছু কিছু ভিত। সেগুলোর চারি পাশে ঘন ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। কাঁকুরে পাথুরে ডাঙার এই ঠাঁইটুকুতে সাহেবরা সার মাটি দিয়ে খুঁড়ে-খুসে জল ঢেলে অদ্ভুত উর্বর ক'রে তুলেছিল। তখন ছিল বাগান, এখন জঙ্গল। বাকিটা চিরকালের সেই লাল মাটি ধূ-ধূ করছে।

সুচাঁদ ডাঙাটার ধারে দাঁড়িয়ে মধ্যে মধ্যে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে আক্ষেপ করে। চোখ দিয়ে তার সত্যই জল পড়ে। হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবাদির কাহার-পাড়ায় মানুষদের প্রকৃতি আছে, চরিত্র নাই। অল্পেই ওরা হাসে, অল্পেই ওরা কাঁদে; নিজের দুঃখেও কাঁদে, পরের দুঃখেও কাঁদে। মহাবনে মহাগজ পতনের সংবাদ পেলে কৌতূহলবশত দেখতে যায় এবং এত বড় দেহটি অসাড় হয়ে প'ড়ে থাকতে দেখে ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদে। তবে ওদের পুণ্য নাই, ওদের চোখের জলের স্পর্শে মৃত জীবন্ত হয়ে উঠে না। সুচাঁদের মুখে সাহেবডাঙার গল্প শুনে সবাই চোখ মোছে, তবে সুচাঁদের মত এত কাঁদতে কেউ পারে না। সুচাঁদ সেই উপকথার শেষের যুগের মানুষ যে!

সুচাঁদ চোখ মুছে বলে—আঃ, আঃ, রোপোকথায় সেই যে বলে, রাক্ষুসীর খাওয়া পুরী, এ তাই। খাঁ-খাঁ-খাঁ-খাঁ করছে।

সত্যই খাঁ-খাঁ করে। মানুষজন ওদিকে বড় কেউ আসে না। দাঁতালের আড্ডা, জঙ্গলে-ভরা ভাঙা নীলকুঠি। রাত্রে ওরাই দল বেঁধে বার হয়, ছুটে গিয়ে পড়ে নদীর ধারে, দাঁতে মাটি চিরে নানান গাছের মূল তুলে খায়। ধানের সময় মাঠে গিয়ে পড়ে। মাঠে মাচান বেঁধে টিন বাজিয়ে কাহারেরা তাদের তাড়ায়। ছোট ছোট বাঁখারিতে শক্ত দড়ি-গাঁথা বঁড়শী বেঁধে মদের মেয়া ও কলার টোপ গেঁথে ছড়িয়ে দেয় মাঠময়, ধান খেতে এসে মুখে বঁড়শী গেঁথে পায়ে দড়ি আটকে ওদের ধরে মারে। বেশি উপদ্রব হলে দল বেঁধে গিয়ে মেরে আসে ওদের।

সেই কুঠিডাঙায় কোদালের কোপ পড়ছে।

জল ঝড় হয়ে গিয়েছে দু দিন আগে। বৃষ্টি বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণেই হয়েছে। চন্ননপুরের বড়বাবুরা সাঁওতাল মজুর লাগিয়েছেন প্রায় দেড় শো। এই লাল কাঁকুরে মাটির একটি বিশেষত্ব আছে। যে মাটি পাথরের মত শক্ত, কোদালে কাটে না, কোপ মারলে খানিকটা লাল ধুলো ওড়ে, চোখে মুখে মিহি বালি ছিটকে লাগে, সেই মাটি বৃষ্টিতে ভিজলে কয়েকদিন ধরে ভুরোর মত নরম হয়ে থাকে। মাটির এই অবস্থার নাম 'বতর'। এখানকার মাটি-কাটার সুযোগ এই বতর। এ সুযোগ গেলে মাটি-কাটা আবার কঠিন হয়ে পড়বে। সাহেবডাঙার যে ঢালটা নেমেছে কোপাইয়ের দিকে, সেই ঢালে চাষের জমি তৈরি হচ্ছে। ঢালের শ্রেষ্ঠ অংশটায় চন্ননপুরের বড়বাবুদের নিজের জমি তৈরি করছে সাঁওতালেরা। কাছাকাছি জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়দের কয়েকজন সেলামি দিয়ে খাজনা-বন্দোবস্তিতে জায়গা নিয়েছে। তারা নিজেরা ব'সে আছে, খাটছে কৃষাণ মাহিন্দার সঙ্গে দু-চারজন মজুর। বনওয়ারী সবচেয়ে খারাপ পাঁচ বিঘা জায়গা নিয়েছে। বিনা সেলামিতে জমি, নীরস তো হবেই। তা ছাড়া কাহার-বাউরীর অদৃষ্টে এর চেয়ে ভাল জমি হবেই বা কেন? সে নিজেই কোপাবে মাটি, সেই মাটি ঝুড়িতে তুলে মাথায় ব'য়ে আলবন্দী করে ফেলবে বনওয়ারীর বউ আর সুচাঁদ পিসী। সুচাঁদ পিসীকে বনওয়ারী মজুরি দেবে অবশ্য। তিন পহর খাটবে, চোদ্দ পয়সা নগদ পাবে আর পাবে জলখাবার মুড়ি। আর কথা আছে—বিকেলবেলা ঠাণ্ডার সময় ছুটির পর প্রহ্লাদ রতন পানু আরও জনকয়েক কোদাল নিয়ে এসে মাটি কেটে রেখে যাবে। পরের দিন সেই মাটি তুলে ফেলবার জন্য পাড়ার কয়েকজন মেয়েকে লাগাবে বনওয়ারী। বনওয়ারী এক হাঁটু গেড়ে ব'সে প্রণাম করলে—'আচোট মাটিকে' অর্থাৎ কুমারী ভূমিকে। মনে মনে বললে—তোমার অঙ্গে আঘাত করি নাই মা, তোমার অঙ্গকে মার্জ্জনা করছি। সেবা করছি তোমার। তুমি ফসল দিয়ো। আমার ঘরে অচলা হয়ে থেকো। তারপর সে কোঁচড় থেকে খুলে সেখানে নামিয়ে দিলে—বাবাঠাকুরের পূজার ফুল। জয় বাবা, তুমি

অক্ষে কর। যেন পাথর না বার হয়! যেন জন্তু-জানোয়ার না বার হয়! হাতে তালি দিয়ে বললে—কীট-পতঙ্গ, সাপ-খোপ, সাবধান, তোমরা স'রে যাও। আমি আজার কাছে জমি নিয়েছি, দেবতার কাছে আদেশ নিয়েছি—এ জমি আমি কাটব। সে কোপাতে লাগল। সদ্‌গোপ মহাশয়েরা নিজে হুঁকোয় তামাক খেয়ে মধ্যে মধ্যে কৃষাণ মাহিন্দারদের দিচ্ছেন। সাঁওতালেরা 'চুটা' খাচ্ছে। বনওয়ারী দু পয়সার বিড়ি কিনে এনেছে, নিজে খানিকটা খেয়ে এঁটো বিড়ি বউকে দিচ্ছে, সুচাঁদকে দিচ্ছে গোটা বিড়িই। পিসীও বটে, তা ছাড়া পুরো একটা বিড়ি না খেলে সুচাঁদের নেশাও হবে না। কিন্তু সুচাঁদ বিড়ি খেতে চায় না, তামাকই তার সব চেয়ে প্রিয়। হঠাৎ সুচাঁদ হেদো মণ্ডলের কাছে গিয়ে বললে—কল্কেটা একবার দাও কেনে গো!

মণ্ডল বিনা বাক্যব্যয়েই কল্কেটা নামিয়ে দিলে। সুচাঁদ মণ্ডলের সামনেই উবু হয়ে, অবশ্য লজ্জা ক'রে পিছন ফিরে বসে নারীত্বের ভূষণ বজায় রেখে, তামাক খেতে লাগল। হঠাৎ এক সময় লজ্জা ভুলে সামনে ফিরে বললে—তুমি তো তবু কল্কে দিলে মোড়ল, পানার মুনিব হ'লে মারতে আসত আমাকে। অথচ আমার মেয়ের তরে যখন অণ্ড ধরেছিল, তখন আমার পায়ে ধরতে এসেছিল।

হেদো মণ্ডল ধমক দিয়ে চীৎকার করে বললে—থাম্‌, এখানে বকবক করিস না। হেদো মণ্ডলের গলার আওয়াজ একেই খুব জোর, তার উপর সুচাঁদকে কালা জেনে চীৎকার করেই কথা বলায় সুচাঁদ স্পষ্ট শুনতে পেলে কথাগুলি। এর জন্যে সে হেদো মণ্ডলের উপর বরাবরই খুব সন্তুষ্ট।

—বকবক করব না?

—না।

কিছুক্ষণ হেদো মণ্ডলের মুখের দিকে চেয়ে রইল সুচাঁদ, তারপর বললে—সব শেয়ালের এক রা। তা বেশ। আবার সে তামাক খেতে লাগল। আবার বললে—তোমরা বুঝি আর কোদাল ধরবা না, নয়?

হেদো মণ্ডল ব'লে উঠল—এ-হে-হে! এ মাগী তো বড় জ্বালালে দেখছি!

—কেনে? জ্বালালাম কি ক'রে? বলি, জ্বালালাম কি ক'রে? তোমার বাবাকে দেখেছি নিজে হাতে কোদাল ধরে ওই লম্বা বাকুড়ি কাটতে। হাঁস্ হাঁস্ ক'রে সে কী কোদালের কোপ! তোমরাও তো কাটতে গো মাটি নিজে হাতে। আমি তো ভূশণ্ডী কাক—আমার তো দেখতে বাকি নেই কিছু।

কথাটা সত্য, কিছুকাল অর্থাৎ বিশ-পঁচিশ বৎসর আগেও এই সব মণ্ডল মহাশয়েরা পুরাপুরি চাষী ছিলেন। জমি কাটাইয়ের কাজ থেকে আরম্ভ ক'রে চাষের কাজ পর্যন্ত কৃষাণ মাহিন্দার এবং মজুরদের সঙ্গে নিজেরাও প্রত্যেক কাজটি ক'রে যেতেন, তাতে অপমান বোধ করতেন না। এই বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এমন ওলটপালট হ'ল যে, সদ্গোপ মহাশয়েরা এখন আধাবাবু হয়ে উঠেছেন। হেদো মণ্ডল নিজেও এ কথাটা ভাল ক'রে বুঝতে পারে, তার শরীরে প্রচুর ক্ষমতা এখনও, এবং চাষে কর্মে তার গভীর অনুরাগ। সকল কাজ পূর্বের মত করতে তার ইচ্ছাও হয়, কিন্তু পারে না। পারে না, নিজেদের জাতি-জ্ঞাতির কাছে লজ্জা পেতে হবে বলে; আঃ, হায় রে! কি যে ইংরিজী বাবুগিরির ঢেউ এল দেশে।—এই বলে মনে মনে আক্ষেপ করে সে। বাড়ির দরজা বন্ধ ক'রে তবুও সে অনেক কাজ করে। কিন্তু সুচাঁদের কাছে স্বীকার করতে পারে না সে কথাটা। সে বিরক্ত হয়েই বললে—বকিস না মেলা। তোরা যে মরা কুকুর বিড়েল ফেলা ছেড়েছিস, আবার রব তুলেছিস মরা গরু কাঁধে করে ফেলব না, বাড়ি নদ্দমা পরিষ্কার করবি না বলছিস! বলি, তোরা এত বাবু হলি কি করে? তোরাও বাবু হচ্ছিস, আমরাও বাবু হচ্ছি! না হ'লে আমাদের মর্য্যাদা থাকে কি ক'রে?

সুচাঁদ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে বনওয়ারীকে। বললে—ওই—ওই মুচ্ছুদ্দি, বুঝলে মণ্ডল—ওই বনওয়ারীর মাতব্বরি এ সব। ওই ধুয়ো তুলেছিল—মরা কুকুর বেড়েল ফেলব না। তা'পরেতে সবাই মিলে গুজুর গুজুর ক'রে ধুয়া ধরেছে—গরু ফেলতে হ'লে কাঁধে ক'রে ফেলাব না,—গাড়ি চাই; জলনিকেশী লালা ছাড়াব, কিন্তু এঁটো-কাঁটা ময়লা মাটির পচা নদ্দমাতে হাত দোব না। আমি বলি, বাপ পিতেমোর আমল থেকে ক'রে আসছিস করবি না

কেনে? তা বনওয়ারী ঘাড় লেড়ে বলে—উঁ-হুঁ, মুদ্দোফরাস মেথরের কাজ করব কেনে?

হেদো মণ্ডল এবার ক্ষেপে উঠলেন—বনওয়ারীর দোষ? বলি, হ্যাঁ রে মাগী, তোর নাতজামাই করালী যে সেদিন আমাকে বললে—বেটা-ফেটা ব'লো না মশাই, সেও কি বনওয়ারীর দোষ নাকি?

সুচাঁদ গালে হাত দিলে—হেই মারে! তারপর বললে—ওকে আমি দু চক্ষে দেখতে নারি। পাড়ার সব্বনাশ করবে—দেখো তুমি, সব্বনাশ করবে।

বনওয়ারীর কানে কথাগুলি সবই যাচ্ছিল। সুচাঁদ পিসী কালা, হেদো মণ্ডল চীৎকার ক'রে কথা বলছে। সুতরাং শুধু সে কেন, এখানকার সকলেই শুনতে পাচ্ছে। সে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে ডাকলে—বলি, তামুক খাবা আর কতক্ষণ?

সুচাঁদ ব্যস্তভাবে উঠল। বনওয়ারীকে খাতির সে করে না, কিন্তু আজ বনওয়ারী সুচাঁদের প্রায় মনিব-স্থানীয়, নগদ চোদ্দ পয়সা এবং জলখাবারের মুড়ি দেবে সে। উঠেও সে দাঁড়াল। কিন্তু হঠাৎ দুঃখের আবেগে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলে, তারপর হেদো মণ্ডলকে বললে—আমার ললাট দেখ কেনে মণ্ডল মশায়। এই বুড়ো বয়সে মজুরি খাটছি। ওই করালীকে বিয়ে করেছে ব'লেই লাতিলের সাথে বসনের সাথে ভিন্নু হয়েছি আমি।

আবার সে বসল। গলা ফাটিয়ে মণ্ডলকে বললে—আমি বলেছিলাম বসনকে, ওই হারামজাদী পাখীকে—নয়ানের হাঁপানি ধরেছে, ভাল হয়েছে, নামের মরদ নামে থাকুক। পাখীর এমন উঠতি বয়স, কিছু ওজগার-টোজগার ক'রে লে। তা'পরেতে খানিক-আদেক বয়েস হোক—এক কুড়ি, ড্যাড় কুড়ি হোক, তখন 'ছাড়বির' ক'রে সাঙা দিবি। না কি বল মণ্ডল? সুচাঁদ আবার কাঁদতে লাগল—আমার প্যাটের বিটী বসন, বসনের প্যাটের বিটী পাখী—

এবার বনওয়ারী কাছে এসে দাঁড়াল। সুচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—চল্ বাবা, চল্। এই দুটো পরানের বেথার কথা মণ্ডল মশায়কে বললাম। খুঁড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলে সে নিজের কাজের জায়গার দিকে।

বনওয়ারী মাটি-বোঝাই ঝুড়িটা তার মাথার উপর তুলে দিতেই সুচাঁদ বনওয়ারীর মুখের দিকে তাকিয়ে কাতর অনুনয় ক'রে বললে—আগ করেছিস, হা? বনওয়ারী?

বনওয়ারী উত্তর না দিয়ে ঘুরে কোদালটা ধ'রে মাটিতে কোপ মারতে আরম্ভ করলে। মোটা বলিষ্ঠ হাতে রাগের মাথায় সে কুপিয়েই চলল। কিছুক্ষণ পর দাঁড়িয়ে কোমর ছাড়িয়ে নিলে, ধুলোমাখা হাতের আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম টেনে চেঁছে ফেললে। দেড়শো সাঁওতালের টামনার কোপে বাবুদের কাজ এগিয়ে চলেছে কোপাইয়ের বানের মত। আর তার কাজ চলছে রিমিঝিমি বর্ষায় ধানের জমিতে গরুর ক্ষুরের খালে জল জমার মত। তা হোক। এমনি ক'রেই চিরদিন কাজ চ'লে আসছে। বাবুদের কাজ চলবে দিনকয়েক—যতদিন 'বতর' থাকবে ততদিন, তার কাজ চলবে বারো মাস। রোজ বিকালে এসে সে খানিকটা ক'রে কেটে যাবে। এবার মাত্র একখানা জমি তৈরি করবে সে। বাকি জমিটায় চাষ দিয়ে ভাদ্র মাসে কতকটা 'তেপেখে' অর্থাৎ তিন পক্ষীয় কলাই, কতকটা ঘেসোমুগ, কতকটা বরবটি ছিটিয়ে দেবে। তারপর আসছে মাঘে যে জলটা হবে, সেটা হ'লেই লাঙল চালিয়ে মই দিয়ে ঠেলে মাটি সরিয়ে আলবন্ধনের চেষ্টা করবে; তারপর কিছু মাটি কেটে সমান করবে; সঙ্গে সঙ্গে আল-বন্ধনও শক্ত হবে। এভাবে জমি করায় সুবিধাও আছে, ধীরে ধীরে ঠেলে ঠেলে পাশের পতিতের মধ্যে চল না কেন এগিয়ে। নজর পড়বে না কারও। পাঁচ বিঘা জমি নিয়েছে বনওয়ারী—ওটাকে সাড়ে পাঁচ বিঘা তো করতেই হবে।

প্রথম ফসল উঠলে সে ফসলের ভোগ দিতে হবে বাবাঠাকুরের থানে, মুগ-সিদ্ধ বরবটি-সিদ্ধ আর এক বোতল পাকি মদ। কালারুদ্দুর পুরুত মশায়কে দিয়ে আসবে গোটা কলাই। বেরাম্ভন পুরুতের মুখেই বাবা খেয়ে থাকেন। তারপর দিয়ে আসবে চন্ননপুরে বড়বাড়ি, নতুন মালিক-বাড়ি। মুখুজ্জে-বাড়িতে 'আজলক্ষ্মী'র ভোগে লাগবে, 'আজা' মহাশয়ের বদনে উঠবে। আর দিতে হবে জাঙলের দু-পুরুষে মনিব ঘোষ-বাড়িতে। তা না দিলে হয়? এই

সব দিয়ে-থুয়ে যদি থাকে, তখন পাড়াতে একমুঠো ক'রে দিতে হবে। তার পরে থাকে থাকবে, না থাকে—তাতেও বনওয়ারীর 'দুস্কু' থাকবে না। চাষের দ্রব্য—'মা-পিথিমির দান', এ পাঁচজনকে দিয়েই খেতে হয়। বিশেষ ক'রে প্রথম বছরের ফসল। দেবতা-ব্রাহ্মণ-রাজা-মনিব-জ্ঞাত-গোষ্ঠী সবাইকে দিয়ে যদি থাকে তো নিজে খাবে, না থাকে হাত-পা ধুয়ে হাসিমুখে ঘরে ঢুকবে। যা দেবে তা তোলা থাকবে—আসছে বছর দুনো হয়ে ঘরে আসবে, যমপুরীর খাতাতেও জমা হয়ে থাকল তোমার নাম।

মনের আনন্দে হুম-হাম ক'রে কুপিয়ে চলল বনওয়ারী। বনওয়ারীর বউ ছুটে ছুটে বইছে ঝুড়িভর্তি মাটি। সুচাঁদ পিসী খুঁড়িয়ে চ'লে এক ঝুড়ি ফেলে ফিরতে ফিরতে সে দু-তিন ঝুড়ি ফেলে আসছে। তার গরজের তুলনা কার সঙ্গে! এ জমি যে তার নিজের হবে।

ওঃ! সেরেছে রে! পাথর লেগেছে। কোদালের তলায় খং-খং ক'রে শব্দ উঠছে। মাটি সরিয়ে দেখলে বনওয়ারী। হাতখানেক মাটির নিচেই পাথর রয়েছে—নুড়িপাথর।

মাথায় হাত দিয়ে বসল বনওয়ারী। নুড়িপাথর এমন-তেমন নয়, একটা মেঝের পাড়নের মত; ইয়া বড় বড় নুড়ি, আধ হাত তিন পো পুরু স্তরে জ'মে আছে। কোদাল দিয়ে টামনা দিয়ে কোপ মারলে ধার ভেঙে যাবে, ভোঁতা হয়ে যাবে অস্ত্র, কিন্তু তাতে তো পাথর উঠবে না। সে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। টামনার বাঁটের উপর হাত রেখে ভাবতে লাগল—উপায়?

বাবুদের সাঁওতাল মজুরেরাও পেয়েছে পাথরের স্তর। টামনা রেখে গাঁইতি ধরেছে। বাবু মহাশয়দের কারবারই আলাদা, আগে থেকেই 'রনুমান' অর্থাৎ অনুমান ক'রে গাড়ি বোঝাই ক'রে গাঁইতি এনেছে। হেদো মণ্ডল বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। সেও ভাবছে, পাথর লাগলে মুশকিল হবে। হেদো মণ্ডল বললেন—লাগল তো? অর্থাৎ পাথর।

বনওয়ারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ, লেগেছে।

—আমি জানতাম। হেদো মণ্ডল সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন, চ'লে গেলেন বাবু

মহাশয়দের চাষবাবুর কাছে। গুজু গুজু ফুসু ফুসু লাগিয়ে দিলেন। বনওয়ারী হেসে ঘাড় নাড়লে অর্থাৎ 'ঢাকে ঢোলে বিয়ে তাতে কাশতে মানা।' চাষবাবুকে কিছু দিয়ে গাঁইতি ভাড়া নেবেন। তার আর চুপিসারে কথা কিসের বাবা!

বনওয়ারীর স্ত্রী হতাশ হয়ে পাশে উবু হয়ে ব'সে পড়ল। সে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি হবে?

সুচাঁদ চোখ বড় বড় ক'রে বললে—ছেড়ে দে, বুল্লি, বাবা—ছেড়ে দে। পাথরের মধ্যে কোথা কোন্ দেবতা আছে, অসুরের কাঁড়ি আছে, তাতে চোট মেরে কাজ নাই—ছেড়ে দে।

সে তুলে নিলে একটা গোল নুড়ি। নুড়িটার কালো গায়ের মাঝখানে গোল সাদা দাগ—ঠিক পৈতের মত। বললে—দেখ্! তারপর তুলে দেখালে একটা টুকরো অসুরের কাঁড়ি। ঠিক গাছের গুঁড়ির মত চেহারা, এগুলিকে সুচাঁদ বলে—অসুরের কাঁড়ি। অর্থাৎ অসুরের হাড় জ'মে পাথর হয়ে গিয়েছে। দেবতারা অসুর মেরেছিলেন, তাদেরই হাড়। এ সব কাহারদের পিতিপুরুষের কথা। কিন্তু বনওয়ারীদের আমলে ও সব বিশ্বাস চ'লে গিয়েছে। সুচাঁদ পিসীর মিথ্যে ভয়। জমি কাটছে বনওয়ারী জীবন-ভোর; পাথরের গায়ে পৈতের মত দাগ হাজারে হাজারে দেখেছে। দেবতা কি হাজারে হাজারে ছড়িয়ে থাকে? পাথরে ও-রকম দাগ থাকে। অসুরের কাঁড়িও তাই। তবে ভাবনা একমাত্র এ পাথর কাটবে কি ক'রে? গাইতি না হ'লে 'রসম্ভব' অর্থাৎ অসম্ভব। কিন্তু গাঁইতি কাহারেরা ধরে না। ঐ ছুঁচালো অস্ত্রটি কখনও তো ধরা হয় নাই, সাহেব লোকের 'রামদানি' অর্থাৎ আমদানি করা অস্ত্রটি যে শূলের মত! ওতে মা-বসুন্ধরার বুকে আঘাত করা কি উচিত? তার উপর পাবেই বা কোথা? বাবু মহাশয়ের চাষবাবুকে ঘুষ দেবার মত টাকা পাবে কোথা?

হঠাৎ মনে পড়ল করালীর কথা। করালী পারে। চন্দনপুরের রেল-কারখানায় গুদাম-বোঝাই গাঁইতি। সে দিতে পারে। কিন্তু—

হেদো মণ্ডল এসে বললেন—কি রে, হতভম্ব হয়ে গেলি যে! চোট মেরেই দেখ্।

তা বটে! চোট মেরে দেখাটা দরকার, কতখানি পাথর আছে! মনে মনে প্রণাম ক'রে সে চোট মারতে আরম্ভ করলে। খং—খং—খং। লোহা এবং পাথরে আঘাত লেগে শব্দ উঠতে লাগল। পাথরের স্তরটা আধ হাতের মত পুরু, নিচে মোলাম কালো মাটি। বাহবা, বাহবা! একেবারে উৎকৃষ্ট ধরনের মাটি। গাঁইতি ধরতেই হবে। না-ধ'রে উপায় নাই। কুঁদোর মুখে বাঁকা কাঠ সোজা, নেয়াইয়ের উপর হাতুড়ির নিচে লোহা জব্দ, গাঁইতির মুখে মাটি-পাথর জব্দ। সে দেখেছে চন্নপুরের লাইনে—দূর থেকে দেখেছে অবশ্য—পশ্চিমা মজুরের হাতের গাঁইতির ঘায়ে পাথর খান খান হয়ে যায়। তাদের চেয়ে কম জোরে কোপ মারে না কাহারেরা।

—আঃ! আরে, বাপ রে, বাপ রে, বাপ রে!

টামনা ছেড়ে দিয়ে বনওয়ারী কপালখানা চেপে ধরলে। হঠাৎ একটা পাথর ভেঙে তার কুচি ছিটকে এসে তার কপালে লেগেছে। ওঃ, বাঁটুলের মত বেগে, কিন্তু তার চেয়ে ভীষণ। বাঁটুল গোল, তার ধার নাই, এটা ধারালো ভাঙা পাথর।

হাতের তালুতে আগুনের মত 'তাই, অর্থাৎ তাপ ঠেকছে কিসের? হুঁ, তা হ'লে নিয়েছে। 'অক্ত' নিয়েছেন মা-বসুমতী।

ছুটে এল বনওয়ারীর পরিবার।—দেখি, দেখি! অক্ত পড়ছে যে গো! হেই মা! কি হবে? পিসী—অ—পিসী!

হেদো মণ্ডলের হাতের কল্কে দেখে সুচাঁদ আবার একদফা তৃষিত হয়ে উঠেছিল। সে শুনতেই পেলে না বনওয়ারীর পরিবারের কথা।

হেদো মণ্ডল দেখেছিলেন, তিনি উঠলেন না, শুধু বললেন—নিয়েছে নাকি?

বনওয়ারী হেসে বললে—হ্যাঁ।

হেদো বললেন—ও তো জানা কথাই। নেবেই। না নিয়ে ছাড়বে না। লাগিয়ে লে, মাটি লাগিয়ে লে।

বনওয়ারী এক মুঠো মাটি তুলে চেপে ধরলে কপালের ক্ষতস্থানে। এতক্ষণে সুচাঁদ দেখতে পেয়ে সামনে উবু হয়ে বসল।

হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা! মা-বসুমতী!

মা-বসুমতী যেমন দেন, তেমনিই নেন। আমন ধানে চালে ফসলে তোমাকে খাওয়াবেন, কিন্তু শেষকালে ‘ছাহখানি’ নেবেন, পুড়িয়ে দিলেও নিদেন পক্ষে ছাইমুঠোটি তাঁকে দিতে হবে। বেঁচে যতদিন আছ, নখ চুল এ দিতে হবে। মধ্যে মাঝে দু-চার ফোঁটা ‘অক্ত’। ‘যে প্যাটে ছেলে ধরে সে প্যাট কি অন্নে ভরে?’ এত মানুষ এত পশু পাখী পেসব করেছেন মা, বুক চিরে ফসল দিচ্ছেন, তার তেষ্টা কি শুধু মেঘের জলে মেটে? মায়ের বুকে চোটাতে গেলে ‘অক্ত’ দিয়ে মায়ের পুজো দিতে হয়! না দাও, মা ঠিক তোমার দু-চার ফোঁটা রক্ত বার ক’রে নেবেনই। নিয়েছেন মা তার পাওনা-গণ্ডা। বনওয়ারী রক্তমাখা মাটি মুঠো ক’রে জমির এক কোণে পুঁতে দিলে।

তবে এ লক্ষণ ভাল; রক্ত যখন নিয়েছেন মা, তখন দেবেন—তাকে দু হাত ভ’রে দেবেন।

ঝম্-ঝম্-গম্-গম্! গম্-গম্-ঝম্-ঝম্! পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে, হাঁসুলী বাঁকের বাঁকে বাঁকে পঞ্চশব্দের বাজনার মত ধ্বনি তুলে দশটার গাড়ি চলেছে কোপাই পাগলীর বুকের ওপরের লোহার মালার পুল পার হয়ে।

মুখুজ্জেবাবুদের সাঁওতাল মজুরেরা গাঁইতি টামনা ঝুড়ি ফেলছে ঝপাঝপ। দশটায় এ বেলার মত ছুটি।

হাঁসুলীর বাঁকে বোশেখ মাসে দ্বাদশ সূর্যের উদয়।

এখানে গ্রীষ্মের দিনে খাটুনির সময় সকাল ছটা থেকে দশটা। আবার ও-বেলায় তিনটে থেকে ছটা।

বনওয়ারীও কোদাল ঝুড়ি তুললে। ও-বেলায় খাটুনি বনওয়ারী খাটবে না। বনওয়ারীর ও-বেলার পালা আরম্ভ হবে সন্ধ্যেবেলা থেকে। চাঁদনী রাত্রি আছে, ফুর ফুর ক’রে ‘বাওর’ অর্থাৎ বাতাস বইবে, মদের নেশার আমেজটি লাগবে, পাড়াপ্রতিবেশী পাঁচজনকেও পাওয়া যাবে, তখন আবার কাজ আরম্ভ

করবে বনওয়ারী। বাবুদের পয়সার খেলা, জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়দেরও কতকটা তাই,—কতকটা দাপটের খেলাও বটে, জবরদস্তি কাজ আদায় ক'রে নেয় তারা। বনওয়ারীর নিজের গতরের খাটুনী, আর পাড়াপ্রতিবেশীর ভালবাসা 'ছেন্দার' খেটে দেওয়ার কাজ। বনওয়ারীর জমি রাত্রে কাটা হবে, জাঙলের মনিবেরা সকালে এসে দেখে বলবেন—এ শালোদের সঙ্গে পারবার জো নেই।

জাঙলের কাছাকাছি এসে সুচাঁদ বললে—বনওয়ারী, তা পয়সা কটা দিবি এখন ?

বনওয়ারী কোমরের গেঁজলে থেকে একটি দুআনি বার ক'রে তার হাতে দিয়ে বললে—এই এক বেলা খাটুনির দামই দিলাম তোমাকে। উ-বেলা আর আসতে হবে না।

—আসতে হবে না ? কেনে ?—বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল সুচাঁদের। সে বুঝতে পেরেছে, বনওয়ারী তাকে শুধু আজ ও-বেলার জন্যই নয়, বরাবরের জন্যই আর কাজে নেবে না।

বনওয়ারী বললে—তুমি বুড়ো মানুষ, তোমাকে নিয়ে কি খেটে পোষায় ? না, তোমারই আর খাটা পোষায় ?

সুচাঁদ খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে—তা বেশ। দে, তাই দে। তোর ধম্ম তোর ঠাঁই। প্যাটের বিটীই যে কালে বৈমুখ, সে কালে আর পরের ভরসা কিসের ? লইলে আমি এখুনও যা খাটতে পারি, তা তোর পরিবারে পারে না।

বনওয়ারী আর কথা বললে না। সে স্ত্রীকে সঙ্গে করে চ'লে গেল গ্রামের দিকে। জলখাবারের সময় হয়েছে, জল খাবে। তার আগে গরুগুলিকে দুইতে হবে ; তাদের মাঠে ছেড়ে দিতে হবে। অনেক কাজ। একটু দেরিই হয়ে গিয়েছে আজ। বনওয়ারীর গড়নটা খুব মোটা, তার উপর জোয়ান বয়সের প্রথম থেকেই বাঁক ব'য়ে পালকি ব'য়ে বাঁ কাঁধটা ডান কাঁধের চেয়ে উঁচু হয়ে গিয়েছে। চলেও সে বেঁকে। ডান পাটা পড়ে জোরে জোরে। হন হন ক'রে

সে চলল। ভিজে আলপথের ডান দিকের কিনারায় তার পায়ের ছাপ ব'সে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা জায়গা ভস করে ব'সে গেল। বনওয়ারী পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে। বললে—হুঁ। সঙ্গে সঙ্গে হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়লে সে।

বউ বললে—কি ?

—পিঁপড়ে।

অসংখ্য পিঁপড়ে গর্তটার ভিতরে বিজবিজ করছে। অধিকাংশের মুখে ডিম।

বউ বললে—আহা, দেখে চলতে হয়! ডিম নিয়ে কেমন আকুলি-বিকুলি করছে দেখ দি-নি।

—তোর মাথা। বনওয়ারী এদিক ওদিক চেয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে একটা পিঁপড়ের সারি দেখিয়ে দিয়ে বলল—ওই দেখ্। অনেকক্ষণ থেকে ওরা পালাতে লেগেছে এখান থেকে। তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বললে—জলঝড় পেচণ্ড একটা হবে লাগছে।

—জলঝড় হবে ?

—পেচণ্ড।

—পেচণ্ড ?

—হ্যা। পিঁপড়েতে জানতে পারে। বর্ষায় দেখিস না, মেঝে থেকে ঢালে বাসা করে ? দাঁড়া।

ব'লে সে এগিয়ে গেল কর্তার থানের দিকে। ওখানে বেলগাছের গোড়াগুলিতে বারো মাস মানুষের হাত পড়ে না, পড়ে কালে কস্মিনে। এই নিরুপদ্রবতার জন্য বেলগাছ-শ্যাওড়াগাছের গোড়াগুলি পিঁপড়ের বাসায় ভর্তি। প্রচুর পরিমাণে বালি এবং মাটির কণা তুলে ছোট স্তূপের আকারে উঁচু ক'রে সাজিয়ে চমৎকার বাসা করে। কিন্তু বর্ষার আভাস মাত্র পিঁপড়েগুলি ডিম নিয়ে উঠে যায় গাছের উপরে, পুরানো গাছগুলির জীর্ণ গাঁঠে ছিদ্র করাই আছে, সেই ছিদ্রগুলি পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বাস করে। বৃষ্টি-অনাবৃষ্টির লক্ষণ জানতে

হ'লে বনওয়ারী ওই গাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে দেখে, পিঁপড়েগুলি নিচে নেমে এসেছে, কি উপরে উঠছে!

বেশি দূর যেতে হ'ল না, কর্তার থানের মুখে এসেই তার নজরে পড়ল, কতকগুলো কাক নেমেছে। বেলগাছের ডালে ব'সে আছে সড়ক-ফিঙের ঝাঁক। তারাও মাঝে মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কাকেদের আশেপাশে লাফাতে লাফাতে ঠুকরে কিছু খেয়ে চলেছে। পিঁপড়ে খাচ্ছে, তাতে আর ভুল নাই। পিঁপড়েরা দল বেঁধে বেরিয়ে উপরে চলেছে। পক্ষীর ঝাঁক নেমেছে, ওদের ভোজ লেগেছে। প্রচণ্ড জলঝড় একটা হবে, তাতে সন্দেহ নাই। পাড়ার লোককে সাবধান 'করতে হবে। এ সব হুস যদি কারু থাকে! বনওয়ারীর আক্ষেপ হ'ল, ব'লে ব'লে কাহারদের সে জ্ঞান দিতে পারলে না!

বনওয়ারী বাড়ি ফিরল। বউ আগেই এসেছে। সে বললে—আচ্ছা বাজে করণে তোমার মতি বটে বাপু! সাবি বেনোদা ব'সে আছে। ওদ উঠেছে—ওরা আর যাবে কখন?

বনওয়ারী বললে—চেঁচাস না, চেঁচাস না, বুল্লি মাগী, একদণ্ড দেরিতে সাবি বেনোদা ওদে ননীর পুতুলের মতন গ'লে যাবে না। আমার কম্ম আমি বুঝি। দে, বাছুর ছেড়ে দে। কেঁড়েটা দে।

গাইগুলি চীৎকার করছিল বাছুরের জন্য, বনওয়ারী গিয়ে কপালে গলায় হাত বুলিয়ে বললে—হচ্ছে, হচ্ছে। মা সকল, ধয্য ধর একটুকুন। হাসতে লাগল সে।

গাই দুয়ে শেষ ক'রে কেঁড়েটি নামিয়ে দিতেই সাবি বললে—গেরস্তরা বলছে বেজায় জল দিছিস দুধে। জল একটুকুন কমিয়ো কাকী।

সাবি বেনোদা দুজনে চন্ননপুরে যায় দুপুরবেলা, সুকৌশলে স্তূপীকৃত ঘুঁটে বড় বড় ঝুড়িতে সাজিয়ে নেয়, তার উপর রাখে দুধের ঘটি। চন্ননপুরের ভদ্রলোকের বাড়িতে দুধের রোজ দিয়ে আসে। চার পয়সা সের দুধ। বনওয়ারীর বাড়ীতে দুধ হয় চার সের। সেই দুধে কোপাইয়ের বালি-খোঁড়া পরিষ্কার জল মিশিয়ে বনওয়ারীর বউ পাঁচ সের ক'রে দেয়। দিন গেলে

পাঁচ আনা পয়সা। তার মধ্যে দৈনিক পাঁচ পয়সা হিসেবে পায়—সাবি আর বেনোদা।

বনওয়ারীর বউ বড় ভাল মানুষ। সে ঘাড় নেড়ে বললে—জল তো সেই এক মাপেই দিই মা। বেশী তো দিই না।

বনওয়ারী সাবির দিকে তাকিয়ে বললে—পথে ঝরনার জল মিশিয়ে তোরা আরও কতটা বাড়াস বল্ দিনি?

বেনোদা বললে—হেই মা গো! আমরা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা? তোমরা বড় স্যায়না হে!—হাসতে লাগল বনওয়ারী।

বেনোদা এবং সাবিও হাসতে লাগল। এ কথার পর আর অস্বীকার করলে না তারা অভিযোগ। বনওয়ারী আবার বললে—একটুকুন কম বাড়িয়ে লিস, মানে—আগে যতটা বাড়াতিস, তার চেয়ে বাড়াস না। তা হ'লে বাবুরা কাড়বে না।

কথাটা সত্য, সাবি এবং বেনোদা—শুধু তারাই বা কেন—কাহারপাড়ার যে সব মেয়ে পরের দুধ নিয়ে চন্দনপুরে যোগান দিয়ে আসে, তারা সকলেই ওই কাজ করে। পথে দুধে খানিকটা জল ঢেলে দুধ বাড়িয়ে দৈনিক দুটো চারটে পয়সা উপরি উপার্জন করে।

বনওয়ারী স্ত্রীকে বললে—ডিমগুলান দিয়ে দে।

স্ত্রী বললে— মনিব-বাড়িতে দেবে বলছিলে যে?

—দে দে। এখন পয়সার টানা, জমি কাটতে নোকজনকে পয়সা লাগবে।

মনিব। মনে মনেই জল্পনা-কল্পনা করে বনওয়ারী। মনিব যে এখন কে হবেন কে জানছেন! চন্নপুরে বড়বাবুর চরণ যদি পায়, তবে—

মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সেই হাসিমুখেই চলল সে করালীর বাড়ীর দিকে। করালী নাই নিশ্চয়। পাখীকে ব'লে আসবে—করালীকে বলিস আমার গোটা কয়েক গাঁইতি চাই। একটু পাড়া ঘুরেই চলল সে, কার ঘরের চালের কেমন অবস্থা দেখে নিচ্ছিল। দু-চার দিনের মধ্যে জল একটু বেশি পরিমাণেই হবে; সামনে বৈশাখ মাস—জল হ'লে ঝড় হতেই হবে।

'পাথর' অর্থাৎ শিলাবৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। সকলকে সতর্ক ক'রে দিতে হবে। কাহারপাড়ার ঘর।

বানে ডোবে, ঝড়ে ওড়ে। দালান নয়, কোঠা নয়, ইট নাই, কাঠ নাই; মাটির দেওয়াল, বাঁশবাঁদির বাঁশ, হাঁসুলী বাঁকের নদীর ধারের সাবুইয়ের দড়ি আর মাঠের ধানের খড়—এই নিয়ে ঘর। কোঠা-ঘর করতে নাই—বাবাঠাকুরের বারণ আছে। তা ছাড়া কোঠায় শোবে বাবুরা, সদ্‌গোপ মহাশয়েরা। কাহারদের কি তাদের সঙ্গে সঙ্গ করতে হয়? না, সাজে?

বনওয়ারীর ভুরু কুঁচকে উঠল। নাঃ, আর পারলে না সে। কাহারদের শিক্ষা হবে না এ জীবনে। তার হাড়ে আর কুলাবে না। সকলের চালই ফুরফুর করছে। কারুর চাল তেমন ভাল নয়। এখন কারুর হুঁশ নাই। এখন বেশ লাগছে। 'আত্তিরে' ঘরে শুয়ে চালের ফুটো দিয়ে চাঁদের আলো আসে, 'দেবসে' 'ওদ' আসে, বেশ লাগছে। গ্রাহ্য নাই। গ্রাহ্য হবে বর্ষার মেঘ নিয়ে এলে সেই ঘোর লগনে। চালের অবস্থা একমাত্র তার ঘরেরই ভাল। এরই মধ্যে চালে সে নতুন খড় দিয়েছে। আচ্ছা বাহার খুলেছে! ওই আর একখানা ঘরের চালেও নতুন খড়। ওখানা তো করালীর ঘর! হ্যাঁ, করালীর বউ তো। বাঃ! বাহাদুর ছোকরা! সে এগিয়ে গেল এর ঘর ওর ঘর দেখতে দেখতে। করালীর ঘরের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল সবিস্ময়ে। এদিক দিয়ে তার পথ নয়। এ পথে সে বড় হাঁটে না। পাড়ার মাতব্বর সে, দরকার না হ'লে সে কারও বাড়ি যায় না। করালীর বাড়ি সে ওদের বিয়ের পরে আর আসে নাই।

হরি হরি হরি! বলিহারি বলিহারি! ঘরখানাকে নিকিয়ে চুকিয়ে রঙ-ঢঙ দিয়ে করেছে কি? মনের মানুষ নিয়ে ঘর বেঁধেছে কিনা ছোকরা! ঘরের সামনেটার উপরের দিকে ঘন লাল গিরিমাটি দিয়ে রাঙিয়েছে, নিচের দিকটায় ছে আলকাতরা। দরজায় দিয়েছে আলকাতরা। দরজার দুপাশে আবার লাল নীল সবুজ হরেক রকম রঙ দিয়ে এঁকেছে দুটো পদ্ম। বাঃ—বাঃ!

বাড়িতে কেউ নেই। পাখী বোধ হয় ঘাস কাটতে গিয়েছে। করালী তো

সকালেই গিয়েছে চন্নপুর লাইনে খাটতে। নসুও গিয়েছে চন্নপুরে মজুরনীদের সঙ্গে খাটতে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সে দেখলে। মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠল তার।

—ক্যা গো? কে দাঁড়িয়ে? এক বোঝা ঘাস মাথায় ক'রে পাখী এসে বাড়ি ঢুকল। বোঝার ঘাসগুলি তার চোখের সামনে ঝুলে রয়েছে ব'লে সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছে না সে।

—আমি রে পাখী। তোদের ঘর দেখতে এসেছি মা। বা-বা-বা! এ যে রিন্দভোবন ক'রে ফেলালছে করালী!

বোঝা উঠানে ধপ ক'রে ফেলে পাখী তাড়াতাড়ি ঘর খুলে একটা নতুন কাঠের চৌকো টুল বার ক'রে দিলে—ব'স মামা।

বা-বা-বা! এ যে টুল রে! বলিহারি বলিহারি! ভদ্দরজনের কারবার ক'রে ফেলালছে করালী!

পাখী ঘর থেকে একটা নতুন হ্যারিকেন, একখানা নতুন সস্তা দামের শতরঞ্চি, একটা রঙচঙে তালপাতার পাখা এনে সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে—এই দেখ, মানা করলে শোনে না, আজেবাজে জিনিস কিনে টাকা-পয়সা ছেরাদ্দ করছে।

হা-হা ক'রে হেসে বনওয়ারী বললে—ওরে বাবা, নতুন বিয়ের এই বটে। তার ওপরে বউ যদি মনে ধরে, তবে তো আর কথাই নাই। তা তোকে মনে ধরা তো ধরা—দুজনেতে মনের মানুষ।

পাখী মুখে আঁচলটা দিয়ে হাসতে লাগল মামার কথা শুনে।

বনওয়ারী উঠল, বললে—আসছিলাম তোর বাড়িতেই। পথে পাড়াটাও ঘুরলাম, সব চাল দেখে এলাম। একটা পেচণ্ড ঝড়জল হবে লাগছে কিনা! তা তোদের ঘরে এসে দাঁড়ালাম, এমন ঝকমকে ঘরদোর দেখে দাঁড়াতে হ'ল। যাই, এখন দেখি—কার চালে খড় আছে, কার চালে নাই। মাতব্বর হওয়ার অনেক ঝক্কি মা।

পাখী বললে—ঝক্কি নিলেই ঝক্কি, না নিলে কে কি করবে? ওই তো

আটপৌরেপাড়ার মাতব্বর অয়েছে পরম—সে ঝক্কি নেয়? এত সব খোঁজ করে? কার চালে খড় নাই, কার ঘরে খেতে নাই—দেখে বেড়ায়? কারও দোষ-গুণ বিচার করে? তুমি এই যে আমার ঘর ক'রে দিলে, লইলে আমি চলে যেয়েছিলাম চন্নপুরে ওর সঙ্গে। তা'পরেতে নিকনে কি ঘটত কে জানে? হয়তো আবারও কারুর সঙ্গে চ'লে যেতাম বিষ্যাশ বিভুঁয়ে। তোমার দয়াতেই আমার সব। তুমি ধাম্মিক লোক, মা-নক্ষীর দয়া অয়েছেন তোমার 'পরে। কত্তাঠাকুরতলায় ধূপ দাও, পিদীম দাও, তোমার ধরমবুদ্ধি হবে না তো হবে কার? পাখী হঠাৎ হেঁট হয়ে তার পায়ের ধুলো নিলে।

বনওয়ারীর বড় ভাল লাগল পাখীকে আজ। বড় ভাল মেয়ে পাখী। বসনের কন্যে, 'অক্তে' চৌধুরী মশায়দের 'অক্তের' মিশান আছে, হবে না ভাল কথা! আনন্দে তৃপ্তিতে তার মন জুড়িয়ে গেল, হিয়েখানি যেন ভ'রে উঠল গরমকালে মা-কোপাইয়ের 'শেতল' জলে-ভরা 'আঙা' মাটির কলসের মত। মনে মনে সে কত্তাঠাকুরকে প্রণাম করলে, বললে—বাবাঠাকুর, এ সব তোমার দয়া। তুমি মাতব্বর করেছ, তুমিই দিয়েছ এমন মন, মতি। তুমি অক্ষে করবে কাহারদের ঘরবাড়ি ঝড়ঝাপটা থেকে। বনওয়ারী তোমার অনুগত দাস, তোমার হুকুমেই সে কাহারপাড়ার চাল দেখছে। লাঙল টানে গরু, তার কি বুদ্ধি আছে, না, সে জানে কোন্ দিকে ঘুরতে হবে, ফিরতে হবে? পিছনে থাকে লাঙলের মুঠো ধ'রে চাষী, তাকে গরু দেখতে পায় না; কিন্তু হালের মুঠোর চাপের ইশারায় গরু ঠিক চলে। বনওয়ারী সেই গরু। বাবাঠাকুর, কত্তাবাবা, তুমি হ'লে সেই চাষী।

তা নইলে করালীর মতিগতি ফেরে! চন্নপুরে কারখানায় পাকা-মেঝের কোয়ার্টার ছেড়ে কাহারপাড়ার বাড়িতে রঙ ধরিয়ে ফিরে আসে! কথাবার্তা মিষ্টি হয়! না, করালী অনেকটা সোজা হয়েছে। এই তো সে দিন নিজে থেকে তেরপল দিয়ে এল গুড়ের শালে। কোনও রকমে ওকে ঘরবশ ক'রে, চন্নপুর ছাড়িয়ে, কাহারদের কুলকর্মের কাজে লাগাতে হবে; ধরমের পথ ধরিয়ে দিতে হবে। সে একদিনে হবে না। 'কেমে-কেমে' 'ধেরো-ধেরো' বাঁকা

বাঁশকে যেমন তাতিয়ে চাপ দিয়ে সোজা করতে হয় তেমনই ভাবে। পাড়ার লোকে ক্ষেপে উঠেছিল করালীর বিরুদ্ধে। কিন্তু তার .তো দশের মত হুট ক'রে মাথা গরম করলে চলে না! ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে তাকে।

ছোঁড়ার একটা দোষ হ'ল 'লবাবী' করা। অ্যাই টেরি, অ্যাই জামা, অ্যাই কাপড়, অ্যাই একটা 'টরচ' আলো, একটা বাঁশী, যেন বাবুর বেটা বাবু বেড়াচ্ছে, কে বলবে কাহারদের ছেলে! মুখে লম্বা লম্বা কথা। লোকে এ সব সহ্য করতে পারে না। তাও অনেক করেছে—অনেক। তবে নাকি শোনা যাচ্ছে, ছোঁড়া আজকাল বে-আইনী চোলাই মদের কারবার করছে চন্নপুরে। কাহারপাড়াতেও আনছে। রাত্রে মজলিস ক'রে এই মদ খায়। সাবধান করতে হবে। শাসন করতে হবে।

বনওয়ারীর মনের মধ্যে একটি সাধ হয়। করালীকে নিয়ে সাধ। সে জেনেছে, বেশ বুঝেছে, এই ছোঁড়া থেকে হয় সর্বনাশ হবে কাহারপাড়ার, নয় চরম মঙ্গল হবে। সর্বনাশের পথে যদি ঝোঁকে তবে কাহারপাড়ার অন্য সবাই থাকবে পেছনে—লাগতে লাগবে তার সঙ্গে। সে পথে করালী গেলে বনওয়ারী তাকে ক্ষমা করবে না। তাই তার ইচ্ছা তাকে কোলগত ক'রে নেয়। তার 'পুত্ত'সন্তান নাই। ডান হাত থেকে বঞ্চিত করেছেন ভগবান। বনওয়ারীর ইচ্ছে, বিধাতা যা তাকে দেন নাই—নিজের কর্মফলের জন্যে—সে তা এই পিথিমীতে অর্জন করে।

পুণ্য তার আছে। বাবার চরণে মতি রেখেছে, নিত্য দু বেলা প্রণাম করে, বাবার থান আগলে রাখে। আঁধার পক্ষের পনরো দিন সনঝেতে পিদীম দেয়। জ্ঞানমত বুদ্ধিমত ন্যায্য বিচারই করে সে। নয়ানের বউ পাখীকে করালীকে দিয়ে অন্যায় একটু করেছে, নয়ানের মা চোখের জল ফেলেছে—তাকে শাপ-শাপান্ত করেছে। তা করুক, বনওয়ারী নিজের কর্তব্য করবে। নয়ানের একটি সাঙা দেবে সে, কনে এর মধ্যেই ঠিক ক'রে ফেলেছে। মেয়েটির রীত-করণ একটুকুন চনফনে, কালামুখী, বদনাম একটু আছে তার বাপের গাঁয়ের সমাজে। তা থাক্, নয়ানের মায়ের ভবিষ্যৎ ভেবেই এমন মেয়ে সে ঠিক করেছে।

নয়ান যদি সেরে না ওঠে, তবে ওই মেয়েই রোজকার ক'রে নয়ানের মাকে খাওয়াবে।

লোকে না ভেবে কথা বলে। ভদ্রলোকে বেশি বলে। তারা বলে—ছোটলোকের জাতের ওর করণ। তাঁরা হলেন টাকার মানুষ, জমির মালিক, রাজার জাত। তাঁদের কথাই আলাদা। কথাতেই আছে, 'আজার মায়ের সাজার কথা'। নয়ান যদি তাঁদের জাতের হ'ত, তবে নয়ান ম'রে গেলেও থাকত তার টাকা জমি, তাই থেকে নয়ানের মা একদিকে কাঁদত, একদিকে খেত। আর কাহারের জাত? না জমি, না টাকা, নয়ান ম'রে গেলে নয়ানের মায়ের সম্বল হবে গতর, গতর গেলে ভিক্ষে। তার চেয়ে এ মন্দের ভাল। পাপ পুণ্যি বনওয়ারী বুঝতে পারে না এমন নয়, সে বুঝতে পারে মেয়েলোকের সতীত্বের মূল্য। কিন্তু বিধির বিধান, উপরে আছেন সৎজাতেরা, তাদের ময়লা মাটি থুথু সবই আপনি এসে পড়ে তাদের গায়ে। সৎজাতের ময়লা সাফ করে মেথর। চরণসেবা করে হাড়ি ডোম বাউরী কাহার। শ্মশানে থাকে চণ্ডাল। বিধির বিধান এসব। কাহারদের মেয়েরা সতী হ'লে ভদ্রজনদের পাপ ধরবে কারা, রাখবে কোথা? কাজেই কাহার-জন্মের এ কর্ম স্বীকার যে করতেই হবে।

পাখী কিন্তু পাখীর মতই কলকল ক'রে চলেছিল—ভোরবেলার পাখীর মত। কত প্রশংসাই সে ক'রে গেল! বাবার চরণে পেনাম জানিয়ে কাহার-জনমের কথা ভাবছিল বনওয়ারী। হঠাৎ পাখীর কণ্ঠস্বর পরিবর্তনে সে একটু চমকে উঠল।

গলা খাটো ক'রে পাখী বললে--জান মামা, ওই মিচকেপোড়া চিপেষষ্ঠী নিমতেলে পানা সেদিন বলছিল—দেখ কেনে মাতব্বরের ধরম, এই বছর না ফিরতে বেরিয়ে যাবে। ফেটে যাবে। পাপ ক'রে যদি বাবাঠাকুরের ঠাঁই ছোঁয় কেউ তবে বাবা তাকে ক্ষমা করে না। তুমি নাকি—? পাখী চুপ করলে।

—কি? আমি নাকি—? কি করেছি আমি?

—ক্যা জানে বাপু! আমার আগেকার শাউড়ী, আটপৌরেপাড়ার কালো-

বউ—এইসব পাঁচজনাকে নিয়ে নানান কথা নানান কেচ্ছা করছিল বলে, সে নাকি নি—চোখে দেখেছে।

বনওয়ারীর বুকটা হঠাৎ ফুলে উঠল রাগে। কানে শোনা কথা, মিথ্যে নয় তা হ'লে।

পাখী বললে—আটপৌরেপাড়ার ঘেঁটুগান কে বেঁধেছে জান ? ওই পানা।

—পানা ?

—হ্যাঁ। নসুদিদির তো ভাবীসাবীর অভাব নাই। ওই আটপৌরেপাড়ার দলের কোন্ ছোঁড়া বলেছে।

—হুঁ। বনওয়ারী মাটির দিকে চেয়ে একটু ভেবে নিলে—আচ্ছা।

পাখী আবার বললে—সে তো এগে একেবারে কাঁই। বলে—মারব শালোকে। পানা নাকি-নি থানায় কি সব লাগান-ভাজান ক'রে এয়েছে ওর নামে। ও নাকি চন্নপুরে চোলাই মদ বিক্কি করে, লুকিয়ে অ্যালের সিলিপাট বিক্কি করে। আমাদের বাড়িতে নাকি সনজেবেলায় ছেলে-ছোকরাদের আড্ডা বসে, নাচগানের ছাউনি দিয়ে ভেতরে ভেতরে নাকি চুরিডাকাতির শলাপরামশ্ব হয়। চোরের দল গড়ে।

সর্বনাশ ! বনওয়ারী চমকে উঠল। পানা, হারামজাদা পানা, ঘরভেদী পানা, কাহারপাড়ার পাপ পানা ! পানাকে মাটিতে ফেলে তার বুকে চেপে বসা অতি সহজ কাজ। কাঠির মত চেহারা, পাখীর মত নাক, ছুঁচোর মত লম্বাটে সরু মুখ পানার, কিন্তু হারামজাদা নিজের চোখে কিছু যেন দেখেছে বলেছে। কি দেখেছে ?

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল বনওয়ারীর, পানার মনিব পাকু মণ্ডল মহাশয়ের কথা। পাকু মণ্ডল বলছিলেন—পানা তাঁকে বাঁশঝাড় বিক্রি করেছে। পাকু মণ্ডলের সন্দেহ নাকি পানা এর মধ্যে কিছু গোলযোগ করেছে। বাঁশঝাড় দেখে তার মনে হয়েছে, ঝাড় একটা নয়, ঝাড় দুটো। চৌহদ্দীটা শুনতে বলেছেন একদিন বনওয়ারীকে। পাকু মণ্ডলের কাছে যেতে হবে তাকে। এক্ষুনি যাবে সে।

উঠে পড়ল বনওয়ারী। করালীর বাড়ি থেকে হনহন ক'রে বেরিয়ে সেই দুপুর রৌদ্রেই চলল সে পাকু মণ্ডলের কাছে।

পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। যাঃ, পাখীকে আসল কথাটাই বলা হ'ল না! গাঁইতির জন্যে বলতে এসে পানার চতুরালির কথা শুনে মাথা ঘুরে গেল তার! ভুলে গেল আসল কথা!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। মাতব্বরির যত সুখ তত দুঃখ। চড়কের পাটা থাকে মানুষের মাথায়, সেই পাটায় গজাল পোঁতা থাকে, তার উপর শুতে হয় গাজনের প্রধান ভক্তকে। মাতব্বরিও তাই। মানুষের মাথার উপরে কাঁটা-ভরা পাটায় শোয়া। হে ভগবান! পানা তার সব্বনাশ করবে। এটা অবশ্য তার পাপ, তার অন্যায়। কিন্তু সে তো মানুষ! কালো বউ—

হঠাৎ মাথায় যেন তার বিদ্যুতের মত খেলে গেল—চড়কের পাটা! সামনে গাজন। বাবা কালারুদ্দের চড়কের পাটায় শুয়ে সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে লোকের সামনে প্রমাণ করবে তার কত পুণ্য।

এগারো

শিবো হে! সকল বুড়ার আদি বুড়া, সকল দেবতার বড় দেবতা—বাবা বুড়া শিব, বাবা কালারুদ্দু! বেলতলার বাবাঠাকুর, কাহারদের দেবতা! তাঁরও দেবতা বাবা কালারুদ্দু। ধম্ম রঞ্জ—যে ধম্মরাজ—তারও বড় বাবা কালরুদ্র।

এবার বাবা কালারুদ্রের গাজনে চড়কের গজাল পেটা ঘুরচাকির গজালের মাথায় শোবার পুণ্য সে অর্জন করবে। করতেই হবে তাকে।

বাবা কালারুদ্দু—কর্তাঠাকুরের উপরওয়ালা। বাবাঠাকুরের বাবা। 'লারায়ণে'র যেমন 'লারদ', বাবা কালারুদ্দুরের তেমনি ন্যাড়া-মাথা গেরুয়া-পরা খড়ম-পায়ে দণ্ড-হাতে কর্তাঠাকুর। কর্তার ইচ্ছেতে কর্ম, কালরুদ্রের হুকুমে মরণ-বাঁচন। গতবারে গাজনের ঠিক পনেরো দিন পরেই বাবা কালা-

রুদ্দের প্রধান ভক্ত মারা গিয়েছে। প্রধান ভক্তই চড়কের পাটার গজালের ডগায় শোয়, সে-ই দু হাতে আগুন ফুলের ‘আজল’ অর্থাৎ অঞ্জলি নিয়ে চাপিয়ে আসে বাবার মাথায়, সে-ই নাচে আগুনের ফুলের উপর। মড়ার মাথা নিয়ে তাকেই খেলতে হয়। নিজের অনেক পুণ্য—তার অনেক বেশি দেবতার দয়া না থাকলে কালরুদ্রের প্রধান ভক্ত কেউ হতে পারে না। এবার সেই প্রধান ভক্তের খালি ঠাঁইয়ে বনওয়ারী গিয়ে শোবে। সংকল্প দৃঢ় ক'রে ফেললে সে। বাবা কালারুদ্দের প্রধান ভক্ত চিরকাল হয় নীচ জাতের লোক। সেই আদ্যিকালের বাণ-গোঁসাইয়ের কাল থেকে। সুচাঁদ পিসী বাণ-গোঁসাইয়ের কাহিনী বলে। বাণ-গোঁসাই ছিল ছোটজাতের রাজা, কিন্তু ভোলা মহেশ্বর কালারুদ্দের ভক্ত। মদ খেত, ‘মাস’ খেত, কিন্তু বাবার চরণে ফুল দিত, গাজনে সন্ন্যেস করতে কখনও ভুলত না। সন্ন্যেস ক'রে আগুনের আঙারের ওপর ব'সে বাবাকে ডাকত, লোহার কাঁটার শয্যেতে ‘শয়েন’ করত, সোনা রূপো হীরে মানিকের গয়না ছেড়ে মড়ার হাড়ের মালা গলায় পরত। কিবা ‘আত্তি’ কিবা দিন গাল বাজিয়ে বম্-বম্ করত, বাবার নামগান করত। ‘শিবো হে—শিবো হে—শিবো হে!’ বাবার দয়াও তাঁর ওপর খুব। পিথিমীর ‘আজা-আজড়া’ থেকে দেবতারা পর্যন্ত বাণ-গোঁসাইয়ের সঙ্গে এঁটে উঠত না। গোঁসাইয়ের একশো পরিবার। একটিমাত্র সন্তান—তাও কন্যে; কন্যের নাম ‘রোষা’ অর্থাৎ ঊষা। সেই রোষাকে দেখে লারায়ণের লাতির মন টলল। লারায়ণের লাতি একদিন লুকিয়ে ঢুকল বাণ-গোঁসাইয়ের বাড়িতে রোষাবতীর ঘরে। বাণ-গোঁসাই জানতে পেরে বলে—কাটব লারায়ণের লাতিকে। লারায়ণের আসন টলল, মুকুট লড়ল। লারায়ণ বললেন, লারদ, আসন কেনে টলে, মুকুট কেনে লড়ে, গুনে দেখ তো? লারদ খড়ি পেতে গুনে বললেন বিবরণ। লারায়ণ ছুটে এলেন, গোঁসাইয়ের বাড়িতে হানা দিলেন। অ্যাই লেগে গেল লড়াই। পিথিমী টলমল করতে লাগল। জলে আগুন লাগল, মাটির বুক ফেটে জল উঠতে লাগল, আকাশের তারা খ'সে পড়ল, ‘ছিষ্টি গেল ছিষ্টি গেল’ রব উঠল। লারায়ণ ‘চক্ক’ দিয়ে কেটে ফেললেন বাণ-গোঁসাইয়ের হাত পা। তবু গোঁসাই

হারে না, মরে না, মরে—আবার বাঁচে। তখন এলেন বাবা কালারুদ্দু। কালারুদ্দু আর নারায়ণ—হরি আর হর; হরি-হরের মিলন হ'ল। বাবা কালারুদ্দু মাঝে প'রে রোষাবতীর সঙ্গে লারায়ণের লাতির বিয়ে দিয়ে দিলেন। হরি বললেন বাণ-গোঁসাইকে—তোমাকে আমি বর দোব। তোমার কাটা হাত-পা জোড়া লাগবে, তোমাকে পিথিমীর আজা ক'রে দোব। বাণ-গোঁসাই বললেন—না। কাটা হাত পা আমি চাই না। আজাও আমি হব না। বর যদি দেবে তো বর দাও, বাবা কালারুদ্দুর সাথে আমারও যেন পূজো হয়। আমার জাত জ্ঞাত পেজা সজ্জন ছাড়া বাবার গাজনের ভক্ত যেন কেউ না হয়। হরি-হর দুজনেই বললেন—তথাস্তু। সেই জন্যেই তো গোঁসাইয়ের হাত পা নাই, কেবল আছে ধড় অর্থাৎ শরীরটা আর মুণ্ডু। আর সেই কারণে বাণ-গোঁসাই আজ কালারুদ্দুর ভক্ত দেবতা। আগে বাণ-গোঁসাইয়ের পূজো হবে, তবে বাবা পূজো নেবেন। এই কালারুদ্দু বাবার দয়াই তাদের সম্বল। সেই ভরসাতেই কালারুদ্দুর পূজোয় তারা নির্ভয়ে দেবকাজে এগুতে পারে, নইলে তাদের পুণ্য কতটুকু ?

সেই বাবা কালারুদ্দু লারায়ণের আশীর্বাদ আর কাহারদের জেবন-মরণের মালিক বাবা কত্তাঠাকুরের স্নেহ তাকে পেতেই হবে। এইবার বনওয়ারী বাবার প্রধান ভক্ত হয়ে চড়কের পাটায় চাপবেই। বনওয়ারী ঠিক করলে, যা হয় হবে। সে চাপবেই চড়কের পাটায়। পাপ যা আছে, সে খণ্ডিয়ে যাবে এই 'বেবৃতোর' অর্থাৎ ব্রতের পুণ্যে। কর্তাঠাকুরের দয়ায় বাবা কালারুদ্দুর পেসাদে সহ্য হলে নিন্দুকের মুখ বন্ধ হবে। যদি সহ্য না হয়, সে যদি পাপের তাপে ওই চড়কের পাটার উপরেই ফেটে ম'রে যায়, তাতেও তার 'দুস্কু' কি ? 'যাকে দশে করে ছি, তার জীবনে কাজ কি ?' সে আবার দশের মধ্যে গণ্য নয়, সে এ পাড়ার পেথম এবং প্রধান, সে মাতব্বর।

কিন্তু পানার শাস্তির প্রয়োজন। শাস্তি অবশ্য দিলেই হ'ল। যে কোন ছুতোয় একদিন ঘাড় ধ'রে অঙ্গখানি ছেঁচে দিতে বনওয়ারী এখনি পারে। ঘাড়ে ধরলেই টিকটিকির মত পরাণকেষ্টর পরাণ খাঁচা-ছাড়া হয়ে যাবেন। তবে

তা সে করবে না। সত্যকার অন্যায় খুঁজে বার করতে হবে। সত্যিই কেষ্ট পেয়ে চলল সে পাকু মণ্ডলের কাছে।

কীর্তিটি জটিল প্রাণকৃষ্ণের একটি জটপাকানো কীর্তি।

মুনিব পাকু মণ্ডল অতি বিচক্ষণ হিসাবী লোক। তার হিসাবের পাক অত্যন্ত জটিল—খুলতে গেলেও জট পাকায়, সেই জন্যই তার আসল নামের পরিবর্তে পাকু নাম দিয়েছে লোকে। রতনের মনিবের স্থূল চেহারার জন্য নাম হয়েছে 'হেদো মণ্ডল'। এ নামগুলি দেয় কিন্তু কাহারেরাই। এ বিষয়ে তাদের একটা প্রাক্‌পৌরাণিক মৌলিকত্ব আছে। বস্তু বা মানুষের আকৃতি বা প্রকৃতিকে লক্ষ্য ক'রে নিজেদের ভাষাজ্ঞান অনুযায়ী বেশ সুসমঞ্জস নামকরণ করে। যাক সে কথা। পাকু মণ্ডলের কৃষাণ প্রাণকৃষ্ণ। সাত বছর ধ'রে কৃষাণি করছে। প্রতি বৎসরই কৃষাণেরা বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত মনিবের কাছে খোরাকির ধান ঋণ নিয়ে থাকে। বৎসরান্তে পৌষ মাসে ধান তুলে মাড়াই ক'রে হিসাবনিকাশ হয়। শত-করা পঞ্চাশ হারে সুদ, অর্থাৎ এক মণ ধান ঋণ নিলে দেড় মণ দিতে হয়। বৎসরের মধ্যে শোধ না হ'লে সুদ ও আসল দেড় মণই পর-বৎসর আসলে দাঁড়ায় এবং তার সুদ আসে তিরিশ সের। এই চিরকালের নিয়ম। এ ছাড়াও অবশ্য আপদে বিপদে মনিবের কাছে সারের দাদন নিয়ে থাকে। কেউ কেউ সে সার না দিয়ে বাবুদের বেচে দেয় সে সার। মনিবকে বলে—বাবুরা জোর ক'রে নিয়ে গিয়েছে। যাই হোক, এবার পাকু মণ্ডল তিন বৎসর পর হিসাবনিকাশ ক'রে পানুর কাছে নিজের পাওনা ধার্য ক'রে শোধের জন্য চেপে ধরেছিল। পানু তাই এ কীর্তি করেছে। নয়ান কাশির রোগী—হয়তো কিছু দিনের মধ্যেই মারা পড়বে। বউ পাখী পালিয়েছে। নায়ান নয়ন মুদলে কে তার হয়ে দাবি-দাওয়া করবে ও-বাঁশ-ঝাড়টা বেচেছে। আবার বিয়ে-সাঙার চেষ্টা করেছে বটে বনওয়ারী, কিন্তু হবে ব'লে মনে হয় না। ওদের বেচাকেনার দলিল-দস্তাবেজ নাই, পাড়ার দু-চারজনকে ডেকে মুখে বলাকওয়া হয়—'আমি বেচলাম। এই পঞ্চজন সাক্ষী রইল।' পাকু মণ্ডল কিন্তু হুঁশিয়ার লোক। তিনি ডেম্যিতে লিখিয়ে পানুর

টিপছাপ নিয়েছেন। চৌহদ্দী ক'রে নিয়েছেন; নিজের পাড়ার পঞ্চজন সাক্ষীরও সই নিয়েছেন। তিনি পানাকে মুখে মুখে বলেছেন—তুমি বেটা সহজ পাত্তর নও হে! বেটার চেহারা যেমন লিকলিকে চরিত্তিরও তেমনি এঁকাবাঁকা। পাকু মণ্ডলের কাছে চৌহদ্দী সমেত সব বুঝে নিলে বনওয়ারী। কিন্তু মণ্ডলের কাছে বনওয়ারী ব্যাপারটা ফাঁস ক'রে দিলে না। তার মত মাতব্বরের সে কাজ নয়। পাড়ার লোককে বাঁচাতে হবে আগে। পানুকে জব্দ করবার অস্ত্রটি সে নিজের হাতে রাখবে শুধু। পানুকে বধ করবার অস্ত্র তার চাই।

এই সব কারণেই পাকু মণ্ডলের কাছে সত্য কথা না ব'লে বললে—হঁ্যা, একটা বাঁশঝাঁড় আছে ওখানে পানার। তা আপনাকে দেখে বলব পরে। একটুকু গোলমাল যেন অইচে লাগছেন।

পাকু মণ্ডল শুনে হাসলে গোঁফের ফাঁকে-ফাঁকে। চতুর লোক। বনওয়ারীর মনে হ'ল পানার দোষ তো বটেই। কিন্তু মণ্ডল মহাশয়ও জেনেই করেছেন ব্যাপারটা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। মণ্ডল মশায়রা এমন অনেক কাজেই তাদের দিয়ে করান।

পাকু মণ্ডল কথাটা বলে নাই বনওয়ারীকে। দলিলে টিপছাপ দেবার সময় পানুর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, সে তখন স্বীকার করেছিল সত্য কথা। ব'লেও ছিল—না, ওটা থাকুক মুনিব মশায়। পাকু মণ্ডল শোনেন নাই, শুধু দশ টাকা দামের পাঁচ টাকা কমিয়ে ওই দলিলেই পানুর টিপছাপ নিয়ে বলেছেন—দখলের ভার আমার। তোকে ভাবতে হবে না। আমি প্রকাশও করব না। তু নিশ্চিন্ত থাক্। কিন্তু পানাকে আবারও তাঁর জব্দ করবার প্রয়োজন হয়েছে, তাই বনওয়ারীর কাছে প্রকাশ ক'রে দিলেন।

পথে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল বনওয়ারী। আটপৌরেপাড়ায় কিসের জটলা? জটলা কি—? বুকটা কেমন ক'রে উঠল তার। পানা কি আটপৌরেদের নিয়ে সেই ব্যাপারটাকে উপলক্ষ ক'রে তুলতামাল ক'রে তুলেছে?

পরমের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—এই! এই! এই!

হা-হা ক'রে কে হেসে উঠল। এমন দরাজ জোরালো হাসি কে হাসে? তার বুকের হাপরটা তো কম জোরালো নয়! কে? এইবার তার কথার আওয়াজ পেলে বনওয়ারী—এই—এই—এই!

সঙ্গে সঙ্গে শব্দ উঠছে—ঠক-ঠক-ঠক। দুটো কঠিন বস্তুতে ঘাত-প্রতিঘাত চলছে। বুঝতে বিলম্ব হ'ল না বনওয়ারীর, আটপৌরেপাড়ায় খেলা চলছে। পরম সাকরেদদের নিয়ে আখড়া বসিয়েছে। কিন্তু এমন জোরালো সাকরেদ—জবর মরদ কে আটপৌরেপাড়ায়? পরমের সঙ্গে লাঠি ধ'রে এমন ক'রে হাসে।

পরম হাসছে হা-হা ক'রে।

হঠাৎ একটা ঢেলা এসে তার গায়ে পড়ল। চমকে উঠল বনওয়ারী। কে? বুকখানা আবার চমকে উঠল তার। এ ঢেলা কথা বলে—সে কথা বুঝেছে বনওয়ারী। হ্যাঁ, ঠিক। ওই যে কালোশশী বাঁশবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আঙুল নেড়ে ডাকছে তাকে। আঃ, এ কি বিপদ! ছাড়ালে ছাড়ে না! হে বাবা-ঠাকুর, তুমি রক্ষা কর! সে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে কালোশশীকে জানালে—না। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে—লাঠি-খেলার আখড়া।

কালোশশী হেসে উঠল। অদ্ভুত মেয়ে! সাক্ষাৎ ডাকিনী! কামরূপের ডাকিনীর মত যেমন সাহস তেমনি মোহিনী। বনওয়ারী গেল না ব'লে কালোশশীই বেরিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। চোখ দুটি টলটল করছে। ভয় পেলে বনওয়ারী। সম্ভবত কালোশশী মদ খেয়েছে। এখন তাকে কোন বিশ্বাস নাই। অগত্যা সে ইঙ্গিতে আসতে নিষেধ ক'রে নিজেই এগিয়ে গেল।—কি বলছ?

কালোশশী তার হাত ধ'রে বললে—দেখা নাই যে!

বনওয়ারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আটপৌরেপাড়ার ঘেঁটুগান শোন নাই?

—শুনেছি।—কালোশশী পিচ কাটলে। বললে—ওকে তা হ'লে ভয় কর? অর্থাৎ পরমকে।

—ভয় ?—হাসলে বনওয়ারী।—ভয় একজনাকে করি। বাবাঠাকুরকে। এবার আমি বাবাঠাকুরের আদেশ পেয়েছি ভাই, কালারুদ্দু বাবার চড়কে চাপতে হবে।

শিউরে উঠে কালোশশী তার হাত ছেড়ে দিলে।—না ভাই, তবে তোমাকে ছোঁব না। কপালে হাত ঠেকিয়ে সে প্রণাম জানালে দেবতাকে।

জয় বাবাঠাকুর, জয় কালারুদ্দু! তোমার দয়ায় পাপীর পাপ খণ্ডায়, যমদূতের হাত থেকে পাপীর পরাণপুরুষকে ছিনিয়ে শিবদূতেরা কৈলাসে নিয়ে যায়। কানায় চোখ পায়, খোঁড়ায় হাটে, মানুষের মতি পালটায়। কালোশশীর মতি ফিরেছে।

কালোশশী হেসে বললে—পুণ্যির ভাগ দিতে হবে কিন্তুক।

তারপর আবার বললে—গাজন হয়ে যাক, তা'পরে মাতব কিন্তু একদিন। সে তর্জনি তুলে যেন শাসিয়ে দাবী করলে তার পাওনা। হ্যাঁ, পাওনা বইকি!

বনওয়ারী মনে মনে প্রণাম করলে দেবতাকে। কালোশশী বললে—চুপ ক'রে রইলে যে ? সে বোধ হয় বুঝেছে বনওয়ারীর মনের কথা। ওর ভুরু কুঁচকে উঠেছে। বনওয়ারী এবার হেসে প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্যেই বললে—হাসছি পরমার কাণ্ড দেখে। বুড়ো বয়সে লাঠি নিয়ে মাতন দেখে হাসছি। কিন্তু এমন মরদ আটপৌরেপাড়ায় কে হে, পরমের সঙ্গে লাঠি ধ'রে হা-হা ক'রে হাসে ?

কালোশশী বললে—তোমার পাড়ার করালী।

চমকে উঠল বনওয়ারী।—করালী ?

—হ্যাঁ, করালী। কদিন ধ'রেই পরামশ্শ চলছে আটপৌরেদের, করালীকে হাত করবে। জংশনে সেদিন নাকি দাঙ্গা লেগেছিল দু দলের খালাসীতে, করালী তাতে খুব জোর লাঠি ধরেছিল।

করালী ? বিস্মিত হ'ল বনওয়ারী। সে তো শোনে নাই কথাটা!

—হ্যাঁ। তাই ওকে হাত করবে। তা ছাড়া ওকে পেলে অ্যাল-লাইনে ডাকাতি করবার খুব সুবিধে হবে। তাই ডেকেছে ওকে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বনওয়ারী বললে—তাই মতলব হচ্ছে নাকি? পরমের পাখা গজালছে তা হলে?

—পাখা যার ওঠে হে, তার আর ঘোচে না।—হাসলে কালোশশী।

বনওয়ারী ঘুরে বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে দূরের আখড়ার দিকে তাকালে। খটখট শব্দ এখন পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। কিন্তু করালী শেষ পর্যন্ত—? হে ভগবান!

—চললাম। লোক।—মৃদুস্বরের দুটি কথার সঙ্গে সঙ্গে বনওয়ারী ফিরে তাকিয়ে দেখলে, কালোশশী আত্মগোপন ক'রে চ'লে যাচ্ছে নিবিড়তর বনের মধ্যে। বনওয়ারী ডেকে বললে—একটা কথা। করালী কি দলে মিশছে? জান?

একবার দাঁড়াল কালোশশী। একটু ভেবে বললে—তা জানি না। এখনও মনে লাগছে দলে মেশে নাই। তবে চারে ভিড়েছে। তা'পরতে টোপ ধরলে ঘাই মারবে। মনের মতলব আমি বুঝি তো!

কালো বউ চ'লে গেল। বনওয়ারী লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সাপের হাঁচি বেদেতে চেনে। পরমকে কালো বউ ঠিক চেনে। হে ভগবান, আবার কাহার-পাড়ায় দারোগা আসবে, হাঁকবে—এই! করালী কাহার! জমাদার হাঁকবে—করালীয়া! আরে সারোয়া!

বারো

না না না। সে হতে দিতে পারবে না বনওয়ারী। সে যতকাল বেঁচে আছে, তার মাতব্বরির আমলে কাহারপাড়ার কারও 'রক্তে' ওই দাগ লাগতে সে দেবে না। যত ঘেন্নার দাগ, তত দুঃখের কষ্টের দাগ। ভাবলেও শিউরে ওঠে বনওয়ারী। একা বনওয়ারী নয়। এ পাড়ায় প্রবীণেরা সকলেই শিউরে উঠবে।

কাহারপাড়ার উপকথায় ওই দাগের কথা মনে হ'লেই শিউরে ওঠে বনওয়ারী। স্মরণ হয় বর্ষার উপকথায় কালো অমাবস্তের 'আত্তিকাল' ঝমঝমিয়ে আকাশ ভেঙে মাটিতে নামছে, কোপাইয়ের হাঁসুলীর বাঁকে বাঁকে জল ছুটছে, তাতে 'অঙ' ধরেছে লালচে ; কাহারদের চোখে তার ছটা জাগত সেকালে। দূর মাঠ থেকে একটি শেয়াল ডাকত। সুটসাট ক'রে বেরিয়ে পড়ত কাহারেরা। মাথায় ফেটা বেঁধে মুখে চুন-কালি মেখে, হাতে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত।

হে বাবাঠাকুর, তুমি 'অক্ষে' কর।

বনওয়ারী প্রহ্লাদ রতন গুপী—এরা সকলেই ছেলেবেলায় সে সব কিছু কিছু দেখেছে। সুচাঁদ চোখে দেখে, সে আজও সেই গল্প করে, চোখ বড় হয়ে ওঠে, ভারী গলায় বলে—"কোপাইয়ের সে 'মনন্তরার' বানে ডুবে দেশ 'শোঁশান' হয়ে গেল। কুঠি উঠে গেল। সাহেব মশাইরা গেলেন। কাহারপাড়া অনাথা হ'ল। মুনিব গেল, না বাপ গেল! পেটের তরে ভাবতে হ'ত না ; সকালবেলাতেই ষোলজনা কাহার কুঠির কাছারিতে গিয়ে হাজির হ'লেই খালাস। পালাপালি ক'রে ষোলজনা ক'রে যেত কাহারেরা। কাহারপাড়ায় তখন দু কুড়ি আড়াই কুড়ি মানুষ। মোষের কাঁধের মত ইয়া-ইয়া কাঁধ। কুঠি উঠে গেল, বানে ঘরবাড়ি ভেঙে গেল, মড়ক লাগল, তখন যে 'যেমনে' পেলে—এ-গাঁ সে-গাঁ পালাল। কেউ গেরামে মরল, কেউ ভিন গেরামে মরল, কেউ পথে মরল, প'চে ফুলে ঢোল হয়ে গ'লে গেল—গতি পর্যন্ত হ'ল না। তা'পর আবার সব গেরামে ফিরল। ফিরল তো দেখলে, পথের ফকির। চৌধুরীরা চাকরাণ জমি কেড়ে নিলে। দয়া ক'রে দিলে শুধু ভিটেটুকুন। কাহারেরা সকালে উঠে চৌধুরী বাড়ীর মা-দুগ্‌গাকে আর ওই কত্তাকে 'পেনাম' করত। 'তেনারা' স্বপন না দিলে ওটুকুও দিত না চৌধুরী মাশায়। তখন ভাবনা হ'ল 'প্যাটের'। চৌধুরী মাশায় বললে, চাষে বাসে খাটতে, কৃষেণ মান্দেরী করতে। তা সদ্‌গোপ মাশায়রা কেউ রাখবে না কাহারদিগে। কাহারেরা সায়েব মাশায়দের আমলে সদ্‌গোপ মাশায়ের জমিতে জোর ক'রে

'নীল' অর্থাৎ নীল বুনেছে, ধান কেটে নিয়ে গিয়েছে, ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া কাহারেরা চাষেরই বা জানে কি? সত্যিই কাহারেরা 'চাষকর্ম' ভাল ক'রে জানত না। তবু চৌধুরী মাশায়ের কথায় ছেলেছোকরাকে 'বাগাল মান্দের' অর্থাৎ রাখাল মাহিন্দার রাখলে। বড় বড় জোয়ানেরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। তখন আটপৌরেপাড়ায় হ'ল চোরের দল। 'এতে' 'দুপরের শ্যাল' ডাকলে সুটসাট ক'রে বেরিয়ে ই-গাঁ সি-গাঁ থেকে চুরিচামারি ক'রে আনত। ক্রমে পেটের দায়েও বটে, মতিভ্রমের কারণেও বটে—কাহারেরা ধরলে ওই পথ।

রাত্রের অন্ধকারে কালো কাহারদের দেখতে হ'ত আরো কালো, গলার 'রজ' হ'ত জন্তু-জানোয়ারের মত, চোখ দুটো জলত আঙরার মত। তারা চুপি চুপি গিয়ে গেরস্থ-বাড়িতে সিঁদ দিত, দরজার কুলুপ ভাঙত; সোনাদানা চালধান বাসনকোসন কাপড়চোপড় যা পেত নিয়ে আসত। সকালে উঠে বুক ধড়ফড় করত, ওপারে যমরাজার ধর্মের খাতায় নাম লেখা যেত। এপারে পুলিস এসে ঘর খানাতল্লাস করত। মেয়েদের পর্যন্ত কাপড় ঝাড়া নিত। পুরুষদের মা-বোন তুলে গাল দিত, থানার হাজতে পুরে কিল চড় লাথি চালাত।

আজও আটপৌরেপাড়ায় সেই বৃত্তান্ত চলছে। তবু ওদের হায়া নাই। বেহায়ার দল ওই আটপৌরেরা! অনেক কষ্টে কাহারেরা নিষ্কৃতি পেয়েছে। সুচাঁদ বলে—

এক পুরুষ গেল, দু পুরুষে সবাই দাগী হ'ল। কাহারেরা তখন চাষে-বাসে মন দিলে; চুরিচামারিও করত কিন্তুক আগের মতন লয়। তবু দাগীর বিপদ যাবে কোথায়? চুরি হ'লে কাহারপাড়ায় পুলিস আসত, ধ'রে বেঁধে নিয়ে যেত—দোষেও নিয়ে যেত, বিনি-দোষেও নিয়ে যেত। মধ্যে মধ্যে বদমাইসী মকদ্দমায় গুষ্টিসমেত নিয়ে টানাটানি। এই তখন আমার দাদা—ওই বনওয়ারীর বাপ—গেরামের মধ্যে পবীন সৎলোক ঘোষবাড়ির আশ্চয় পেয়েছে—ঘোষ মাশায়রা অনেক তদ্বির ক'রে থানার খাতা থেকে নাম কাটিয়ে দিলেন। দাদাই তখন বললে—পিতিজ্ঞে কর সব, চুরি কেউ করবে না। নয়ানের বাবা—ছোকরা বয়স, চৌধুরী মাশায়দের বাড়ির লোক সে, সে তো গেরাহ্যিই

করলে না। চৌধুরী মাশায়দের দয়াতে ঘরভাঙারা পুলিসের হাত থেকে অক্ষে পেল। তখন গেরামে দুটো দল হয়ে গেল। একদল দাদার কথা শুনলে। একদল হেসেই উড়িয়ে দিলে। তা'পরেতে নয়ানের বাবা কাঁচা বয়সে মরলে পর দাদা হ'ল মাতব্বর। দাদা অ্যানেক কষ্টে কাহারপাড়ার চোর নাম ঘুচালে। তাও দু-একজনা মানত না, শুনত না; ওই গুপের দাদা কালা ছেরটা কাল চুরি ক'রে এল। গাঁয়ে দল নাই, তো চন্ননপুরে ডোমেদের সাথে চুরি করত। বনওয়ারী কত মারধোর করেছে, কালাচাঁদ তাও শুনত না। পুলিসে ধ'রে নিয়ে যেত। হাসতে হাসতে যেত, বলত—শরীর সেরে আসিগো দিন কতক। তা জ্যাল থেকে ফিরত এই 'ভাকুম-কুমো' অর্থাৎ মোটাসোটা হয়ে। শেষ কথাটি ব'লে হাসে সুচাঁদ।

মধ্যে মধ্যে আফসোসও করে সুচাঁদ। আঁচলের খুঁটে চোখ মোছে আর বলে—আঃ, কি সব কাল ছিল, আর কি হ'ল! সে সব ছিল মরদ। এই বুকের ছাতি, এই সাহস—মেয়েকে সোনার গয়না পরিয়েছে আতে এই ঝকঝকে কাপড় পরিয়েছে। হোক কেনে আতের আঁধারে, পরিয়েছে তো। এখনকার মরদ, না, শ্যাল কুকুর।

বলুক, সুচাঁদ যা বলে বলুক। আড়ালে আবডালে কাহারদের যারা মতিভ্রষ্ট তারা যা বলে বলুক। বনওয়ারী আর সে পাপ পাড়ায় ঢুকতে দেবে না। আজ করালীকে নিয়ে সেই ভয় দেখা দিয়েছে। করালী ছোকরাটির গায়ে 'তাগদ' আছে, ছাতিতে সাহস আছে, মাথাও খেলে বেশ! ভয় যে সেইখানে। কাঁচা বয়সের দশজনা মদ-মাতালি করতে গিয়ে শেষে একটা কুকর্ম না ক'রে বসে! 'ধর্মপথে অধিক রাতে ভাত।' যে ধর্মপথে থাকে তার যদি উপবাসেই দিন যায় তবে ধর্ম নিজে অর্ধেক রাত্রে অন্ন জুগিয়ে দেন। বনওয়ারী করালীকে বলবে, সৎ পরামর্শ দেবে।

বাড়িতে ফিরেই মেজাজ তার আরও বিষিয়ে উঠল। হি-হি-হি-হি ক'রে পাখী হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ছে। এ কি হাসি? এত হাসি কি মেয়েছেলের ভাল? বনওয়ারীকে দেখেও পাখীর হাসি কম হ'ল না। অন্য কেউ হ'লে

কাপড়ের আঁচল দিয়ে অন্তত মুখটা ঢাকত। পুরুষমানুষকে কি দাঁত দেখিয়ে হাসে মেয়েছেলেতে? পুরুষ ব'লে পুরুষ নয়—বনওয়ারীর মত পুরুষ, সম্মানের মানুষ! পাখী ব'লেই পেরেছে এটা। করালীবাবুর 'অঙ' ক'রে বিয়ে করা বউ যে! করালীর দেমাকে পাখীর দেমাক বেড়েছে। কাহারপাড়ার কন্যেরা বউয়েরা ক্ষেপলে অবশ্য বানভাসা কোপাই; কিন্তু সহজে তারা নীলবাঁধের জল, শান্ত স্থির।

গম্ভীর ভাবে বনওয়ারী বললে—কি? বেপার কি? এত গোঁ-গোল-করা হাসিটা কিসের?

গোপালীবালা ঘোমটাকে কপাল পর্যন্ত তুলে দিয়ে অল্প হেসে বললে—পাখী যা 'ভিকনেস' করতে পারে।

'ভিকনেস' অর্থাৎ ব্যঙ্গভরে মানুষকে নকল-করা; পাখী ভিকনেস করছিল রেল-কোম্পানির সাহেবের মেমের। সরু গলা ক'রে ইংরিজী বাক্য নাকি সে অবিকল তুলে নিয়েছে—গুড্-মুনিং মুড্-বুড-টিংটং; অনুস্বার লাগিয়ে অনর্গল ব্যঞ্জন বর্ণগুলি উচ্চারণ ক'রে নিয়েছে সে। ইস্টিশান-মাস্টারের ভুড়ি দুলিয়ে চলা নকল ক'রে দেখিয়েছে। এবং গোপালীবালার চেয়ে নিজেই হেসেছে বেশি। কঠিন বাক্য উচ্চারণ করতে গেল বনওয়ারী। হঠাৎ তার নজরে পড়ল—তার দাওয়ার উপর চারখানা নতুন গাঁইতি, টকটকে লাল রঙ মাখানো, যেন 'ত্যাল'-সিঁদুর দিয়েছে যন্ত্রটায়। এ গাঁইতি রেল-কোম্পানির এবং আনকোরা নতুন। এ গাঁইতি করালী এনেছে জংশন থেকে, এবং পাখী যখন এমন অসময়ে এসে হাসছে তখন পাখীই নিয়ে এসেছে—করালীর বাড়ি থেকে তার বাড়ি। রূঢ় শাসনবাক্য বনওয়ারীর গলায় এসে আটকে রইল। সে নীরবে এসে দাওয়ায় উঠে গাঁইতিগুলি নেড়ে দেখলে। খাসা জিনিস! সায়েব কোম্পানির যন্ত্র। সায়েবরা তো যে-সে নন, সাদা রঙ, কটা চোখ, ওঁরা না পারেন কি? কল চলে গড়গড়িয়ে লাইনের উপর। আকাশ ফেড়ে ভরভরিয়ে চলে উড়ো-জাহাজ। যুদ্ধ লেগেছে। অনেক উড়ো-জাহাজ এ দেশ পর্যন্ত এসেছে। বনওয়ারী তিনখানা উড়ো-জাহাজ দেখেছে।

পাখী বললে—কার কাছে শুনেছে, তোমার গাঁইতি চাই। তা আমাকে বললে, যা এখুনি দিয়ে আয়। তাই নিয়ে এলাম।

বনওয়ারীর মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে এল আশীর্বাদ।—বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক। আঃ, কি রূপকার যে হ'ল! সে একখানা গাঁইতি তুলে নেড়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলে। তারপর বললে—তা করালী দেখালে অ্যানেক রকম। বাহাদুর বটে!

আজ্যের জিনিস মামা—আজ্যের জিনিস। আখবার ঠাঁই নাই—এই ডাঁই ক'রে এখেছে। বারণ করলে শোনে না।

—পরমকে গাঁইতি দিয়েছে না কি?

—কাকে? পরম মামাকে? না। ওকে আমি দু চক্ষে দেখতে লারি। দেখ কেনে, এসে অবেলায় ধ'রে নিয়ে যেল—লাঠি খেলবি! নাচতে নাচতে ধেই ধেই ক'রে চ'লে গেল। বলে—চল। আমি থাকতে কাহারপাড়ার মান যেতে দোব না আটপৌরেদের কাছে।

বনওয়ারী খুশি হ'ল একটু, এ কথা যে বলেছে করালী—একটা কথার মত কথা বলেছে বটে। কিন্তু ছেলেমানুষ, ফের বুঝতে পারে নাই। ওরে বাবা, খাবার দিয়ে ফাঁদ পাতাই হ'ল সংসারের নিয়ম। সাবধান করতে হবে করালীকে। বললে—তা বেশ। তা আজ যেয়েছে বেশ করেছে—আর যেতে দিস না। হাজার হ'লেও পরম হ'ল দাগী। ওর সাথে লাঠি খেলা ভাল লয় বাছা! বুঝলি?

চোখ বড় ক'রে পাখী বললে—তা তো ভাবি নাই মামা। ঠিক বলেছ তো তুমি। যাব, আমি আখুনি যাব।

—না। আসবে, আখুনি আসবে খানিক বাদে, তখন বারণ করিস। আর—। একটু থেমে গভীরভাবে বললে—সনজেতে পাঠিয়ে দিস মজলিসে। সমঝিয়ে দোব আমি।

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল জংশনে দাঙ্গার কথা। বনওয়ারী ঘুরে বেশ আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বললে—করালী নাকি জংশনে দাঙ্গা-টাঙ্গা কি করেছে পাখী?

—ও বাবা! তা জান না? হিঁদু খালাসীরা এক দিক, মোছলমানেরা এক দিক। একজন মোছলমান খালাসী হিঁদু কামিনের হাত ধ'রে টেনেছিল। তাই নিয়ে ঝগড়া। তা'পরেতে লাঠালাঠি। বানের এগুতে হাদি—চ'লে গেল এক লাঠি নিয়ে। খুব ঠুঁকে দিয়ে আইছে।

বিস্মিত নয়, স্তম্ভিত হয়ে গেল বনওয়ারী। কাহারেরা মুসলমানদের চেয়ে কম শক্তিমান নয়, কিন্তু এ পর্যন্ত মুসলমানদের সম্মানই ক'রে এসেছে ওরা। মুসলমানেরা কাহার-মেয়েদের দু-চার জনকে নিয়েও গিয়েছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কলহ কেউ করতে সাহস করে নাই। ওরা 'শ্যাখ', 'পাঠান'। ছোকরাটা যদি বনওয়ারীর 'পুত্তু' হ'ত! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বনওয়ারী।

সন্ধ্যাবেলায় মজলিসে করালী এল।

বনওয়ারী তাকে বুঝিয়ে বললে। ছেলেছোকরারা সকলেই হাজির ছিল আজ, করালী যখন এসেছে তখন তারা থাকবে কোথায়? সকলে চুপচাপ ব'সে শুনলে বনওয়ারীর কথা।

হাঁসুলীর বাঁকের সাধারণ মন্থর জীবনের ঠাণ্ডা মজলিস। মদ সকলেই খেয়েছে, কিন্তু সে পরিমিত পরিমাণে। সারা দিনের খাটুনির পর যেটুকু খেলে রাত্রে সুনিদ্রা হবে, সকালে গা-গতরে ব্যথা থাকবে না—সেইটুকু। মজলিস বসে নীল বাঁধের ঘাটের উপরে যে ষষ্ঠীতলার বটগাছটি আছে তারই তলায়। সাধারণের জায়গা এটি। সেই প্রথম আমল থেকে এখানে মজলিস ব'সে আসছে। নীলকুঠি যখন ভাঙতে থাকে, তখন নীলকুঠির ভাঙা গাঁথনির চাঙড় কতকগুলি এনেছিল কাহারেরা, সেইগুলি সুদীর্ঘকাল ধ'রে আসনের কাজ ক'রে আসছে। প্রবীণেরা সেই সব চাঙড়ের উপর বসে। গাছের তলায় ঠিক মাঝখানটিতে যে চাঙড়টি সেইটিতে বসে মাতব্বর। বনওয়ারী সেই চাঙড়টির উপর ব'সে হাত নেড়ে বেশ বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে বললে—বাপধন, করালীচরণ, বুয়েছ কি না তোমাকে বলছি আমি।

—আমাকে?—করালী বিস্মিত হ'ল। সে তো আজকাল বনওয়ারীকে

মান্য ক'রেই চলছে। তার সঙ্গে একটা সদ্ভাব স্থাপন করতে অন্তরে অন্তরে ব্যগ্র হয়েই উঠেছে। বনওয়ারী তাকে স্বীকার করেছে, তাকে খানিকটা খাতির করেছে—এটা সে বুঝতে পারে। পানাই হোক, আর পেল্লাদই হোক, রতনই হোক, সকলের চেয়ে তার খাতির বেশি—এটা বনওয়ারীর ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে। সেও বনওয়ারীকে মনে মনে খানিকটা যেন বাপখুড়োর মত ভাল-বেসেছে। সেই কারণেই সে সেদিন ওই তেরপলটি ঘাড়ে ব'য়ে নিজে থেকে নিয়ে এসেছে গুড়ের শালে। আজ খবর পাবা মাত্র সে চারখানা গাঁইতি পাখীর ঘাড়ে চাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। এত করার পরেও তাকেই বলবে কথা! সে ভুরু কুঁচকে বললে—বল। সে সামনে চেপে বসল। মনে মনে সংকল্প করলে—বনওয়ারী অন্যায় কথা বললেই কড়া জবাব দিয়ে দেবে।

বনওয়ারী ও-বেলার মনে-করা কথাগুলি বললে। বললে—বাবাধন, ধরমের পথে থাকলে বাবাঠাকুর আদেক এতে—মানে ধরগা যেয়ে—দোপর তিনপোর এতে আমাকে নিজে ভাত এনে ছামনে ধ'রে বলবেন—লে বেটা, ধরমের পথে থেকে আজ ভাত জোটে নাই, লে খা।

কথাগুলি ভাল। গোটা কাহারপাড়ার প্রবীণদেরই আধ্যাত্মিক মন ভাব-গদগদ হয়ে উঠল; কেউ বললে—হরি বল, মন, হরি বল! কেউ বললে—শিবো হে! কেউ বললে—এ সংসারে মরণই সত্যি। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলে তারা দেবতাকে। করালীর কিন্তু হাসি পেলে। কথাগুলির বিপরীত কোন সত্যে সে বিশ্বাসী ব'লে নয়, ওই কথা বলার ভঙ্গি দেখে তার হাসি পায়। চন্ননপুরে মীটিং শুনেছে সে। কি ক'রে যে বাবুরা বক্তৃতা করে! ওঃ, সে শুনে চনচন ক'রে ওঠে 'শরীল'। তবু হাসি গোপন করলে। শুধু একটু হাসিমুখেই বললে—তা, বলছ ভালই, কথাও ভাল।

বনওয়ারী প্রবীণদের দিকে চেয়ে বললে—কি হে মাতব্বরেরা, ল্যায় বললাম, কি অল্যায় বললাম? বল কেনে হে? ছোকরাদের এমন আলাদা আড্ডা ভাল নয়।

রতনের ছেলে মাথলা করালীর ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ, রতনের কথা শোনে না,

কিন্তু রতন তার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা ছাড়তে পারে না, সে সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল—এর আর কথা আছে বনওয়ারী? আর তুমি কি অন্যায্য বলবার লোক?

তামাক খাচ্ছিল প্রহ্লাদ, সে অনেকটা নিরাসক্তভাবেই বললে—লাও, খাও। হুঁকোটি বনওয়ারীর হাতে দিয়ে সে মূল প্রশ্নের উত্তর দিলে—হ্যাঁ, কথা তুমি ঠিক বলেছ। বলুক কেনে, ছোকরারা কি বলছে!

—কি হে সব, তোমরা কি বলছ? ও সব ছাড়। একত্ত হয়ে আড্ডা কর। না-কি?

অপর সকল প্রবীণও ওই প্রহ্লাদের দলে। এতখানি উৎকণ্ঠার প্রয়োজন তারা বুঝতেই পারছে না। ছোকরাদের দল যদি আলাদা আসর ক'রে গান-বাজনা করে, 'অঙচঙে'র কথাই কয়, একটু আধটু মদই খায়—তাতে এত সব কথা কেন? তিলকে তাল ক'রে তুলেছে বনওয়ারী। তবুও তারা বললে—কথা তো ভালই। অন্যায্য আর কে বলবে?

বনওয়ারী এইবার উঠে বললে—তুমি তা হ'লে শোন দিকিনি করালী। গোপনে একটি বাক্যি বলব তোমাকে।

—গোপনে? বেশ, চল। শুনি।

একটু স'রে এসে বনওয়ারী বললে—আটপৌরেপাড়ায় পরমের আখড়ায় লাঠি খেলতে যাওয়া তো ভাল কথা লয় বাবা।

—কেনে?

—সে দাগী ডাকাত বাবা। সাধুজনের সঙ্গে সাধু থাকে, চোরের সঙ্গে চোর, ছেনালের সঙ্গে ছেনাল। কাহারপাড়ার সঙ্গে ওই কারণে আটপৌরেদের মিল হ'ল না। বুয়েচ?

করালী বললে—পরম যি ঠাট্টা করলে! তাতেই তো যেলাম—বলি, কাহারপাড়ার মরদ দেখ একবার।

বনওয়ারী বললে—ওই বাবা, ওই অকম ক'রেই ডাকাত ছেলেছোকরাকে দলে টানে! বুয়েচ? পেথম পেথম লাঠি খেলা, হাসি ঠাট্টা, মদ-মাস খাওয়া,

তা'পরেতে কানে মন্তর। একবার সঙ্গে যেয়েছ তো আর ছাড়ান নাই। ধম্মের পাক সাতটা, পাপের পাক সাতান্নটা। বুয়েচ? আর খোলা যায় না, ছেঁড়া যায় না। দলে যাব না বললেই তখন ধরিয়ে দেবে।

করালী বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে চেয়ে রইল। সত্যই সে এ কথাটা ভাবে নাই। তবে কথা বনওয়ারীমামা ঠিকঠাক বলেছে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে অকুণ্ঠিতভাবে ব'লেও ফেললে—ই সব কথা আমি ভাবি নাই মামা।

—অ্যাই! ভাব নাই তো! এস; আর যেয়ো না। ছেঁয়া মাড়িয়ো না। করালীর হাত ধ'রেই সে মজলিসে ফিরে এল।

মজলিসে তখন নসুবালা হাত-পা নেড়ে অঙ্গ দুলিয়ে সে এক কাণ্ড 'সেজ্জন' অর্থাৎ সৃজন ক'রে তুলেছে। ব্যাপারটার মূল হ'ল নিমতেলে প্যাকাটি প্রাণকৃষ্ণ। বনওয়ারী করালীকে নিয়ে উঠে যেতেই অভ্যাসমত সে বনওয়ারীর ভূমিকায় মাতব্বরি শুরু ক'রে দিলে। বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে ভঙ্গিতে বললে—বনওয়ারীকাকা যা বলেছে তার চেয়ে ভাল কথা আর হয় না। ছেলে-ছোকরার এ সব মতিগতি ভাল লয়। ধর যেয়ে, কেউ ছাড়ছে কুলকর্ম, অক্তের ত্যাজে ধরাকে সরাখানটা দেখছে। না, কি গো?

প্রতিটি কথা তার করালীর দিকে নিক্ষিপ্ত গুপ্তবাণ। বুঝতে বাকি কারও রইল না।

নসুবালা ব'সে ছিল পুরুষদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। সে এবার উঠে এসে পানুর মুখের সামনে হাত নেড়ে শরীর দুলিয়ে ব'লে উঠল—আ ম'রে যাই, গুড় দিয়ে তোমার গাল চেটে খাই। কি রে আন্তিকালের বস্তিবুড়ো আমার! উনি বলছেন—আমরা ছেলেছোকরা! তোমার মতিগতি তো ভাল! বলি—হা রে মুখপোড়া চিমড়ে শুকুনি, কি করেছি আমরা? বল্, শুনি? মাতব্বরের দোসর আমার! বাঘের পেছুতে ফেউ—সানাইয়ের পোঁ!

করালী এসেই নসুর হাত ধ'রে টেনে সরিয়ে এনে বললে—চুপ কর্ তু। ব'স্। তারপর সে এগিয়ে এসে ওই মজলিসের মধ্যে সর্বসমক্ষে বনওয়ারীর

পায়ে হাত দিয়ে বললে—এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, এমন কাজ কখনও করব না।

বনওয়ারী এতটা কল্পনা করে নাই, এবং এর পরের কি উত্তর তাও সে ভেবে পেলে না। করালীর উপর স্নেহে সে আর্দ্র হয়ে উঠল।

পাঁচজনে তারিফ ক'রে উঠল করালীর—বা-বা-বা।

—হ্যাঁ রে বাবা। পথ চলবি, আপথ কুপথ খাল ডিঙ বাঁচিয়ে চলিস।

পানু কিন্তু উঠে দাঁড়াল, বললে—পা ছুঁয়ে তো বললে। কিন্তুক চোলাই মদের কথাটা? সেটা অল্যায় লয়?

এবার করালী ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলে তার গালে। দুর্বল চেহারার লোক সে, করালীর হাতের চড় খেয়ে সে 'বাপ' ব'লে বসে পড়ল। করালী বললে—দেখাতে পার তুমি শালো? পেমাণ করতে পার?

বনওয়ারী খুশি হ'ল। খুব খুশি হ'ল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই হেঁকে উঠল—করালী, অল্যায় করলে তুমি।

—আমি?

—হ্যাঁ। ব'স তুমি।

—তা বসছি আমি। হোক, এর বিচার হোক। তুমি আমার ঘর পেতে দিয়েছ, তোমাকে আমি মানি। একশো বার হাজার বার আমি মানি। ধার্মিক লোক তুমি, মাতব্বর তুমি, তোমার কথা শুনতে পারি। তা ব'লে ওই লিক্‌লিকে সড়িঙ্গের কথা শুনব আমি!

—ব'স, ব'স।

সকলেই বসলে। কেবল প্রাণকেষ্ট বসল না। সে গট গট ক'রে মজলিস থেকে বেরিয়ে গেল। বনওয়ারী করালীর জরিমানা করলেও সে বেশ অনুভব করতে পারছে—করালীর প্রতি তার স্নেহাধিক্যের পরিমাণ। শুধু তাই নয়, সে বেশ বুঝতে পারছে বনওয়ারী এইবার তাকে নিয়ে পড়বে। কয়েকবারই সে লক্ষ্য করেছে তার প্রতি বনওয়ারীর বক্র ক্রুর দৃষ্টি। বুঝতে ঠিক পারছে না, কিন্তু—। তার উপর তার অভিমানও হ'ল। সে বেরিয়ে চ'লে গেল।

—চ’লে যেছিস যে পানা ?—জিজ্ঞাসা করলে মাথলা।

উত্তর দিলে না পানা।

—কি রে, আ কাড়িস না যে ?

পানা এবার বললে—ছুঁচোর সাকরেদ চামচিকের কথার জবাব পানকেষ্ট দেয় না।

করালীর লাফিয়ে ওঠার কথা, উঠতও সে লাফিয়ে এবং কাণ্ডও একটা ঘ’টে যেত; কিন্তু তার আগেই বনওয়ারী ডাকলে—পানকেষ্ট! গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলে।

প্রাণকৃষ্ণের গলার সাড়া পাওয়া গেল তার নিজের উঠানের নিমতলা থেকে। চীৎকার ক’রে সে বললে—সাধু নোক, আটপৌরেপাড়ার বটতলাতে সনজে-বেলা সাধন-ভজন করেন! মনে করলাম—থাক্, বলব না, মানী নোক—। কিন্তু কথা সে শেষ করতে পারলে না। আতঙ্কে সে চমকে উঠল; বনওয়ারী এসে তার হাতখান সজোরে চেপে ধরেছে।

পানু শুয়ে পড়ল মাটিতে। যাব না আমি। জাত জ্ঞাত কেউ আপনার লয় আমার। লরমকে ধরম দেখায়! আমি মানি না কারুকে।

বনওয়ারী তার ঘাড়ে ধ’রে খাড়া ক’রে তুলে দিলে। তারপর ধাক্কা দিয়ে নিয়ে এল মজলিসে। পানু আর উপুড় হয়ে পড়বার অবকাশ পেলে না। পানুকে ঠেলে মজলিসের মাঝখানে ফেলে দিয়ে বললে—লয়ানের বাঁশঝাড় নিজের ব’লে পাকু মোড়লকে বেচে দিয়েছিস কেনে ?

পানুর চীৎকার ঝংকার এক মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল।

—বল্। মজলিসে বল্।

এবার পানু ফ্যাল ফ্যাল ক’রে বনওয়ারীর দিকে চেয়ে বললে—ক্যা বললে? অর্থাৎ কে বললে ?

—তোর মুনিব খোদ পাকু মোড়ল আমাকে বলেছে। চৌহদ্দী পড়ে শুনিয়েছে—অতনের দরুন কেনা, হেদো মণ্ডলের বাঁশঝাড়ের পূব্ব, বনওয়ারীর, মানে—আমার বাঁশঝাড়ের দক্ষিণ,কোপাইয়ের বাঁধের উত্তর, গুপীর দরুন কেনা

ঘোষ মাশায়দের বাঁশঝাড় আর শিরীষগাছের পচ্চিম এর মধ্যে আমি—নিমতেলে পানকেষ্ট কাহার নিজহাতে লাগানো বড় বাঁশঝাড় একটি—বাঁশ সাড়ে আট গণ্ডা—আট টাকায় বিক্রয় করিলাম।

পানু উঠে ব'সে বললে—হ্যাঁ, তা বিক্রয় করেছি আমি। সে তো আমার নিজের বাঁশঝাড়। বাঁশঝাড় আমি নিজে হাতে লাগালছি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাগালছ। 'না' বলি নাই আমি। আমার বাঁশঝাড়ের পূবে—লয়ানের বাবার লাগানো বাঁশঝাড়, তার পূবে ঘোষ মাশায়দের বাঁশঝাড়ের মধ্যিখানে ফালি জায়গায় তুমি লাগালছ এক ঝাড় বাঁশ—ক বছর আগে, তাতে দুগণ্ডা বাঁশও জমে নাই এখনও। নয়ানের ঝাড়ের সাথে লাগালাগি হয়ে এয়েছে, এই সুবিধেতে তুমি গোটা সাড়ে আট গণ্ডা বাঁশসমেত বাঁশঝাড় মুনিবকে বেচে দিয়ে এয়েছ! বল, কেনে বিক্রি করেছ পরের ধন নিজের ব'লে?

মজলিসে কলরব উঠে গেল।

—অল্যায়, মহা অল্যায়, হে ভগমান! সমস্বরে সকলে চীৎকার ক'রে উঠল।

নসুবালা গালে হাত দিয়ে ব'লে উঠল—হেই মারে! ব'লে কিছুক্ষণ স্থির বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তার পর ঘাড় নেড়ে বললে—ঘোর কলি মা! আমের ধন শ্যামে বিক্রয় করছে!

পানু কাতরভাবে বললে—আমি কি করব? মুনিবই আমাকে নিকে দিতে বললে।

—বললে?—করালী ব'লে উঠল—চন্নপুরের বাবুদের পাকা বাড়িটা নিকে দিতে বললে দিবি?

বনওয়ারী বললে—করালী, চুপ কর তুমি।

পানু কাঁদতে লাগল। বনওয়ারী করালীকে চুপ করতে বলতেই সে কেঁদে ফেললে।

বনওয়ারী বললে—ফোঁপাস না, বুল্লি, ফোঁপাস না। ওতে কেউ ভুলবে না।

পানু বললে—আরার বেবরণটা পঞ্চজনে দয়া ক'রে শোনেন—না কি আমি

বানের জলে ভেসে আইছি? অপরাধ তো হয়েছে আমার, সাজা নিতে তো আমি পস্তুত।

বনওয়ারী নিজের পাথরটায় ব'সে বললে—বল্, কি বলছিস?

পানুর বিবরণ অন্য কিছু নয়, নিজের অন্যায়ের স্বপক্ষে বিপক্ষে কোন যুক্তিতর্ক নয়, নিতান্তই নিজের মন্দভাগ্য এবং মনিবের কঠিন আচরণের করুণরসসিক্ত ইতিবৃত্ত। এইটুকু পানুর কাপুরুষ এবং কুটিল মনের উপস্থিতবুদ্ধি। পানু বললে—মুনিবে যে মেরে ফেলাইছে তার পিতিবিধেন কর পাঁচজনায়। 'ধরে মারে সয় বড়'। আমাকে মুনিব ধ'রে নিকে লিলে—আমি কি করব? মাশায়, তিন বছর হিসেব করলে না, ই বছর হিসেব ক'রে বললে—পঁচিশ টাকা পাওনা তোর কাছে। দে, ফ্যাল্। তা বললাম—বছর বছর হিসেব করলেন না, না-ক'রে একবারে এমনি মোটা পাওনা কি ক'রে দোব আমি? তা বললে—তা, আমি কি জানি? তো শালোদের ওজগারই কি কম? পরিবারে ওজগার ক'রে আনছে চন্নপুর থেকে। তুমি শালোরা মাঠ থেকে ধান সরাচ্ছে। ঘর থেকে এনে শোধ দাও। কি করব মাশায়, বললাম—আপনকার জমির পাশে সরকারী গোপথ ভেঙে যে জমিটুকুন ভেঙেছে, সেইটুকুন তো আপনকারই হয়েছে—তারই দরুন বলেছিলেন দশ টাকা দেবেন, সেই ল্যান আর বাঁশঝাড় একটা আছে ল্যান, লিয়ে আমাকে রেহাই ভ্যান। তা সে কী গালাগাল করলে!—ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদতে লাগল পানু।

পানু চতুর, নিঃসংশয়ে বুদ্ধিমান। মুহূর্তে ঘুরে গেল মজলিসের মনোভাবের মোড়। পানু যে কথাটা বলেছে, সেটার সঙ্গে সকলেরই অন্তরের কথার অল্পবিস্তর মিল আছে। বনওয়ারীর মত মাতব্বর সচ্ছল ব্যক্তির পর্যন্ত মিল আছে। সদ্গোপ মহাশয়দের সঙ্গে নিয়মিত হিসাব হয় না। ঘোষবাড়িতে বনওয়ারীও এবার হিসাব করিয়ে উঠতে পারে নাই। দু বছর তিন বছর পর হিসাব হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষাণদের ঋণ দাঁড়িয়ে যায়। অবশ্য মনিব অন্যায় হিসেব করেন না। সে অন্যায় কথা বলা চলে না, বললে পাপ হবে।

ঋণ দাঁড়াবারই কথা, সম্বৎসরের ছ'মাস—বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত মনিবের কাছে ধার করে খাওয়া হয়, বাকি ছ মাস তাও একরকম মনিবের কাছ থেকেই নেওয়া। মনিবের পাওনা শোধ না ক'রে ফসলের কৃষাণী পাওনা তিন ভাগের এক ভাগ থেকে কিছু কিছু নিয়েই চলে ; এটার স্থদ লাগে না—সেও মালিক দয়া ক'রেই নেয় না বলতে হবে। তারপর গম, ছোলা, গুড়, আলু, সরষে, তিসি—এ সবের ভাগ মনিব কাটেন না। স্থতরাং ঋণ যে শোধ হয় না, তাতে কোন সংশয় নাই। তবে বছর বছর হিসেব করলে, এগুলো শোধ করা সহজ হয়। ছু বছর তিন বছর অন্তর মনিব হিসেব নিয়ে বসলে—ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়। ভরসার মধ্যে মা-কোপাইয়ের চরে অনেক পতিত, আর বাঁশবাঁদিতে বাঁশের 'মুড়ো'র অর্থাৎ শিকড়সুদ্ধ বাঁশের অভাব নাই, প্রতি বৎসরই কাহারেরা ছুটো চারটে বাঁশঝাড় লাগায়, ছু-চারটে বট-পাকুড়ের চারা বা ডাল পোঁতে। সেই বাঁশঝাড় আর গাছগুলি মনিবেরা নিয়ে রেহাই দেন। প্রতিজনেই মনিবের জমির পাশে যেখানে যতটুকু সরকারী পতিত জমি থাক্—সে পতিত ডাঙাই হোক বা জলাই হোক বা জলনিকাশী নালাই হোক কিংবা গোপথ হোক—সেটুকুকে কেটেকুটে বা ভরাট ক'রে আলবন্ধন দিয়ে মনিবের জমির সঙ্গে চাষ করে। সেগুলি নিয়েও রেহাই দেন মনিবেরা।

পান্থর কথার উত্তর খুঁজে না পেয়ে সকলে চুপ ক'রেই রইল। কেউ কেউ দীর্ঘনিশ্বাসও ফেললে। বনওয়ারীও ফেললে দীর্ঘনিশ্বাস। বনওয়ারীও এমনি খানিকটা নালা ভেঙে জমি করেছে। ঘোষেরাও বছর কয়েক হিসেব করেন নাই তার সঙ্গে।

শুধু করালী ব'সে পা নাচাতে লাগল। সে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত মানুষ, চন্ননপুরে খাটে, নগদানগদ মাইনে ; সে ব'লেও ফেললে—ঝাড়ু মারে চাষের মুখে !

বনওয়ারী বললে—অ্যাই করালী !

করালী বললে—তবে পিতিবিধেন কর। পানা যা বলেছে, তা তো মিথ্যে লয় !

—বল ভাই করালী, বল।

কাউকে কিছু বলতে হ'ল না। ওদিকে তখন মেয়েরা কথা বলতে শুরু করেছে। মজলিসের ঢেউ ঘরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে। একেবারে আধুনিক রাষ্ট্রনীতি ফুটে উঠেছে ঝগড়াটার মধ্যে।

পরস্পরের শত্রু নয়ানের মা এবং করালীর নসুদিদি একত্রিত হয়ে প্রাণকেষ্টর বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছে। নয়ানের মা অগ্নি-বর্ষণ করছে।

পানুর বউ দুলে দুলে নসুকে গাল দিয়ে চলেছে—ওলো, বেটাখাকী লো, ওলো ভাতারখাকী লো, নিব্বংশের বিটী লো—তোর মুখে আগুন দি লো—। ভুলেই গিয়েছে যে, নসুবালা কারও কন্যা নয়, সে পুরুষ, তার স্বামীও নাই, পুত্রও নাই।

নসুবালা আবার নেচে নেচে গালাগাল দিচ্ছে—নোকের জোড়া বেটাকে আমি এমনি ক'রে নেচে নেচে খালে পুঁতব। নোকের ভাতার মরবে—ওগ নাই, বালাই নাই, ধড়ফড়িয়ে মরবে, আমি ধেই ধেই ক'রে নাচব।

বনওয়ারী বিরক্ত হয়ে প্রহ্লাদ এবং রতনকে বললে—যা তো রে বাপু একজনা, মেয়েগুলাকে গলায় ধ'রে—আপন আপন ঘরে দিয়ে আয়।

মেয়েদের ঝগড়া অসহ্য হ'লে এই হ'ল কাহারদের ঝগড়া বন্ধ করার প্রথা। এতেও না মানলে তখন প্রহার।

পানু গোটা মজলিসের মন আরও বেশি ক'রে পাবার জন্য বললে—ঘা কতক গুমাগুম্ দিয়ো, বুল্লে পেহ্লাদকাকা, আমি বলছি—আমার ওই পরিবারটাকেও দিয়ো ঘা কতক।

সঙ্গে সঙ্গে করালী উঠে গেল, নসুবালাকে সে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরে বন্ধ ক'রে দেবে।

৬

মেয়েদের ঝগড়া বন্ধ হ'ল। সকলে মজলিসে ফিরে এসে আবার বসল। বনওয়ারী স্থির দৃষ্টিতে পানার দিকে তাকিয়ে আছে। পানা দৃষ্টি তুলছে

আর নামাচ্ছে। একবারও সে দেখলে না যে, বনওয়ারীর দৃষ্টি তার দিক থেকে ফিরেছে। সে চতুর, বুঝছে সব। মধ্যে মধ্যে কান ম'লে বলছে—এই—এই, আর যদি করি—! তারপরই ফেলছে কয়েক ফোঁটা চোখের জল। বনওয়ারীর ঠোঁটের কোণে মধ্যে মধ্যে হাসিও খেলে যাচ্ছে।

মাতব্বর!—হাত জোড় ক'রে আবেদন করলে পানা।

—আর করবি এমন কাজ?—বনওয়ারী জানে পানু বুঝতে পারছে কাজের সত্যকার অর্থ।

—কান মলেছি দশবার। আবার মলছি।

—আচ্ছা, যা। ব্যবস্থা করছি আমি। ধরব গিয়ে মণ্ডলকে। বলব, ভুল হয়ে যেয়েছে—আর তা আপুনি জেনে শুনেই পানাকে দিয়ে করিয়েছেন। না হয়, লয়ানকে দিয়ে আমার মুনিবের নামে লিখিয়ে দোব লয়ানের ঝাড়। লেগে যাবে ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই।

প্রহ্লাদ বললে—এটা আচ্ছা হবে বুল্লে কিনা। পাকু মণ্ডলের পাক টান মেরে ছিঁড়ে দেবে ঘোষ। হুঁ হুঁ বাবা, ঘোষ হ'ল ভাগলপুরের ষাঁড়!

খুব হেসে উঠল সকলে।

কিন্তুক হিসেবের কথা?—জিজ্ঞাসা করলে রতন। সে হেদো মণ্ডলের কাছে এমনি একটা বকেয়া হিসাবের বন্ধনে পড়েছে। হেদো শুধু মুখেই কথা ব'লে ক্ষান্ত হন না, গদাগদ কিল মারেন।

—হবে, হিসেবও হবে। চল, সবাই মিলে যাই একদিন।

—কালই চল সকলে।—রতন বললে।

—কাল হবে না ভাই। কাল গাজনের উতুরী পরাবার দিন।

—সি তো যে গাজনের পাটায় চাপবে।

—এবার আমি চাপব। বনওয়ারী বললে।

—তুমি?

—হ্যাঁ।

—না, না। কাজ নাই বনওয়ারী। কিসে খ্যানত হয়! কাজ নাই।

—উ-হুঁ! বাবাঠাকুর পেত্যাদেশ করেছেন, রুপায় নাই।

—বাবাঠাকুর!—মজলিস স্তব্ধ হয়ে শিউরে উঠল।

বনওয়ারী বললে—কাল এতে অ্যাই ভোরবেলাতে, ঠিক স্বপনটিও ভাঙল, কাককোকিলও কলকল ক'রে উঠল।

ভোরের স্বপ্ন একেবারে প্রত্যক্ষ অব্যর্থ। সকলে হাতজোড় ক'রে প্রণাম করলে দেবতাকে।

—তা ছাড়া—। বনওয়ারী বললে—বাবাঠাকুরের রজগরটি আমাদেরই ভুলচুকে পুড়ে মরেছে তো। পাপটা খালন করতে হবে, চড়কে চাপার মানত তখুনি করেছিলাম আমি। হঠাৎ হেসে বললে—বয়েসও তো হ'ল। না হয় ফেটেই মরব।

ভোরবেলায় বনওয়ারী কোপাইয়ের জলে গিয়ে নামল। গঙ্গা—গঙ্গা—গঙ্গা! কালই সে কাটোয়ায় যাবে গঙ্গাস্নান করতে, গঙ্গাস্নান ক'রে কালরুদ্রের মাথায় ঢালবার জন্যে ভার ব'য়ে নিয়ে আসবে গঙ্গাজল। যাবার সময়টা ট্রেনেই যাবে। আসবার সময় কাঁধে ভার নিয়ে দুলতে দুলতে দশ কোশ রাস্তা চ'লে আসবে মনের আনন্দে—'শিবো হে, শিবো হে' হাঁকতে হাঁকতে কোশকেঁধে বনওয়ারীর কাছে দশ কোশ কতটুকু!

কালারুদ্দুতলায় ঢাক বাজছে, আজ থেকে সকাল সন্ধ্যে ধুমুল শুরু হ'ল।

ড্যাডাং—ড্যাডাং—ড্যাডাং—ড্যারা ড্যাং—ড্যাডাং—

এ-র্—র্-র্—র্-র্—ড্যাডাং।

লোহার কাঁটা-ভরা চড়কের পাটার উপর শুয়ে বনওয়ারী ঘুরবে। আকাশের দিকে চেয়ে ডাকবে—শিবো হে, শিবো হে!

তাতে মরতে হয় মরবে, খেদ নাই।

গোটা কাহারপাড়ায় আজ সে দেবতা হয়ে উঠেছে। সকলে তার পথে গোবরজল ছিটিয়ে পবিত্র ক'রে দিচ্ছে।

পাখী এসে বললে—গঙ্গাজল চাই তো? শুধিয়ে গিয়েছে।

—কে? করালী?

পাখী হাসলে।

—আমি নিজেই যাব কাটোয়া। যাবার সময় ট্যানে যাব। আসবার সময় হাঁটব।

—ট্যানে কিন্তুক টিকিট ক'রো না। সে ঠিক ক'রে দেবে।

তৃতীয় পর্ব

এক

ড্যাডা-ড্যাং—ড্যাডা-ড্যাং—ড্যাডাং ; ড্ডার্র্র্র্র্—ড্যাডা-ড্যাং। ড্ডার্র্—ড্যাডাং—ড্ডার্র্ ড্যাডাং—

বড় বড় ঢাকের পিঠে কাক-চিল-বক পক্ষীর পালক দিয়ে সাজানো ফুল্কো ডাঁটির মাথার চামরের চুল বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচে। কাঁসি বাজে, শিঙা বাজে, ধূপের ধোঁয়ায় মৌ-মৌ করে বাবা কালরুদ্দুর থান ; ‘পাটাগনে’ অর্থাৎ পাটঅঙ্গনে ভক্তরা নাচে—হাতে বেতের দণ্ড, গলায় ‘উতুরী’ অর্থাৎ উত্তরীয়, পরনে গেরুয়া কাপড়, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গঙ্গামাটির ‘তিপুণ্ডক’, রুখু চুল, উপবাসে শুকনো মুখ, তবু বাবার মহিমায় ধেই-ধেই ক’রে নাচে। হাড়ি-ডোম-বাউরী-কাহার যার ইচ্ছে বাবার ভক্ত হতে পারে। এবার শিরভক্ত বনওয়ারী। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাই গোটা কাহারপাড়াটাই গাজনে ‘উতুরী’ পরেছে। শিবো হে, শিবো হে! জয় শিবো—কালারুদ্দু—! বম্ বম্ বম্! বব বম্-বম্! ঢাকে বাজে—ড্যাডা-ড্যাং—ড্যাডা-ড্যাং-ড্যাং!

গজাল-পেটা চড়কপাটার উপর শুয়ে আছে শিরভক্ত বনওয়ারী। ষোলজন ভক্তের কাঁধের ‘সাঙ’ অর্থাৎ বাঁশের ডাণ্ডার উপর চড়ক চলেছে—ঘুরছে বন্-বন্ বন্-বন্—বন্-বন্!

চৈত্র-সংক্রান্তি শেষ হয়ে গেল। বছরের শেষ রাতটি ‘পেভাত’ অর্থাৎ প্রভাত হ’ল, গোটা রাতটি নাচলে কালারুদ্দের ভক্তরা। শিবো হে, কালারুদ্দু হে, বম্ বম্ বম্—বম্-ববম্ বম্-ববম্ বম্। চড়কের পাটা পাক দিয়ে ‘চক্কর’ অর্থাৎ চক্রের মত ঘুরল বন-বন ক’রে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে-বনে আদ্যিকালের অন্ধকার ‘চ’কে চ’কে’ অর্থাৎ চমকে উঠল। কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষীরা কলকল ক’রে উঠল। সাপেরা গর্তের মধ্যে পাক ঘুরে ফণা তুললে। জন্তুজানোয়ার গা-ঝাড়া দিলে। তারাও জানলে—বছর শেষ হ’ল। তারাও প্রণাম জানালে—শিবো হে, কালারুদ্দু হে!

বছরের প্রথম দিন, গাজন শেষ হ'ল। শিব চললেন জল-শয়নে কালীদহের তলায় ; গোটা বছরটি থাকবেন সেথায়, আবার উঠবেন বছরের শেষে গাজনের এক মাস আগে আগামী চৈত্রের শুভদিন অর্থাৎ পয়লা। বলবেন—সূর্য হে, চন্দ্র হে, আমি উঠলাম—বছর শেষ কর। শিব জলশয়নে যাচ্ছেন ; —সেই মিছিল চলেছে—জঙ্গলের কালারুদ্দু তলা থেকে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়া হয়ে হাঁসুলী বাঁকের কালীদহে। প্রথম চলেছে ঢাক, কাঁসি, শিঙে, বাদ্যভাণ্ড ; তারপর চলেছে সঙ। সঙ হ'ল—বাবার ভূতপ্রেত দানা দৈত্যের দল। মানুষেই সেজেছে, নন্দী ভৃঙ্গী 'তিজট' 'দন্তবক্র'—আরও কত ভূত তার নাম কে জানে ? যারা সেজেছে তারাও জানে না। এবার সঙেও কাহারপাড়ার লোক বেশি। হবে না কেন, এবার বনওয়ারী কাহারপাড়ার মাতব্বর যে শিবভক্ত। সঙের দলের পিছনে চলেছে ভক্তের দল। সারিবদ্ধ হয়ে নাচতে নাচতে চলেছে—মাথার উপরে তালে তালে নাচাচ্ছে বেতের দণ্ড, সঙ্গে সঙ্গে পড়ছে পায়ের সারি। তাদের পিছনে চড়কপাটা। ঘুরছে বন্‌-বন্‌! চড়কপাটায় গজালের কাঁটার উপর শুয়ে আছে বনওয়ারী আকাশের দিকে মুখ ক'রে। তার পিছনে বাণ-গোঁসাই, তার পিছনে বাবার 'দোলা' অর্থাৎ চতুর্দল—আসলে একটি ডুলি। ডুলির আশেপাশে ধূপ গুগ্‌গুল জ্বলছে। আর খবরদারি ক'রে চলেছেন জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়েরা। চৌধুরী-বুড়োকে পর্যন্ত আজ বের হ'তে হয়েছে। হেদো মণ্ডল, পাকু মণ্ডল, নাকু কর্মকার, এমন কি মাইতো ঘোষও চলেছেন।

না চ'লে উপায় আছে। সকল দেবতার আদি দেবতা—কালারুদ্দু। দিন বল, রাত বল, মাস বল, বছর বল, আদি বল, অন্ত বল—সব কিছুর মালিক হলেন উনি। শিবো হে! শিবো হে! চড়কের পাটার উপর শুয়ে বনওয়ারী মনে করে কথাগুলো, আর প্রণাম জানায় বাবাকে। প্রাণ নাও বাবা, মান রাখ, আমাকে দণ্ড দাও, কাহারদের মঙ্গল কর—শিবো হে, আসছে জন্মে উচ্চকুলে জন্ম দিয়ো। বাবাঠাকুর তোমারই শিষ্য বাবা, তাঁরও পুজো দিয়েছি, তোমার চড়কের পাটায় লোহার কণ্টকে শুয়ে তোমার চরণে মিনতি করি বাবা,

তুমি তাকে প্রসন্ন হতে বল, তোমার শিষ্যকে বল—তাঁর বাহন-'হত্যে'র অর্থাৎ সেই অজগরটিকে পুড়িয়ে মারার অপরাধ যেন তিনি ক্ষমা করেন, যেন হাঁসুলী বাঁকের অমঙ্গল না হয়। ক্ষেত ভ'রে ধান দাও, ঝড়-ঝাপটা থেকে রক্ষা কর, কোপাই বেটীকে ক্ষ্যাপা বানে ভাসতে বারণ কর।

কাহারপাড়ায় আজ মহাধুম!

বনওয়ারী এবার শিবভক্ত, চড়কের পাটায় চেপেছে—এবার কালীদহে যাবার পথে বাবার ডুলি, চড়কের পাটা নামবে কাহারপাড়ায়। এই দুবার নামছে। একবার নেমেছিল অনেক কাল আগে, তখন নীলকুঠির আমল—কাহারপাড়ার মাতব্বর তখন গণ্ডার কাহার। এই দশাশয়ী 'পেরকাণ্ড' চেহারা ছিল ব'লে নীলকুঠির দেওয়ান জাঙলের চৌধুরী নাম দিয়েছিলেন—গণ্ডার কাহার। গণ্ডার কাহারের বংশ নাই। গণ্ডার সেবার চেপেছিল চড়কের পাটায়। মদ খেয়ে পাটায় চড়েছিল ব'লে বংশটাই শেষ ক'রে দিয়েছেন বাবাঠাকুর। সেই সেবার কালারুদ্দুর ডুলি নেমেছিল কাহারপাড়ায়। সেও নাকি খুব ধুম হয়েছিল। সাহেবান মহাশয়রা 'বশকিস' করেছিলেন অনেক। এবারও খুব ধুম। এবার দ্বিতীয়বার বাবার ডুলি নামবে কাহারপাড়ায়।

ডুলি নামবে ওই মজলিস যেখানে বসে, সেইখানে। গোবরজল দিয়ে জায়গাটি পরিপাটি ক'রে নিকানো হয়েছে। বেদী বাঁধা হয়েছে, গোটা কাহারপাড়াই আজ ঝকঝক তকতক করছে। এঁটো কালো হাঁড়ি সরানো হয়েছে, মুরগী হাঁস আজ ঘরে বন্ধ, ছেলেপিলে সাবধান, বউ-বেটী গিন্নি-বান্নি সব কাচা কাপড় প'রে, চান সেরে, চুল এলিয়ে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা আসবেন।

হাঁকডাক ক'রে বেড়াচ্ছে করালী।

বনওয়ারী চেপেছে চড়কে। করালী পাড়ায় ঘুরছে চরকির মত। গোটা পাড়াটাকে সে-ই সাজিয়েছে। সাজিয়েছে, আচ্ছা সাজিয়েছে, বাহা-বাহা সাজিয়েছে। এই কথা ছাড়া, প্রশংসা প্রকাশের ভাষা কাহারদের নাই। সকলে একবাক্যে বলছে—আচ্ছা ছোকরা, বাহাদুর ছোকরা! বাঁশবাঁদিতে

বাঁশের অভাব নাই, গাছপালার অভাব নাই ; করালী তার দলবল নিয়ে বাঁশে পাতায় ফটকই করেছে চারটে। মজলিসের 'থানটি'তে চার কোণে খুঁটি পুঁতে পাতা দিয়ে মুড়ে মাথার উপর টাঙিয়েছে সেই তেরপলখানি ; রঙিন কাগজ কিনে এনেছে নিজের পয়সায়, তাই দিয়ে শেকলের মত মালা তৈরি করেছে একরাশ। তাই জড়িয়ে দিয়েছে খুঁটিতে খুঁটিতে, লম্বালম্বি কোণাকুণি ; লালে নীলে সবুজে সাদায় রঙ লাগিয়ে দিয়েছে। জাঙলের সদ্‌গোপ মশায়দের খাতির করবার জন্যে সিগারেট কিনে এনেছে চন্ননপুর থেকে। ও ছাড়া আর কি দিয়ে খাতির করবে ? কাহারদের ছোঁয়া আর তো কিছু খাবেন না—পান পর্যন্ত না। নিজেও সিগারেট টানছে আর ঘুরছে। পাখী ঘুরছে ঘুরঘুর ক'রে, তার পরনে চমৎকার বাহারে ডুরে শাড়ি। বউ বিটীরা তার দিকে আর করালীর দিকে তাকাচ্ছে। পাখী বুঝছে সব। হাসছে।

বনওয়ারীর স্ত্রী গোপালীবালা জোড়হাত ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মজলিসের বেদীর সামনে। ধূনুচিতে মধ্যে মধ্যে ধুনো দিচ্ছে। শান্ত ভাল মানুষ, চুপ ক'রে রয়েছে। তার পাশে বসেছে সুচাঁদ। চোখ বড় বড় ক'রে মোটা গলায় গল্প বলছে—বলছে গাজনের গল্প। প্রতিবার গাজনেই বলে, এবারও বলছে। গল্প না ব'লে চুপচাপ ব'সে থাকতে হলে সুচাঁদের মনে হয়, সে যেন কত কাঙাল দুঃখী হয়ে গিয়েছে, লোকে তাকে হেনস্তা করছে। তাই লোকে শুনুক না-শুনুক গল্প সে ব'লে যায়। বলে—তোরা শুনে আখ্, বুড়ী হ'লে বলবি। গাজন ছেরকাল আছে, গল্প ছিল না। হয়েছে, বলি তাই আছে, না বললে থাকবে না।

পাখী বলে—তবে যে বললে, ছিষ্টি ছিল না তখন। চন্দ না, সুয্যি না, পিথিমী না, মানুষ না, পশু না, পক্ষী না—

—হ্যাঁ লো, হ্যাঁ। ছিলই না তো, কিছুই ছিল না। কিছু—কিছু না। তারপর কিছু-না-থাকার ব্যাপকতা এবং গুরুত্ব বুঝাবার জন্য শেষ দীর্ঘ ক'রে টেনে বলে—কি-ছু—ই না—। ব'লে দু হাত নেড়ে দিলে।

—কি-ছু—ই না ?

—কি-ছু—ই না। অন্ধ—কা—র, আঁ-ধা-র, থমথম করছে। চোখ দুটো তার বিস্ফারিত হয়ে উঠল। শরীরে রোম খাড়া হয়ে উঠল, কণ্ঠস্বর হ'ল গম্ভীর থমথমে, বললে—আঁধারের মধ্যে শুধু কালারুদ্দের চড়ক ঘুরছিল বন্-বন্, বন্-বন্ বন্-বন্। ব'লে সে হাতখানি তুলে ধরলে। ইঙ্গিতে সেই আদিকালকে যেন দেখিয়ে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। সৃষ্টির আদিকাল পর্যন্ত প্রসারিত ক'রে দিলে তার আঙুলের ইঙ্গিতকে।

আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত কতকাল, তার সংখ্যা বা পরিমাণ নির্ণয়ের শক্তি ওদের নাই, হয়তো প্রয়োজনও নাই; কিন্তু শক্তিহীন মনের বিস্মিত উদাসীনতার মধ্যে একটা অস্পষ্ট অনুমানের আভাস ওদের বুকে জেগে উঠেছে। তাই সম্বল ক'রে বাবা কালারুদ্দ্‌কে অভ্যর্থনা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে করজোড় ক'রে।

করালী ছুটতে ছুটতে এল। এসে পড়েছে, এসে পড়েছে।

বাবা এসে নামলেন কাহারপাড়ার নীলবাঁধের পাড়ে মাতব্বরদের মজলিসে পবিত্র ক'রে বাঁধানো নতুন মাটির বেদীতে।

সুচাঁদ পাখীকে এবং করালীকে টেনে এনে বললে—পেনাম কর্। পেনাম কর্।

বনওয়ারী একটু হাসলে পাটার উপর শুয়েই। পিসী ঠিক আছে। গোদালড়ি ছাঁদনদড়ি, যখন যার কাছে থাকে তখন তারই। পিসীর সঙ্গে করালী-পাখীর মিটমাট হয়েছে, এখন আর পিসী ওদের ছাড়া আর কাউকে জানে না।

করালী-পাখীর সঙ্গে সুচাঁদের মিটমাট হয়েছে এই সেদিন, গাজনের প্রথমেই। চড়কপাটার উপর শুয়েই বনওয়ারী কথাগুলি মনে করলে।

সেদিন সুচাঁদের কান্না সুরু হয়েছিল সকালেই। কাঁদছিল বাবার বাহনের জন্য। গাজন আসছে, বাবার বাহনকে মনে প'ড়ে গিয়েছে। বনওয়ারী বিরক্ত

হ'লেও কিছু বলতে পারে নাই। উপোস ক'রে শুয়ে ছিল—ভালও লাগে নাই বুড়ীকে নিয়ে বকাবকি করতে। কাঁদুক। দুঃখ এই যে কেঁদে মানুষ ম'রে যায় না।

আদ্যিকালের বুড়ী ও। উপকথার বুড়ীর মত ওর 'কাঁদি-কাঁদি মন করে, কেঁদে না আত্যি মেটে' অর্থাৎ আত্মার তৃপ্তি হয় না। ওরা কারণেও কাঁদে, অকারণেও কাঁদে।

হঠাৎ বাহনের জন্য কান্না বন্ধ ক'রে বুড়ী কাঁদতে লাগল ওর বাপের জন্য। বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল—ওরে বাবা, আমাকে সঙ্গে কর রে! তুমি কোথা গেলে রে! আমি কোথা যাব রে! ওরে, আমার কি হবে রে! একেবারে মড়াকান্না।

আর সহ্য হ'ল না বনওয়ারীর। সে উঠল। নীলবাঁধের ঘাটে বুড়ী কাঁদছিল, তার মুখের কাছে হাত নেড়ে চীৎকার ক'রে বললে—বলি, সকাল-বেলা থেকে এমন ক'রে কাঁদছ কেনে?

সুচাঁদ চোখ মুছে মুখের দিকে চেয়ে অভ্যাসমত তারই প্রশ্নটার পুনরুক্তি করলে—কাঁদছি কেনে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাঁদছ কেনে?

—আমার মন।

—তা বললে হবে না।

—আমি কাঁদতে পাব না?

—না।

—তবে আমি কোথা যাব?

—যাবার কথা কে বলেছে?

—তবে?

—বিনি কারণে কাঁদতে পাবা না?

—বিনি কারণে কাঁদতে পাব না?

—হ্যাঁ।

—পাব না?

—না না না।

সুচাঁদ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। উঠে কোমরে কাপড় বেঁধে—চন্নপুরের বাবুদের বাড়ির রাসের উৎসবে বারুদের কারখানার বোম ফাটার মত ফেটে পড়ল।

—বিনি কারণে? বিনি কারণে? বিনি কারণে?

চীৎকার করতে করতে সে এসে মজলিসের মাঝখানে পা ছড়িয়ে ব'সে মাটিতে একরাশ ধূলো উড়িয়ে বললে—মাতব্বর! পঞ্চায়েৎ! কই, বিচার করুক পঞ্চায়েৎ! আমি থাকব কার কাছে? আমাকে খেতে দেবে কে?

উপবাসী বনওয়ারী ঘরেই ফিরে যাচ্ছিল। তা ছাড়া কালারুদ্দের শিরভক্ত হয়েছে সে, সন্ন্যাসের সময় সংসারের ধূলো-মাটি ঝগড়া-ঝাঁটি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে তাকে বারণ। তার অভাবে প্রহ্লাদ সকলকে নিয়ে মজলিস করছিল। প্রহ্লাদ সুচাঁদের আস্ফালনে বিস্মিত হ'ল না, কারণ পিসীর ধরনই ওই। পিসী হ'ল 'অরুণ্য' অর্থাৎ অরণ্যের মত, অরণ্যে যেমন ডাল পড়লে ঢেঁকি হয়, পাতা পড়লে কুলো হয়, অরণ্য যেমন মাতলে ঝড় ওঠে, কাঁদলে বর্ষা নামে, তেমনি পিসী তিলকে করে তাল, উই ঢিপিকে করে পাহাড়, কাঁদলে গগন ফাটিয়ে চেঁচায়, হা-হা ক'রে হেসে ধেই ধেই ক'রে নাচে। প্রহ্লাদ হেসে ফেললে।

সুচাঁদ ক্ষেপে গিয়ে কপাল চাপড়াতে আরম্ভ করলে।—আমাকে খেতে দেবে কে? আমাকে খেতে দেবে কে? হাসছিস? তু হাসছিস?

প্রহ্লাদ এবার গম্ভীর স্বরে বললে—কেনে, তোমার কন্যে রয়েছে।

—খাব না, আমি কন্যের ভাত খাব না।

—তবে নিজেই খেটে খাবা।

—খেটে খাব?

—হ্যাঁ। তুমি তো এখনও খাটতে পার।

—নিশ্চয় পারি। খুব পারি, তোদের পরিবারদের চেয়ে বেশি পারি।

বনওয়ারীর ওই মুখে-ময়দা-নেপা পরিবারের চেয়ে বেশি পারি। হেই পারি। হেই পারি।

সে অঙ্গভঙ্গি ক'রে কত খাটতে পারে বুঝিয়ে দিলে, দেখিয়ে দিলে।

প্রহ্লাদ হেসে বললে—তাই তো আমরাও বলছি গো।

—তবে? সেদিন বনওয়ারীর কাছে খাটতে গেলাম, তা বনওয়ারী এক দো-পর খাটিয়ে লটা পয়সা দিয়ে বিদেয় ক'রে দিলে। সারা দোপর পুকুর-ডোবার চারিপাশ ঘুরে এতটি পাতগুগলি তুলে আনলাম, তা কে আমাকে এঁধে দেয়?

এবার বনওয়ারী বললে—চেঁচিও না, থাম। বনওয়ারী ফিরেছে বাড়ীর পথ থেকে।

—অ্যাঁ? বনওয়ারীকে দেখে একটু থমকাল সে।

—থাম। আগে থাম।

—থামব?

—হ্যাঁ, থাম।

—থামব, কই, জবাব দে আমার কথার।

বনওয়ারী বললে—তুমি খাটতে গিয়ে হেদো মণ্ডলের সঙ্গে ব'সে তামুক খাবে, গল্প করবে—

সুচাঁদ তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই যথাসাধ্য সবিনয়ে ব'লে উঠল—আর করব না, আর তামুক খাব না।

বনওয়ারী গম্ভীরভাবে বললে—তা ছাড়া, তুমি ওই মণ্ডলকে কি সব বলছিলে?

—কি বললাম? কিছুই না।

—কিছুই না? বল নাই তুমি? মরা কুকুর বিড়েল ফেলা, নদ্দমা পরিষ্কারের কথা নিয়ে বল নাই যে, এ ওই বনওয়ারীর মাতব্বরি?

নির্বাক হয়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল সুচাঁদ বনওয়ারীর মুখের দিকে।

বনওয়ারী বললে—বল কেনে, বল নাই তুমি হেদো মণ্ডলকে?

শান্ত কণ্ঠে এবার সুচাঁদ বললে—হ্যাঁ, তা বলেছি বাবা। তা, এসব তো পিতিপুরুষে করত, তাই বলেছি। আর সিটি তো তোমারই কীত্তি বাবা।

—হ্যাঁ গো। আমারই কীত্তি বটে। তা অল্যায়টা কোন্‌খানে? আমরা মেথর, না মুদ্দফরাস?

সুচাঁদ চুপ করে রইল। কিন্তু মরা কুকুর বিড়াল ফেলা, মরা গরু কাঁধে ব'য়ে ফেলায় যে অন্যায়টা কোন্‌খানে, সে তাও বুঝতে পারলে না।

প্রহ্লাদ এবার বললে—জাঙলের সদ্‌গোপ মাশায়রা পিরান গায়ে দিতে শিখলে, বামুনদের মড়া কাঁধে ক'রে গঙ্গাতীরে নিয়ে যেত, তা ছাড়লে। আমরাই এ-সকল কম্ম করব কেনে?

ওসব ছেড়ে দিয়ে সুচাঁদ এবার নিজের কথা ধরলে—তা আমি যাব কোথা তা বল? বসন আমার প্যাটের বিটী, সে খেতে দেবে না। দুটো পাতগুগলি খেতে সাধ, তা—

বসন্ত এগিয়ে এল নিজের উঠান থেকে। সে শান্ত মানুষ, শান্ত কণ্ঠেই প্রতিবাদ ক'রে বললে—হা—'টে'! বলি, কবে বলেছি তোকে খেতে দোব না? ভাত বেড়ে তোর ছামনে দিয়েছি—তু ফেলে দিয়েছিস।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুচাঁদ বললে—ফেলে দিয়েছি?

—দিয়েছিস কিনা, আমার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌?

সুচাঁদ চীৎকার ক'রে উঠল—বেশ করেছি, খুব করেছি। দোব না? ওই করালীর সঙ্গে পাখীর সাঙা দিলি কেনে? ওর এত বড় বাড়—আমার গায়ে ব্যাঙ দেয়।

বনওয়ারী চীৎকার ক'রে বললে—তার জন্যে করালী তোমার পায়ে ধরবে।

—পায়ে ধরবে?

—হ্যাঁ। কই করালী? ডাক করালীকে। সে নিশ্চয় এতক্ষণ চন্নপুর থেকে ফিরেছে।

সুচাঁদ ঘাড় নেড়ে বললে—না। শুধু পায়ে-ধরা লোব কেনে আমি?

আমার লাতিনকে সাঙা করলে, একখানা ভাল কাপড় দিয়েছে আমাকে? বোতল বোতল পাখী মদ খায়, আমাকে দিয়েছে?

করালী এল, বললে—দোব, আমি দোব।

—দে, এখুনি দে। আমি মদ খেয়ে লতুন কাপড় প'রে লাচব।

এগিয়ে এল পাখী। সুচাঁদের হাত ধ'রে টেনে বললে—আয়, এখুনি আয়। এখুনি।

সুচাঁদ অন্য হাতে নিজের পা দেখিয়ে দিয়ে বললে—ধরুক, করালী আমার পায়ে ধরুক, তবে যাব।

করালী শুধু পায়েই ধরলে না, সুচাঁদকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে বললে—চল্, তোকে কোলে ক'রে নিয়ে যাব। চল্।

ছোকরার দল সব ছুটল করালীর বাড়ির দিকে।

সেই দিন থেকে সুচাঁদ প্রায় পাখীর বাড়িতেই আড্ডা গেড়েছে। ওইখানেই থাকে, পাকি মদ খায়, সিগারেট খায়, নসুবালার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাচে, শুধু ভাত খাবার সময় বসনের কাছে আসে। ভাত সে করালীর ঘরে খেতে পারে না। এক, পেটের বেটীর ভাত খায়, তারই লজ্জায় বলে—আমার মরণ নাই, প্যাটের হায়া নাই, বেটীর ভাত খাই সেই লজ্জা। আমার লাত-জামাইয়ের ভাত! চড়কের পাটায় শুয়ে সব কথা মনে পড়ল বনওয়ারীর, হাসলে একটু।

* * *

কালারুদ্দ্র কাহারপাড়ায় বসলেন—ধূপে ধূনোয়, প্রদীপের আলোয়, তেলে সিঁদুরে পূজা নিলেন কাহাড়পাড়ায়। আবালবৃদ্ধবনিতা মাটির উপর উপুড় হয়ে গড়িয়ে পড়ল, প্রণাম জানালে। এল না শুধু নয়ান এবং নয়ানের মা। নয়ান বললে—আমি পেনাম ক'রে কি করব? মরার বাড়া গাল নাই। মরবার লেগে ব'সে আছি। করালীকে পেনাম করতে বল্‌গা। কুৎসিত ভাষায় পৃথিবীকে গাল দিতে শুরু করল, তারপর হাঁপাতে লাগল।

নয়ানের মা ছেলের বুকে হাত বুলাতে লাগল। কথার জবাবই দিলে না। সন্ধ্যার সময় তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কালীদহে স্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে

এলোচুলে চিলের মত তীক্ষ্ণস্বরে গাল দিতে দিতে পাড়ায় ফিরল—চড়কের পাটায় পাপ ক'রে চেপে যে তোমার মহিমে নষ্ট করলে, তাকে তুমি ফাটিয়ে মার বাবা। যে বাবাঠাকুরের বাহনকে পুড়িয়ে মারলে তাকে তুমি ধ্বংস কর বাবা। কোপাইয়ের বানে ভাসিয়ে দাও বাবা পাপ আজন্থি, ঝড়ে উড়িয়ে দাও বাবা। হে বাবাঠাকুরের মরা বাহন, আকাশে মাথা তুলে ফোঁসফুঁসিয়ে হেলে দুলে তুমি রে-রে ক'রে এস বাবা।

গোটা পাড়াটা শুভদিনে সচকিত শঙ্কিত হয়ে উঠল।

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

দুই

নয়ানের মা যে অভিসম্পাতই দিক, বনওয়ারী তার উপর রূঢ় হ'তে পারলে না। সে মাতব্বর, তার সে কর্তব্য নয়। বরং নয়ানের প্রতি যে অবিচার সে করেছে তার প্রতিকারের জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠল। নয়ানের সাঙা দেবার জন্য কন্যে খুঁজতে লাগল। তবে অবসর যে কম। কাজ যে অনেক। বৈশাখ মাস, দিন যাচ্ছে জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়দের ঘর ছাওয়াতে। কাহারেরা পাকা বারুই, বনওয়ারী প্রহ্লাদ রতন—এ অঞ্চলের ডাকসাইটে বারুই। ঘর ছাওয়াবার মজুরিও বেশি। এটা একটা রোজগারের মরসুম তাদের। চন্নপুর পর্যন্ত যেতে হয় তাদের। এখন যে দিন-রাত্রির মধ্যে বিশ্রাম মিলছে না। দিনে ঘর ছাওয়ানো, রাত্রে রয়েছে জমি কাটার কাজ। শুক্লপক্ষ চলছে, এই পক্ষে চাঁদের আলোয়—কাহারদের নিয়ে বনওয়ারী জমিটা কাটছে। গাঁইতি চলছে। পাথরেরা জব্দ হয়েছে। ভাগ্য ভাল, পাথরের 'থাক্' অর্থাৎ স্তরটা খুব পুরু নয়, পাথরের নীচে মাটিও ভাল। বনওয়ারীর কাছে কাহারেরা মজুরি নেয় না, নেয় দৈনিক মদের মূল্যটা। রোজই চন্নপুরের পচাইয়ের দোকান থেকে দুটি জালা মদ ওরা ঘাড়ে ব'য়ে নিয়ে আসে, খায়, তারপর সন্ধ্যে পার হ'লেই, ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বললেই তারা যে যার 'হাতিয়ার' অর্থাৎ

কোদাল-টামনা-গাঁইতি-ঝুড়ি নিয়ে দল বেঁধে চলে সায়েবডাঙার দিকে। পথে বাবাঠাকুরকে প্রণাম ক'রে নেয়। ধূলো মাথায় নিলেই নির্ভয়—বাস্, চল এইবার।

মধ্যে মধ্যে ওদের সঙ্গে করালীও এসে মাটি কেটে দেয়। করালী অনেকটা বশ মেনেছে। ক'দিন আগেই তাক বুঝে বনওয়ারী বলেছে—এইবার তোর মঙ্গল হবে করালী। সুমতি ফিরছে তোর।

করালী হেসে মাথায় ঝাঁকি দিয়ে সামনে-ঝুলে-পড়া চুলগুলি পিছনে ফেলে বললে—তা মতিভ্যম তো হয় মানুষের।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাজ ক'রে যায় বনওয়ারী। সবাই নীরব। শুধু শব্দ করে লোহার হাতিয়ার আর মাটি পাথর—ঠং-খং-খস্-ঘং; সঙ্গে সঙ্গে চারি বেড়ে ঝুড়ির মাটি পড়ে—ঝপ—ঝুপ—ঝাপ। বনওয়ারীর জমি দেখতে দেখতে বেড়ে যায়।

পাশে পরমের জমিটা প'ড়েই আছে। যে ডাঙা, সেই ডাঙা। কোন একটা চুরি বা ডাকাতি ক'রে পয়সা হাতে না-পেলে পরমের জমি কাটানো হবে না।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বনওয়ারী আবার কথা বললে। আপসোসের সুরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আঃ, তু যদি ওই খ্যানতটি না করতিস করালী!

—কি?—করালী মাথা ঝাঁকি দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কি বললে সে? ভুরু কুঁচকে উঠল তার।

ওই বাবাঠাকুরের বাহনটিকে।—আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না এই ভয়টিকে। ভুলতে তাকে দিচ্ছে না নয়ানের মা। নিত্য সে গালাগালি করছে। যখনই শোনে বনওয়ারী তখনই সে চমকে উঠে। মন তার খারাপ হয়ে যায়।

করালীর মনে কিন্তু এ জন্য কোন শঙ্কা বা সংশয় নাই। রেল-লাইনে সে কাজ করে, মাটি কাটতে গিয়ে কত সাপ বেরিয়ে পড়ে। সাপ দেখলেই মারে। তা ছাড়া, ওই সাপটা মারবার কিছুদিন আগেই ঠিক এমনি একটা চন্দ্রবোড়াকে তাদের সায়েব গুলি ক'রে মেরেছে তার চোখের সামনে। সাপটা তার কাছে

সেই জন্মেই সাপ ছাড়া আর-কিছু নয়। সঙ্গী-সাথীদের কেউ এ কথা বললেই সে বলে—ভাগ্। বনওয়ারীর কথার উত্তরে ওই কথাটা বলতে পারলে না, তবু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে—ওই তোমার এক কথা। সাপ আবার—

—ও কথা ব'লো না বাবা, ও কথা ব'লো না।

করালী চুপ ক'রে গেল। বনওয়ারীর কণ্ঠস্বরে গুরুগম্ভীর সুর গমগম ক'রে উঠেছে। সে কোদাল ছেড়ে দুই হাত জোড় ক'রে প্রণাম করছে।

কিছুক্ষণ পর বনওয়ারী আবার বললে—চন্নপুর ছাড়্ তু করালী। ওখানে গিয়েই তোর এই সব মতিগতি। কিছু জমি কেন্—

—জমি ?

—হ্যাঁ। জমি কেন্, বলদ কেন্, চাষ কর্।

—সে বুড়ো বয়সে করব।—হাসতে লাগল করালী। তারপর বললে—ওরে বাপ রে ! এখন রেলের কাজ ছাড়তে পারি ? যুদ্ধু আবার জোর ধরল। রেলের কাজ যুদ্ধের সামিল হবে। বুয়েচ ? মজুরি বেড়ে ডবল হবে। এখন লোক-লোক শব্দ উঠেছে।

যুদ্ধের ব্যাপার। কালারুদ্দের মন, মহিমা। তিনিই লাগান যুদ্ধু। তাঁর চড়কের পাকে ঘটে বড় ব্যাপার। আকাল আসে, মহামারণ আসে। যুদ্ধু এসেছে।

যুদ্ধ, নাকি ঘোর 'যুদ্ধু' লেগেছে। সেই যুদ্ধের জন্যই নাকি এ দিকেও অনেক ব্যাপার হবে। লাইন বাড়বে। কোথা নাকি উড়ো-জাহাজের আড্ডা হবে ! গোটা রেল-লাইনই নাকি যুদ্ধু-কোম্পানি নিয়েছে কেড়ে। অনেক নতুন লোক নেবে। অনেক খাটুনি, অনেক মজুরি। দেশ-বিদেশ—রেঙুন, না, কোথা বোমা পড়েছে ! 'জাপুনি' না কারা আসছে ! কলকাতা থেকে লোক পালাচ্ছে। চন্নপুরেও নাকি আসছে কলকাতার লোক। চন্নপুরে হৈ-হৈ প'ড়ে গিয়েছে।

বাঁশবাঁদির হাঁসুলী বাঁকের মাথার উপর দিয়েও উড়ো-জাহাজ উড়ে যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে। পক্ষীগুলা কলরব ক'রে ওঠে, দূর আকাশে বিন্দুর মত উড়ন্ত

চিলগুলো জাহাজ দেখে ভয় খেয়ে পাখা গুটিয়ে সন্‌সন্‌ ক'রে নেমে পড়ে। কাহারপাড়ার মেয়েপুরুষ অবাক হয়ে দেখে। ছেলেগুলো অবোধ, মাঠে মাঠে ছুটতে থাকে উড়ো-জাহাজের সঙ্গ নিয়ে। আকাশে মেঘ থাকলে মধ্যে মধ্যে মেঘের ভিতর ঢাকা পড়ে, আবার মেঘ কেটে বেরিয়ে পড়ে; গোঁ-গোঁ শব্দে উড়ে চ'লে যায় কোন্‌ মুল্লুক থেকে কোন্‌ মুল্লুকে।

প্রথম যে দিন উড়ো-জাহাজ উড়ে যায়, সেদিনের কথা বনওয়ারীর আজও মনে আছে। রাত্রিকাল, নয়ানের মা গাল পাড়ছে, বনওয়ারী ব'সে আছে একা। হঠাৎ বাঁশবাদির অন্ধকার কাঁপিয়ে আকাশের কোণে সে এক মহাশব্দ।

গোঁ-গোঁ শব্দ উঠছে দুই আকাশের দূর কোণ থেকে। শব্দ ক্রমশ এগিয়ে এল।

বনওয়ারীর হাত-পা কাঁপতে লাগল।

বাবার বাহন ফণা তুলে আবার কোন নতুন রূপ ধ'রে আসছে নাকি? সমস্ত কাহারপাড়া অন্ধকারে আকাশপানে উদ্‌গ্রীব শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

লাল-নীল দুটো তারা যেন ছুটে আসছে! তার সঙ্গে ওই শব্দ।

করালীর সাকরেদ মাথলা ও নটবর বললে—উড়ো-জাহাজের শব্দ। উড়ো-জাহাজ! ওরই আড্ডা হবে চন্দনপুরের পাশে কোন্‌খানে?

হে ভগবান! হাঁসুলী বাঁকের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল অলুক্ষণে উড়ো-জাহাজ!

এখন আর সে ভয় হয় না। কিন্তু এ যে অলক্ষণ, তাতে সন্দেহ নাই। ধানের দর চড়তে লেগেছে। কাপড়ও চড়ছে। অন্য 'দব্য' অর্থাৎ দ্রব্যের দরও চড়েছে, কিন্তু কাহারদের আছে শুধু খাওয়া আর পরা—অন্য দ্রব্যের দর চড়লে তাদের বেশী কিছু যায়-আসে না।

রাত্রি নটার গাড়ি ঝমঝমিয়ে বাঁশি বাজিয়ে কোপাইয়ের পুল পার হ'লেই জমি কাটার কাজ শেষ ক'রে কাহারেরা বাড়ি ফেরে।

খেটেখুটে আর মজলিস জমে না। যে যার শুয়ে পড়ে। শুধু করালীর ঘরে আরও কিছুক্ষণ মজলিস চলে। ছোকরার দল, খেটে ওদের ক্লান্তিও হয় না, আর বয়সের কারণে খানিকটা আমোদ না ক'রে ঘুমও আসে না। ওদের মজলিসে আজকাল মাঝখানে বসে হাঁসুলী বাঁকের আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী সুচাঁদ। ওর এক পাশে গা ঘেঁসে বসে নসুবালা, অন্য দিকে পাখী। চারিপাশে বসে ছোকরারা। ছোকরারা মাতব্বরের জমি কেটে না ফেরা পর্যন্ত যত অল্পবয়সী মেয়েরা বসে। পুরুষেরা ফিরলেই ঘরে ফেরে তারা। মধ্যখানে জ্বলে একটা নতুন লণ্ঠন। হাঁসুলী বাঁকে সেকালে জ্বলত পিদীম। তাও নিম এবং রেড়ীর তেলের। নিমফল কুড়িয়ে, রেড়ীর ফল সংগ্রহ ক'রে গড়াঞী-বাড়ি থেকে পেষাই ক'রে আনত। 'কেরাচিনি' অর্থাৎ কেরোসিন উঠে 'লম্প' অর্থাৎ ডিবে হয়েছে। লণ্ঠন আজও কাহারদের কেউ কেনে নাই। বনওয়ারীর বাড়িতে আছে একটা, তাও ঘোষ-বাড়ির দেওয়া পুরনো। পানার ঘরেও একটা আছে, সেটাও পুরনো—সেটা মনিব-বাড়ি থেকে চুরি-করা। পুরনো রঙ ঢাকতে প্রাণকেষ্ট তাতে আলকাতরা মাখিয়েছে। নয়ানদের বাড়ি সে আমলের চৌধুরী-বাড়ির একটা ভাঙা লণ্ঠন প'ড়ে আছে। তলাটা ফুটে গিয়েছে; মাথাটা নাই, কাচটা ভাঙা; সেটার আবার চারিপাশে তারের বেড় দেওয়া আছে। এ সব আলোর কোনটাই বড় একটা জ্বালে না। পালে পার্বণে দায়ে দৈবে জ্বালে। একটা লণ্ঠনের তেলে চারটে লম্প জ্বলে। সুতরাং কেন জ্বালবে কাহারেরা? চন্ননপুরের কারখানার চাকরে করালীর কিন্তু লণ্ঠন জ্বালা চাইই—চাই। সুচাঁদের আবার সেটি চাই ঠিক মুখের সামনে। একেবারে উজ্জ্বল ক'রে জ্বলা চাই। তাকিয়ে দেখে আর হাসে। মধ্যে মধ্যে আরও একটু দম বাড়িয়ে দেয়, একটু বাড়াতে গিয়ে বেশি বেড়ে গেলে হাউ-মাউ ক'রে ওঠে—গেল রে—গেল রে—হেই মারে! ও পাখী—ও নসু—! ওরা কমিয়ে দিলে শান্ত হয়ে বলে—হুঁ—হুঁ, সায়েবী কল!

পাখী বলে—মরণ, লণ্ঠনেই মজেছে বুড়ী।

সুচাঁদ চুলের গোড়া থেকে দু আঙুলে টিপে টেনে কিছু বার ক'রে নসুকে বলে—দেখ্ তো ভাই, ডেঙুর, না, নিকি ?

নসু বলে—ও মাগো, এ যে ডেঙুর ! অ্যাই একেবারে বলদের মতন। ব'লে সেটা নিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের উপর রেখে ডান হাতের নখ দিয়ে টিপে মারে—পট ক'রে শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে নসুও মুখে শব্দ ক'রে—হুঁ ? ওই শব্দটি না করলে উকুনের স্বর্গ হয় না।

পাখী বলে—ওই শোনের সুড়িগুলান কেটে ফেলাস। উকুনের রাজ্যি হয়েছে।

—কি বললি ? কেটে ফেলাব ?

—হ্যাঁ।

—চুলগুলান ?

—হ্যাঁ।

—আমার চুল শোনের সুড়ি ?

—লয় ? আয়না নিয়ে দেখবি ?

চীৎকার ক'রে ওঠে বুড়ী—আতে আয়না ? না। দেখে কাজ নাই আমার।

—কেনে ?

—এই বুড়ো বয়সে কলঙ্ক হবে।

সমস্ত মেয়েরা এবার হেসে ভেঙে পড়ে। নসুবালা গান ধ'রে দেয়—

"লষ্টচাঁদের ভয় কি লো সই, কলঙ্ক মোর কালো ক্যাশে—
কলঙ্কিনী রাইমানিনী—নাম রটেছে দ্যাশে-দ্যাশে।"

হঠাৎ ওই সুরে সুর মিশিয়ে অতি সুন্দর পুরুষালি গলায় কে বাড়ির বেড়ার ধার থেকে গেয়ে উঠল—

"শ্যাম কলঙ্কের বালাই লয়ে—
ঝাঁপ দিই সই কালীদয়ে,
কালীলাগের প্রেমের পাকে মজব আমি অবশ্যাষে !"

সকলেই চমকে উঠল।—কে লো ?

সুচাঁদ এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল, বললে—রবঙ্খাষে এল!

নসু লাফ দিয়ে স'রে এসে বললে—উ মুখপোড়া কোথা থেকে এল লো? মড়া মরে নাই তা হ'লে?

পাখী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

এইবার গায়ক এসে বাড়ি ঢুকে লণ্ঠনের আলোয় দাঁড়াল। অদ্ভুত বেশ। মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল—কিন্তু মহাদেব নয়, গাজনের সঙের নন্দীর বেশ!

পাখী হাততালি দিয়ে উঠল।—পাগলদাদা!

পাগল কাহার—পাগল-পাগল ভাব, কারুর ভালতে নাই, কারুর মন্দতে নাই। ঘর নাই, সংসার নাই, 'স্তী' নাই 'পুত্ত' নাই, বিচিত্র মানুষ পাগল। একটি মাত্র কন্তে, তার বিয়ে দিয়েছে ভিন গাঁয়ে। এখানে যদি দশ দিন থাকে তো পাগল সেখানে থাকে পনেরো দিন, বাকি পাঁচ দিন এখানে ওখানে সেখানে। নেহাত অভাব হ'লে কিছুদিনের জন্য কাজকর্মে মন দেয়, নগদ মজুরিতে রোজ খাটে, খায়। খাটুনির অভাব নাই, লোকটার বিস্তে অনেক। ঘর ছাওয়ার কাজে ওস্তাদ, মাটির দেওয়ালের কাজে পাকা কারিগর, ঘর লেপনের কাজে সুন্দর হাত, বাঁশ কেটে ফেলে দাও, ঝুড়ি তৈরি ক'রে দেবে পাকা ডোম কারিগরের মত, খাঁচা তৈরি করবে। লোকটার সবেই পাকা হাত। সব চেয়ে সেরা বিস্তে গান, নিজেই গান বেঁধে গায়, গানও অতি চমৎকার। এখানকার ঘেঁটুগান একালে বরাবর পাগল বেঁধে আসছে। বনওয়ারীর পরম বন্ধু। কার নয়? সবারই বন্ধু পাগল। গলাগলি ঢলাঢলি নিয়েই থাকে। হবে না কেন! সুচাঁদ পিসী বলে—পাগলের মা অঙ খেলেছিল বোষ্টম আজমিস্ত্রী আখাল আজা দাস বোষ্টমের সঙ্গে। চন্নপুরে নয়, জাঙলে বাবা কালারুদ্দুর থানটিতে যখন পাকা ইমারতের কাজ হয়, তখন জাঙলের চৌধুরীরা খুঁজে খুঁজে বোষ্টম আজমিস্ত্রীকে এনেছিলেন কাটোয়া থেকে। পাগলের গায়ে আছে সেই বোষ্টমের অক্ত। এককালে পাগলই আনত চন্নপুরের সকল খবর। সে তখন নিত্য যেত চন্নপুর। চন্নপুরের বামুন-বউ লালঠাকরুণের সঙ্গে সে 'দিদি' পাতিয়েছিল। ছেলে ছিল না, বিধবা

মানুষ, কি যে ভক্তি হয়েছিল পাগলের, 'দিদি' বলতে অজ্ঞান হ'ত, রোজ যেত দিদির বাড়ি একটি ঘটিতে দুধ নিয়ে। ঘরের গাই নিজ হাতে দুয়ে কাপড় ছেড়ে নির্জলা দুধ দিয়ে আসত; পাগলের দিদি লালঠাকরুণ 'আত্তিকালে' সেবা করতেন, একাদশীর পরদিন লালঠাকরুণ পারণ ক'রে পাগলকে পেসাদ দিতেন। চন্ননপুরে কারুর বাড়িতে ভোজ-কাজ হ'লে লালঠাকরুণ থালা নিয়ে যেতেন, বলতেন—আমার বাড়িতে পুরুষ নাই, আমার ছাঁদা দাও, আমি নিয়ে যাব, কাহার-ভাইকে খাওয়াব। খাওয়াতেন তিনি। লালঠাকরুণের স্বগ্‌গ হয়েছে। পাগলও চন্ননপুর ছেড়েছে, হেথা কোথা যাওয়াও বেড়েছে। এখন নেশা পড়েছে কন্তের কন্তে পাঁচ বছরের নাতনীর ওপর। তাকে নিয়ে ছড়া বেঁধেছে—গান বেঁধেছে "এ বুড়ো বয়সে তুমি আমার নতুন নেশা হে!"

ওই নেশায় ম'জে সে দেশ ছাড়ায় হাঁসুলী বাঁকের আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছে। এবার ঘেঁটু ভাল হয় নাই। বনওয়ারী মনে মনে আপসোস করেছে, পাগল থাকলে আটপৌরেপাড়ার ঘেঁটুর জবাব দিত সে। গাজনের সময় পাগল থাকলে গাজন আরও জমত। সকলেই পাগলের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। হঠাৎ আজ সে এসে উপস্থিত হ'ল। উপস্থিত হ'ল বিচিত্র বেশে।

সুচাঁদ বললে—এলে তা হ'লে? ব'স ব'স। তা, ই ব্যাশ কেনে? গাজন তো ফুরিয়েছে।

পাগল বললে—এই ব্যাশেই বেরিয়েছিলাম, বলি—গাজনের সঙে একেবারে গিয়ে নাচতে লেগে যাব। তা, পথে কাটোয়ার ধুম দেখে সেইখানেই থেকে গেলাম। গাজন গেল। ব্যাশ আর খুললাম না, এই ব্যাশে গান ক'রে ভিখ মাগতে মাগতে চ'লে এলাম। কথায় বলে—ভ্যাক লইলে ভিখ মেলে না, জান তো! তা তোমার দেখলাম, বুয়েচ, পাওনা তোমার ভালই হয়েছে।

নিজের ঝোলাটা দেখালে সে। বললে—অ্যানেক আছে। চাল পেলাম, বেচে টাকা করলাম। হাসতে লাগল সে।

সুচাঁদ বললে—এখানেও এবারে খুব ধুম।

—শোনলাম। ব্যানো চড়কে চেপেছিল।

—হ্যাঁ। বাবা নেমেছিল এবার কাহারপাড়ায়।

—হ্যাঁ। তাও শোনলাম। করালীর খুব নাম শোনলাম। পাখীর সঙ্গে অঙের কথা শোনলাম, সাপ-মারার কথা শোনলাম। তা বেশ, তা বেশ। ব'লেই সে হঠাৎ সুচাঁদের গা টিপে এবং ইঙ্গিত দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললে—তা এই বারেতে আমার বেবস্থা একটা কর। না, কি ?

নসু চমকে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে গালাগাল দিয়ে উঠল—মর্, মর্ খালভরা।

কথাটা কৌতুকের। পাগল নসুবালাকে ওই স্ত্রী-বেশের জন্য ক্ষ্যাপায়, বলে—বিয়ে করব। নসু একেবারে ক্ষেপে যায়। ছুটে পালায়।

এই হাসি-কৌতুকের মধ্যেই কোপাইয়ের পুল পার হয়ে নটার ট্রেন চ'লে গেল। মেয়েরা যে যার উঠল। করালীর দল ফিরল। পাগল তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললে—বলিহারি, বলিহারি !

—পাগল-দাদা ?

পাগল গান ধ'রে দিলে—

> "পেমে পাগল হলাম আমি, পেমের নেশা ছুটল না—
> হায় সখি গো—সনজে হ'ল ঝিঙের ফুল কই ফুটল না !"

করালী গানে বাহবা দিলে না, ঢোল পেড়ে বসল না। বরং উল্টে পাগলের হাত ধ'রে টেনে বললে—ঠিক নোক পেয়েছি।

—আই দেখ, নোক কিসের ?

—ঠিক কথা বলবার। বল তুমি, বল।

—কি ?

—ব'স নসুদিদি, বার কর বোতল।

নসু ঝংকার দিলে—পারব না। উ মুনসে ভারি বদ। মুনষে অর্থাৎ পাগল।

এতক্ষণে করালী হাসলে। বললে—মর্ মুখপুড়ী মর্। বুড়ো বয়সে ঢঙ দেখ !

সুচাঁদ একদৃষ্টে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল, মুখের দিকে তাকিয়ে শুনলে কথা বুঝতে খুব কষ্ট হয় না ওর। সুচাঁদ এবার বললে—দেখ কেনে, আমাকে আবার বলে—বুড়ো বয়সে ঢঙ!

নসু গজগজ করতে করতে বোতল এনে দূর থেকে হাত বাড়িয়ে দিলে করালীর হাতে।

করালী বললে—অল্যায় কোনখানটা বল ?

কথাটা হ'ল—বনওয়ারী বাড়ি ফিরবার পথে করালীকে এবং করালীর অন্য অন্তরঙ্গদের সাবধান করেছে, শাসিয়েছে। যুদ্ধ লেগেছে—চন্ননপুরের কারখানায় অনেক লোক চাই, মজুরি ডবল হয়ে গিয়েছে। অনেকে গোপনে করালীকে বলেছে, তারা যেতে চায়। কিন্তু বনওয়ারী বলেছে—খবরদার! খবরদার! হাঁসুলী বাঁকের গণ্ডি পেরিয়ো না বাবারা। চন্ননপুর হাঁসুলী বাঁকের উত্তর দিকে। কিন্তু আসলে ওই হ'ল দক্ষিণপুরী। উপকথায় আছে—সব দিক পানে চেয়ে দেখো, মন চায় তো হাঁটতেও পার, কিন্তু দক্ষিণ দিক পানে চেয়ে দেখো না, ও দিকে, ও পথে হেঁটো না।

শেষে গম্ভীর গলায় বলেছে—সাবোধান! সাবোধান!

করালী বলতে চায়—কিসের সাবোধান ? বল তুমি পাগলদাদা, তুমি হ'লে গুণী নোক, তুমি বল, কিসের সাবোধান ?

পাগল বললে—হুঁ, তুইও মন্দ বলছিস না ভাই, বনওয়ারীও মন্দ বলছে না।

নসুবালা সুযোগ পেয়ে ব'লে উঠল হাত নেড়ে—তুমিও মন্দ বলছ না ভাই। তুমিও ভালি, আমিও ভালি—ন্যাজ বাঁধা দিয়ে চরতে গেলি। তুইও মন্দ বলছিস না—বনওয়ারীও মন্দ বলছে না। খুব বলা হ'ল।

সকলে হেসে উঠল। পাগল কিন্তু চটল না, অপ্রস্তুতও হ'ল না। সেও হাসতে লাগল।

করালী বললে—এখন যে কামিয়ে লেবে, সেই কামিয়ে লেবে। তা ছাড়া, ছেরকাল চাষই করবে না কি ? আমি চাষ করলে, এমুনি হ'ত আমার ? ওই

জাঙলের সদ্‌গোপদের কিল খেয়ে জান যেত। জান, মাথলা এবার চাষ ক'রে কি পেয়েছে? পাঁচ আড়ি ধান। ধুর্‌। মার্‌ চাষের মাথায় ঝাড়ু।

সকলেই সমর্থন করে, কিন্তু নীরবে। কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইল মজলিসটা। হঠাৎ সুচাঁদ বললে—যুদ্ধু যুদ্ধু! কিসের যুদ্ধু বাবা! ক্যা জানে?

করালী বললে—মরণ! সায়েব নোকের যুদ্ধু। ইংরাজ, জারমুনি জাপুনী।

সুচাঁদ বললে—তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু। যুদ্ধু হয়েছিল সেকালে। বর্গী এয়েছিল। ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গী এলো দেশে! সে বাবা শুনেছি বাপ-পিতেমর আমলে। অ্যাই বর্গীরা এল। ঘোড়া ছুটিয়ে টগবগ টগবগ ক'রে তরোয়াল ঘুরিয়ে—কেটে-কুটে ঘর-দোর জালিয়ে ভেঙে—মানুষের নাক কেটে কান কেটে হাত কেটে মুণ্ডু কেটে—খচাখচ—খচাখচ! লোকে ভয়ে পোড়া মালসা মাথায় দিয়ে জলে গলা ডুবিয়ে ব'সে থাকত।

পাগল বলে—হাঁ দিদি, সাঁওতাল হাঙ্গামা—সেটা বল?

বুড়ীর চোখ বড় হয়ে ওঠে!—এই সিঁদুরে মুখ আড়িয়ে, কালো যমের মত সব—হেই বাবা! গাঁ কেঁপে ওঠে মা।

বুড়ী ব'লে যায় সে গল্প।

পাখী বিরক্ত হয়ে বলে—গান কর পাগলদাদা।

—গান?

—হ্যাঁ। যুদ্ধু আর যুদ্ধু; ই কোথা যুদ্ধু হচে—আর উ কোন্‌ কালে হয়েছে। তার চেয়ে তুমি রাম-রাবণের যুদ্ধুর পাঁচালী বল।

পাগল শুরু করলে। করালী উঠল মজলিস থেকে। মাথলাদের নিয়ে বাইরে গিয়ে পরামর্শ শুরু ক'রে দিলে। করালী বনওয়ারীর উপর ক্ষুব্ধ হয়েছে। তা ছাড়া, এ কি রে বাপু? সাবোধান আর সাবোধান! বেটাছেলের আবার সাবোধান আছে? সে বললে—চল্‌, তোরা চল্‌—চল্‌ তা'পরেতে যা হয় হবে।

মাথলা বললে—এই দেখ, কাউকে বলি নাই, দেখাই নাই, এই দেখ।

সে করালীর হাতখানা নিয়ে নিজের মাথার চুলের মধ্যে গুঁজে একটা স্থান দেখিয়ে দিলে।

করালী শিউরে উঠল—কাটল কি ক'রে ?

—মুনিব মেরেছে পাঁচন দিয়ে।

—কেনে ?

—আমি বললাম, কৃষাণি করতে লারব। তা বলে—পাঁচ টাকা পাব, দে, দিয়ে যেখানে খুশি যা। আমি বললাম, মাশায়, আপুনি যদি টাকাই পাবেন, তবে আমি পাঁচ আড়ি ধান ফেরত পেলাম কেনে ? হিসেব ক'রে আপুনিই তো দিয়েছ। তা আমার হাতের পাঁচনটা ফরাম্ ক'রে টেনে নিয়ে মেরে দিলে এক বাড়ি। কেটে গেল মাথা। তা আবার দয়া ক'রে খানিক ন্যাকড়া পুড়িয়ে লাগিয়ে দিয়ে এক আঁচল মুড়ি দিয়ে বললে—ফের চালাকি করবি তো আবার ঠ্যাঙাব।

করালী বললে—দাঁড়া। ব'লে হনহন ক'রে ঘরে ঢুকে কিছু নিয়ে বেরিয়ে এল। মাথলার হাতে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললে—কালই ফেলে দিয়ে আসবি, বুঝলি ? তারপর সটান চ'লে যাবি চন্ননপুরে। মাথলা আমার সঙ্গেই যাবে। আমি ঠিক দাঁড়িয়ে থাকব ইস্টিশানের সিগনালের ধারটিতে, বুঝলি ?

পাগলের তখনও চলেছে পাঁচালী। রাম-রাবণের যুদ্ধ।—সীতাকে নিয়ে বনে গেলেন রাম। দেশসুদ্ধ লোকে কাঁদলে। রাম চলেন, সীতা চলেন, লক্ষ্মণ চলেন পিছনে পিছনে। পথে গুহক চণ্ডালের সঙ্গে পাতালেন মিতালি। এ-বন সে-বন ঘুরতে ঘুরতে শেষে 'সুপ্যনখার' সঙ্গে দেখা। লক্ষ্মণ তার নাক কাটলেন। রেগে এলেন রাবণ। সোনার হরিণের মায়া দেখিয়ে সীতাকে হরণ করলেন। রাম-লক্ষ্মণ খুঁজতে খুঁজতে কাঁদতে কাঁদতে বনের বানরকে দিলেন কোল, মিতালি করলেন। জয়রাম ধ্বনি দিলে বানরেরা। সাগর বাঁধলেন, লঙ্কায় এলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। অগ্নিবাণ নিবে যায় বরুণবাণে। বরুণবাণ ওড়ে বায়ুবাণে। সর্পবাণ কাটে অর্ধচন্দ্রবাণে। ব্রহ্মবাণে জ্ব'লে ওঠে দাউ দাউ ক'রে আগুন। মহাপাপী রাক্ষসের বুক কাঁপতে থাকে।

পৃথিবী·কাঁপে থরথর ক'রে। পশুপক্ষী কলরব করে। নদীর জল স্তম্ভিত হয়। গাছপালা ঝলসে যায়।

পাখী এবং শ্রোতারা নির্বাক হয় শোকে। হাঁসুলী বাঁকে কাহারদের পূর্বপুরুষেরা কেঁপেছিল সেকালে। হাঁসুলী বাঁকের পশুপক্ষী কলরব করেছিল, কোপাইয়ের জল স্তম্ভিত হয়েছিল। বাঁশঝাড়গুলির পাতা ঝলসেছিল। যত কালই হোক, হাঁসুলী বাঁক তো ছিল সেকালে। সেই রাম-রাবণের যুদ্ধের কালে!

হঠাৎ পাখী চকিত হয়ে আকাশের দিকে তাকালে। গুর-গুর গুর-গুর গুর-গুর—শব্দ উঠেছে হুই কোণে।

তিন

'ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম না ছাড়েন আপন জাত।'

করালী হ'ল নিম, আর ঘি হ'ল বনওয়ারীর উদার স্নেহ। কথাটা বললে নিমতেলে পানু। সকালেই আজ যাবার কথা জাঙলে ঘোষ-বাড়ি—বনওয়ারীর মনিব-বাড়ির ঘর ছাওয়াতে। ঘোষেদের বাইরের বাড়িটার নাম বাংলাকুঠি; একতলা লম্বা ঘরখানি সাহেবদের ডাকবাংলার 'ফেশানে' তৈরি করেছেন মাইতো ঘোষ মহাশয়; চুনকাম করিয়েছেন, মেঝে বাঁধিয়েছেন, দরজায় জানালায় সবুজ বিলাতী রঙ দিয়েছেন, ভিতরে ঘরজোড়া চাঁদোয়া খাটিয়েছেন—যাতে না চাল-কাঠামো দেখা যায়, মায় টানা-পাঙ্খাও খাটিয়েছেন। বাহারের ঘর! জাঙলে লোকের কুটুম সজ্জন এলে ওইখানেই বাসা দেওয়া হয়। যাদের বাড়ির কুটুম, তাদেরই রাখাল অথবা মান্দের অথবা কৃষাণের ছেলে এই কাহারনন্দনই কেউ বারান্দায় ব'সে টানা-পাঙ্খা টানে। কাজেই ঘরখানার সব কিছু কাহারপাড়ার নখ-দর্পণে। সেই ঘরখানা এবার ছাওয়াবার কথা নয়, কিন্তু হঠাৎ সেদিন হনুমানের সন্ন্যেসীর দলে যুদ্ধ লেগে ধমাধম লাফিয়ে ঘরখানার চাল একেবারে তছনছ ক'রে দিয়েছে।

হনুমানের সন্ন্যেসীর দল ক্ষেপলে ভীষণ ব্যাপার। সাধারণত হনুমানের দলে থাকে বিশ-পঞ্চাশটা হনুমতী, তাদের দলপতি থাকে এক বিরাট হনুমান, কাহারেরা বলে—গাঁদা-হনুমান, এই লম্বা এই সাদা দাঁতে দাঁতে অনবরত শব্দ করছে কট-কট-কট-কট, খ্যাঁকাচ্ছে খ্যাঁকোর-খ্যাঁক খ্যাঁকোর-খ্যাঁক। মধ্যে মধ্যে গম্ভীর গলায় উ-প শব্দ ক'রে লাফ দিয়ে চলছে,—এ ডাল থেকে ও ডাল; এ গাছ থেকে ও গাছ, গাছ থেকে পাশের ঘরের চালে ধম ক'রে লাফিয়ে পড়ছে। দলের মধ্যে দ্বিতীয় পুরুষ হনুমান নাই। দলের প্রতিটি হনুমতী প্রসব ক'রে তার সন্তান। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। প্রসব হ'লেই সর্বাগ্রে সে খবর নেবে—বাচ্চাটা হনুমান, না, হনুমতী! হনুমতী হ'লে থাকবে, হনুমান হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ নখে বাচ্চাটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেড়ে দেবে।

পুরুষ-সন্তান হ'লে হনুমতীই পালায়—এখানে ওখানে লুকিয়ে থেকে সন্তানকে খানিকটা বড় ক'রে ওই সন্ন্যাসীর দলে সমর্পণ ক'রে আবার ফিরে আসে নিজের দলে। সন্ন্যাসীর দলের দলপতির সঙ্গে মধ্যে মধ্যে এই দলের দলপতির যুদ্ধ বাধে। ভীষণ যুদ্ধ। আঁচড়-কামড় চড়-চাপড়—সে রক্তারক্তি ব্যাপার! এ ওর টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে দিতে চায়, ও ওর বুকে নখ বসিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে দিতে চায় তার হৃৎপিণ্ড। উ-প উ-প শব্দে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে, গোটা গ্রামের চাল তছনছ হয়ে যায়, দুপ-দাপ শব্দে এ চাল থেকে ও চালে লাফ দিয়ে এ ওকে, ও একে অনুসরণ করে। সঙ্গে সঙ্গে চারি পাশে সন্ন্যেসীর দল উৎসাহভরে আক্রোশভরে লাফ মারে। হনুমতীর দলও লাফ দিয়ে এ চাল ও চাল ক'রে ফেরে, তারা লাফ :দেয় উৎসাহে এবং আশঙ্কায়। একজন হার না-মানা অথবা না-মরা পর্যন্ত যুদ্ধ থামে না। এক নাগাড় তিন দিন চার দিন যুদ্ধ চলে।

এর উপায় নাই, প্রতিবিধান নাই। মাইতো ঘোষের বন্দুক আছে, তিনি আক্রোশে গুলি করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বাড়ির লোক, গ্রামের লোকে দেয় নাই। হনুমান—বীর হনুমান—রামচন্দ্রের বাহন; তিনি তাদের —

দিয়ে গিয়েছেন গাছের ডাল এবং ঘরের চালের রাজত্ব; মানুষের ফসলের একটা ভাগও তাদের দিয়ে গিয়েছেন। 'উনি'রা হলেন পবন-নন্দন, ওঁদের মারলে পবনঠাকুর মেঘ আনবেন না সে অঞ্চলে, অনাবৃষ্টি হবেই। বনওয়ারীও হাত জোড় করেছে মাইতি ঘোষকে। জল না হ'লে জাঙলের সদ্‌গোপেরা তবু বাঁচবেন, ঘরে ধান আছে, টাকা আছে। কিন্তু কাহারদের যে সর্বনাশ! তারা খাবে কি? সবংশে সগোষ্ঠী অনাহারে শুকাবে যে! সে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, গোটা কাহারপাড়া একত্র ক'রে তিন দিনে ঘরখানাকে ছাইয়ে দেবে। ঘোষ জোর তাগিদ দিয়েছেন পরশু। কলকাতা থেকে তাঁর এক বন্ধু আসবেন মেয়েছেলে নিয়ে, বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে আসবেন, যুদ্ধ যতদিন না মেটে বাস করবেন; সুতরাং ঘরে লাগতেই হবে। গতকাল থেকেই তিনি লাগবার জন্য বলেছিলেন; কিন্তু আর-এক মণ্ডলের ঘরে লেগেছিল—ঘর আধ-ছাওয়া হয়ে রয়েছে; তাই কালকের দিনটি ছুটি ক'রে নিয়েছিল বনওয়ারী। আজ লাগবে—শপথ ক'রে এ কথা বলে এসেছে। সকালেই সকল কাহার—বুড়ো যুবা এসে জুটল, এল না মাথলা নটবর ফড়িং হেবো। করালীর কথা আলাদা। সে চন্নপুরে খাটে, কাহারপাড়ার কাহার হয়েও কাহার নয়—এক গাছের ফল বটে, কিন্তু নিজেই বোঁটা ছিঁড়েছে। কিন্তু চার-চারটে জোয়ান ছোকরা এল না কেন?

আর কেন? তারা চার জনে করালীর সঙ্গে চন্নপুরে গিয়েছে। রেলে কাজ নেবে। নিয়ে গিয়েছে করালী। দলের সকলে ঘাড় নাড়লে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বনওয়ারী গুম হয়ে ব'সে রইল কিছুক্ষণ। নিমতেলে পানা সুযোগ বুঝে বললে—ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম না ছাড়েন আপন জাত!

বনওয়ারী উত্তর দিতে পারলে না কথাটার। ঘোষ মহাশয়ের ঘর ছাওয়া অবশ্য আটকাবে না, কিন্তু এ কি হ'ল? এত ক'রে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে করালীর মতি ফিরল না, তার নিষেধ লঙ্ঘন ক'রে ছোকরাদের নিয়ে গেল? কাহারপাড়ায় ভাঙন ধরিয়ে ছোকরাদের হাঁটাচ্ছে চন্নপুর—ওই দক্ষিণপুরীর পথে!

পাগল এল এতক্ষণে। সে রাত্রিটা ছিল করালীর উঠানে শুয়ে। গরমের দিন, খোলা উঠানে নিজের ঝুলিটা মাথায় দিয়ে একখানা মাদুরের উপর শুয়ে ছিল। কাহারদের বাড়িতে মাদুর বড় একটা নাই, খেজুরপাতা তালপাতার চ্যাটাই ওরা নিজেই বুনে নেয়, ওই ওদের সম্বল, কিন্তু করালী তাকে মাদুর দিয়েছিল—নতুন মাদুর। সকালে উঠে সে এল বনওয়ারীর ওখানে। বৈশাখ মাস— ঘর ছাদনের সময়, ওইখানেই সকলের সঙ্গে দেখা হবেই। হাসিমুখে গান ধ'রে সে এসে দাঁড়াল—

"মন হারিয়ে গিয়েছিলাম কোপাই নদীর তীরে হে—
কে পেয়েছে, ও সইয়েরা, দাও আমাকে ফিরে হে!"

কিন্তু মজলিসের লোকেরা শুধু একবার মুখে তুলে একটু শুকনো হাসি হেসে আবার গম্ভীর হয়ে গেল। বনওয়ারী প্রহ্লাদ রতনের তাকে বুকে জড়িয়ে ধরার কথা, তারাও চুপ ক'রে রইল। একটু পরে বনওয়ারী বললে—এলি কখন?

—কাল এতে। কিন্তু বেপারটা কি?

—অ্যানেক। তা এয়েছিস ভালই হয়েছে। চল্।

—কোথা?

—ঘোষ মাশায়ের বাংলাকুঠী তিন দিনে শ্যাষ ক'রে দিতে হবে।

—অ্যাই ছাখ্, আমাকে কেনে? আমাকে ছেড়ে দে।

—কেনে?

—আমার ভাই—। হাসলে পাগল, বললে—গান গেয়ে ভিখ ক'রে অস পেয়েছি। উ সব খাটুনি-খুটুনিতে নাই।

—না, তা হবে না। ওঠ্। ভিখ করবি? লাজ লাগবে না?

হা-হা ক'রে হেসে উঠল পাগল—পরিবার না ছেলে, ঢেঁকি না কুলো, চাল না চুলো, দিন না আত, মাস না বছর, বাঁচা না মরা—আমার আবার লাজ-শরম কিসের?

বনওয়ারী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, বললে—তোর শরম থাকলে কাল

এতে এসে তু আমার কাছে না এসে করালীর বাড়াতে উঠিস্। তা তোকেই বলি, করালীকেও বলি, বলিস ছোকরাকে—বলি, কিছু না থাক্, জাতধরম তো আছে? না, তাও নাই?

পাগল একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল, বললে—ই কথা বলছ কেনে ভাই?

—বলছি সাধে? বলছি অনেক দুখে। সে ছোকরা কজনাকে নিয়ে চন্নপুরে গেল। বেজাত বেধম্মের আড়ৎ-। বনওয়ারী চুপ ক'রে গেল, আর ভাষা খুঁজে পেলে না সে। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে—তু বলছিস ভিখ মাগবি। গতর থাকতে ভিখ মাগবি? বলি—ওরে, একটা কথা শুধাই তোকে। তোকে খেতে দিয়ে জাতটি কেউ মারতে চায়, মারতে দিবি?

পাগল বললে—চল, কথার দরকার নাই। চল; আমি যেছি।

যেতে যেতে বনওয়ারী বললে—তা'পরেতে সাঙাত।

—বল সাঙাত।

—তোর কনে কত বড় হ'ল? ভাল আছে?

—এই তোমার পাঁচে পড়ল। তা বেশ ডাগর হয়ে উঠছে দিনে দিনে। এইবার বিয়ে হলেই হ'ল। হাসতে লাগল পাগল। গান ধ'রে দিলে—এ বুড়ো বয়সে সে আমার লতুন নেশা হে!

—সেই গানটি গা দিকিনি।

—কোন্‌টি?

—সেই 'সায়েব আস্তা বাঁধালে'।

পাগলের বাঁধা রেল-লাইনের ঘেঁটুগান। চন্নপুরে যখন প্রথম রেল-লাইন বসে তখন এই ঘেঁটুগান বেঁধেছিল পাগল, এ গান গেয়ে খুব নাম হয়েছিল। আজও কাহারেরা কখনও কখনও গায়।

ঘোষ মহাশয়ের চালে চেপে পাগল গান ধরলে—

ও সায়েব আস্তা বাঁধালে!
হায় কলিকালে!
কালে কালে সায়েব এসে আস্তা বাঁধালে—

ছোকরারা ধুয়ো গাইলে—

ছ মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে !
ও সায়েব আস্তা—

ঝপাঝপ খড় উঠছে, ছুঁড়ছে নীচ থেকে। বিচিত্র কৌশলে—উপরে চালে ব'সে বারুইরা বাঁ হাতে ধরছে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। পাশে গাদা ক'রে রাখছে। বাঁখারিতে বাঁখারিতে বাবুই দড়ির বাঁধন দিচ্ছে, ঠুকছে, তারপর কোমর থেকে কাটারি বা কাস্তে খুলে দড়ি কেটে আবার সেটা কোমরে গুঁজছে।

বনওয়ারী ঘোষের চালের 'টুই'য়ে অর্থাৎ মাথায় দাঁড়িয়ে মধ্যে মধ্যে তাগিদ মারছে! ওরই ফাঁকে ফাঁকে একবার দেখছে উত্তরে চন্ননপুরকে, একবার হাঁসুলী বাঁকের ঘেরার মধ্যে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়াকে।

হাঁসুলী বাঁকের মানুষগুলি বাঁশবনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে এতকাল ওই চন্ননপুরকে দেখে আসছে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদির কাহারপাড়ার উত্তরে জাঙল, তার উত্তরে পোয়া তিনেক অর্থাৎ দেড় মাইল দূরে চন্ননপুর। কাহারেরা বলে—তা খানিক আদেক বেশি হতে পারেন, কমও হতে পারেন। চন্ননপুর চিরকাল ভয়ের জায়গা। কাহারেরা সাহেবানদের গোলামি করেছে, তাদের 'আঙামুখ' 'হাঁসাচোখ' লালচুলকে যত ভয় করেছে, ঠিক ততখানিই ভয় করেছে চন্ননপুরকে। চন্ননপুরের ঠাকুরমহাশয়দের, দোকানদার বণিক মহাশয়দের গেরাম—'ভগবান-ভগবতী' অর্থাৎ দেবদেবীর গেরাম। ঠাকুরদের ছিল সূর্যের মত তেজ, এক রাস্তায় হাঁটতে ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপত কাহারেরা; কে জানে বাবা, কোন্ খড়কুটোয় যোগসাজসে ছোঁয়া পড়বে! বণিক মহাশয়দিকে ভয় হিসেবের। বড় বড় মোটা মোটা খাতার গুটি গুটি কালির আখরের লেখন, এক খাতা থেকে আর-এক খাতায় যায়, সুদে সুদে পাওনা বাড়ে, ওদের দোকানে ধার করলে সে পাওনা পাথরের মত বুকে চেপে বসে। ভগবান-ভগবতীকে আরও ভয়। তাঁরা কত্তাঠাকুর নয়, তাঁরা কালরুদ্র নয়, তাঁদের পুজোর ঘটা কত, মহিমা কত! তাঁদের দরবারে পুজোর থান দূরের কথা—কাহারেরা

নাটমন্দিরেও উঠতে পায় না, দূর থেকে দেখতে হয়, তাঁদের ভোগের সামগ্রীতে কাহারদের দৃষ্টি পড়লে ভোগ নষ্ট হয়ে যায়। নানা ভয়ে কাহারেরা সাধ্যমতে ওপথে হাঁটত না।

নীচে থেকে এক আঁটি বাবুই দড়ি হুস ক'রে তার সামনে এসে পড়ল। মুহূর্তে বনওয়ারী সেটাকে ধ'রে ফেললে। ব'সে পড়ল, বাঁধন দিতে লাগল। কাজ জোর চলেছে। পাগল মাতিয়েছে ভাল। যেমন গলা, তেমনি গাইয়ে। সব চেয়ে সুখ ওকে নিয়ে পাল্কী বহনে। এমন ছড়ার বোল ধরবে!

পাগল গেয়ে চলেছে ঘেঁটুর গান।—

লালমুখো সায়েব এল কটা কটা চোখ—
ছ্যাশ-বিদাশ থেকে এল দলে দলে লোক—
—ও সায়েব আস্তা—
ও সায়েব আস্তা বাঁধালে—কাহার-কুলের অন্ন ঘুচালে
পাল্কী ছেড়ে র‍্যালে চড়ে যত বাবু লোক।
—ও সায়েব আস্তা—

মধ্যে মধ্যে সেকালে তাদের ডাক পড়ত ওখানকার ‘বিয়েসাদীতে’ পাল্কী-বহনের জন্য। লক্ষ্মীনারায়ণকে বহন করে গরুড় পক্ষী, শিবদুর্গাকে বহন করে দুধবরণ ষাঁড় প্রভু, ‘পিথিমী’তে বর-কনে, সে ঠাকুর মহাশয়রাই হোন আর বণিকেরাই হোন আর মণ্ডলেরাই হোন আর সেখ সৈয়দ হোন, সকল জাতের বর-কনে বহন করতে আছে এই ‘অশ্বগোত্ত’ কাহারেরা। কাহারেরা পাল্কী কাঁধে করলেই পবিত্র। পাল্কী চেপে ঠাকুরেরাও চান করেন না। ওই পুণ্যেই তাদের বাড়বাড়ন্ত। সে কর্ম ঘুচিয়ে দিয়েছে ওই চন্নপুরের কারখানা।

কালে কালে কাল পালটায়। কালারুদ্দুর চড়কপাটায় ঘুরে কত বছর এল, কত গেল, কে তার হিসেব করে! আঁধার রাত্রে সুচাঁদ গল্প বলে গাজনের! বনওয়ারীর মত কাহার মাতব্বর যারা, তারা উদাস হয়ে গভীর অন্ধকারে ভরা বাঁশবনের দিকে তাকিয়ে ভাবে, দিশেহারা হয়ে যায়; কালে কালে কাল কেমন ক'রে পালটায়, সে জানে কোপাই-বেটী। দাঁড়াও গিয়ে কোপাইয়ের কূলে।

দেখবে, আজ যেখানে দহ, কাল সেখানে চর দেখা দেয় ; শক্ত পাথুরে নদীর পাড় ধ্ব'সে সেখানে হয় দহ।

কিছুটা জানে কালীদহের মাথার বাবাঠাকুরের 'আশ্চয়' অর্থাৎ এই শিমুল বৃক্ষটি। কত কোটরে ভরা, কত ডাল ভেঙে পড়েছে, কত ডাল নতুন হয়েছে, কত পাতা ঝরেছে, কত ফুলও ফুটেছে, কত ফল ফেটেছে, কত বীজ এখানে ওখানে পড়েছে, কত বংশে বেড়েছে, কত বীজ নষ্ট হয়েছে, ওই উনি কিছুকিছু জানে। তবে উনি তো কথা যাকে-তাকে বলেন না, বলেন সাধুকে সন্ন্যেসীকে, আর নেহাত যে বাবাঠাকুরের সুনজরে পড়ে তাকে। তাকে বলেন—দেখলাম অনেক কাল বাবা! রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখলাম, কেষ্টঠাকুর কংসকে মারলেন দেখলাম ; বর্গীর হাঙ্গামা দেখলাম, সায়েবদের কুঠি দেখলাম, চৌধুরীদের আমল দেখলাম ; চন্নপুরের ঠাকুর মহাশয়দের বাবু মশায় হতে দেখলাম, কাহারদের ডাক পড়ল চন্নপুরে—সে তো এই সেদিনের কথা রে বাবা! চন্নপুরের ঠাকুরেরা বাবু হয়ে পিরান পরলেন, মসমসিয়ে জুতো পায় দিলেন, ছুত পতিত খানিকটা কম করলেন। না করে উপায় কি বল?

তাঁরা জমি-জেরাদ কিনলেন, টাকা দাদন করতে লাগলেন, ইংরিজী শিখলেন। জমিদারিও কিনলেন কতজনে। চাকরি-বাকরিতে দেশদেশান্তর যেতে লাগলেন। কীর্তনের দল ছিল চন্নপুরে, সে দল ভেঙে হ'ল যাত্রার দল। সে যাত্রাদলের গান বনওয়ারীও শুনেছে অল্পবয়সে। তারপর হয়েছে থিয়েটার। এই কালে কাহারদের ডাক বেশি ক'রে পড়ল চন্নপুরে। বাবু মশায়দের চাষে খাটতে, বাসে খাটতে, মানে—দালান-কোঠার ইট বইতে, সুরকি ভাঙতে, কাহার নইলে চলত না। মেয়েদের ডাক পড়ল মজুরনী হতে। এ কালে তখন সাহেবানদের কুঠি উঠে গিয়েছে, কত্তাঠাকুরের 'ওষে' সাহেব মেম ডুবে মরেছে, কাহারেরা চুরি-ডাকাতিও করে, আবার চাষও করে।

কিন্তু চন্নপুর হাঁসুলী বাঁকের উত্তর দিক হ'লেও আসলে হ'ল দক্ষিণ-পুরী, ওখানে গেলে ওদের মঙ্গল হয় না। সেকালে ছিল শাপশাপান্তের ভয়, একালে হ'ল অন্য ভয়। মেয়ে হারাতে লাগল। রাজমিস্ত্রী সকলেই

প্রায় শেখ ভাই সাহেব, তারা মেয়েদের সঙ্গে ‘অঙ’ ধরিয়ে কলমা পড়িয়ে বিবি ক'রে ঘরে নিয়ে যেতে লাগল। বাবুদের চাপরাসীও মেয়েদের নষ্ট করতে লাগল। বাবু ভাইয়েরাও কাহার-মেয়েদের আঁচল ধ'রে টান দিলেন। বাম্ভনের'র ছেলে, তাঁদের পরশ কাহার-মেয়েরা সইতে পারবে কেন, তারাই ফেটে গেল পাপে। মাতব্বরে মুরুব্বিতে বারণ করলে, দু হাত বাড়িয়ে পথ আগলে দাঁড়ালে—যাস না। যতটুকু না হ'লে নয়, যে যাওয়াটা না গেলে চলবে না, তার বেশি ও-পথ হাঁটিস না।

আবার কাল পাল্টাল। চন্ননপুরে এল কলের গাড়ি। লোহার লাইন পাতলে, মাটির সড়ক বেঁধে কোথাও-বা মাটিতে ‘পুল বন্ধন’ হ'ল। চন্ননপুর হ'ল ‘লদী’র ঘাট। পিথিমীর কালের ভাঙনের সকল ঢেউ এসে আগে আছড়ে পড়ে ওই চন্ননপুরে। বাবু মহাশয়েরা সে ঢেউ বুক পেতে নিতে পারেন। তাঁরা ‘বাম্ভন’, তাঁরা ‘নেকনপঠন’ জানেন ; ভগবান তাঁদের ঘরে দিয়েছেন রাজলক্ষ্মী, তাঁর কৃপাতে ওই ঢেউয়ের মুখে ঘরে এসে ঢোকে ভালটুকু—যেমন কোপাইয়ের বানে ভাগ্যমন্তের জমিতে পড়ে সোনা-ফলানো পলেন মাটি। কাহারদের বুকে ও ঢেউ লাগলে সর্বনাশ হয়, যেমন কোপাইয়ের বান ভাগ্যহীনের জমিতে চাপায় শুধু বালি, বালি আর বালি। চন্ননপুরে রেল-লাইন পড়ল, তাতে বাবুদের জমির দাম বাড়ল, ব্যবসা-বাজার ফলাও হ'ল, আর কাহারদের হ'ল সর্বনাশ। একসঙ্গে এক দল মেয়ে চ'লে গেল। করালীর মা গিয়েছে ওই দলে। হায় রে নিলাজ বেহায়া করালী! আবার এসেছে নতুন ঢেউ—যুদ্ধের ঢেউ। যুদ্ধের ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে চন্ননপুরের ঘাটে। চন্ননপুরে লাইন বাড়বে। হাতছানির ইশারা দিচ্ছে করালীর হাত দিয়ে কাহারপাড়ায় অবুঝ অবোধদের কাছে। ভুলিস না, ভুলিস না তোরা।

পাগলও এই সময়ে তার গান শেষ করে—তারও গানে এই সুর। ইচ্ছে ক'রেই বনওয়ারী তাকে এই গানটা গাইতে বলেছে। শুনুক, যে সব ছোকরা মনে মনে উশখুশ করছে অথচ যেতে পারছে না, দুঃসাহস হচ্ছে না—তারা শুনুক, জ্ঞান হোক। আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। পাগল গেয়ে নিক আগে—

জাতি যায় ধরম যায় মেলেচ্ছো কারখানা
ও-পথে যেয়ো না বাবা, কত্তাবাবার মানা।

গা, তুই গেয়ে যা পাগল—

মেয়েরা ও-পথে গেলে, ফেরে নাকো ঘরে—
বেজাতেতে দিয়ে জাত যায় দেশান্তরে।

করালীর মা গিয়েছে। কে জানে পাখীর দশায় কি আছে! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বনওয়ারী।

পাগল গান শেষ করে, গায়—

লক্ষ্মীরে চঞ্চল করে আলক্ষ্মীর কারখানা
ও-পথে হেঁটো না মানিক কত্তাবাবার মানা।

বনওয়ারী বললে—তবে? পাগল, সাঙাত আমার, তবে?

—কি তবে?

—করালীর খুব পিঠ চাপ্‌ড়েছিস শুনলাম কাল এতে। করালীকে গানটি শোনাস।

পাগল চুপ ক'রে গেল। সে ঠ'কে গিয়েছে! একটু পরে হেসে বলল—তু খুব ফিচেল বনওয়ারী!

বনওয়ারী বললে—পাখীর কথা বলব না, বলতে নাই আমাকে, আমি মামা। তবে তাকে শুধাস, টাকার জন্যে জাত মরবে, সেটা কি ভাল হবে?

বৈশাখ মাস। দারুণ রোদ। তার উপর আজ বাতাস নাই। দরদর ক'রে ঘেমে সারা হ'ল কাহারেরা। তবু মনের আনন্দে গান গেয়ে কাজ ক'রে চলেছে। হঠাৎ পাগল বললে—ব্যানো, যা হয়েছে তা হয়েছে। বাকিটা কোন রকমে আলসা খড় দিয়ে ঢাকো ভাই, গতিক খারাপ।

আকাশের দিকে চাইলে বনওয়ারী। হ্যাঁ, গতিক খারাপই বটে। আকাশ একেবারে ইস্পাতের 'বন্ন' অর্থাৎ বর্ণ ধারণ করেছে। ছায়া ঠিক পড়ে নাই,

তবে রোদ যেন 'আম্‌লে' অর্থাৎ ম্লান হয়ে এসেছে। ঠিক পশ্চিম দিকটা দেখা যাচ্ছে না। একতলা ঘর, নীচু চাল, চারিদিকের গাছপালায় ঢেকে রয়েছে দিকগুলির শেষ সীমানা। তবু ঝড় আসবে ব'লে মনে হচ্ছে। বনওয়ারী মনে মনে ডাকলে বাবাঠাকুরকে। দুটো দিন ঝড় সামলে দাও বাবা, দুটো দিন। মুখে সে তাগিদ দিলে—কতক লোক কাজ কর, হাত চালিয়ে কাজ কর। কতক ওপরে থেকে আলগা খড়ের আঁটি চাপিয়ে দাও। ছোঁড়্, খড় ছোঁড়্! এই ছোঁড়ারা! এই!

হঠাৎ একটা চীৎকার উঠল—হো—!

ওরে বাপ রে! আচ্ছা গলা! কে? আকাশে আকাশে ছড়াচ্ছে গলার আওয়াজ!

পাগল আতঙ্কে দাঁড়িয়ে উঠল।—ব্যানো!

—কি?

—দেখ—দেখ।

—কি রে?

—করালী।

—করালী?

—করালী বাবাঠাকুরের শিমুলগাছের ডালে চেপে চেঁচাচ্ছে।

চালে দাঁড়িয়ে উঠল বনওয়ারী। সর্বনাশ! আদ্যি কালের শিমুলবৃক্ষ, বাবাঠাকুরের 'আশ্চয়', সেখানে চেপেছে করালী! পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করছে—হো—! ডাকছে। কাকে ডাকছে?

—হো—ব্যানোকাকা—! হো—! হো—!

থরথর ক'রে কেঁপে উঠল বনওয়ারী। ওই উঁচু শিমুলগাছ—কাঁটায় ভরা গদি ডাল! ওর উপর উঠেছে! বাবাঠাকুর যদি ঠেলে দেন! করালীকে লাগছে যেন পুতুলের মত।

—হো—ঝড়—ঝড়! ব্যানোকাকা! পেলয় ঝড়! চাল থেকে নাম। চন্নপুরে খবর এসেছে তারে। হো—ব্যানো-কা-কা!

নামছে, এইবার করালী নামছে।

পানা বললে—পড়বে। এই—

—পড়ল ?

—না, সামলেছে ! এই—এই। ওঃ, সামলেছে। আর দেখা যাচ্ছে না।

পাখীর কান্না শোনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইল সকলে। কিন্তু বনওয়ারী কাজ ভোলে না।—খড়, খড়। না ঢেকে কেউ নামতে পাবা না। ঢাক। ঢাক।

পাগল বললে—ব্যানো, এইবার দেখ। কত্তাঠাকুরের বেলগাছ আর শিমুল গাছ এক ক'রে, দেখ।

কত্তাঠাকুরের বেলগাছের পিছনে সায়েবডাঙার ওই 'টেকরের' অর্থাৎ চড়াইয়ের গায়ে আকাশে ও কি ? কালচে মেঘের কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে না? হাঁ, হাঁ। ওই যে বিদ্যুৎ 'লল্পে' অর্থাৎ চমকে উঠছে ফুঁ-দেওয়া আগুনের আঁচের মত। এই আবার। এই আবার। আসছে তা হ'লে, আজই আসছে। নির্ঘাৎ।

আকাশের 'হেঁড়ে' অর্থাৎ বায়ু কোণে, মেঘের তুলোর উপর কোন ধুনুরী যেন তার তাঁতের ছিলের আঘাতে আঘাতে পিঁজে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

—আর দু আঁটি খড়, জলদি দাও। মাথাটায় আর দু আঁটি চাপিয়ে দি।—আকাশের দিকে আর একবার চেয়ে দেখে বনওয়ারী চালের উপর শক্ত হয়ে ব'সে মাথায় বাঁধন দিতে লাগল।

—বাস্, নাম্, নাম্। নিজে সে মইয়ের ভরসা ছেড়ে চাল থেকে লাফ দিয়ে পড়ল নীচের খড়ের গাদায়।

—লে—এইবার দে ছুট। ঘর—ঘর চল।

কাহারপাড়ার নীলবাঁধের মাথায় দাঁড়িয়ে ডাকিনীর মত হাঁক পেড়ে শাপান্ত করছে নয়ানের মা। ওঃ, একেবারে দু হাত তুলে ডাকছে, নাচছে যেন।

—এস বাবা এস। ক্ষ্যাপা বাবা আমার ! এস।

এল। হাঁসুলী বাঁকের দেশের কালবৈশাখীর ঝড়। কালো মেঘের গায়ে রাঙা মাটির ধুলোয় লালচে 'দোলাই' অর্থাৎ চাদর উড়ছে। কালো কষ্টি-পাথরের গড়া বাবা কালারুদ্রের পরনের রক্তরাঙা পাটের কাপড় যেন ফুলে ফুলে উঠছে। হাঁ-হাঁ ক'রে হাঁকতে হাঁকতে আসছে। দু হাত দোলাতে দোলাতে, বুক দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে, সামনে যা পারে সাপটে জাপটে ধ'রে তুলে আছড়ে মেরে ফেলতে ফেলতে ছুটে চলে পাগলা হাতীর মত, শিঙ-বাঁকানো বুনো মোষের মত, গাছ ভাঙে মাঝখান থেকে, ডালও ভাঙে, মূলসুদ্ধ উপড়েও পড়ে, পাতা ফুল ছিঁড়ে কুটি সারি সারি। চালের খড় উড়ে ভাসতে ভাসতে চ'লে যায় বানভাসি কুটোর মত। তালগাছগুলো যুদ্ধ করে। মাটিতে মাথা আছড়ে পড়তে পড়তে আবার খাড়া হয়ে ওঠে, আবার নামে। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ খেলে, কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকে, সে আলোতে চোখে মানুষ আঁধার দেখে, সে শব্দে কানে তালা ধ'রে যায়, মন শুকিয়ে ভয়ে এতটুকু হয়ে ভাবে, 'পিথিমী' আর থাকবে না। তবু ওরই মধ্যে সাহস ক'রে বনওয়ারীর বউ গোপালীবালা ঝড়ঠাকুরকে কাঠের পিঁড়ি পেতে বসতে দেয়, ঘটিতে ভ'রে জল দেয় পা ধুতে; বলে—ঠাকুর, শান্ত হয়ে ব'স। বনওয়ারী ঘরের মধ্যে ব'সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। উঃ, অনেকদিন এমন ঝড় হয়নি! ওরে বাপ্‌রে! কি 'পেচণ্ড' ব্যাপার, 'পেলয়' হয়ে যাবে হয়তো!

আলোতে ধেঁধে গেল সমস্ত। কড় কড় শব্দে থরথর ক'রে কেঁপে উঠল পৃথিবী। বাজ পড়ল। কোথায়? ওরে বাপরে, মাঠের সেই তালগাছটার মাথা জ্বলছে লাগছে।

ও কি! ও কার ঘর? কার ঘরের চালখানা দেওয়াল ছেড়ে ঝড়ের বেগে উঠছে আর নামছে? নতুন খড়ে ছাওয়া চাল! করালীর ঘর নয়? হ্যাঁ, করালীর ঘরই তো! ঝড় বইছে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে, ঘরেয় উত্তর-পশ্চিয কোণটা উঠছে আর নামছে। বুনো মোষ যেন শিঙ লাগিয়ে ঠেলে ঠেলে তুলছে চালখানাকে। গেল, আর বুঝি থাকবে না। ক্রমশ যেন দেওয়াল ছেড়ে বেশি ফাঁক হয়ে উঠছে—এই—এই সর্বনাশ! দেওয়াল ছেড়ে গোটা চালাখানাই ভেসে

উঠল আকাশে ; চলল, তীর বেগে ভেসে চলল—মাঠের দিকে, ঝড়ের হাওয়ার মুখে। হঠাৎ একটু কাত হ'ল, তারপর হ'ল পুরো কাত—ঘুরপাক খেলে কয়েকবার. নীচে পড়ল হুমড়ি খেয়ে। হাঁসুলী বাঁকের মাঝ-মাঠে পড়ল।

বনওয়ারী ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল পাগল।—কার ঘর, ব্যানো ?

করালীর মনে হচ্ছে।

—করালীর ?

—হ্যাঁ।

আর তার সন্দেহ নাই। নয়ানের মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে এই ঝড়ের মধ্যেও।

করালীর ঘর উড়েছে, তাতে আক্রোশ মেটার আনন্দে নয়ানের মা তারস্বরে, এই ঝড়ের মধ্যেই যেন সুরে সুর মিলিয়ে গাল দিচ্ছে। শিউরে উঠল বনওয়ারী নয়ানের মায়ের গালাগাল শুনে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার গালাগাল শাপ-শাপান্ত কোন কিছুকে রেয়াত করে না,—ক্ষমা নাই, ঘেন্নাও নাই তার মধ্যে। চোখের মাথা খায়, গতরের মাথা খায়, স্বামী-পুত্রকে যমের মুখে দেয়, ঘর-সংসার জ্বালিয়ে ছারখারে দেবার জন্য ভগবানকে ডাকে। চুল যায় এলিয়ে, অঙ্গের বসন পড়ে খুলে, সে দিকে দৃক্‌পাত করে না ; আক্রোশে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কাহার-মেয়ে গাল দিতে দিতে নাচতে থাকে, হাতে তালি দেয়, কখনও কখনও দুলতে থাকে। সে সবই বনওয়ারী জানে। শুনতে কটু লাগে, নইলে ওতে কিছু হয় না—এও অভিজ্ঞতাতে তার আছে। গত জনমের 'করমদোষে' ছোট জাত হয়ে জন্মেছে, এ জন্মেতে এমন পুণ্যি কিছু নাই যে, যা বলবে তাই ফলবে। ভয় 'বাম্ভন'-বৈদ্য বড় জাত মহাশয়দের জিভকে,—ও জিভের বাক্যিতে আর শিবের বাক্যিতে তফাত নাই। নয়ানের মায়ের গালিগালাজ শুনে শিউরে উঠে নাই বনওয়ারী। শিউরে উঠেছে নয়ানের মা ঝড়ের মধ্যে যা দেখেছে তাই শুনে। নয়ানের মা হা-হা ক'রে হাসছে আর হাতে তালি দিয়ে বলছে—

ম্যাঘের কোণে বাবার বাহন ফণা তুলে উঠেছে। লকলকিয়ে জিভ ‘কাড়ছে’ অর্থাৎ বার করছে। ফোঁস-ফুঁসিয়ে গজরাচ্ছে। আগুনের আঁচে ঝলসানো অঙ্গের ‘ডাহতে’ ক্ষেপে উঠে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে ঝড় তুলেছে। আমি চোখে দেখলাম, চোখে দেখলাম। যে মেরেছে পুড়িয়ে,তার ঘর দিলে উড়িয়ে। হে কত্তাবাবা, হে বাবাঠাকুর, তুমি ক্ষেপে ওঠ বাবা। বাহনের মাথায় উঠে দাঁড়াও এইবার। আকাশের বাজ নিয়ে নষ্টদুষ্টু বদজাতের মাথায় ফেলো বাবা। কড় কড় ক’রে ডাক মেরে হাঁক মেরে ফেলে দাও বাজ। পুড়ে ফেটে ম’রে যাক ছটফটিয়ে। হে বাবা! হে বাবা! হে বাবা!

থরথর ক’রে কেঁপে উঠল বনওয়ারী। সেই ‘বিচিত্ত’ বরণ ভয়ঙ্কর সাপটির পুড়ে মরবার দৃশ্যটি তার মনে প’ড়ে গেল। সুচাঁদ পিসীই কথা প্রথম বলেছিল। তারও মনে কথাটির উপর বিশ্বাস হয়েছিল কিছু কিছু। আজ নয়ানের মা এ কি বলছে! চোখে দেখেছে সে ওই মেঘের মধ্যে তার ফণা, তার জিভ?

পাগল বিস্মিত হয়ে গেল তার ভীতার্ত দৃষ্টি দেখে। সে ঘটনার কিছুই জানে না। শুধু খানিকটা আভাস পেয়েছে মাত্র। তবুও সে বাঁশবাঁদির কাহার। খানিকটা অনুমান করতে পারছে বনওয়ারীর ভয়। সঙ্গে তারও ভয় লাগছে। সে ভীত কণ্ঠেই ডাকলে—ব্যানো!

—হুঁ।

—কি হ’ল?

বনওয়ারী অঙুল দেখালে আকাশের দিকে।—ওই দেখ।

বনওয়ারী আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে। মোটা মোটা জলের ফোঁটা এসে চোখে পড়ছে, তবু সে চেয়ে আছে আকাশের বায়ু কোণের দিকে। বৃষ্টির ধারায় আকাশের ধুলো ধুয়ে নেমে গিয়েছে মাটিতে। বাতাসের বেগে মেঘপুঞ্জের দ্রুত আবর্তন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সাদা-কালো মেঘের বিচিত্র বর্ণসংস্থান হয়েছে সেখানে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় মানুষের দৃষ্টিতে কত অপদেবতা দেখা দেয়, বর্ষার আকাশে ‘হাতী-নামা’ ধরা পড়ে, কোপাইয়ের

বন্যায় বড় মশাল জ্বালিয়ে যক্ষের নৌকা আসা দেখতে পাওয়া যায়। আজও নয়ানের মা দেখেছে মেঘের মধ্যে ঝড়ের মধ্যে কত্তাঠাকুরের বাহনকে। বনওয়ারীও যেন দেখতে পাচ্ছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেঘের চেহারার মধ্যে সেই মা-মনসার বেটী—কত্তাঠাকুরের বাহন চন্দ্রবোড়া সাপটির দেহের বর্ণবৈচিত্র্যের সঙ্গে মেঘের সাদা-কালো রঙের বর্ণসংস্থানের স্পষ্ট মিল দেখতে পাচ্ছে।

পাগল বুঝতে চেষ্টা ক'রেও ঠিক বুঝতে পারলে না, বনওয়ারী কি দেখতে পেয়েছে। তবে সেও কাহার, সে আর একটা সম্ভাবনা দেখতে পেলে—মেঘ এবং প্রকৃতির গতিকের মধ্য থেকে। সে ডাকলে শঙ্কিতভাবে, গায়ে হাত দিয়ে বনওয়ারীকে সচেতন ক'রে ডাকলে—ব্যানো—ব্যানো! পাথর, পাথর পড়বে। ব্যানো!

—পাথর?

—হ্যাঁ। পাথর।

বৃষ্টি অত্যন্ত মৃদু হয়ে এসেছে। দুটি চারটি কুচি শিল পড়তেও শুরু করেছে।

ঘরকে চল্।—পাগল বনওয়ারীর হাত ধ'রে টানছে। বনওয়ারী হাত ছাড়িয়ে দিলে। পাপ করালী! ছাড় পাগল, হাত ছাড়। আগে—হে বাবাঠাকুর, ক্ষমা কর তুমি। মাজ্জনা কর।

পাগল টেনে বনওয়ারীকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। দেখতে দেখতে শিলাবৃষ্টি প্রবল হয়ে উঠল। ছোট ছোট ছেলেরা মাথায় হাত দিয়ে উঠানে নেমে শিলের টুকরো কুড়িয়ে খেতে আরম্ভ করলে, প্রবীণেরা তাদের ধমক দিয়ে উপরে তুললে। মেয়েরা ছুটে গেল নীলবাঁধের ঘাটে। নীলের বাঁধের জলে আছে হাঁসগুলো। মরবে। ওগুলো হয়তো মরবে। জলে ডুবে অবশ্য ওরা থাকতে পারে। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে?

—আয়—আয়—কোর্—কোর্—কোর্! আয়—কোর্ কোর্ কোর্! তি—তি—তি—! চমকে উঠল বনওয়ারী একটি কণ্ঠস্বরে। কালো বউ!

কালো বউ তুটো হাঁস বগলে নিয়ে বক্রকটাক্ষ হেনে চ'লে গেল। যাক। ও ভাবনার সময় নাই বনওয়ারীর।

পাগল বললে—ভাগ্য ভাল, ছাগলগুলো ঘরে ঢুকেছে। পাগলের পাশেই ব্যানোর ছাগল চারটে দাঁড়িয়ে জল ঝাড়ছে মধ্যে মধ্যে; রোঁয়াগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে রোমন্থন করছে।

শিল পড়েছে অজস্রধারে, ক্রমশ মোটা হচ্ছে আকারে। ঝরঝর শব্দে পড়ছে। চালে ধুপ-ধুপ শব্দ হচ্ছে। জলে চড়-চড় শব্দ উঠছে। নীল বাঁধের পদ্মপাতাগুলো ফুটে ফেটে ছিঁড়ে টুকরো হয়ে গেল।

কাহারেরা স্তব্ধ হয়ে গেছে। দেখছে শিলাবৃষ্টি। নয়ানের মায়ের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত থেমে এসেছে। মাঠঘাট ঘরের চাল সব শিলার খণ্ডে ছেয়ে সা—দা হয়ে গেল।

* * *

ঝড়বৃষ্টি শিলাবর্ষণে লণ্ডভণ্ড ক'রে ঘণ্টা তুয়েক পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। কালবৈশাখী থেমে গেল। অস্ত যাবার মুখে সূর্যও দেখা দিল। লাল হয়ে গেল আকাশটা।

ঝড়বৃষ্টির পরে কাহারপাড়ার মেয়েরা ছেলেরা ছুটল বন-বাদাড় খুঁজতে। কোথায় ডাল ভেঙেছে, পালা ভেঙে তালগাছের শুকনো পাতা খসেছে। কুড়িয়ে আনতে হবে। প্রবীণ-প্রবীণারা ঘর-দোর পরিষ্কার করতে লাগল। খড়-কুটোতে ঝড়ে শিলে ছিঁড়ে খ'সে-পড়া গাছের কাঁচা পাতায় উঠোন ছেয়ে গিয়েছে।

নসুবালা সুচাঁদ কাঁদছে তারস্বরে! হাঁসুলী বাঁকের নিয়ম। বসন মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আছে।

ওদিকে নয়ানের মা এখনও ধেই ধেই ক'রে নাচছে। ওর ঘরের চালও আধখানা উড়েছে। তাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই।

পাখী করালীকে বলছে—শোন্, শোন্ কি বলছে হারামজাদী! অর্থাৎ নয়ানের মা।

করালী একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে চালশূন্য ঘরখানার দিকে। মধ্যে মধ্যে বলছে—শালো!—শালো! শালো, নিলি নিলি, আমার ঘরটাই নিলি?

পাগল এসে দাঁড়াল।

করালী বললে—দেখ।

—দেখলাম।

শালো, আমার উপর দিয়েই গেল হে ঝড়টা।

—পাথর-টাথর বাজে নাই তো?

বেশ হেসে উঠল করালী। বললে—সে এক কাণ্ড। ঘরের মধ্যে খাটিয়ার তলায় গরুর মত—। হো-হো ক'রে হেসে উঠল করালী। বললে—পাখী কিছুতে ঢুকবে না। টেনে, বুয়েচ কি না, ছেঁচড়ে ঢোকালাম। তা'পরেতে খট-খট পট-পট—ওঃ।

মাথলা নটবর এল। মাথলা বললে—আঃ, এমন সুন্দর ক'রে ঘরখানা সাজালে—

—দূর শালো। আবার করব। শালোর চালকে এবার লোহার তার দিয়ে বাঁধেঙ্গা। দেখ্ না।

তারপর বসল ওদের মজলিস। করালীর মজলিস।

পাগল ধীরে ধীরে অনেক বুঝালে করালীকে। বনওয়ারীর কথা তার মনে লেগেছে।

শেষে বললে—বনওয়ারী একটা কথা দামী বলছে। বললে, টাকা দিয়ে যদি কেউ বলে—জাতটি দাও, দেবে তুমি?

হো-হো ক'রে হেসে উঠল করালী। বললে—জাত? জাত লেয় কে? তার ঘর কোন্‌খানে? বলি, জাত মারে কে?

—জাত মারে কে?—অবাক হয়ে গেল পাগল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। জাত মারে কে? জাত! জাত যায় পরের এঁটো খেলে, কুড়ালে। ছোঁয়া খেলে যায় না। জাত ওদের গিয়েছে, আমার যায় নাই। বুয়েচ? আমার জাত মারে কে?

পাগল ঘাড় নেড়ে নেড়ে বুঝতে চেষ্টা করছিল কথাটা। কথাটার মানে নাই, কিন্তু কথাটা কথার মত কথা বটে। ডাকাবুকোর কথা জবরদস্তের কথা। বেশ কথা।

একজন এসে ডাকলে বাইরে থেকে।—পাগলদাদা, মাতব্বর ডাকছে।

—কেনে রে? এই তো এলাম।

—মিত্তি-গোপালপুরের মিত্তি মশায়ের ঘরের নোক এসেছে। বিয়ে। দুখালা পাল্কীর কাহার চাই। আইবিশের দল চাই।

চার

'ঘোড়াগোত্ত' কাহারদের ডাক এসেছে। বর-কনের পাল্কী বহন করতে হবে। ইলাম বকশিশ—কাপড়, পুরনো জামা, মদ, পেট ভ'রে লুচিমণ্ডা। যেতে হবে বইকি। তারা যাবে। আটপৌরেদের 'রাইবেঁশের' দল আছে, ওদেরও নিয়ে যাবে। আলাদা হ'লেও ওরাও কাহার, তারাও কাহার। পরমকে বলা যাক। পরমের ঘরে কালোশশীকেও একবার দেখে আসা হবে।

এই খানিক আগে, শিলাবর্ষণের সময় কালোশশী এসেছিল নীলবাঁধ থেকে হাঁস তুলে নিতে। যাবার সময় বক্র-কটাক্ষ ক'রে গিয়েছে। সম্ভবত রাগ করেছে সে। রাগ হবারই কথা। বনওয়ারীরই মধ্যে মধ্যে রাগ ধরে নিজের উপর। মাতব্বরির পদ মনে হয় যেন আগুনে তপ্ত শালের উনোনের খবরদারির আসন। মাতব্বর যদি সে না হ'ত, কালোশশীকে নিয়ে এই বয়সেই সে চ'লে যেত দেশান্তরের কাহার-সমাজে। তাকে সাঙা ক'রে ঘর বাঁধত। শুধু মাতব্বরির জন্য—। ভাবতে ভাবতে নিজেই শিউরে ওঠে বনওয়ারী। বহু ভাগ্যের মনুষ্যজন্ম পেয়েও পূর্বজন্মের হীন কর্মের জন্য নীচকুলে জন্ম হয়েছে, ঘোড়াগোত্ত কাহার, মানুষ হয়েও—ঘোড়ার মত উচ্চকুলের মানুষদের বহন করতে হয়, পাল্কীর ডাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে, ঘাঁটা পড়ে সেখানে। বাঁক বইতে হয়। মনিব-বাড়ির মরা গরু মোষ কুকুর বিড়াল ফেলতে হয়েছে এককালে—কালের

গুণে বহু কষ্টে বনওয়ারীর মাতব্বরির আমলেই তা থেকে রেহাই পেয়েছে। কিন্তু চরণের তলে তো থাকতেই হবে চিরকাল। এ সব পূর্বজন্মের ফল। আবার এ জন্মে মন্দ কাজ ক'রে কাহার থেকেও নীচকুলে জন্মাবে? কালারুদ্দের চড়কের পাটায় সে চেপেছে এবার। চড়ক-পাটার লোহার কাঁটায় শুয়ে আকাশপানে চেয়ে ডেকেছে বাবাকে। বাবা দয়া করেছেন, আবার সে পাপ করবে? আবার? না। না। ক্ষমা কর, প্রভু, ক্ষমা কর।

কিন্তু দেখতে, দেখা করতে দোষ কি? তাতে তো পাপ নাই। কালোশশীকে দেখবে। বুঝিয়ে বলবে তাকে—এ জনমে হ'ল না ভাই, আসছে জনমে যাতে তুমি পাও আমাকে, আমি পাই তোমাকে—তার লেগে বাবার থানে দু বেলা পেনাম ক'রো। কালারুদ্দের থানে বটগাছের নামালে ঢেলা বেঁধো। আমিও তাই করব। আর মনের আগুনে পোড়ো, আমিও পুড়ি, পুড়ে পুড়ে খাঁটি হই, জ্বলুক। দিবানিশি কুলকাঠের 'আঙোরা'র মত ভালবাসার আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলুক। ওই পুণ্যেই পাব আমরা দুজন দুজনকে।

রতন প্রহ্লাদ এবং ছোকরারাও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠছে। অনেক দিন পর মোটা পাওনার ভাল বায়না এসেছে। উৎসাহে সদ্য এতবড় ঝড় এবং শিলাবৃষ্টির কথা ভুলে গিয়েছে। 'বাত' অর্থাৎ আবহাওয়া হয়েছে ভাল। এই জল এবং শিলাবৃষ্টির পরদিন হবে ঠাণ্ডা। ওদিকে মাঠে হয়েছে কাদা, সেখানে কাজ নাই। মুনিবদের চাল ভিজে ডব-ডব করছে, ও চালে এখন কদিন চাপা যাবে না, 'নিশ্চিন্দি' অর্থাৎ নিশ্চিন্ত হয়ে চল সব।

মিত্র-গোপালপুরে কায়স্থ মহাশয়দের উন্নতির অবস্থা। জাঙলের ঘোষ মহাশয়ের চেয়েও বাড়বাড়ন্ত। তাদের ছেলের বিয়ে। ধুমধামের বিয়ে। 'বেলাতী বাজানা' 'গড়ের বাদ্যি' ঢোল সানাই রসুনচৌকি, থ্যামটা নাচ, রায়বেঁশে—সে অনেক কাণ্ড! কাহারদের কপাল ভাল—বিয়ে রেলরাস্তায় নয়, গাঁয়ের পথে। আট আট—ষোল বেহারার দুখানা পাল্কী যাবে। লুচি মিষ্টি পোলাও মাছ মাংস, পেট পুরে খাওয়া—থমথমে অথচ চরণ ঠিক রাখা। তারপর সঙ্গে বিড়ি সিগারেট, ভাল কাষ্টগড়ার তামাক—মধুর মধুর গন্ধ, এ তো

কাহারেরা ম'রে স্বর্গে গেলেও পাবে না। তার উপর প্রতিজনের এক-একখানা লাল গামছা কনের বাড়ির বকশিশ।

বরের বাড়ির বিদায়! এ কি ছাড়া চলে? আর কাহারেরা ছাড়লেই বা মিত্র মহাশয়েরা শুনবেন কেন? আর তো কলের গাড়ি—মোটর গাড়ির আমদানি হয়ে কাহারদের রেহাইই দিয়েছেন ওঁরা, নেহাত কাঁচাপথ আলপথ হ'লেই ডাকেন। এ না করলে চলবে কেন? এই পথের জন্যেই পাল্কীকাহার চাই, নইলে মিত্র মহাশয়রা ভাড়ার মোটর, বাস-মোটর আনতেন।

আট ক্রোশ ক'রে ষোল ক্রোশ পথ। খানিকটা পাকা, তারপর ক্রোশ ছয়েক কাঁচা গরুর গাড়ির পথ—মাঝখানে খানিকটা আলপথ।

পাল্কী নইলে উপায় নাই। কাহারদের সৌভাগ্য।

পাগল আসতেই তার পিঠ চাপড়ে বনওয়ারী বললে—যেতে হবে সেঙাত। শুনেছ তো?

পাগলের খুব ইচ্ছে নাই, তবুও সে বললে—চল। আজই সকালে কুলকম্ম নিয়ে বনওয়ারী তাকে যে সব কথা, বলেছে, তাতে 'না' বললে বিচ্ছেদ হবে হয়তো।

নাচ খানিক, নাচ।

পাগল নাচলে না। ব'সে পড়ল দাওয়ার উপর। তার মনে এখনও ঘুরছে করালীর কথা। তা ছোকরা খুব জবরদস্ত কথা বলেছে—জাত মারে কে? তার ঘর কোথা? বটে, কথা ঠিক বটে। তুমি যদি ঠিক থাক তো জাত মারে কে? আবার বনওয়ারীর কথাও ফেলনা নয়, পিতিপুরুষের কথা। সে ভাবছে।

বনওয়ারী পাগলের ভাব গতিক দেখে বিস্মিত হ'ল। বললে—তোর হ'ল কি, বল দিনি?

—বলব। গোপনে বলব। কঠিন কথা। বুয়েচ? মাথা ঘুরে যাবে।

বনওয়ারীর প্রাণে আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেছে। পাগলের কথায় সে খুব চিন্তিত হ'ল না; সেই পাগল তো। তার উপর করালীর ঘর উড়ে যাওয়ার

পর, করালীর দম্ভের কথা সে ভাবতেই পারে না। করালীর ঘরখানা উড়ে যাওয়ায় দুঃখ হ'লেও সে খুশি হয়েছে। অর্থাৎ দুঃখও হয়েছে, খুশিও হয়েছে। দুঃখ—ঘরখানা, এমন ঘরখানা গেল! খুশি—ফাঁড়া কেটেছে, পাপের অপরাধের দণ্ড ওই ঘরখানার চালের উপর দিয়ে গিয়েছে। সে তো চোখে দেখেছে মেঘের মধ্যে বাবার বাহনের রূপ। যাক, ফাঁড়া কেটে গিয়েছে। এবং মনে মনে ধারণাও হয়েছে যে, করালীচরণ নিশ্চয় মনে মনে বুঝেছেন। বাবাধন আজই উঠেছিলেন বাবাঠাকুরের আদ্যিকালের শিমুলবৃক্ষে। অনেক উঁচুতে উঠে খুব উঁচু হয়েছেন ভেবেছিলেন। তা এক ঝাপটে শাসনের নমুনা খানিকটা দেখিয়ে দিলেন বাবা। এবং এটাও নিশ্চয় যে, এই বনওয়ারী যদি বাবাঠাকুরকে না সন্তুষ্ট করত, তবে করালী এত অল্পে রেহাই পেত না। হয়তো বজ্রাঘাতই হয়ে যেত আজ।

সে চ'লে গেল আটপৌরেপাড়ার দিকে। পরমের উঠানে গলার সাড়া দিয়ে ডাকলে—পরম! পরম রইছিস?

বেরিয়ে এল কালোশশী। পিচ কেটে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে—ও বাবা! পুণ্যিবান মাতব্বর! কি হে?

ভুরু নাচিয়ে ইশারা ক'রে বনওয়ারী প্রশ্ন করলে—কই? সে কোথায়? অর্থাৎ পরম।

বিচিত্র হাসি হেসে কালোবউ বললে—কে জানে? হয়তো পেনয়িণীর বাড়িতে। তা তুমি? তুমি কি মনে ক'রে? পথ ভুলে?

কিছুদিন আগের একটা কথা মনে প'ড়ে গেল বনওয়ারীর, সে বললে—পুণ্যির ভাগ দেবার কথা ছিল ভাই, তাই ভাগ এনেছি।

উত্তরে রসিকতা না ক'রে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে কালোশশী চাপা গলায় বললে—আসছে।

পরম?—ঘুরে তাকাল বনওয়ারী। পরম বেশ মদ খেয়েছে। টলতে টলতে আসছে।

—ক্যা? ক্যা রে? কোন্ শালো?

গম্ভীর স্বরে বনওয়ারী বললে—আমি রে পরম।

—তুমি ক্যা রে? আমিও তো আমি রে।

—আমি বনওয়ারী।

—বমওয়ারী?

—হ্যাঁ। মিত্তি-গোপালপুরের বিয়ের বায়না এয়েচে। কাহার, আইবিশে চাই। তাই খবর দিতে এয়েছি।

—হুঁ। মিত্তি-গোপালপুর? খুব ধুম! লয়?

—হ্যাঁ। তা যাবি তো?

—তা যাব। কিন্তুক—

—কি?

—তোর সঙ্গে আমার—বুল্লি কিনা, আমার একটা কাজ আছে।

—কি কাজ?

—আছে। আছে। বুল্লি কিনা, খুব দরকারী কাজ। তা—

—বল্ কেনে।

—উঁ-হুঁ। বলব, সে একদিন বলব। বুয়েছিস? বেশ ক'রে বুঝিয়ে বলব। তা, আজ লয়। বিয়েটা সেরে আসি, বুল্লি? কি বল্?

বেশ, তাই বলিস।

বনওয়ারী ফিরল। এই সব পেঁচি মাতালের সঙ্গে তার বনে না। মদ খাবে—মদ কাহারদের পোষ্টাই, তা খাও, কিন্তু টললে চলবে কেনে? পেঁচি মাতাল! কিন্তু এদিকে আবার সামনে কে?

সে হাঁকলে—কে?

—আমি।

—কে তু?

—আমি পানু—পানকেষ্ট।

—পানা? পা থেকে মাথার দিকে রক্ত উঠতে লাগল বনওয়ারীর।—তু এখানে?

—মুনিব-বাড়ি যেয়েছিলাম। বাড়ি যেছি।

হুঁ, বুঝেছে বনওয়ারী। পানা এখনও পাক দিচ্ছে সুতোয়। দে, তা দে। বনওয়ারী ভয় করে না।

পানু বললে—তুমি? পরমের ঘর আইছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ। বায়না আছে আইবেশের। মিত্তিবাড়িতে।

—তুমি সিরগাটটি খাও। আমার মুনিবের ছেলেই স্কুলে পড়ে তো, সিরগাট খায়। আজ পকেট থেকে বার ক'রে একেছিল কুলুঙ্গীতে, আমি এক ফাঁকে বুল্লে কিনা—। হাসতে লাগল পানা। আবার বললে—তা চুরি করাই সার হ'ল। দুটির বেশী ছিল না বাক্সতে। আমি একটি খাব, তুমি একটি খাও।

নিমতেলে পানু ভেতরে তেতো, বাইরে মিষ্টি। বিলাতী নিমের কথা শুনেছে বনওয়ারী, ও সেই বিলাতী নিম। পানু হেসে বললে—ধম্মের কল বাতাসে ল'ড়ে গেল। পিতিফল হয়ে গেল।

বনওয়ারী কোন উত্তর দিলে না।

পানু ব'লেই গেল—ঘর উড়ল করালীর। এত বাড় সহ্য হবে কেনে? লতুন ছাওয়ানো ঘর! বাবাঠাকুরের কোধ। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—বাবাঠাকুর ওকে লেবেন, বুয়েচ? এ আমি নিশ্চয় বললাম। তার পমাণ আমি পেয়েছি।

অন্ধকারের মধ্যে খানিকটা দূর থেকে কে উত্তর দিয়ে উঠল—তা আবার পাবি না? তু ব'লে কত পুণ্যাত্মা, কত তোর সাধন ভজন, তু আবার পমাণ পাবি না? বলে, সেই পুণ্যির ছটায় আনারে আলো হয়। নখে তোর তিন কাল, চোখের দিষ্টিতে বক মরে, ঝুলিতে তোর সিঁদকাঠি—তু আবার পমাণ পাবি না?

নসুবালা। কণ্ঠস্বর আর কথার ভঙ্গিতে চিনতে দেরি হ'ল না নসুবালাকে। পানু চুপ ক'রে গেল। বনওয়ারী বললে—নসু?

—হ্যাঁ। নসুবালাই বটি আমি।

—কোথা যাবি?

—মিত্তিবাড়ি চললাম। ওদের লোক পেয়েছি, চ'লে যেছি।

মিত্র-বাড়ির যে লোক বায়না দিতে এসেছে, তারই সঙ্গে নসুবালা চলেছে মিত্র-বাড়ি। এ অঞ্চলে বিয়ে-বাড়িতে নসুবালার বাঁধা নিমন্ত্রণ। ও নিজেই নেয় নিমন্ত্রণ। গিয়ে হাজির হয়। পরনে মেয়ের সাজ, নাকে নথ, মাথায় খোঁপা, গায়ে গয়না, কাঁখে ঝুড়ি। গিয়ে, ঝুড়িটি রেখে প্রণাম ক'রে বলে—এয়োদের মঙ্গল হোক। এলাম মাঠাকরুণ দিদিঠাকরুণরা। এঁটোকাটা ফেলব, পাট-কাম করব, গান শোনাব, নাচব। যাবার সময় একখানি শাড়ি লোব, খাবার লোব, গুণগান ক'রে নাচতে নাচতে বাড়ি যাব।

নসু তাই চলেছে। বনওয়ারী হাসলে। পানা পালাচ্ছে হনহন ক'রে। নসুবালার তা চোখ এড়াল না। সে তার সিগারেটের আগুনটাকে চলতে দেখে বুঝতে পারছে। সে বললে—আজ ঘর উড়েছে, কাল হবে। বলেছে, এবার লোহার তার দিয়ে বাঁধেঙ্গা। বুঝলি রে সিড়িঙ্গি!

পরের দিনই করালী ঘর মেরামতের আয়োজনে লেগে গেল। ভোরে উঠেই চ'লে গেল চন্নরপুর, সেখান থেকে ট্রেনে কাটোয়া গিয়ে দু দিনের ছুটি নিয়ে ফিরল বিকেলে। ফিরল একেবারে ছুতোর-মিস্ত্রি সঙ্গে নিয়ে। শুধু আপসোস হ'ল, বনওয়ারীরা বাড়িতে নাই। থাকলে দেখিয়ে দিত চন্নরপুরের কারখানায় কাজ করার মুরদটা। ওরাও সব আজ খেয়ে-দেয়ে রওনা হয়ে গিয়েছে মিত্তির-গোপালপুর বিয়ের পাল্কী বইতে। সুচাঁদ বললে—উ কি আমার যে-সে নোক! মোটা চাকরি করে। সায়েব হ'ল মুনিব। সেকালে কুঠীর সায়েবেরা মুনিব ছিল, তখনকার কাহারদের মত ভাগ্যি আমার করালীর।

করালী এ কথাতে চ'টে গেল।—বেশি বকিশ না। সায়েবদের পাল্কী বহন করি না আমি।

সুচাঁদ বুঝতে পারে না, করালীর এতে রাগ করার কি আছে! এ নিয়ে ঝগড়াও একটা বাঁধতে পারত, কিন্তু করালীই ক্ষান্ত হল। নিজের যুক্তির মধ্যেই জোর পায় না করালী। পাখী না বললেও এই সেদিন ছোট একটা খালের ঘাটে তাকে দশজন সাহেবকে কাঁধে তুলে পার করতে হয়েছে। যুদ্ধের জন্য সায়েব এসেছে অনেক।

উদ্যোগ আয়োজন সব ঠিক হয়ে গেল। পরের দিন কিনে-কেটে নিয়েও এল সব। কিন্তু করালীর সবই আশ্চর্য! নতুন বাঁশ কেটে দড়ি কিনে খড় কিনে পুনরায় চাল তৈরি করবার ঠিকঠাক ক'রে সে হঠাৎ ঘোষণা ক'রে দিল—উঁহু, থাক্।

থাকবে কি? এবং কেন? পাখী বললে—মর্ মর্ মর্, ঢঙ দেখে বাঁচি না।

—ঢঙ নয়, ঘরের চাল উড়েছে—ভালই হয়েছে, এবারে ‘নেপাট’ ক'রে ভেঙে নতুন কোঠাঘর করব।

—কোঠা?

—হ্যাঁ, ওপরে শোব। নামোতে আন্না হবে, হাঁড়িকুঁড়ি থাকবে।

পাখী আনন্দে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাঁ ক'রে চেয়ে রইল করালীর মুখের দিকে। লোকজন বিদায় হতেই সে ছুটে এসে দুই হাতে করালীর গলা জড়িয়ে ধ'রে পা গুটিয়ে ঝুলতে লাগল মহানন্দে।

করালী অনেক ভাবলে, গবেষণা করলে, বললে—ঘর করব পু-দুয়োরী, পচি বাগে থাকবে সিঁড়ি। দখিন দিকে আর পূব দিকে দুটো ‘বারজানা’ হবে। ইস্টিশান থেকে নোয়ার তার আনব, ইস্টিশানের টিনের ঘরে কোণে কোণে যেমন তার দিয়ে বেঁধে মাটিতে খুঁটো পুঁতে বাঁধন দিয়ে টান দেয়, তেমনি টান দোব। দেখি, বেটার ঝড় এবার কি ক'রে ঘর ওড়ায়?

পাখীর নাচবার কথাই। পাখী সত্যই নাচল। নসুবালা নাই, সে গিয়েছে বিয়ে-বাড়ি নাচতে, এঁটো পরিষ্কার করতে। সে থাকলে ছড়া কেটে কোমর ঘুরিয়ে নাচত। বসন ভালমানুষ লোক, উচ্ছ্বসিত হওয়া তার স্বভাব নয়, সে

শুধু হাসলে। সুচাঁদ প্রথমটা হাসলে, ছড়া কাটলে, তারপর কাঁদলে পাখীর বাপের নাম ক'রে—তুই কোথা গেলি বাবা, দেখে যা রে, পাখীর কোঠা হবে রে।

লোকে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

হাঁসুলী বাঁকের ঘর ঝড়ে উড়লে, বা আগুনে পুড়লে—লোক ঘরের দেওয়াল অবশ্য আধ হাত এক হাত উঁচু ক'রে চাল তোলে, কেউ কেউ উপরের নতুন দেওয়ালে হাঁড়ির মুখে বসিয়ে একটু আধটু বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা ক'রে নেয়। বানে ঘর পড়ে গেলে নতুন ক'রে পছন্দমত ঘর তৈরি ক'রে ছোট-খাটো জানলাও রাখে, ঘরদোর হয়ে গেলে বলে—মা-কোপাইয়ের দয়াতে এ এক রকম ভালই হয়েছে।

যাদের ভাঙে নাই, তারা আপসোস ক'রে বলে—আমার ঘরখানা পড়লে বাঁচতাম। শুধু একপাট ছাল প'ড়েই তিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে অইল ঘি।

সেই সায়েবডোবা চৌধুরী-বাড়িতে মা-লক্ষ্মী এসেছিলেন বানে, সেই বানে গোটা কাহারপাড়া ভেঙেছিল। সেবার নতুন ক'রে হয়েছিল কাহারপাড়া। তার আগে নাকি কাহারপাড়ার ঘরগুলিতে কেউ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। সেবার নতুন ক'রে কাহারপাড়া তৈরি হ'লে, ঘরগুলি বর্তমানের আয়তন পেয়েছিল। এখন মাঝখানে মানুষ বেশ স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে পারে; কিন্তু চার কোণে এখনও মাথা ঠুকে যায়। এখন কাহারপাড়ার যে বড় ঘরগুলি দেখা যায়, সেগুলি সবই বানে ভেঙে যাওয়ায়, ওই মা-কোপাইয়ের দয়ায় হয়েছে। সেগুলির কোণেও আর মাথা ঠুকে যায় না, দেওয়ালে উপর দিকে ছোট জানলাও আছে। কিন্তু করালীর এ যে বিষম কাণ্ড! ঝড়ে ঘরের চাল উড়ল, দেওয়াল খাড়া আছে, সেই দেওয়াল খরচ ক'রে ভেঙে নতুন ঘর! তাও আবার কোঠাঘর! যা কখনও কাহারপাড়ায় হয় নাই।

বসন্ত করালীকে ডেকে চুপি চুপি প্রশ্ন করলে—বাবা, কোঠাঘরে খরচা অ্যানেক। তা—

করালী তাকে অভয় দিলে—তার লেগে তুমি ভেবো না।

বসন পাখীকে জিজ্ঞাসা করলে—হাঁ লো, টাকা কতগুলি আছে বল্ দিদি?

—লবডঙ্কা।

—তবে?

—ধার করবে। ইস্টিশানে একজনা টাকা ধার দেয়।

—ও মা গো! বসন শিউরে উঠল।—ধার করবে কি লো?

—হ্যাঁ। হপ্তা হপ্তা সুদ মিটিয়ে দেবে। আর কিছু কিছু আসল দিয়ে শোধ করবে।

অবাক হয়ে গেল বসন্ত। আবার সে গেল করালীর কাছে। করালী তাকে জলের মত বুঝিয়ে দিলে। চন্নপুর ইস্টিশানে একজন মাড়োয়ারী আছে, সে গোটা ছোট লাইন বরাবর লাইনের বাবু থেকে আরম্ভ ক'রে কুলীদের পর্যন্ত টাকা ধার দেয়। টাকায় নেয় এক আনা হিসাবে সুদ, সপ্তাহে সপ্তাহে এক পয়সা হিসেবে টাকায় সুদ সে আদায় নেয়। মাসের শেষে কিছু ক'রে আসলে উসুল চায়। দিতে পার ভাল, না পার তম্বি নাই। আর তিন মাসের মাসে আসলে উসুল কিছু চাইই। করালী তার কাছেই এক শো টাকা নেবে। সপ্তাহে তার রোজ এখন আট টাকা চার আনা—ইস্টিশানে দুটো চারটে মাল বয়, তাতেও টাকা দুয়েক হয়। এই দশ টাকা চার আনা থেকে সপ্তাহে সুদ তাকে দিতে হবে এক টাকা 'ন' আনা। থাকবে আট টাকা এগারো আনা। মহাজন মাড়োয়ারী বলেছে, ও থেকে যদি করালী সপ্তাহে আড়াই টাকা হিসেবে আসলে উসুল দিয়ে যায় তো মোটা হিসেবে দশ মাসে এক শো টাকা শোধ হয়—সূক্ষ্ম হিসেব সে পরে ক'রে দেবে। এবং সে-হিসেব সে মাস্টারবাবুকে দিয়ে যাচাই ক'রেও নেবে। বিশ্বাস না হ'লে শাশুড়ী মাথলাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখতে পারে, সেও চাল তৈরি করবার জন্য তার কাছে তিরিশ টাকা ধার নিচ্ছে। নটবরকেও জিজ্ঞাসা করতে পারে। মাথলা নটবর এরা এখন চাষ ছেড়ে লাইনের কাজে ঢুকেছে।

বসন্ত আরও অবাক হয়ে গেল। এমন ধারার লেন-দেনের কথা সে কখনও শোনে নাই। হাঁসুলীর বাঁকের উপকথায় এ হিসেব—এ কারবার নতুন। জাঙলের মণ্ডল মহাশয়দের সঙ্গে কারবার তাদের অন্য রকম। ধান নেয়। এক মণ নিলে দেড় মণ দিতে হয়, শোধ না গেলে সুদে আসলে এক হয়ে আবার সুদ টানে। টাকা নেয়, ধার নয়—দাদন। সারের উপর দাদন, দুধের উপর দাদন। নগদ সার বেচাকেনা হয় টাকায় তিন গাড়ি, চার গাড়ি, যার যেমন সার ; দাদনের সার দিতে হয়—তিন গাড়ির জায়গায় চার গাড়ি, চার গাড়ি দরের সারের দাদনে দর—সাড়ে পাঁচ গাড়ি। টাকায় ষোল সের দুধ, দাদন নিলে—দুধের দর দিতে হয় টাকায় বাইশ সের। পাঁচ টাকার উপর দাদন হ'লে দর দিতে হয় চব্বিশ সের। দশ টাকার বেশি দাদন নাই। ঘটি, বাটি, রুপোর গয়নাও দু-এক পদ বাঁধা দিতে হয় কঠিন বিপদে। তার হিসেব অত্যন্ত জটিল, সে ওরা বুঝতে পারে না, বুঝতেও চায় না, কারণ সে আর কখনও ফেরে না। সুতরাং এমন লেনদেনের কারবার বসন্তের কাছে পরমাশ্চর্যের কথা।

পৃথিবীতে যা আশ্চর্য, তাই হাঁসুলী বাঁকে ভয়ের বস্তু। আশ্চর্যকে ঘেঁটে দেখে তার স্বরূপ নির্ণয় করার মত বুদ্ধির তাগিদ ওদের নাই। যদি বা আদিকালে কখনও ছিল, বার বার ঘা খেয়ে খেয়ে তা ম'রে গেছে। সাহেব সদ্গোপ বাবুদের শাসন ঠেলে কখনও তা কঠিন এবং ধারালো হয়ে আশ্চর্যকে ভেদ ক'রে ছেদ ক'রে দেখবার মত নির্ভয় বিক্রম লাভ করতে পারে নাই। বসন্ত তাই শঙ্কিত হয়ে উঠল এ প্রস্তাবে। সারাদিন চিন্তা ক'রে সে কোন উপায় দেখতে পেলে না করালীকে নিরস্ত করবার। অবশেষে মনে পড়ল বনওয়ারীকে। সন্ধ্যায় করালীকে ডেকে সে বললে—আমি বলি কি বাবা, আজকাল দুটো দিন সবুর কর।

করালী আজই কাজ শুরু করতে বদ্ধপরিকর। পুরানো ঘরখানাকে সে তার বন্ধু দুজনকে নিয়ে ভেঙে ফেলতে চায়! সে বললে—সবুর কেনে? কিসের সবুর?

—এই বনওয়ারীদাদা, অতনদাদা, পেল্লাদদাদা—এরা ফিরে আসুক। এদের সব শুদিয়ে-আবিয়ে যা বলবে সবাই, তাই করবে।

করালী হেসেই খুন।—আমি ঘর করব তা শুধাব কাকে ?

—শুধাতে হয়। মাতব্বরকে তো শুধাতেই হবে। একটা রহুমতি নিতে হয়। বিয়েসাদীর মতন এটাও তো শুভকাজ।

—উঁহু, রহুমতি আমার লেয়া আছে। হঠাৎ হেসে সে বললে—রহুমতি ? কার রহুমতি, কিসের রহুমতি ? আমি করব ঘর, আর রহুমতি দেবে মাতব্বর। উঁহু। লে, লে, চালা গাঁইতি। সে নিজেই দেওয়ালে উঠে কোপাতে লাগল।

আশ্চর্যের কথা, ঠিক এই সময় ছুটতে ছুটতে সুচাঁদ এল, হাঁপাচ্ছিল সে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—না না না। কোঠাবাড়ি করতে পাবি না—পাবি না—পাবি না।

—যা ম'ল। তু আবার সঙ্ করতে এলি কেনে ?

—ওরে কেউ কখনও করে নাই। কাহারপাড়ায় কোঠাঘর করলে তু ম'রে যাবি। সইবে না।—সুচাঁদ গিয়েছিল গুগলি তুলতে, সেই পুকুরের জলে গুগলি খুঁজতে খুঁজতে মনে পড়েছে কথাটা, যা পিত্তিপুরুষে করে না, তা করতে নাই। সয় না। সহ্য হয় না। মানুষ ম'রে যায়।

সুচাঁদের কথার কোন জবাবই দিলে না করালী। সে ভাঙতে লাগল ঘর।

সুচাঁদ কাঁদতে লাগল। কথাটা বসন্তের মনে হ'ল। সেও শিউরে উঠল। আঃ, বনওয়ারী কবে ফিরবে !

মাথলা নটবর এরাও মুখ ফুটে ব'লে ফেললে—হ্যাঁ ভাই, মাতব্বরকে একবার শুধাবি না ? সে এসে যদি আগ-টাগ করে ?

করালী মাথা ঝাঁকি দিয়ে চুলগুলোকে পিছনে ফেলে দিয়ে বললে—আগ

করে, ঘরের ভাত বেশি ক'রে খাবে। মাতব্বর কে রে? আমার মাতব্বর আমি। তারপর হঠাৎ বললে—চল্।

—কোথা?

—চল্। আজ আমার শিমুলগাছে উঠব। সেদিনে গাছে উঠেছিলাম ব'লে নাকি ঝড়ে আমার ঘর উড়েছে। আজ আবার গাছে উঠব। আজ কি হবে হোক।

সঙ্গে সঙ্গেই সে চলল। মাথলারা সভয়ে অনুসরণ করলে। না ক'রে উপায় নাই। করালী এখন ওদের সর্দার যে। চন্দনপুরে ওর তাঁবেই বেচারা-দের খাটতে হয়।

করালী বললে—ভাল করলে মন্দ হয় কিনা! চন্দনপুরে তারে খবর এল—পেচণ্ড ঝড় আসছে। তুদিকে পেলাম না, ছুটে গাঁয়ে এলাম—গেরাম সাবধান করতে। এসে দেখি, গাঁয়ের মরদরা সব জাঙল গিয়েছে ঘোষেদের ঘর ছাওয়াতে। কি করি? আকাশ দেখি কালচে হয়ে গিয়েছে। বুঝলাম, চারদিকে ঝোপের আড়ালে চালে ব'সে ঠাওর পায় নাই। উঠে পড়লাম শিরীষ গাছে। উঠে দেখি, পচি দিকে—অঃ, সে কি ঘটা, কি বলব মাইরি! তা শিরীষ গাছটা তো খুব উঁচু লয়, দেখে সুখ হ'ল না। তখন উঠে পড়লাম ওই গাছটাতে। বলিহারি! বলিহারি! সে আচ্ছা বাহার হয়েছিল!

নটবর বললে—হয়েছিল, দেখেছিলি, বেশ করেছিলি। আজ আর থাক্। কাজ কি দেবতার গাছে উঠে?

শিমুলগাছটার কাণ্ডটা বিশাল, ওটাকে আঁকড়ে ধ'রে ওঠা অসম্ভব। করালী কাণ্ডটার গায়ের কোটরগুলো ধ'রে উঠতে শুরু ক'রে দিলে। উপরে প্রথম ডালটায় উঠে নটবরের দিকে থুথু ফেলে বললে—ভাগ্ শালা।

তারপর বললে—বাঃ, এখান থেকে দয়ে ঝাঁপ খেতে ভারি সুবিধে মাইরি।

—এই, এই, দয়ে কুমীর আছে, বাবাঠাকুর আছে।

তা বটে। কুমীর থাকতে পারে।

দয়ে ঝাঁপ খাওয়া মুলতুবি রেখে উপরের দিকে উঠতে লাগল সে। উঠে সে আজ আবার হাঁক মারলে—হো—

অর্থাৎ দেখ, তোমরা দেখ, আবার আমি উঠেছি শিমুলগাছে।

গোটা কাহারপাড়া সে হাঁক শুনে গাছের দিকে সভয়বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

পাঁচ

বিয়ের পাল্কীবহন দু দিনের আমোদ। কোন কোন বিয়েতে তিন দিনও লাগে—সে খুব দূর পথ হ'লে। গায়ে-হলুদের দিনই বর রওনা হয়, কনের বাড়িতে হয় নান্দীমুখ। নইলে রওনা বিয়ের দিন। বিয়ের দিবসে বর নিয়ে কন্যের বাড়িতে সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছে—খাওয়া-দাওয়া-আমোদ। তার পরের দিন বর নিয়ে বউ নিয়ে আবার সনজে নাগাদ বরের বাড়ি ফেরত-গোষ্ঠ। তার পরেতে বিদেয়, ঘরে ফেরে কাহারেরা এক প্রহর রাত্রি পর্যন্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে দুপুর রাত্রিও হয়ে যায়। গা-গতরে ব্যথা একটু আধটু হয় বইকি, তবু প্রচুর মদের নেশায় হৈ-হৈ ক'রে ফেরে। বিয়ের দু দিন মদ খায় বটে, কিন্তু বেশি খাওয়া বারণ। পাল্কী কাঁধে পা ঠিক রেখে যেতে হবে—পরস্পরের পায়ে পায়ে পা ফেলে যেতে হবে। এর পায়ে ওর পায়ে ঠোক্কর খেলে পাল্কী নড়বে। পা টললে পাল্কী টলবে। বর-কনের মাথায় ঠোক্কর লাগবে পাল্কীর কাঠে, সে একটা খ্যানত। তারপরেতে রাস্তা, আলপথ, খানা, মেটেপথে চলতে হয়—বেশি নেশা করলে চলবে কেন? তাই ফেরত-গোষ্ঠের পর পেট ভ'রে মদ খেয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফেরে কাহারেরা। পাওনাগণ্ডা ভাগ মদের দোকানে হয়। ঢুকবার আগেই যে যার বুঝে নেয়, নয়তো মাতব্বরের কাছে জমা থাকে, বাড়ি ফিরে পরের দিন নেশা ছুটলে আপন আপন নিয়ে আসে। বনওয়ারীর দলের নিয়ম—পরের দিন বুঝে নেওয়া। রতন প্রহ্লাদ প্রভৃতিরা বলে—মানুষ বুঝে কই কথা, দেবতা বুঝে নই মাথা। অর্থাৎ মাথা নোওয়াই। বনওয়ারীর কাছে টাকা থাকা আর লক্ষ্মীর হাঁড়িতে সিঁদুর মাখিয়ে তুলে রাখায় কোন তফাৎ নাই। বনওয়ারী বলে—পরের ধন কালাকুন্দের কণ্ঠের বিষ; নিজের লোকের জিনিস ফেলে দেবার উপায় নাই, রেখে সোয়াস্তি নেই, পেটে দিলে ইহকাল তো ইহকাল—পরকাল পর্যন্ত জ্বালিয়ে খাক ক'রে দেবে।

পাওনাগণ্ডা মন্দ হ'ল না—ষোলো কাহারে দুখানা পাল্কী, পাল্কী পিছু ষোলো টাকা—অর্থাৎ প্রত্যেকে দু টাকা হিসাবে বিদায়, ষোলো জনে ষোলোখানা গামছা, কনের বাড়িতে বিদায়-বকশিশ পাঁচ টাকা অর্থাৎ পাল্কী পিছু আড়াই টাকা, মদের ইলাম দুখানা পাল্কীতে দু গোলা অর্থাৎ দু জালা মদের মূল্য। পরমের দলও বেশ পেয়েছে—রায়বেশে গিয়েছিল ছ জন, বকশিশ-বিদায় নিয়ে পেয়েছে বারো টাকা। এ ছাড়া এক গোলা মদ। মদের দিক দিয়ে পরমেরাই বেশি পেয়েছে। তাতে বনওয়ারী কাউকে আপত্তি করতে দেয় নাই; ছি, ও সব হ'ল ছোট নজরের কাণ্ড। পরমরা খেলা দেখেয়েছে ভাল। হ্যাঁ, লাঠিতে পরম ওস্তাদ বটে, যাকে বলে—একখানা 'খেল্' দেখিয়ে দিয়েছে। পাঁচ-পাঁচটা সাকরেদ লাঠি নিয়ে ঘিরলে, পরম পাঁচটাকেই হঠিয়ে লাফ মেরে বেরিয়ে এল। দুজনের মাথা ফেটেছে, একজনের আঙুল এমন ছেঁচেছে যে, ভুগবে ছোকরা কয়েকদিন। দু পক্ষের কর্তারা ধরেছিলেন—বনওয়ারীকে ধরতে হবে লাঠি পরমের সঙ্গে। পরমই বলেছে—লাঠি খেলা দেখবেন তো বনওয়ারীকে বলেন। হ্যাঁ, একহাত খেলে সুখ পাই, আপনারাও দেখে সুখ পান। বনওয়ারী হাতজোড় করেছে। লাঠি খেলা সে দেখিয়েছে, কিন্তু একা একা; রতন প্রহ্লাদের সঙ্গেও দুহাত খেলেছে। কিন্তু পরমের সঙ্গে খেলে নাই। কাজ কি? দু পাড়ায় রেষারেষি চিরকাল। তা ছাড়া, পরম ডাকাত, দাঙ্গাবাজ, ওকে বিশ্বাস করে না বনওয়ারী। আর কালোশশী, আছে মাঝখানে। মনে পড়েছে আটপৌরেপাড়ায় ঘেঁটুগানের কথা। পরমের হাসিটাও ভাল লাগে নাই। যাক, বাবার কৃপায় বিয়েসাদীর কাজ হৈ-হৈ ক'রে ভালয় ভালয় মিটে গেল। আমোদও হ'ল খুব। অনেকদিন এমন আমোদ হয় নাই। পাল্কীতে পাল্কীতে জবর পাল্লা হয়েছে।

যাবার সময় খুব জমে নাই। দুখানা পাল্কীর একখানাতে ছিল বর, একখানিতে ছিল 'গুরুঠাকুর'। জমেছিল আসবার সময়। এক পাল্কীতে বর, এক পাল্কীতে কনে। দুই পাল্কীতে পাল্লা। কে আগে যাবে? এ পাল্লার আমোদ হাঁসুলী বাঁকের উপকথার সেই প্রথম কালের আমোদের কথা

মনে করিয়ে দেয়। যে কালে তারা ছিল কুঠির দরবারের গোলাম, যে কালে দেশে বড় বড় বাড়িতে ছিল মতির ঝালর-দেওয়া কিংখাবে-মোড়া পাল্কী, পাল্কীর ডাঁটে থাকত রূপোর মকর মুখ, কি বাঘের মুখ, কি সিংহের মুখ। কত্তা-গিন্নীর পাল্কী কাঁধে নিয়ে পাল্লা চলত। হাঁসুলীর বাঁকের চাকরাণ-ভোগী কাহারদের গায়ে তেজ জাগত, পায়ে দৌড় জাগত—সোয়ারী পিঠে ঘোড়ার মত। সায়েব-মেমকে—কত্তা-গিন্নীকে কাঁধে নিয়ে পাল্লা দিয়ে তালে তালে 'প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ' শব্দে হাঁক মেরে চারিদিকে 'সোর' জাগিয়ে ছুটত তারা। সে কাল চলে গিয়েছে। এখন ভাঙা পাল্কীর আমল। কাহারদেরও আর চাকরাণ নাই, দেশেও আর সে সব পাল্কী নাই। সে আমলের সে সব পাল্কী-চড়িয়ে কর্তা-গিন্নীও নাই। এই কর্তার চেহারা, পাকি আড়াই মণ ওজন। তেমনি চেহারা গিন্নীর, দু মণের তো কম নয়, তার উপর গিন্নীর গায়ে গয়না, সেও কোন্ না আধ মণ ওজন হবে। পাল্কী কাঁধে উঠল তো মনে হ'ল, কাঁধ কেটে বসে গেল। এক-এক জন আবার এর চেয়েও জবরদস্ত হতেন। তাঁকে নিয়ে পাল্কী তুললে, মাথা ঝনঝন ক'রে উঠত, বুকের কলিজায় চাপ পড়ত। রসিক বেহারারা নানা বোলের মধ্যে-মাঝে বলত—বাবু বড় ভা—রী। লোকে আজও বেহারার বোলের ঐ লাইনটাই ব'লে থাকে, তারা রসিকতা করে বলে—বেহারারা বলে, শালা বড় ভা—রী। হরি হরি রাধাকৃষ্ণ! তাই পারে বলতে কাহারেরা? এই বিয়েতে অনেক কাল পর দুখানা পাল্কীতে পাল্লা চলেছে। সচরাচর এক পাল্কীতেই বর-কনে আসে আজ কাল, তাই পাল্লার সুযোগ মেলে না। মিত্র মহাশয়েরা দুখানা পাল্কী করে ছিলেন।

আট ক্রোশ পথ মাতিয়ে—পথের ধুলো উড়িয়ে চ'লে এসেছে। চার চার জনে কাঁধ দিয়ে চলেছে এক-এক পাল্কীতে, বাকি চার-চার জন ছুটে এসেছে সঙ্গে। সে প্রায় চৌঘুড়ির মতো জোরে এসেছে। বর যাবে আগে, কি কনে যাবে আগে? কত্তা আগে, না গিন্নী আগে? 'নক্ষী' আগে, না 'লারায়ণ' আগে? প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ! বনওয়ারীর পাল্কীতে

বনওয়ারী আছে আর আছে সেই পাগল কাহার, পাল্কীর আগের ডাণ্ডায় প্রথমেই আছে পাগল। সে হাঁসুলীর বাঁকের কাহারপাড়ার আদ্যিকালের গান গাইতে গাইতে এসেছে। গান গাইতে পাগলের জুড়ি কেউ নাই। পাগল গেয়েছে—

—সরাসরি ভাল পথে—

পিছনওয়ালারা হেকেছে—প্লো-হিঁ।

—জোর পায়ে চলিব—

—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—

—আরও জোর কদমে—

—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—

পাগল হাসতে হাসতে সুর ক'রে এবার বলে—

—বরেরো পাল্কী। প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ!—পড়িল পিছনে—

—প্লো-হিঁ —প্লো-হিঁ।

—আগে চলে লক্ষ্মী—

—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—

—পিছে এস নারায়ণ।

বরের পাল্কীর সামনে আছে রতন, সেও হাঁকলে— জোরে ভাই, জোরে ভাই—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। কনের পাল্কীতে কনে বরের দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে, বরও হাসছে পাল্কীতে ব'সে—এ কথা তারা জানে।

হঠাৎ বনওয়ারী জোরে হাঁকে—বেহারা সাবোধান!—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। —আলপথে নামিলাম। পায়ে পায়ে—পায়ে পায়ে। অর্থাৎ পা যেন ডাইনে বাঁয়ে না পড়ে; একটি পায়ের দাগে আর একটি পা, একজনের পায়ের ছাপের উপর আর একজনের পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে সাবধানে এস বেহারারা। এ সব জায়গায় বনওয়ারী নিজে সুর ধরে, পাগলকে বিশ্বাস করতে পারে না। সে যে-রকম আলাভোলা লোক, হয়তো গানের ঝোঁকে পথের কথা না ব'লে বর-বনের কথাই ব'লে যাবে। পিছনের বেহারারা পড়বে বিপদে। বনওয়ারী

হাঁকলে—ফেলে ফেলে সাবোধানে, এস রে বেহারা। ডা-ই-নে বেঁ-কি-ব। হুঁশ ক'রে—হুঁশ ক'রে। প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ! সামনে উঠতি—আলকাটা নালা ভাই। প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। পিছে টান পড়িছে। পিছন হতে প্লো-হিঁর বদলে শব্দ হ'ল—কাঁধ—কাঁধ। থামল পাল্কী। একজন পাল্কী ছাড়বে, একজন কাঁধ বদলাবে, অর্থাৎ ডান থেকে বাঁ কাঁধে নেবে।

দেখতে দেখতে ডান পাশ দিয়ে বরের পাল্কী নিয়ে রতন হাঁকতে হাঁকতে চ'লে গেল হুম্‌-হুম্‌ শব্দে। ডুনে বোল ব'লে জোর ছুটেছে।

—হেঁইয়ো—হুঁশিয়ার—

—প্লো-হিঁ।

—পাশ কর পাল্কী—

—প্লো-হিঁ।

—কর্তার হুকুমত—

—প্লো-হিঁ।

—গিন্নীর পাল্কী—পিছনে পড়িল—

—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—

পার হয়ে চ'লে গেল ওরা।

বনওয়ারী পাগল আবার ছুটল—বরের পাল্কী এগিয়ে গেল, চল চল। জোর কদমে আবার চলল কনের পাল্কী।—কদমে-কদমে বেহারা চল রে। পাগল আবার স্বরে হাঁক ধরে—কত্তা আগে গেল। প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। ছুটে চল বেহারা, ধর ওই পাল্কী। জোরসে জোরসে। আগে যাবে লক্ষ্মী। তবে তো লক্ষ্মীর মুখে হাসি ফুটবে। লক্ষ্মীর কাছে হেরে 'নারায়ণ'ও হাসবে। প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ—প্লো-হিঁ। বর এবং কনে যে পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসেছে, এ ওরা ঠিক বুঝতে পেরেছে। পাল্কীর ডাণ্ডা বেয়ে সে হাসি এসে ওদের পরশ দিয়ে যায় যে!

অনেক কাল পর এবার ভারি আমোদ গিয়েছে। পান সুপারী চিঁড়ে মুড়কী লুচি মিষ্টি প্রচুর বেঁধে নিয়ে ফিরল কাহারেরা।

মিত্রকর্তা বনওয়ারী এবং পরমের পিঠ চাপড়ালেন—বাহবা!
খুব খুশি
হয়েছি।

পরমেরা ঘাঘরা, বডিজ, পায়ের নূপুর, কানের মাকড়ি খদ্য
পুঁটলি বেঁধে মাথায় নিয়ে রওনা হ'ল। বনওয়ারীকে ডাকলে— খুলে ফেললে।

হাসলে বনওয়ারী, বললে—চল, মাতালশালায় আসর পাত —আয়।
গিয়ে; আমরা
যাচ্ছি—আমাদের কম্ম এখনও বাকি আছে।

পরম ব্যঙ্গভরে বললে—হ। বটে বটে! ঘোড়াদিগে
গাড়ি তুলে দিতে
হবে আস্তাবলে।

কাহারদের অশ্বগোত্র। তাই ঠাট্টা করলে। বনও
ওয়ারীদের এখন পাল্কী
দুখানি নিয়ে পৌছে দিতে হবে চন্নপুরে বড়বাবুদের বাড়ি। পাল্কী দুখানা
তাঁদের। মিত্রেরা চেয়ে নিয়েছিল বিয়ের জন্য। বি— পাল্কী দুখানির জন্য দুটি
বড় মাছ বাবুদের সম্মানী দিতে হবে। য়সাদীতে পাল্কী নিলে মাছ দিতে
হয়। জ্ঞানগঙ্গা নিয়ে যাবার জন্য পাল্কী নিলে সিধে দিতে হয়—ঘি-ময়দার
সিধে। এগুলি বহন ক'রে নি
য়ে যায় কাহারেরাই। এই কাজ সেরে তবে
বনওয়ারীদের ছুটি তবে এ কাজটা ছেলে-ছোকরাদের। তারাই বরাবর
করে। খালি পাল্কী দুই কাহারে ব'য়ে নিয়ে যায়, এক কাহার নেয় মাছ,
কোন কোন ক্ষেত্রে ওই দুজনের একজনই হাতে ঝুলিয়ে নেয় মাছটা। সাধারণ গেরস্তে মাছ দেয় দু সের ন পো, বড় জোর আড়াই সের ওজনের। এর বেশি ওজনের দিতে পাবে কোথায় তারা? যার থাকে, সেও নজরের জন্যে দিতে পারে না। মিত্র মহাশয় মানী লোক, দুটো মাছ দিয়েছেন দশ সের ওজনের। বড়বাবুদের বাড়ি যাবে, ছোট কি দেওয়া যায়? বনওয়ারীও ঠিক ওই জন্যেই ছেলে-ছোকরাকে ভারটা না দিয়ে নিজেই যাবে। বড়বাবু রাজলক্ষীর আশ্রিত, তাঁকে দর্শন হবে, প্রণাম হবে। বাবু মাছ দেখে খুশি হবেন। বলবেন—তুই? কে বল্ তো তুই?

বনওয়ারী বলবে—আজ্ঞে হুজুর, আমি বনওয়ারী। আপনার চাকর পেজা হয়েছি নতুন। সায়েবডাঙায় জমি নিয়েছি।

এ ছাড়া আরও একটু কারণ আছে। নসুবালা এক ফাঁকে এসে ব'লে গিয়েছে—ব্যানোকাকা, বর বলেছে তোমাকে দেখা করতে। দেখা না-ক'রে যেয়ো না যেন। লুকিয়ে বললে আমাকে। কনে হাসছিল।

বনওয়ারী পাগল রতন প্রহ্লাদ পরস্পরের দিকে চেয়ে মুচকে হেসেছে। পাল্লা দিয়ে পাল্কী নিয়ে আসার জন্যে বর কনে দুজনেই খুব—খুব খুশি হয়েছেন। গোপনে রাঙাহাতের 'বশকিশ' আসবে। সেটা আর পরমকে সে জানাতে চায় না। ওরা মনে মনে হিংসে করবে। হয়তো ওরাও গিয়ে বরের কাছে দাবি করবে। কথাটা লোক-জানাজানি হবে। বর কনে হাজার হ'লেও ছেলেমানুষ, বিয়ে ব্যাপারে দশের কাছে আশীর্বাদী দু-দশ টাকা ওঁরা পেয়েছেন তা থেকেই দেবেন, দেশসুদ্ধ লোককে দু' হাতে বিলুতে পাবেন কোথায়? পরমকে দিলে বাজনদার আসবে, বাজনদারের পিছনে রোশনাইদার আসবে, তার পিছনে এ-ও-সে কতজন আসবে তার ঠিক আছে!

ওই যে! নসুবালা হাতছানি দিয়ে ডাকছে খিড়কীর দোরে। নসুবালার কাপড়খানা একেবারে 'অঙে-অঙে' 'অক্তসনজে' হয়ে গিয়েছে। খুব রঙ মেখেছে নসু। গলা ভেঙে গিয়েছে। গান গেয়েছে দিনরাত। হাতে দু হাত ভ'রে কাচের রেশমী চুড়ি পরেছে।

বনওয়ারী পাগল এগিয়ে গেল। পাগল মুচকি হেসে বললে—তা হ'লে গাঁয়ে ফিরে আমার সাঙাটাও হয়ে যাক ব্যানো-ভাই। কনে তো তৈরি।

নসুবালা গাল দিয়ে উঠল—মর্, মর্, মুখপোড়া! ভদ্দনোকের ঘর মান না! নিলেজ্জো, গলায় দড়ি দেগা!

পাগল হঠাৎ চোখ বড় বড় ক'রে বললে—ও বাবা, যাব কোথা? কনের নাকে ঝিকমিক করে কি? ও তো পেতল নয়! ওটি তো দেখি নাই যখন এলি সে দিনে!

গা দুলিয়ে পরম পুলকে নসু এবার বললে—আদায় করেছি হে, আদায় করেছি। কনের কাছে। সোনার 'সামিগ্যি' এই—এই এত! নাকছাবি চার-

পাঁচ গণ্ডা। কানের ফুল মাকড়ি আট-দশটা। কাপড় এক মোট। কনে নাকছাবিটি দিলে। গিন্নীমা পাছাপেড়ে শাড়ি দেবে। বরকে বলেছি—দাদাবাবু, কাহার ব'লে আমি ননদপেটারি পাব না কি? তা হবে না, সে ছাড়ব না আমি—হ্যাঁ। লতুন ডুরে কাপড়—। হঠাৎ লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়ে সে সরে দাঁড়াল। বর মহাশয় বেরিয়ে এসেছেন। বর পাঁচ টাকার একখানি নোট বনওয়ারীর হাতে দিয়ে বললেন—কনের পাল্কীর বেহারারা তিন টাকা নিয়ো, আমার বেহারাদের দু টাকা।

বনওয়ারী খুশিই হয়েছিল, কিন্তু নসুবালা ব'লে উঠল—হেই মা রে, তিন টাকা? তিনে দোশমন! না দাদাবাবু, শুভকাজে দোশমন করতে নেই। আর এক টাকা দাও তুমি।

বর হেসে বললেন—তোকে নিয়ে হয়েছে বিপদ। ব'লেও কিন্তু এক টাকা না দিয়ে পারলেন না।

বনওয়ারী বললে—জয়-জয়কার হোক বাবু মাশায়!

পাগল বললে—একটি পাওনা রইল কিন্তুক।

বর বললেন—কি, বল?

—খোকাবাবু হ'লে আমরা কিন্তু বউদিদি আর খোকনকে বহন করে আনব। বায়না আমাদের হয়ে রইল।

বর লজ্জা পেয়ে হাসলেন। নসু হাতে তালি দিয়ে নেচে উঠল।

তাই ঘুনাঘুন—তাই ঘুনাঘুন।

মাতালশালায় এসে বসল বনওয়ারী। জ'মে উঠেছে মাতালশালা। ব'সে গিয়েছে দলে দলে মাতালেরা। জেলেরা এক জায়গায়, সাঁওতালেরা এক জায়গায়, ডোমদের দল বসেছে আমগাছের তলায়, হাড়ীরা বসেছে ওপাশে, চন্ননপুরের বাউরীরা বসেছে আলাদা, বাগদীরা ওখানে ব'সে বড় মদ খায় না, বাড়ি নিয়ে গিয়ে পাড়ায় বসে খায়। পরম দলবল নিয়ে বসেছে ডোমেদের

দলের কাছাকাছি। বনওয়ারী আশা করেছিল, আজ অন্তত এই একসঙ্গে বিয়ের কার্য সেরে ফেরার পথে সকলে 'একসঙ্গেই বসবে। ক্ষুণ্ণ হ'ল সে। বললে—পরম হোথা গিয়ে বসল ?

গুপী বললে—যাক বাপু, যার যেথা মন—সেথাই বিন্দাবন। বেশ বসেছে।

বনওয়ারী সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলে, পথে কিছু ঘটেছে। পরমকে তো সে জানে! হেসে বসল সে। ব'সে বললে—হ'ল কি ? ল্যাই করেছে বুঝি পাওনা নিয়ে ? অর্থাৎ ঝগড়া।

—পাওনা নিয়ে ল্যাই হ'লে বুঝতাম—মনের ঝাল। জাত নিয়ে, গোত্ত নিয়ে ল্যাই।

—জাত নিয়ে, গোত্ত নিয়ে ?—বনওয়ারীর কপালের শিরা ফুলে উঠল।

পাগল বললে—ছাড়ান দাও। লাও, ঢাল ঢাল।

—ছাড়ান কিসের ? তোর ঘেন্নাপিত্তি সব গিয়েছে পাগল !

—তু খেপেছিস ব্যানো। জাত নিয়ে ঝগড়া কিসের ? যে বড় সে বড়, যে ছোট সে ছোট। ভগবান যা ক'রে পাঠাল্‌ছেন, তাতে কার কি হাত ? আসল জাত নিজের নিজের আচার-আচরণে, কাম-কম্মে।

বনওয়ারী বুঝে গেল। এইটি ওর গুণ।—ঠিক ঠিক, এ তু ঠিক বলেছিস, বাস্‌। লাও, ঢাল। ছোট বললে ছোট হয় না, খুঁড়িয়ে দাঁড়ালে বড় হয় না। বাস্‌।

পাগল গান ধরলে। মুড়ি বেগনি—ফুলুরির সঙ্গে চলতে লাগল মদ। বনওয়ারী হঠাৎ পাগলকে ডেকে দেখালে—দেখ্‌, শালো জাত দেখায়, শালোর করণ দেখ্‌।

সকলেই দেখলে, পরম ডোমেদের আসরের মাঝখানে গিয়ে বসেছে। মদও খাচ্ছে।

পাগল বললে—ছাড়ান দাও।

—ছাড়ান দোব কেনে ? এ তো পরমের ডোমে জাত দেওয়া হ'ল।

—নিশ্চয়।—সকলেই একবাক্যে সায় দিলে।

শুধু পাগল বললে—ওহে, ওতে জাত যায় না। জাত যার যায় তার যায়—এমনিতেই যায়। যার যায় না, তার যায় না। জাত না দিলে, লেয় কে? তার নাম কি, ঘর কোথা?

বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল।

পাগল বললে—লাখ কথার এক কথা বলেছে করালী। ঠিক বলেছে। সেদিন থেকে ভেবে আমি দেখলাম। সার কথা বলেছে ছোকরা।

—করালী? করালী বলেছে?

—হ্যাঁ। সে দিনে বললাম তো তোমার কথা। তুমি বলেছিলে, শুধাস করালীকে। তা করালী বললে—আমার জাত আমি না দিলে লেয় কে? তার ঘর কোথা? তা ছাড়া আর একটি কথা বললে—ভীষণ কথা। বললে—ছোঁয়া খেলে জাত যায় না, জাত যায় এঁটো খেলে। জাত আমার যায় নাই, আমি কারুর এঁটো খাই না। কাহারেরা সদ্‌গোপেদের এঁটো কুড়িয়ে স্বগগে যায়।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বনওয়ারী মাটির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল।

শুধু পানা বললে—আমি কিছু বলব না বাবা। সবেই দোষ আমার হয়। বুয়েচ!

বনওয়ারী তার হাতখানা ধ'রে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললে—তু বেটার ওই সরিজে মুখ দেখলে আমার সব্বাঙ্গ জ্ব'লে যায়। স'রে যা, ছামু থেকে তু স'রে যা।

রতন বললে—ওঠ, ওঠ, ঘর চল। আর লয়।

বনওয়ারী বললে—এক গোলা গোটা নিয়ে লে। মেয়েছেলে—। এক গোলা লইলে হবে না।

পাড়ার জন্যে মদ নিতে হবে। তারা মদ খেলে, আমোদ করলে—পাড়ার লোকে খাবে না, এ কি হয়? পাড়ার জন্য মদ নেওয়ার নিয়ম বরাবর আছে।

পরম শুধালে—উঠলি না কি?

গম্ভীরভাবে বনওয়ারী বললে—হ্যাঁ!

পরম বললে তার দলকে—ওঠ্। আমাদেরও ওঠ্।

চন্নপুর আর বাঁশবাঁদির মধ্যে মস্ত একটা মাঠ—ক্রোশখানেক লম্বা। পোয়া-তিনেক গিয়ে প্রথম পড়বে বাঁ হাতের দিকে জাঙল গ্রাম, তারপর বাঁশবাঁদি। রাস্তার মাঝামাঝি এসে পরম ডাকলে—বনওয়ারী!

বনওয়ারী আগে চলছিল, সাড়া দিলে—কে? কে ডাকলি?

—আমি পরম। হ্যাঁ। তোর সাথে একটা কথা আছে।

—আমার সাথে? কি?

—বলি, দাঁড়া।

পরম ছু দলকেই বললে—চ, চ, তোরা এগিয়ে চ। আমরা কথা বলতে বলতে যাই। একটা গোপন কথা আছে আমাদের।

পাগল সকলকে ডেকে নিয়ে গেল, চল্—চল্। সঙ্গে সঙ্গে সে গান ধ'রে দিলে—

গোপনে, মনের কথা বলতে দে গো আঁধার গাছতলায়,
ও হায় ঠাণ্ডা শেতল সাঁজবেলায়।

খপ করে বনওয়ারীর হাত চেপে ধরলে পরম। স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল বনওয়ারীর মুখের দিকে। বনওয়ারী বুঝে নিলে। সে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস নিয়ে ছাতিটা ফুলিয়ে দাঁড়াল। বললে—মার করবি? অর্থাৎ মারামারি করবি?

পরম বললে—করালীকে কি বলেছিস? আমি ডাকাত, আমি দাগী?

বনওয়ারী হেসেই বললে—নোস তু উ সব? তু নিজেই বল্ কেনে?

এবার পরম দাঁতে দাঁত ঘ'ষে বললে—শালো সাধু নোক, আমাদের পাড়ার বটতলাতে তোমার কিসের ভজন?

পরমের লজ্জা নাই। 'ন্যাংটার আর বাটপাড়ের ভয়' কিসে? যে সর্বাঙ্গে কাদা মেখে থাকে, উপর মুখে থুতু ছুঁড়ে যে নিজের গায়েই মাখে, এ জ্ঞান

তার থাকবে কি ক'রে ? নিজের ঘরের মেয়ের কেলেঙ্কারি নিয়ে ঝগড়া করা আর উপর দিকে থুতু ছোঁড়া একই কথা। জ্ঞানও নাই, ঘেন্নাও নাই ; যার ঘেন্না নাই, তার লজ্জাও নাই। কিন্তু বনওয়ারীর লজ্জা আছে, কেলেঙ্কারিকে ভয় তাকে করতেই হয়, গোটা কাহারপাড়ার মাতব্বর সে। আগেকার কাল ছিল আলাদা। এ কাল আলাদা। আর এ কালের এই হালচাল—বনওয়ারীরাই বাপ-বেটা দু পুরুষে প্রতিষ্ঠা করেছে কাহারপাড়ায়। 'মেয়েদের পানে তাকিও না।' মানে না সবাই, তবুও অনেক হাল ফিরেছে। সুতরাং নেশার মধ্যেও বনওয়ারী মাথা ঠিক রেখে বললে—হাত ছাড়্ পরম। উ সব মিছে বাজে কথা।

—ওরে শালো, পানা আমাকে বলেছে। সে নিজের চোখে দেখেছে তোমার কীত্তি। চাপাগলায় অকুণ্ঠভাবেই ব'লে গেল পরম, একবার বাধল না মুখে।

বনওয়ারী চুপ ক'রে রইল। না, উত্তর দেবে না সে। পাপ তার বটে, তবুও উত্তর তার আছে। সে উত্তর দিতে গেলে কালোশশীকে দোষ দিতে হয়। পরমের অবহেলার জন্য সে-ই বনওয়ারীকে টেনেছে পাপের পথে। বনওয়ারী তাকে ডাকে নাই। কিন্তু সে কথা সে বলবে না, বলতে পারবে না।

পরম হঠাৎ তার গালে ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলে, বললে—কি শালো, চুপ ক'রে অয়েচ যে ! ধাম্মিক ! মাতব্বর !

আর আত্মসম্বরণ করা সম্ভবপর হ'ল না বনওয়ারীর পক্ষে। সে হুঙ্কার দিলে—পরম।

মত্ত পরম দু হাতে শূন্যলোকে অনুসন্ধান ক'রে বললে—লাঠি ? আমার লাঠি ?

মনের উত্তেজনায় পরম লাঠি ফেলে দিয়ে দু হাতে বনওয়ারীর হাত চেপে ধরেছিল। খেয়াল নাই। মুহূর্তে বনওয়ারী পরমের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। তার হাতে লাঠি নাই। পরম লাঠি পেলে মানুষ-খেকো বাঘ। লাঠি পরমকে আর কুড়িয়ে নিতে দেবে না।

এর পর আরম্ভ হ'ল যুদ্ধ। নিঃশব্দে—সেই নির্জন প্রান্তরের মধ্যে তারা দুজনে বন্যপশুর মত পরস্পরকে আক্রমণ করলে। জড়াজড়ি ক'রে দুজনে এ অঞ্চলের পাষাণের মত মাটির উপরে প'ড়ে গড়াতে লাগল। কখনও এ উপরে, কখনও ও উপরে। পরম ডাকাত, পরম খুনে,—সে উপরে উঠে নিষ্ঠুর নৃশংসভাবে বনওয়ারীকে আঘাত করবার চেষ্টা করছিল। কোশকেঁধের ঘরের ছেলে বনওয়ারীর গায়ের শক্তি বেশি, সে তাকে প্রতিহত করলে কিন্তু মারাত্মক আঘাত করতে চাইল না। না, তা সে করবে না।

হাঁসুলীর বাঁকের উপকথার রাত্রে দাঁতালে দাঁতালে লড়াই হয়। গাছের মাথায় হনুমানের দলে বীরে বীরে যুদ্ধ হয়। সুচাঁদ বলে—হাঁসুলী বাঁকে মাঝে মাঝে মরদে-মরদেও খুনোখুনি 'অক্তগঙ্গা' হত সেকালে। কাহারপাড়ার মরদে-মরদে সে খুনোখুনি এখন নাই। সেকালে হামেসাই হ'ত। দুই 'দানোতে' অর্থাৎ দানবে যেন যুদ্ধ লাগত। দুই বুনো দাঁতালে গুঁতোগুঁতির মত লড়াই। একালে সে লড়াই লজ্জার কথা। কিন্তু উপায় কি? পরম আক্রমণ করলে ঠেকাতেই হবে। ঠেকাতে গিয়ে মার খেয়ে রাগও জাগছে। এইবার সেও মারবে—! হুঁশিয়ার পরম! আবার সে নিজেকে সামলে তাকালে রাস্তার দিকে। পরম এবং বনওয়ারীর সঙ্গীরা তাদের পিছনে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে গিয়েছে। বনওয়ারীর ইচ্ছা হ'ল, ওদের চীৎকার করে ডাকে। কিন্তু, না। সে বড় লজ্জার কথা। সে হ'ল হার মানার সামিল। সে প্রাণপণ শক্তিতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। প্রাণপণে টেনে পরমকে নিয়েই উঠে দাঁড়াল। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সুযোগে তাকে আছাড় মেরে মাটিতে ফেললে। এই আছাড়েই পরম প্রায় অসাড় হয়ে পড়ল। বনওয়ারীরও খুব বেশি শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। তবু সে চেপে বসল পরমের বুকে। মারলে আরও কয়েকটা নিষ্ঠুর কিল। তারপর ছেড়ে দিলে। সে পাশে বসে হাঁপাতে লাগল। সর্বাঙ্গে যেন থেঁতলে গিয়েছে।

অনেকক্ষণ পর কোনরকমে সামলে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। পরমও তখন উঠে বসেছে। বনওয়ারী গিয়ে তার হাত ধ'রে টেনে বললে—উঠতে পারবি?

পরম গর্জন ক'রে উঠল—ছাড়্।

বনওয়ারী তাকে ছেড়ে দিয়ে টলতে টলতে চলল। পরম বার কয়েক ওঠবার চেষ্টা ক'রে শুয়ে পড়ল সেই মাঠের উপরেই।

গ্রামে তখন মদ নিয়ে আনন্দ চলেছে, তার সঙ্গে নানা উপাদেয় খাদ্য। বনওয়ারী গ্রামের প্রান্তে থমকে দাঁড়াল। কি ভেবে, গ্রামে না ঢুকে পাশের পুরনো কালের ঘন গাছপালার অন্ধকারের মধ্য দিয়ে গিয়ে উঠল আটপৌরে-পাড়ায়। আজ যেন কালো বউ শতগুণ লোভনীয় হয়ে তাকে আকর্ষণ করছে। শরীরের মধ্যে রক্ত এখনও যেন গরম আগুন হয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে, আজ কালো বউকে নিয়ে এখুনি সে চ'লে যায় নিজের ঘরে। কোন পাপ হবে না। পরম নিজেই সে পাপ হওয়ার পথে কাঁটা দিয়েছে। সে কম্পিত হাতে গোটা কয়েক ছোট ঢেলা তুলে নিয়ে পরমের উঠান লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়লে।—টুপ্ টুপ টুপ্! সুচতুর মেয়ে কালোশশী ঠিক বুঝতে পেরেছে! আবছা অন্ধকারে সাদা মূর্তি উঠানে এসে দাঁড়াল।

সে এবার মৃদু গলাঝাড়ার শব্দ করলে। চতুরা কালো বউয়ের কান এদিক দিয়ে বেহালার তারের মত ; খুট করলেই তারে সাড়া জাগে। চকিত দৃষ্টি হেনে বনওয়ারীকে দেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সে। মুখ ভ'রে হেসে বললে—তুমি! ঠিক বুঝেছি আমি, সেই বটে।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এ কি, হাঁপাইছ কেনে?

—পরমের সাথে হয়ে গেল এক হাত।

গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠল কালো বউ—এ কি! অক্ত?

—হ্যাঁ। সি প'ড়ে আছে মাঠে।

কালো বউ বিন্দুমাত্র ব্যস্ত কি উৎকণ্ঠিত হ'ল না। সে কিছুক্ষণ তার

দিকে চেয়ে রইল মুগ্ধ দৃষ্টিতে, তারপর বললে—দাঁড়াও, অক্ত-টক্ত ধুয়ে ফেল আগে।

—ঘটির জলে যাবে না। হাসলে বনওয়ারী। অক্ত-ধুলো—চান করতে হবে।

বনওয়ারীর হাত ধ'রে সে বললে—চল তবে নদীতে। কাচের পারা জল, ধুয়ে মুছে চান করবা।

—চল। বনওয়ারী খুশি হয়ে উঠল। আজ কালো বউকে সবচেয়ে বেশি মনোরমা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কালো বউ ধুয়ে মুছে দিলে সকল ক্ষত এবং আঘাতের যন্ত্রণা জুড়িয়ে যাবে। কালো বউয়ের কাঁধে হাত রেখে সে বলল—চল।

পাড়ায় আনন্দ যেন চলছে। ঢোল বাজছে। মদে খাবারে মেতে উঠেছে সকলে। আটপৌরেপাড়াতেও চলছে। বনওয়ারী টলতে টলতে কালো বউকে নিয়ে কোপাইয়ের গর্ভে এসে নামল। আকাশে সবে চাঁদ উঠছে। একপাশ-খাওয়া লাল-বরণ মস্ত চাঁদ। হাঁসুলীর বাঁকের ওপারে, গাছের মাথায় মাথায়, আকাশ ফরসা হয়ে উঠেছে, গাছের ডালগুলির পাতায় চিক্ চিক্ ক'রে নাচছে উঠতি চাঁদের লালচে আলোর ছটা। আলো নাচছে না, পাতাগুলিই নাচছে বাতাসে, কিন্তু মনে হচ্ছে—চাঁদের আলোই নেচে খেলে বেড়াচ্ছে উড়ন্ত প্রজাপতির হিলহিলে পাখনার মত। বনওয়ারী কোপাইয়ের জলে গলা ডুবিয়ে বসল। জল পেয়ে ক্ষতগুলি জ্বলছে; কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে, শরীর জুড়িয়ে গেল। কালো বউ বসেছে নদীর বালিতে পা ছড়িয়ে। দেখতে দেখতে চাঁদের আলো দুধবরণ হয়ে গাছপালা বাঁশবন ঝলমল ক'রে তুলে নদীর বুকে নামল। কোপাইয়ের জলে গলানো রুপোর ছটা জেগে উঠল। কোপাইয়ের তরতরে স্রোতের মধ্যে চাঁদ যেন ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে, যেন খিলখিল ক'রে হেসে ঢ'লে গড়িয়ে পড়ছে। ওই ছটায় কালো বউকে বড় সুন্দর লাগছে। তার উপর মনে ধরেছে রঙ, সে রঙের ছটাও গিয়ে পড়েছে কালোশশীর মুখে। বনওয়ারী বললে—মিহি সুরে এক পদ গায়েন কর কেনে!

হাসলে কালো বউ। কালো বউয়ের দাঁতগুলি ঝিকমিক ক'রে উঠল, সে বললে—গায়েন ?

—হ্যাঁ। বেশ অঙের গায়েন।

—আজ যে দেখি নেশা খুব !

হাসলে বনওয়ারী। কালো বউ গান ধরলে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার গান। সে যে কে রচনা করেছে, কেউ তা জানে না। কালো বউ গাইলে—

আমার মনের অঙের ছটা
তোমায় ছিটে দিলে না—
পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হে—
সে জল পাতা নিলে না—
টলোমলো—টলোমলো—
হায় বধূ হে প'ড়ে গেল—
ও হায়, চোখের জলের মুক্তোছটা মাটির বুকে ঝলে না।

হঠাৎ কোপাইয়ের পাড়ের উত্তর পাড়ে দুটো 'টিটে' অর্থাৎ টিট্টিভ পাখী চীৎকার ক'রে উঠল, মাথার উপরে তালগাছটা থেকে একটা প্যাঁচা কর্কশ শব্দ ক'রে পাখা ঝটপট ক'রে উঠল। কালো বউ চমকে উঠল, বললে—মা গো ! মর্ মর্ মুখপোড়ারা। বলতে বলতে সে পিছন ফিরে দেখতে চাইলে ওই অশুভক্ষণে পাখীটাকে। ফিরে তাকিয়েই সে ভয়ার্ত কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠল ! —ও কে ? সে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে পরম। চোখ জ্বলছে শ্বাপদের মত। অন্ধকারে পরমের হাসা চোখ বুনো বিড়ালের চোখের মত জ্বলে। কিন্তু এমন জ্বলতে কেউ কখনও দেখে নি। সে টলছে। মুহূর্তে কালোশশী উঠে দাঁড়াল ; বনওয়ারীকে ডাকলে। কিন্তু কই বনওয়ারী ? কই ? সমস্ত কোপাইয়ের জলস্রোতটা চাঁদের আলোয় চকচক করছে। কিন্তু বনওয়ারী কই ? ওদিকে পাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল পরম। কালো বউ পরমকে জানে। তারই মুখে গল্প শুনেছে—

মানুষের গলায় পা দিয়ে কেমন ক'রে অনায়াসে মানুষকে মারা যায় এবং কতজনকে সে মেরেছে। কালো বউ শিউরে উঠল, তার পরই সে ছুটল—কোপাইয়ের গর্ভে গর্ভে বালির উপর দিয়ে। পরমও ছুটল তার পিছনে। গোঙাচ্ছে পরম।

জলের তলে তলে বেশ খানিকটা দূরে ভেসে গিয়ে মাথা তুললে বনওয়ারী। জলে ডুবে নদীর স্রোতে সে ভেসে চলেছিল। মাথা তুলে সে ব্যাপার দেখে চমকে উঠল। উপরের দিকে অর্থাৎ স্রোতের উল্টো দিকে ছুটছে কালো বউ। পিছনে টলতে টলতে ছুটছে পরম। সে এবার জল থেকে উঠল তাড়াতাড়ি। ছুটতে চেষ্টা করল। কিন্তু সেও টলছে। তার উপর বালি।

ওই কালো বউ ছুটছে! ওই!

ওই পরম!

সর্বনাশ! সামনে যে 'সায়েবডুবির দহ'; কেউ বলে—'যখের দহ'; কাহারপাড়ার লোক বলে—কত্তার দহ। কত্তা ওই দহে চান করেন। কালারুদ্র ওই দহে জলশয়ানে আছেন। কাহারেরা বছরে চারবার নামে ওই দহে। গাজনে কালারুদ্রের শিলারূপকে তুলে নিয়ে যায়, আবার জলশয়ানে রেখে যায়; আর ওখানে থাকেন কালারুদ্রের বেটী মা-মনসার 'বারি'। একবার নেমে সেই বারি নিয়ে যায়—একবার নেমে সেই বারি ডুবিয়ে দেয়। তা ছাড়া কেউ ওদিকে ঘেঁষে না। ওখানে পাহারা দেয় আস্তিকালের এক বুড়া কুম্ভীর। মধ্যে মধ্যে বেড়াতে এদিকে ওদিকে যায় বটে, কিন্তু দহের বিঘ্ন হ'লে নিশ্চয় সে কোপাইয়ের জল কেটে তীরের মত ছুটে আসবে। রক্ষা কর হে বাবাঠাকুর, রক্ষা কর।

যাক, দহের কিনারা ধ'রে উপরে উঠছে কালোশশী। উঠতে পারলে নিশ্চিন্ত; শিমুলবৃক্ষটি পার হ'লেই কোপাইয়ের জঙ্গল; জঙ্গলে ঢুকলে কালোশশীকে খুঁজে বার করা পরমের সাধ্যে কুলাবে না। কালোশশী শিমুলবৃক্ষটির শিকড় ধ'রে উঠে যাচ্ছে বুনো বিড়ালীর মত। দহের দিকের মাটি খুলে গিয়ে শিমুলবৃক্ষের শিকড় বেরিয়ে আছে—ঝুলে আছে,

তাই ধ'রে আর তাতেই পা দিয়ে উঠছে। বাহা—বাহা! বাহা রে কালোশশী!

হঠাৎ কালো বউয়ের ভয়ার্ত চীৎকারে কোপাইয়ের স্তব্ধ গর্ভভূমি যেন বুকের উপর খুনীর ছুরির ঝকমকানি দেখে চমকে উঠল। ওটা কি? শিকড়ের তলা থেকে আকাশের বিদ্যুতের মত এঁকেবেঁকে মাথা তুলে দাঁড়াল, ওটা কি? চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে কোপাইয়ের জল বালি। তীরের জঙ্গলের কোল পর্যন্ত ঘাস নড়ছে দেখা যাচ্ছে, বালির মধ্যে ঝিকমিক করছে বালুর কণা, দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কালো বউকে দেখা যাচ্ছে না কেন? সে কই? কালো বউ কোথায় গেল? বনওয়ারী চারিদিকে চেয়ে দেখে চাপা চীৎকারে ডাকলে—কালোশশী!

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল পরম। পরম দহের কিনারা ধ'রে ফিরে এসে কোপাইয়ের জলে নামছে। কই কালো বউ? এ কি হ'ল? শুধু দহের জলটা দুলছে। সে ছুটে গেল দহের দিকে। দুলছে জল ঢেউয়ে ঢেউয়ে। বিদ্যুতের মত আঁকাবাঁকা যেটা শিমুলবৃক্ষের তলা থেকে বেরিয়ে কালো বউয়ের বুকের উপর মাথার উপর দুলে উঠেছিল, সেটা এখনও মুখ খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে দুলছে। সেও দেখছে দহের জল ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। বনওয়ারী করজোড়ে প্রণাম ক'রে পিছু হঠতে লাগল। সাদা গোখুরা একটা।

পিছন থেকে পরম আবার হেসে উঠল। বনওয়ারী ফিরল। বুঝা-পড়ার শেষ হয়ে যাক। পরম কোপাইয়ের ও-তীরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

বনওয়ারী কঠিন স্বরে ডাকলে—পরম!

পরম উত্তর দিলে না। তার আক্রোশ মিটে গিয়েছে। সে পালাচ্ছে।

বনওয়ারী বললে—মরদ হোস তো ফিরে আয়।

পরম দাঁত মেলে হাসলে। তারপর মিশিয়ে গেল কোপাইয়ের ওপারের তীরের জঙ্গলের মধ্যে। বনওয়ারীর কিন্তু কত্তার দহে নামতে সাহস হ'ল না।

বনওয়ারী থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। কত্তাবাবার ক্রোধ কি তার উপরেও পড়ল ? কালো বউকে জলের তলা থেকে কেউ টেনে নিলে ? মাথার উপর, বুকের উপর কালদণ্ড তুলে দাঁড়িয়ে উঠল কে ? বাবার বাহন ! বাবার বাহন ! সে চোখে অন্ধকার দেখলে, হয়তো প'ড়েও যেত। কিন্তু তাকে কে পিছন থেকে ধ'রে ফেললে। ধরেছে পাগল, সে ডাকলে—বনওয়ারী ! বনওয়ারী ! বনওয়ারী !

চতুর্থ পর্ব

এক

পাগল বনওয়ারীকে এনে বাড়িতে শুইয়ে দিলে। বনওয়ারী বিহ্বল। পাড়ার লোক ভিড় ক'রে এল। কি হ'ল? কি ক'রে হ'ল?

পাগল বললে—জাঙলের ধারে প'ড়ে হাঁপাইছিল।

—জাঙলের ধারে?

—হ্যাঁ।—কথাটা ভেবে চিন্তেই বলেছে পাগল। শেষের প্রায় সবটাই সে দেখেছে। কোপাইয়ের ধারে সে গিয়েছিল চাঁদের আলো দেখে মনের খেয়ালে। কালো বউ তখন গান গাইছিল। অপার কৌতুকে বনওয়ারীর প্রেমলীলা দেখবার জন্য একটা গাছে উঠে বসেছিল। তারপর এল পরম, সমস্তটা ঘ'টে গেল চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে। গাছ থেকে সে যখন নামল, তখন পরম ও-পারে; কালীদহের জল দুলছে, তীরে দাঁড়িয়ে বনওয়ারী কাঁপছে টলছে। সে ধ'রে ফেললে বনওয়ারীকে। দহে নামতে তারও সাহস হয় নাই। সে জানে, কালো বউয়ের দেহ কাল ভেসে উঠবে। পুলিস আসবে। বনওয়ারী ওখানে ছিল বললে, বনওয়ারীকে টানবে, তাকে ছাড়বে না। সেই বা ওখানে গিয়েছিল কেন? চাঁদের আলোয় সবাই ভোলে, দারোগাবাবু ভোলে না। তাই সে ভেবেচিন্তেই বনওয়ারীকে এবং নিজেকে রক্ষা করবার জন্য বললে—জাঙলের ধারে ব'সে হাঁপাচ্ছিল বনওয়ারী। সে জানে পরম ফেরার হয়েছে। সন্দেহ যদি পরমের উপর পড়ে, তবে সে অন্যায় হবে না। কালো বউকে পরমই মেরেছে। যদি দহে ডুবে না মরত কালোশশী, তবে পরম তাকে নিশ্চয় মারত। মুহূর্তে গলা টিপে মেরে ফেলত এবং দহেই ফেলে দিত। জাঙলের ধার কোপাইয়ের দহ থেকে অনেক দূর। জাঙল গ্রাম, তারপর মাঠ, তারপর কাহারপাড়া, তারপর বাঁশবেড়, তারপর

জঙ্গল—সে জঙ্গলের ইবুক চিরে চ'লে গিয়েছে কোপাই-বেটী—সেই কোপাইয়ের দহে ভাসবে কালো বউ। দারোগাবাবু হাত বাড়িয়ে ধরতে পারবেন না বনওয়ারীকে।

পাগল বললে পরমের কাণ্ড। বনওয়ারী মাতালশালায় বলেছিল—পরমের জাত নাই, জাত গেল, ডোমেদের সাথে মদ খেলে। পরম শুনেছিল। পথে ডাকলে বনওয়ারীকে। আমরা বুঝতে পারলাম না। তার পর এই কাণ্ড।

—সকলেই বিশ্বাস করলে।

করালী উঠল।—কাঁহা সে পরম? কাঁহা?

অচেতনের মত বনওয়ারী তখন কাঁপছে। কম্প এসেছে। তার মধ্যেও সে বললে—না। পাগল, বারণ কর। আটপৌরেদের সঙ্গে দাঙ্গা ক'রে ফেলাবে ছোঁড়া। আর—

দাঁতে দাঁতে কসকস ক'রে উঠল সে। ওই—ওই ছোকরাই সব অনিষ্টের মূল! বাবাঠাকুরের বাহন মেরেছে। বাবাঠাকুরের শিমূল বৃক্ষে চড়েছে। করালীর দিকে সে তাকালে—বিস্ময়ে সে অভিভূত হয়ে গেল। করালীর পরনে কোট পেণ্টুলেন। স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল।

গোপালীবালা তার হাত দিয়ে বনওয়ারীর চোখ ঢেকে বললে পাগলকে—ও দেওর, কি ক'রে তাকাইছে দেখ, এ যে ঠকঠক ক'রে কাঁপছে গো! কি হচে গো!

পাগল নাড়ী দেখতে জানে। হাত ধ'রে সে বললে—জ্বর আসছে, জ্বর। কাঁথা দাও, কাঁথা দাও।

বনওয়ারী বললে—দূর কর্, ছামনে থেকে দূর কর্—

বলতে বলতে প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে কালোশশীর দেহ ভেসে উঠল কালীদহের মাঝখানে। এলোচুল ঢেউয়ে নাচছে, কালো বউয়ের দেহটা ডুবছে আর উঠছে।

পরম নিরুদ্দেশ।

দুঃখ সবাই করলে। দুঃখ করলে না কেবল নয়ানের মা। বনওয়ারীর দুর্দশায় সে খুশি হয়েছে। কালো বউয়ের মৃত্যুতেও সে পুলকিত হয়েছে। কালো বউ যে বনওয়ারীর 'অঙের' মানুষ! সে স্নান ক'রে এলোচুলে বাবাঠাকুরকে প্রণাম ক'রে এল। বাবাঠাকুরের মহিমাকীর্তন করতে লাগল।

বিস্মিত কিন্তু কেউ হ'ল না।

হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে ঘেরা বাঁশবাদির ইতিহাসে এমন অস্বাভাবিক মৃত্যু যে বরাবরই ঘ'টে আসছে। সাপে কাটা, দাঁতালের দাঁতের আঘাতে মৃত্যু—এর তদন্ত নামমাত্র, তা ছাড়া জলে ডোবা, গাছ থেকে পড়াও প্রায় তাই, এর পর গলায় দড়ি আছে, বিষ খাওয়া আছে, নিজের গলায় বঁটি দিয়ে কাটার কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় মেয়েদেরই বেশি। থানার খাতায় আছে—মেয়েরা চরিত্রহীনা,অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতৃপ্ত বাসনা থেকে আত্মহত্যা করে। কখনও কখনও সন্দেহও ক'রে থাকে যে, আত্মহত্যা নয়—হত্যা, পুরুষেরাই হত্যা ক'রে থাকে। দু-চারজন চালানও গিয়েছে। সে সব আগের কালের কথা, একালে এসব বড় ঘটে না।

হাঁসুলীর বাঁকের উপকথা সবচেয়ে বেশি জানে সুচাঁদ। সে বলে—বনওয়ারীর বাবার বাবার বাবা আর আমার বাবার বাবা এক নোক তো। তা আমার কত্তাবাবা আমার পেথম কত্তামাকে শিলনোড়ার নোড়ায় মাথা ছেঁচে মেরেছেল বুকে ব'সে নোড়া দিয়ে। বলতে বলতে সুচাঁদের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। চুপি চুপি বলে—আটপৌরেদের একজনাকে আমার কত্তাবাবা এতের বেলায় ঘর থেকে বেরুতে দেখেছেল কি না। বাস্, মাথায় অক্ত উঠে গেল। ঘরের ছামনে শিলনোড়া, সেই নোড়া দিয়ে মাথা ছেঁচে মেরেছিল পরিবারকে। তা'পরে টেনে ফেলে দিলে কোপাইয়ের গভ্যে; বললে—প'ড়ে পাথরে মাথা ভেঙে গিয়েছে। তখন সায়েব মাশায়দের আমল। সায়েবরা পুলিস ফিরিয়ে দিলে। কিন্তুক কত্তাবাবাকে চাবুক দিয়ে সপাসপ মেরে পিঠ ফাটিয়ে দিয়েছেল। তাদের বুদ্ধির কাছে তো ফাঁকি নাই বাবা!

রতনের পূর্বপুরুষ চড় মেরে মেরে ফেলেছিল তার বোনকে। তখন ওই দহতে ছিল বড় বড় কুমীর, সেই দহে ফেলে দিয়েছিল লাস।

গুপীর পূর্বপুরুষ বিষ খাইয়েছিল তার স্ত্রীকে।

পরমের পূর্বপুরুষের বাহাদুরি সবচেয়ে বেশি। সে তার হাতে পায়ে বেঁধে মুখে কাপড় বেঁধে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তারপর হাত-পায়ের দড়ি, মুখের কাপড় বার ক'রে নিয়ে হৈ-চৈ করেছিল। কেউ সন্দেহ করতে পারে নাই।

একমাত্র ছেলে মারা যেতে ঘরভাঙাদের নয়ানের প্রথম ঠাকুরমা ওই দহে ঝাঁপ দিয়ে মরেছিল। তারপর নয়ানের ঠাকুরমাকে বিয়ে করে নয়ানের ঠাকুরদাদা।

অম্লশূলের বেদনা অসহ্য হওয়ায় পানুর কাকা গলায় দড়ি দিয়েছিল।

উপকথায় অনেক কাহিনী আছে। তারই সঙ্গে কালো বউয়ের কাহিনী যোগ হ'ল। পরম নিজে যেত জাঙলের এক পাড়ায়। সেখানে নফর দাসের বোনের বাড়িতে সন্ধ্যে কাটাত। কালো বউয়ের স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না। পরম ডাকাতির দায়ে জেলে থাকতে সে চন্নপুরে বড়বাবুদের বাড়িতে ছোট-জাতের ঝিয়ের 'পাট' করত। বাবুদের দরোয়ান ভূপসিং মহাশয়ের সঙ্গে লোক জানাজানি ক'রেই ভালবাসা করেছিল। তা করে। কাহারপাড়ায় অনেকে করে এমন ভালবাসা—জাঙলে সদ্‌গোপ মহাশয়ের সঙ্গে করে, চন্নপুরে বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে দু-চারদিনের ভালবাসার খেলাধুলো—সে তো কেউ ধরেই না। পরম মধ্যে মধ্যে মারধোর করত, তা সে আর এমন কি! কিন্তু এই বিয়েতে যাবার কদিন আগে থেকে সে কালো বউয়ের উপর খুব তর্জন-গর্জন করতে আরম্ভ করেছিল। আটপৌরেপাড়ার লোকেই বলে—কালো বউকে উঁচু গলায় বলতে শুনেছে—বেশ করেছি, তোর খুশি তু সনজে বেলা জাঙলে যেথা খুশি যাস, আমারও যা খুশি তাই আমি করি। চ'লে যাব আমি তোর বাড়ি থেকে। আমার ভাতের অভাব? লোকে বলেছে, কালো বউ সিংজীর কাছে যাবে ব'লেই শাসিয়েছিল। কাল রাত্রে পরম আর বনওয়ারী

মিত্তির-বাড়ির বিয়ে থেকে ফেরার পথে কথা বলবার জন্য পিছিয়ে আসছিল। আটপৌরেরা বলে, তারা পাড়ায় এসে মদ খাচ্ছে, রাত্রি কত তা খেয়াল ছিল না, তবে চাঁদ উঠেছিল তখন, সেই সময় পরমের উঠানে পরমের ক্রুদ্ধ হিংস্র কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। কালো বউকে সে ডাকছিল—কোথা গেলি? কই? যাবি কোথা? যম আমি তোর।—বলতে বলতে সে বেরিয়ে গেল। দু-একজন এসেওছিল, তখন কিন্তু পরম কি কালো বউ কেউ ছিল না, পরমের গলা শোনা যাচ্ছিল জাঙলের বাঁশবন থেকে। তারা তার গলা শুনে বুঝেছিল, সে নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছে। তারপর আর কিছু তারা জানে না। পরম আর ফেরে নাই। সকালে যারা নদীর ধারে গিয়েছিল, তারাই দেখতে পায় দহের জলে ভাসছে কালো বউ। তাদের অনুমান তারা ফিসফিস ক'রে বলে—পায়ে কাপড় জড়িয়ে দিয়ে পরমই তাকে দহের জলে ফেলে দিয়ে পালিয়েছে। কালো বউয়ের কাপড় পায়ের সঙ্গে জড়ানো ছিল। জানত পাগল কাহার। সে কিন্তু একটি কথাও বললে না। বনওয়ারীর জ্বর হয়েছে গেল রাত্রি থেকে। জ্বরে বেহুঁশ অবস্থায় তাকে পাওয়া গিয়েছে জাঙলের ধারে। কোপাইয়ের কালীদহ ওখান থেকে অনেক দূর।

সুচাঁদ আক্ষেপ ক'রে বলে—আঃ আঃ, কিবে দলমলে মেয়ে ছিল,—অ্যাই চুল, অ্যাই বুক, যেমন চোখ তেমন দাঁতগুলি—কে বলবে যে যোবতী মেয়ে লয়—বয়েস হয়েছে! আঃ—আঃ! পাগল শুধু ছড়া কেটে গান গাইলে—“অঙের খেলার যাই বলিহারি! জেবন দিলেও দিতে পারি, তবু তো ছাড়তে লারি মনের মানুষে;” তারপর খেদ ক'রে বললে—আঃ—আঃ! হে ভগবান! তারপর ঝোলা-ঝম্প নিয়ে উঠল—চললাম, ঘুরে আসি দু দিন। দেশ বিদ্যাশে নতুন গান শুনিয়ে আসি।

চ'লে গেল সে।

* * *

দিন পনরো পর। অপরাহ্ণবেলা।

রোগ থেকে সদ্য সেরে উঠে দু হাতে মাথা ধ'রে ব'সে কালো বউয়ের বিবরণ শুনছিল বনওয়ারী। তাকে শোনাচ্ছিল সুচাঁদ। বনওয়ারী চুপ করে ব'সে ছিল মাটির দিকে চেয়ে। ফোঁটা ফোঁটা জল চোখ থেকে ঝ'রে পড়ছিল। বনওয়ারীর ইচ্ছে হচ্ছিল, চীৎকার ক'রে কাঁদে। সকলের কাছে চীৎকার ক'রে বলে—জান না, তোমরা জান না, দোষ আমার। আঃ! সে যদি পরমকে দেখে ভয়ে জলে না ডুবে জল থেকে উঠে পরমকে আটকাত, তা হ'লে কালো বউ ছুটত না এমন দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে। দহের কিনারায় বাবাঠাকুরের শিমুল-বৃক্ষের ওই শিকড় ধ'রে উঠতে যেত না। পরমের তাড়ায় সে ছুটেছিল, করালীর পাপে বাবাঠাকুরের বাহনের দংশনে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল দহের জলে। দোষ তারই। করালীকে সে শাসন করে নাই। দোষ তারই, সে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নাই। নিজের পরাণের ভয়ে, দুর্নামের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পালিয়ে এসেছে। সে মরলেও তো পারত। দোষ কার! অর্থাৎ বনওয়ারীর।

মনে মনে অত্যন্ত যন্ত্রণা হচ্ছে তার। এ পাপের তার আর খণ্ডন নাই। হে ভগবান, হে হরি, হে কালারুদ্দু, হে ধরম, হে বাবা কত্তাঠাকুর, তোমরা বনওয়ারীকে মার্জনা কর, রক্ষা কর।

এদিকে তাকে ঘিরে পাড়ার প্রবীণ মেয়েরা বসেছে। সকালবেলা মরদেরা—সকলেই কাজে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠে জল পড়েছে, ধানের ক্ষেতে চাষের সময় হয়েছে। বীজ পাড়তে, জমিতে চাষ দিতে হবে। বাতের চাষ। অর্থাৎ সময়ের চাষ। এ সময় একটা 'বাতের চাষ' বিঘে ভুঁই দু গাড়ি সারের সমান। এ কামাইয়ের সময় নয়। 'খানিক আদেক' শরীরের 'বেজুত' অর্থাৎ অসুস্থতা চাষের মুনিষে এ সময় গ্রাহ্যও করে না। তা ছাড়া মনিব আছে, মনিবে বলে—এত যারা 'সুকুমোরী' তাদের আবার চাষ করা কেন? কথা ঠিকই বলেন তাঁরা। 'মি নইলে মাড়ন হয় না,' পাচন নইলে গরু হাঁটে না, সওয়ার নইলে ঘোড়া ছোটে না, তেমনি মনিব—ওই সদ্‌গোপ মহাশয়দের মত চাষী

মনিব ছাড়া কৃষাণ কাহার মুনিষ ঠিক ঠিক কাজ করে না। বাবুদের হ'ল অন্য কথা। তাঁদের ঠিক চাষে মন নাই। সদ্‌গোপ মনিবদের কাহার কৃষাণেরা কেউ বাড়ি নাই। বনওয়ারীকে ঘিরে আছে পাড়ার প্রবীণ মেয়েরা। শুধু নয়ানের মা বাদে।

মেয়েদের দলের মধ্যে বসনও এসে সেই সকাল থেকেই ব'সে আছে।

তার সমস্যা মেয়ে-জামাই নিয়ে। করালী পাখী কোঠাঘর তুলল। এই নিয়ে পাড়ার মেয়েরা যে গবেষণা করছে, তাতে তাকে আতঙ্কিত ক'রে তুলেছে। সে নিজেও ভেবে দেখেছে, কেউ কখনও করে নাই। করালী করছে—অনিষ্ট ঘটা বিচিত্র কি? কিন্তু করালী মানবে না। অন্য কোন মেয়ে হ'লে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়াই হয়ে যেত। সুচাঁদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে করালীর পাখীর। করালী সুচাঁদকে প্রায় দূর ক'রেই দিয়েছে। সুচাঁদ কাঁদছে, বাবাঠাকুরকে ডাকছে, করালী-পাখীকে এবার আর অভিসম্পাত দিচ্ছে না, তিরস্কার করছে এবং বাবাঠাকুরকে বলছে—মতি ফিরিয়ে দাও, সুমতি দাও। প্রথম দিন সে আনন্দে গৌরবে পাখীর বাপের জন্য নিজের বাপের জন্য কেঁদেছিল। কিন্তু পরে বুঝেছে বিপদ। সর্বাগ্রে সেই বুঝেছে। বারণ করতে গিয়েছিল। করালী তাকে দরজা দেখিয়ে বললে—নিকালো।

ও-পাশ থেকে নয়ানের মা ফোড়ন দিয়েই চলেছে।—হে বাবা, একবার যেমন নিয়েছ, আবার তেমনি ক'রে নিয়ো। তোমার বাহনের বিষ নিশ্বাসে 'ফুস্ ধা' ক'রে দিয়ো। সঙ্গে সঙ্গে এবার চাল চাপা বাবা! কোঠাঘরের চাল—হুড়মুড় ক'রে।

নসু গাল দিচ্ছে ইঙ্গিতে—হাঁপাতে হাঁপাতে 'ফুস-ধা' হয়ে যাবে লো! অর্থাৎ নয়ান। যে মুখে পরের মন্দ চায় লোকে, সেই মুখে লোকের পোকা পড়বে লো!

দুই হাতের বুড়ো আঙুল নাড়ছে আর ঢেউয়ের মত দুলছে।

বাকি গোটা পাড়াটা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কালবৈশাখীর অপরাহ্ণের মত। বনওয়ারী ভাল হয়ে ওঠার অপেক্ষা করছে। করালী ভীষণ হাঙ্গামা বাধিয়েছে। সে বাবাঠাকুরের শিমূলবৃক্ষের চেয়ে মাথা উঁচু ক'রে উঠেছে। সত্যিই উঠেছে। আবার সেদিন শিমুলগাছের উপরে উঠেছিল। এবার আর ডালে উঠে ক্ষান্ত হয় নাই, একেবারে ডগায় উঠে কাহারপাড়াকে হেঁকে বলেছিল—দেখ।

করালীর অপরাধেই নানা অঘটন ঘটছে, এই অপবাদের প্রতিবাদেই সে গাছটায় আবার উঠেছিল। এবার সে চমৎকার একটা টিয়াপাখীর ছানা পেড়ে এনেছে শিমুলবৃক্ষের কোটর থেকে। আগের থেকে অনেক গুণ তার বাড় বেড়েছে। কোট পেণ্টুলেন প'রে বেড়াচ্ছে। বলে—যুদ্ধের পোশাক। যুদ্ধের চাকরি নিয়েছে করালী। হঠাৎ সেদিন ওই পোশাক প'রে এসে বললে—যুদ্ধের চাকরি নিলাম। এবার আর দিন-মজুরি নয়। মাস-মাইনে। পায়ে জুতো। ফোস্কা পড়েছে, খুঁড়িয়ে চলছে, তবু জুতো ছাড়বে না। ছোঁড়ারা সব চুলবুলিয়ে উঠেছে। প্রবীণদের আশঙ্কার অবধি নাই। কিন্তু বসনের সমস্যা কোঠাঘর। সেই কোঠাঘরের কল্পনা সে কাজে পরিণত করতে শুরু করেছে। ঘর আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

বিয়েবাড়ি থেকে ফিরেই হ'ল বনওয়ারীর অসুখ। বসন বিব্রত হয়ে ধরেছিল রতনকে, প্রহ্লাদকে। পাগল থাকলে ভাল হ'ত, কিন্তু সে সেই দিনই সকালে চ'লে গিয়েছে, ব'লে গিয়েছে—দুদিন ঘুরে মন ভাল ক'রে আসি। পনরো দিন হয়ে গেল, আজও ফেরে নাই।

রতন প্রহ্লাদ অবাক হয়ে বলেছিল—কোঠাঘর!

—হ্যাঁ। তোমরা বারণ কর। যা পিতিপুরুষে করে নাই, তা করতে নাই।

রতন এসে বললে—করালী?

—কি?—করালী বুঝতে পেরেছিল।

—কোঠাঘর করছিস তু?

—হ্যাঁ।

—পিতিপুরুষে কখনও করে নাই—

—তা না করুক। আমার বাবাও যুদ্ধের কাজ করে নাই।

প্রহ্লাদ এগিয়ে এল এবার।—দেখ্ করালী। কথা শোন্, ভাল, আমাদের কথা না শুনিস, বনওয়ারীর কথা শুনবি তো?

—যদি না শুনি?

রতন এবার ধমক দিয়ে বললে—শুনতে হবে। সবাই শোনে, তুমি শুনবে না কি রকম? সে সেরে উঠুক, তার সাথে শলা পরামশ্য ক'রে যা বলে করবি।

করালী বলেছিল—যাঃ কচু খেলে! এর আবার শলাই বা কিসের, পরামশ্যই বা কেনে? যাও যাও। তোমাদের শলা পরামশ্যই যদি লাগে তো মাতব্বরের জ্বর ছাড়ার লেগে ব'সে থাকো গা। আমার শলা পরামশ্য চাই না।

প্রহ্লাদ বলেছিল—ঘর করতে হ'লে নেয়ম হ'ল মাতব্বর এসে দড়ি ধরে।

—আমি নেয়ম মানি না।

—তোর বুঝি গায়ে জোর হল্ছে বেজায়? ধরাকে সরা দেখছিস?

—সরা নয়, খুরি। যাও যাও, মেলা ফ্যাঁচফ্যাঁচ ক'রো না।

রতন মাথলার বাবা, মাথলা করালীর সাকরেদ; রতন তাকে বলেছিল—দুদিন সবুরই কর্ না কেনে বাবা।

—উঁহু। বর্ষার আগে ঘর সারতে হবে অতনকাকা। সবুর করবার টায়েম কোথা? আমার আবার যুদ্ধের চাকরি। যেখানে হুকুম করবে, যখন বলবে, তখুনি যেতে হবে।

রতন বলেছিল—কিন্তু ভাল কাজ হচ্ছে না করালী। কেউ কখুনও করে নাই কোঠাঘর।

—না করুক। আমি করবই।

গুপী বলেছিল—যা কেউ করে নাই, তা করতে গেলে খ্যানত হয়। চৌধুরী

মাশায়রা দালান করতে ইট পোড়ালে, লোকে বারণ করেছিল, সে আমলে চৌধুরী শোনে নাই, ইটের ভাঁটা পুড়ল—উদিকে চৌধুরী মাশায়ের ছোট বেটা ধড়ফড়িয়ে ম'রে গেল।

—আমার তো বেটা হয় নাই, এখনও।—হেসে জবাব দিয়েছিল করালী।

আপসোস হচ্ছে বসনের। এ জামাই নিয়ে কখনও সুখ পাবে না সে। এই সব কি কথাবার্তার ধরন, না, ছিরি! এই সব মাথার মাথার লোকের সঙ্গে এই ধরনের কথাবার্তা যখন করালী বলে, তখন বসন ভয়ে লজ্জায় সারা হয়ে যায়। নিমতেলে পানুকে তো সে মারতে বাকি রেখেছে। নিমতেলে পানু করালীর সামনেও আসে নাই, মুখামুখি তাকে কোন কথাও বলে নাই; নিজের বাড়িতে ব'সে সে নয়ানের মাকে বলেছিল—এ কাল ডাকাৎ তিন তিনটে মোড়ল-মাতব্বরের গুষ্টি গুজরে গেল—আটপৌরেদের পরমদের ঘর, ঘরভাঙাদের বাড়ি, কোশকেঁধেদের গুষ্টি, তারা কেউ কোঠাঘরে পরিবার নিয়ে শোয় নাই বাবা।

কথাটা করালীর কানে উঠতেই সে পানুর বাড়ি ব'য়ে গিয়ে তার সামনে উপু হয়ে ব'সে বলেছে—হা শালো, মোড়লেরা কোঠায় শোয় নাই ব'লে আমি শুতে পাব না?

নিমতেলে পানু সেদিন সেই চড় খাওয়া অবধি করালীকে দুর্দান্ত ভয় করে। সে কোন জবাব দেয় নাই। করালী তবু ছাড়ে নাই, নিরুত্তর পানার মুখের সামনে ঠিক পানার মত ভঙ্গিতে ব'সে ভেঙিয়ে মৃদুস্বরে শ্লেষের সঙ্গে বলেছে—হা শালো, বনওয়ারী মাতব্বরের পরিবারের যে রঙ কালো, দেখতে সে যে কুচ্ছিৎ—তা ব'লে আমি ফরসা সোন্দর মেয়ে বিয়ে করতে পাব না? তোমার পরিবারের তো অঙ-ফরসা, তা—তাকে তুমি ছাড়। শালো! বলি ওরে শালো!—ব'সে ব'সেই খানিকটা এগিয়ে গেল পানুর দিকে।

পানু বেচারী ভয় পেয়ে গিয়েছিল, সভয়ে সেও ব'সে ব'সেই পিছিয়ে স'রে যেতে চেষ্টা করেছিল, বলেছিল—ওই—ওই, উ সব কি কথা?

করালীও ব'সে ব'সে পানুর দিকে আরও এগিয়ে গিয়েছে আর বলেছে—ইটের বদলে পাটকেল রে ছুঁচো।

—তোর যা মন তাই কর্‌গা কেনে? আমার কি?

আরও খানিকটা সামনে এগিয়ে ব'সে করালী প্রশ্ন করেছে—তাই তো শুধাইছি রে ছুঁচো, তোর কি? আমি কোঠাঘর করব, তাতে তু কথা বলবি কেনে? শালো ছুঁচো!

বসন্ত বার বার অনুরোধ ক'রেও করালীকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে নাই। মহিষের মত তার গোঁ। অবশেষে পাখী এসে তাকে ক্ষান্ত ক'রে উঠিয়ে নিয়ে যায়। যেমন করালী, তেমনি পাখী। মেয়ের রঙ যেমন গোরো, তেমনি তেজ—

যেন আগুনের হল্‌কা। ভয়-ডর নাই। করালীকে বললে—উঠে আয়।

করালী গ্রাহ্য করলে না।

—শুনছিস?

—না।

মেয়ে এসে ধরলে তার হাত, হাত ছাড়িয়ে নিলে করালী। পাখী ধরলে তার চুলের মুঠো, করালী মাথা ঝাঁকি দিয়ে চুল ছাড়িয়ে রেগে উঠল, হাঁক দিয়ে উঠল—অ্যা-ই! সঙ্গে সঙ্গে পাখী নিজের কপালে পাগলের মত কিল চড় মারতে আরম্ভ করলে—এই লে—এই লে—এই লে।

করালী হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর গিয়ে তার হাত ধ'রে মিষ্টি কথায় আনুগত্য স্বীকার ক'রে বললে—চ চ বাপু, চ। ঘর যেছি আমি। থাম্ বাপু, থাম্। আসবার সময় নয়ানের মাকে ব'লে এসেছি, মরাকে আমি কোন কথা বলি না। মরার গালেও আমার কিছু হবে না। দে তুই, গাল দে যত পারিস। পাখী তাকে নিবৃত্ত করতে পারে কোঠাঘর তোলার সংকল্প থেকে। কিন্তু পাখীও ক্ষেপেছে কোঠাঘরের জন্য। যেমন এ কালের ছেলে, তেমনি এ কালের মেয়ে। পাখী বলে—চন্নপুরের বাউরীরা কোঠাঘর করেছে—হারু বাউরী, শম্ভু বাউরী, কানাই বাউরী।

—সে তো চন্নপুরে। আর তারা তো কাহার নয়।

—তা হোক কেনে।

তাই বসন্ত এসে ব'সে আছে বনওয়ারীর কাছে। সুযোগ পেলেই বনওয়ারীকে বলবে। করালীকে এক সে-ই নিবৃত্ত করতে পারে। তা ছাড়া আর একটা আশঙ্কা আছে তার। করালী যাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, তারা নিশ্চয় সাতখানা ক'রে বনওয়ারীর কাছে করালীর বিরুদ্ধে লাগাবে। বনওয়ারীকে বুঝিয়ে সে আগে থেকেই ঠাণ্ডা ক'রে রাখতে চায়। বনওয়ারী মাতব্বর বিরূপ হ'লে করালীর কি হবে, সে কথা ভেবে বসন্তের অনেক আশঙ্কা। কিন্তু এ মজলিসের মধ্যে বলবার সুযোগ পাচ্ছে না সে। ভাগ্যক্রমে হঠাৎ সুযোগ মিলল। হঠাৎ বনওয়ারী উঠল। গোপালীবালা বললে—এই, কোথা যাবা ?

—বাবাঠাকুরের থানে। তার মুখ দেখে কেউ 'না' বলতে পারলে না।

বনওয়ারী উঠতেই বসন্ত বললে—চল, আমি যাই সাথে।

স্নেহভরে বনওয়ারী বললে—আসবি ? আয়। লইলে বনওয়ারী একটা জ্বরে কাবু হয় না, এখনও তোর এক কোশ পথ গিয়ে ফিরে আসতে পারি দুপুরের মধ্যে। একটু হাসলে সে।

যাবার পথে হেলে বলদ দুটি এবং গাই কয়টির কাছে দাঁড়িয়ে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলে। ডাইনের আটকেলে অর্থাৎ সাদার উপরে আটটি কালো দাগবিশিষ্ট বলদটা বনওয়ারীর বড় ন্যাওটা, ওটা তার ঘরেরই বাছুর—বলদটা তার হাত চেটে মাথা নেড়ে নানা ভঙ্গিতে আনন্দ প্রকাশ করলে। বনওয়ারী একটু প্রসন্নতার স্পর্শ পেলে ওদের কাছ থেকে। মনে মনে বললে—মা ভগবতী, তোমাদের সেবার তো কখনও ত্রুটি করি না মা, তোমাদের আশীর্বাদে আমার এই পাপটি খ'ণ্ডে দাও।

পথে সেই আটপৌরেপাড়ার বটগাছের তলায় কালো বউয়ের সঙ্গে তার দেখা হ'ত। বনওয়ারী বললে—একটুকুন দাঁড়া বসন।

বসন ভাবলে, ক্লান্তি। বললে—না এলেই হ'ত। বললে—পরে আমিই এসে কত্তার থানের মিত্তিকে নিয়ে যেতাম।

বনওয়ারী উত্তর দিলে না। সে ভাবছে। কালো বউয়ের কথা, তার অপরাধের কথা।

—বনওয়ারী হা? অর্থাৎ বনওয়ারী নাকি?

বনওয়ারী ফিরে তাকালে। আটপৌরেপাড়ার বুড়ো রমণ আটপৌরে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে দেখে। রমণ পরমের আত্মীয়—ভায়রাভাই, কালোশশীর বড় বোনকে সে বিয়ে করেছে। সে তার বাঁকা ভেঙে-পড়া মূর্তির দিকে চেয়ে রইল। রমণ প্রবীণ লোক, সুচাঁদের বয়সী। তবে সুচাঁদ শক্ত আছে, রমণ ভেঙে যেন তুমড়ে গিয়েছে। এক সময় রমণ শাহী লম্বা ছিল। লোকটাকে রোগেও ধরেছে। বনওয়ারী শঙ্কিত হ'ল। পরম-কালোশশীর আত্মীয় রমণ তাকে দায়ী করতে এল নাকি? বনওয়ারী জোর ক'রে হেসে বললে—হ্যাঁ গো। যাব একবার কত্তার থানে। তা যে বিকেলের ওদ, বারো চোদ্দটা রোপ-বাস হ'ল, শরীরে বল নাই, তাই বসলাম একবার গাছতলায়।

বসন বিরক্ত হ'ল। কথাগুলি বলবার বড় সুন্দর সুযোগটি তার মিলেছিল।

রমণ বনওয়ারীর কাছে বসল। বললে—পরমদের বেপার তো সব শুনেছ? আঃ, কালোশশীর লেগে দুঃখ হয় আমার।

আবার বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। কে জানে বুড়ো কি বলবে? আটপৌরেপাড়ার কেউ কি জানে না, কেউ কি শোনে নাই, পরম যে কথা জেনেছিল পানার কাছে? পানা কি—?

রমণ বললে—যতই ঢেকে কর পাপ, সময় পেলেই ফলেন পাপ, পাপ মানেন না আপন বাপ। বুঝলে কিনা—পরমের পাপের ফল। কালোশশীরও বটে; নইলে অপঘাতে মিত্যু! অনেক মানা করেছি তাকে। ভূপসিং ব্রাহ্মণ, তার পরশে পাপ হয়—কতবার বলেছি।

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

রমণ বললে—আচ্ছা, সেদিন এন্তে আসবার পথে কি কথা বলবার লেগে ডেকেছিল পরম? কি বলেছিল তোমাকে?

বনওয়ারীর বুক ধড়ফড় করতে লাগল।

—বনওয়ারী!

বনওয়ারীর একটা কল্পিত কাহিনী চকিতে মাথার মধ্যে এসে গেল। সে বললে—বলেছিল চন্ননপুরের সিং মাশায়ের কথা। বলে—ভাই তু যদি আমার সাথে থাকিস, তবে ওই শালোকে একদিন ঠেঙাই। বলে—সাবাড় ক'রে শালোকে দহে ফেলে দোব গলায় কলসীতে বালি ভ'রে। তা আমি অনেক বুঝালাম। শেষ চটাচটি হ'ল আমার সাথে। আমাকে বললে—আমার জাত গিয়েছে বললি কেনে মাতালশালায়? ব'লেই আচমকা লাফিয়ে পড়ল ঘাড়ে। তা'পরে মারামারি। আমি কাবু হয়ে গেলাম। আমাকে ফেলে তখন হনহনিয়ে চ'লে এল। কি করব আমি, সব্বাঙ্গে বেথা, ধূলো বালি—পথে পুকুরে নামলাম। তখন শুনলাম, কালো বউকে গাল দিতে দিতে যেছে পরম। আমার তখন জ্বর এয়েছে—কাঁপছি। তা'পরেতে তো পাগল গেল—। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

রমণ বললে—যাক, তোমারও যে জ্বর! ডরিয়েছিল সকলে। বেঁচেছ এই কাহারপাড়ার ভাগ্যি। না মাথা, না ছাতা। এক তুমিই আছ। আমরা এ পাড়ায় তাই বলি, অমনি মাতব্বর যদি আমাদের হ'ত! তা সে দিনে আমি বললাম পাড়াতে যে, আর আমাদের আলাদা হয়ে থেকে কাজ কি? এক হ'লেই হয়। করণ-কারণ কর, বিয়ে-সাদী হোক। আমাদের আটপৌরে আর ক ঘর? বাঁশবাঁদি ছাড়া হুঁই হোথা—হেথাকার নীলকুঠি যেথা ছিল, সেথাকে ছ ঘর চার ঘর আছে। তাও আবার সব জাগায় নাই। তুমি বাবা, মাতব্বর হয়ে এইটি কর। নইলে আটপৌরেপাড়ার পিতুল নাই। আমি বিদ্ধ হলাম, এখনও আমার দাগী নাম ঘুচল না বাবা।

বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল।

এ কি ভগবান হরি কালারুদ্দু কত্তা ঠাকুরের লীলা! মনে মনে সে

প্রণাম করলে দেবতাদের। এ কি দুঃখের মধ্যে সুখ, ভাঙনের মাঝে গড়ন!

সে বললে—একটুকুন সারি অমনদাদা। তা'পরেতে হবে সব কথা।

রমণ বললে—তোমার শরীলে বল হোক, একদিন নিয়ে যাবা আমাদিগে চন্ননপুরের বড়বাবুর কাছারি। পরম তো ফেরার। সে আর ফিরবেও না। তা সায়েবডাঙায় পরম যে জমি পাঁচ বিঘে নিয়েছিল, আমাদের আটপৌরেরা ভাগ ক'রে লোব। বাবুর একটা 'রনুমতি' তো চাই! তা আমাদের সে কথা বলবার লোক নাই।

বনওয়ারী উঠল। রমণের কথাটা সে বুঝেছে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে 'কত্তার থানের' শোভাটি হয় মনোরম। বেলগাছগুলি অজস্র কচি পাতায় ভ'রে উঠেছে, কুলঝোপগুলিতেও কচি পাতার সমারোহ, বেলগাছের পাতার সমৃদ্ধির মধ্যে পাকা বেল দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গন্ধ উঠছে। কর্তা স্বয়ং যে গাছটিতে থাকেন, সে গাছটির আশ্চর্য মহিমা! সকল গাছে পুরনো পাতা ঝরতেই চৈত্রমাসের বিশ-পঁচিশ দিন চ'লে যায়, তারপর বেলগাছ কয়েকদিন ন্যাড়া হয়ে থাকে—শুধু বেলগুলো ঝুলতে থাকে, বৈশাখের আট-দশ দিন গেলে তবে কচি পাতা দেখা দেয়। কিন্তু কর্তার বাস যে গাছটিতে, সেটির পাতা চৈত্রের প্রথম সপ্তাহে ঝরে যাবেই, গাজনের আগে তাতে পাতা দেখা দেবেই। না দিলে চলবে না যে! জাঙলের বাবা কালরুদ্রের মাথায় গাজনের পুজোয় ঐ গাছের নতুন বেলপাতা প্রথমেই চড়াতে হয় যে! এমন চৈত্র মাসে পাতা-ধরা গাছ এ চাকলায় আর নাই। বাবার মহিমায় গাছটির আশেপাশে ওই বিল্ববৃক্ষের দু-চারিটি চারাপল্লবও হয়েছে। হবেই যে! যুগে যুগে এ মাহাত্ম্য বজায় থাকতে হবে তো। শ্যাওড়াগাছগুলিতেও নতুন পাতা ধরেছে। সোয়াকুলের ঝোপগুলিতেও নতুন পাতা। গাছগুলির মাথায় চারিপাশের কুলঝোপগুলির মাথা ছেয়ে আলোকলতা

ছড়িয়ে পড়েছে ছাতার মত। মধ্যে মধ্যে ফুলে-ভরা ধুতরা ও আকন্দের গাছ। সবচেয়ে বাহার দিয়েছে একটা বাঁদরলাঠির গাছ। গাছটা ভ'রে অজস্র হলুদ রঙের ফুল ফুটেছে—লম্বা ডাঁটার অসংখ্য ফুল! ফুলের ভারে নুয়ে প'ড়ে দুলছে। ফুলঝুরি না বললে সে ফুল ফোটার সঠিক বর্ণনা হয় না। চারপাশে তালগাছের বেড়া। তাল ধ'রে রয়েছে কাঁদি কাঁদি। কর্তার থানটির আর একটি মহিমা—চারপাশে নজর চলে। পূবে ওই দূরে—পলেনের মাঠের কিনারায় দেখা যাচ্ছে বাঁশবাদি, তার পাশে সেই দহ, যে দহে ডুবেছে কালো বউ। উত্তরে তাকাও, দেখবে, দেখা যাচ্ছে জাঙল গ্রাম। উত্তর-পূর্বে চন্নপুর ইস্টিশান একেবারে পরিষ্কার দেখতে পাবে। পশ্চিমে তাকালে সায়েবডাঙা নজরে পড়বে। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে তাকাও, নজরে পড়বে—কোপাইয়ের হাঁসুলী বাঁকের প্রথম খোঁচ। মোট কথা, কর্তা এই বেলগাছটিতে ব'সে রুদ্রাক্ষের মালা জপ করেন, আর গোটা হাঁসুলী বাঁকে তাঁর দৃষ্টি দেন। প্রসন্ন দৃষ্টিতে মানুষের ঘরে সুখ শান্তি উছলে পড়ে, মাঠে ফসল লুটিয়ে পড়ে, পশ্চিম আকাশের ঝড় সসম্মানে হাঁসুলীর বাঁকের পাশ কাটিয়ে চ'লে যায়, কোপাইয়ের বান দুকূল ভাসিয়ে আসতে আসতে এ কূল ছেড়ে ও কূল ভাসিয়ে চ'লে যায়। আবার কোপদৃষ্টি হানলে এর উল্টো হয়। ঘরে ঘরে দুঃখ, ঝগড়াঝাটি, লাঠালাঠি, মনে মনে অসুখ, গাঁয়ে গাঁয়ে বিবাদ, আকাশে অনাবৃষ্টি, মাঠে অজন্মা, মাথার উপর ঝড়, কোপাইয়ের বান সেবার হাঁসুলীর বাঁকের ওই প্রথম খোঁচই বল আর খাঁজই বল—ওইখানে যে বাঁধ আছে, সেই বাঁধ ভেঙে হাঁসুলীর বাঁক ভাসিয়ে দিয়ে চ'লে যায়।

উপুড় হয়ে পড়ল বনওয়ারী বেলগাছের সামনে। হে দয়াময়, হে প্রভু, হে হাঁসুলী বাঁকের মঙ্গল-অমোঙ্গলের মালিক, হে বাবা ইহলোকের রক্ষাকর্তা, পরলোকের ত্রাণকর্তা, তুমি বনওয়ারীকে রক্ষা কর, ত্রাণ করবার ভরসা দাও। সকল পাপ তুমি ক্ষমা কর। পাপ সে করেছে—একশো বার হাজার বার সে স্বীকার করছে তোমার চরণতলে। চোখ থেকে তার জল পড়ল। অনেক প্রার্থনা ক'রে সে উঠে বসল।

বসন অবাক হয়ে গেল তার চোখের জল দেখে। বনওয়ারীদাদা ভাল লোক, ধর্মিষ্ঠ মানুষ তা সে জানে; কিন্তু এত বড় ধর্মাত্মা তা সে জানত না। মাথার উপর রোদ চড়ছে, বনওয়ারীর দুর্বল শরীর, তাড়াতাড়ি ফেরাই উচিত, কিন্তু এর পর আর সে কথা বলতে তার সাহস হ'ল না। গাছের ছায়া দেখে সেইখানেই বনওয়ারী বসল উবু হয়ে। এতক্ষণে তার মন খানিকটা শান্তি পেলে। বুকের ভিতরের উদ্বেগ অনেকটা উপশম হ'ল। কর্তাবাবার কৃপায় পাপের অবশ্যই খণ্ডন হবে। মনে মনে সে মানতও করেছে। তারপর রমণের সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেও ভাল হয়েছে; পরমের সঙ্গে পথের বৃত্তান্তটাও খুব চমৎকার হয়েছে; এর পর আর কোন দোষ তার ঘাড়ে আসবে না। অপরাধ অবশ্য তার অল্পই। সে পরমকে ইচ্ছা করলে মেরেই ফেলতে পারত, কিন্তু মারে নাই। কালো বউকে নিজেও সে ডাকে নাই। সে তাকে দেখতে গিয়েছিল। বলতে গিয়েছিল, পরমের আসবার কথা। কালো বউই নিজে থেকে তার হাত ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল নদীর ধারে। পরমই কালো বউকে খুন করতে গিয়েছিল। কালো বউ নিয়তির টানে গিয়ে পড়ল কর্তার দহে। বলতে গেলে, কর্তাই তাকে সাজা দিয়েছেন। তার অপরাধ—সে জলে ডুব মেরেছিল পরমকে দেখে, উঠে বাধা দেয় নাই, আর কালো বউকে তুলবার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নাই। ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠল সে। ভাগ্য ভাল যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নাই, নইলে সেও আর উঠত না। বাবার বাহন—বাবার বাহনই তাকে দহের বুকে ডুবিয়েছে। সে চোখে দেখেছে। করালীর পাপেই মরল কালো বউ।

হাঁসুলীর বাঁকের উপকথায় পাপ আছে—পুণ্য আছে। পাপপুণ্যের চেয়ে, বিষয়বুদ্ধি ধর্মবুদ্ধি বলাই ভাল। সংস্কারের বাঁশবন এবং জৈব কামনার আদিম কালের আপনি-জন্মানো বট-অশথ-শিমুল-শিরীষ গাছের ঘন বনের ছায়ার তলায় জন্মানো পাপপুণ্যবুদ্ধির গাছগুলির চেহারা বিচিত্র—হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে এবং বটবনে সযত্নে পোঁতা আম-কাঁঠালের চারার মত বিবর্ণ এবং হিলহিলে তাদের চেহারা, বট অশ্বত্থ এবং বাঁশবনের ওই ঘন ছায়ার মধ্যেও এরা আলোক ও উত্তাপের কিছু কিছু আস্বাদ পায় এবং আরও বেশি পেতেও

গভীর কামনাও তাদের আছে। কিন্তু কোন মতেই যেন পেরে উঠছে না—হাঁসুলী বাঁকের মাঠ যেন বটগাছ বাঁশগাছকেই বেশি রস দিচ্ছে। কাহারেরা সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে থাকে এই আম-কাঁঠালের গাছগুলির দিকে। কবে বড় হয়ে ছাড়িয়ে উঠবে বাঁশবনের অন্ধকার! বটের পাশে ওরা মেলবে পল্লব! কবে দেবে ফল! কিন্তু কোন ভরসাই পায় না। এই গাছগুলি মরছে অথবা বাঁচবার পথে বাড়ছে—সে কথায় কাহারপাড়ায় দ্বিমত রয়েছে। সুচাঁদের মত হ'ল, মরছে—নিশ্চয় মরছে। অধিকাংশ প্রবীণের মতই তাই। সুচাঁদ বলে—সেকালে লোকের ভক্তি কত ছিল! ঘর ঘর দিত মানসিকের পাঁটা। অ্যাই বড় বড় পাঁটা, অ্যাই তার ডাড়ী। ড্যার বছর এক বছর বয়েস না হ'লে বলিদানই দিত না। এতে চুরি করতে যেত মরদেরা—কত্তার ঠাঁইটিতে পেনাম ক'রে তবে যেত। মেয়েরা কারুর সাথে অঙ করতে—আগে কত্তার গাছতলায় একখান সিঁদুর দিয়ে তবে অঙ করতে নামত। কত্তা লোককে স্বপনে আদেশ দিত। গুপীর কর্তাবাবা মাথা ঠুকলে কত্তাবাবার গাছের শেকড়ে—ই পরিবার নিয়ে আমি কি করি, তা বল বাবা তুমি? গুপীর কত্তামায়ের অঙ হয়েছিল ভুই পাড়ার একজনার সাথে। বাবা স্বপন দিলে—মেরে ফেলাও বিষ দিয়ে। স্বপনে বাবা ইয়েদের গরুমারা বিষ হাতে দিয়ে বললে—এই লে। সেই বিষে মরল গুপীর কত্তামা। তারপর সে বলে—সে আমও নাই, সে অযুধ্যেও নাই। মানুষের সে বেক্কম নাই—ভক্তি নাই, বাবাও নিজের মহিমে গুটিয়ে নিয়েছেন। যেমন কলি তেমনি চলি। কলিকালে ধম্মই নাই। তাই মানুষের হালচাল এমুনি। জাঙলের চৌধুরী মাশায় বলতেন—কলিকালে ধর্মের এক ঠ্যাং। তাও ক্ষ'য়ে আসছে।

ক্ষ'য়ে এলেও খানিকটা আছে, তাই এখনও কিছু কিছু আছে। বনওয়ারী তার উল্টো মত অবশ্য পোষণ করে না, কিন্তু তবু সে প্রত্যাশা করে—হাঁসুলী বাঁকের মধ্যে সে ধর্মের ওই একটি ঠ্যাংকে আর ক্ষ'য়ে যেতে দেবে না। বনওয়ারী এসে গড়িয়ে পড়ল বাবার থানে। সান্ত্বনাও সে পেলে। মনে মনে বললে—ক্ষমা কর, বাবা, ক্ষমা কর। আমি তার জন্যে দায়ী নই। তবে

করালীকে আমি সাজা দিই নাই, সে অপরাধ আমার বটে। কিন্তুক হে বাবাঠাকুর, তার জন্তে তো আমার বুক খালি ক'রে কালো বউকে কেড়ে নিয়েছ। এইবার তোমার কোধ শান্ত কর।

যে যতই বলুক, বনওয়ারী জানে, কালো বউয়ের সঙ্গে তার 'অঙের' খেলার অপরাধ বাবাঠাকুরের কাছে বড় পাপ নয়। অজ্ঞান কাহারদের এ অপরাধ ধরেন না বাবা। বাবাঠাকুর কাহারদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক—তিনি বোঝেন যে কাহারদের 'অঙের' খেলা ছাড়া আর কোন মন-ভুলানো খেলা নাই। বাবাঠাকুরের কাছে প্রধান অপরাধ করেছে করালী। সেই বাহনটিকে পুড়িয়ে মেরেছে। তাঁর শিমুলবৃক্ষে বার বার উঠে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত করেছে। করালীই আবার কাহারপাড়াকে যুদ্ধে যেতে বলেছে! অসুখের মধ্যে এই সব ভাবনা ভাবতে গিয়ে বনওয়ারী একটি নূতন সত্য পেয়েছে। বাহনের শিসের মানে বুঝেছে। শিস দিয়ে দিয়ে সাবোধান ক'রে দিচ্ছিলেন হাঁসুলী বাঁকের কাহারকুলকে—সাবোধান! হাঁসুলী বাঁকের মাথার উপর গিয়ে গোঙাতে গোঙাতে নিত্যি উড়বে—উড়োজাহাজ। চন্ননপুরের জাতনাশা কারখানা বেড়ে এগিয়ে আসবে এই দিকে। পিথিমীতে যুদ্ধ লেগেছে—সাবোধান! করালীকে আড়াল করতে গিয়ে বাবাঠাকুরের হাতে মার খেলে বনওয়ারী, বনওয়ারীর বুকে আঘাত দেবার জন্তেই বাহন ছোবল দিলে কালো বউয়ের বুকে।

বনওয়ারী চুপ ক'রে ব'সে রইল বেলগাছটির তলায়। সামনেই পশ্চিমে সায়েবডাঙা; সেখানে কালো কালো মানুষেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মধ্যে মধ্যে বৈশাখী গরম দমকা বইছে। আটপৌরেপাড়ার সেই বটগাছটায় সাড়া জাগছে নতুন কচি পাতায় পাতায়।

সায়েবডাঙায় কালো কালো মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে—বাবুরা জমি কাটাচ্ছে। ওরা সাঁওতাল। বনওয়ারীর জমি আর এবার কাটানো হ'ল না। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘাড় নাড়লে।

বসন পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বনওয়ারীর মুখের চেহারা দেখে তার কথা বলতে সাহস হচ্ছে না। আর একবার যদি বনওয়ারীদাদা হাসে!

হঠাৎ বনওয়ারী উঠল। সুযোগ পেয়ে বসন্ত কথা বললে—চল, বেলা অনেক হয়েছে।

পথে সে সাহস ক'রে বললে—বনওয়ারীদাদা!

—হুঁ।

—তুমি বাপু করালীকে একবার বারণ করবে।

—কাকে? করালীকে?—চোখ দুটো তার জ্ব'লে উঠল। বসন ভয় পেলে।

বনওয়ারী বললে—শুনেছি কোঠাঘর করছে সে। হবে তার বোঝাপড়া। একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে আবার বললে—আমি কি কোঠাঘর একখানা করতে পারি না বসন?

শিউরে উঠল বসন্ত। মনে পড়ল—করালী বসন্তকে এই কথার উত্তর কি দিয়েছে। বসন্ত বনওয়ারীর মনও ঠিক বুঝতে পারছে না। করালী তো কম নয়! শেষে কি দুজনে—? কত কথা ভাবতে লাগল। হঠাৎ বনওয়ারী থমকে দাঁড়াল। বনওয়ারীর কি সবই অদ্ভুত! বসন বললে—কি হ'ল? বলতে বলতে পিছন থেকে একটা ঘূর্ণি হাওয়া এসে দুজনকেই আবৃত ক'রে দিলে। ধুলোয় পাতায় সর্বাঙ্গ ভ'রে গেল—মুখে ধুলোবালি ঢুকল। বসন্ত এবার এটাকেই তামাশার ভূমিকা ক'রে নিয়ে অপরিমিত হাসতে লাগল—থূ-থূ মা গো! থূ! পরক্ষণেই সে বিস্মিত হয়ে বনওয়ারীকে বললে—কি হ'ল বনওয়ারীদাদা? দাঁড়ালে?

বনওয়ারী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। ঘূর্ণিটা তাদের অতিক্রম ক'রে সামনে এগিয়ে চলেছে। অদূরেই আটপৌরেপাড়ার বটগাছটা। ঘূর্ণিটা এগিয়ে গিয়ে কাণ্ডের গায়ে খুব ঘুরপাক খেয়ে থেমে গেল। গাছের পল্লবে পল্লবে চঞ্চলতা জেগে উঠল।

বনওয়ারী কাঁপতে লাগল। ব্যাপারটা বুঝেছে বসন। সে শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—বা-বাওড়? অর্থাৎ ভূত?

বনওয়ারী তার হাতটা ধ'রে বললে—পাশে পাশে আয়। বসন্ত তার

হাতটা ধ'রে দেখলে, বনওয়ারীর হাতটা ঘামছে, থরথর ক'রে কাঁপছে। বনওয়ারী তাকে সাহস দিতে চায়, না, তার কাছ থেকে সাহস পেতে চায় বুঝতে পারলে না।

সে ডাকলে—ব্যানোদাদা!

বনওয়ারী উত্তর দিলে না। হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী মাতব্বর ঠিক চিনেছে, বসন চিনতে পারে নাই। কালো বউ! কালোশশী! আর কেউ নয়। কালোশশী—হাসিখুশি! ঠিক তেমনি নেচে চ'লে গেল! সে ইশারা দিয়ে গেল—বঁধু, এই গাছেই আমি বাসা বেঁধেছি। হয়তো তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েও গেল। বনওয়ারী সাহস সঞ্চয় ক'রে আবার চলতে আরম্ভ করলে। বাড়ি এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। বসন নিরুপায় হয়ে ফিরে গেল।

দুই

ওদিকে কোপাইয়ের ধারে খুব গোলমাল।

সুচাঁদ বাড়িতে ব'সে কাঁদছে—ওরে বাবা রে—কোথা গেলে রে—দেখে যাও করালী মরল রে!

থরথর ক'রে কেঁপে উঠল বসন।—কি হ'ল কি? ওটে, সোরমার ক'রে চেঁচাস না, আগে বল্ কি হ'ল?

—ওরে আমার মাথা হ'ল রে! করালী মরল রে!

—তোর পায়ে পড়ি, বল্, কি হ'ল?

—অ্যাই আগাসায়েব লো বসন, অ্যাই লাঠি—ব'লেই কপালে চাপড় মেরে সে আবার চেঁচাতে শুরু ক'রে দিলে।

পাড়ায় একটি লোক নাই যে, সে জিজ্ঞাসা করে। সব ছুটে গিয়েছে ওইখানে। ওখানে যেতে তার পা উঠছে না। পাড়ায় রয়েছে শুধু নয়ান। ব'সে হাঁপাচ্ছে, সাদা চোখগুলো যেন জ্বলছে। তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে বসনের জিভ যেন আটকে যাচ্ছে।

সে নিজেই ছুটে গেল। কোপাইয়ের ঘাটে গোটা কাহারপাড়া জ'মে গিয়েছে। ভিড়ের মধ্যে করালীকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তুক আগা সায়েবের পাগড়ি দেখতে পেলে বসন। আগা সায়েব, মানে—কাবুলীওয়ালা। ভিড় ঠেলে ঢুকে বসন অবাক হয়ে গেল। করালী মরে নাই। আগা সায়েবের হাত ধ'রে বীরবিক্রমে তাকে শাসাচ্ছে—উ সমস্ত চলে গা নাই আর। হাঁ। ঠেঙিয়ে দোরস্ত ক'রে দেগা। মেরে ফেলে দেগা দহমে—কুমীরে খেয়ে লেগা। সে আমল আর নেহি হ্যায়।

আগা সায়েব সবিস্ময়ে বললে—আরে, তুম চন্ননপুরসে হিঁয়া আয়া হ্যায়?

—হাঁ। হিঁয়া হামারা ঘর হ্যায়, বাড়ি হ্যায়। মনে পড়তা হ্যায় চন্ননপুরকে ঠেঙানি। হিঁয়া ওই হোগা।

আগা বললে—হামারা রুপেয়া তো দে দেও ভাই।

—কাহে? কাহে তুম হাত ধরা হ্যায়? কাহে? কাহে তুম মেয়েলোককে খারাপ বাত বোলা হ্যায়? কাহে? হামলোক সবাই মিলকে তুমকে মারকে ছাতু বানায় দেগা তো কেয়া করেগা তুম?

ব্যাপারটা ঘটেছে পাগলকে নিয়ে। দু বছর আছে পাগল একখানা র‍্যাপার কিনেছিল আগা সায়েবের কাছে। টাকা দেবার কথা পরের বছর। কিন্তু পাগল দেশ ছেড়েছে। টাকা আদায়ের সময় আগা এসে ওকে পায় নাই। ফিরে গিয়েছিল। এবার হঠাৎ নদীর ওপারে আজ আগার সঙ্গে পাগলের দেখা হয়ে গিয়েছে। পাগলের টাকা দেবার ইচ্ছে নাই এমন নয়, কিন্তু গতবারে যথাসময়ে দেওয়া হয় নাই ব'লেই ভয়ে সে ছুটে নদী পার হয়ে পালিয়ে আসতে চেষ্টা করেছে, আগাও ছুটেছে—এসে তাকে ধরেছে।—রুপিয়া দেকো! দু-চার ঘা দিয়েছেও। পাগল চীৎকার করেছে। ঠিক সেই সময়েই কাজ সেরে চন্ননপুর থেকে করালী ফিরছিল। চীৎকার শুনে দল নিয়ে করালী ছুটে গিয়েছে এবং আগার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে।—খবরদার! মারে গা তো, মাথা ভাঙ দেগা তুমারা।

আশ্চর্যের কথা, আগা থমকে গিয়েছে।

আগা সায়েব ভীষণ লোক—ভয়ঙ্কর লোক। আগারা এ দেশে ব্যবসা করেছে এতদিন লাঠির জোরে। এই জোয়ান, এই লাঠি। একজন আগা গাঁয়ে ঢুকলে গোটা গ্রাম ত্রস্ত হয়েছে। আগারা টাকার জন্য গালাগাল দিয়েছে, মেরেছে, এমন কি পুরুষদের না-দেখে মেয়েদের অপমান করেছে। সেই আগার সামনে—হেই মা!

পাগল বললে—করালী, টাকা আমি দিচ্ছি ভাই, ছাড়ান দে।

—দাঁড়াও না কেনে। ছাড়ান দোব। ওর ভুরুকুটি ভাঙব আমি।—ব'লেই সে বললে—যাও, ভাগো। টাকা কাল দেগা—কাল, যাও—যাও—

আশ্চর্য, আগা আস্তে আস্তে চ'লে গেল—জরুর দেও, কাল রূপি জরুর দেও। আচ্ছা।

—আচ্ছা, আচ্ছা। থোড়া হিং নিয়ে এস। আর এইসা জবরদস্তি মৎ করো। নেহি তো হামলোক মারে গা, হাঁ।

আগা সত্যিই চ'লে গেল। সুড়সুড় ক'রে চ'লে গেল।

কাহারপাড়ায় করালী যেন ভিনদেশী মানুষ। জাত এক হ'লে কি হয়, রীতকরণ আলাদা,—বাক্যি, যে বাক্যি শিখেছে সে হাঁসুলী বাঁকের কাহারপাড়ায়, সেই মুখের বাক্যি পর্যন্ত আলাদা হয়ে গিয়েছে।

নিজ চন্নপুরের মুখুজ্জেবাবুদের এক ছেলে বিলাত থেকে সায়েব হয়ে এসেছেন। চন্নপুরের মানুষদের মধ্যে তিনি আলাদা। চন্নপুরের কারখানা কাহারপাড়ার কাছে বিলাত; সেখান থেকে করালীও হয়েছে কাহারপাড়ার বিলাত-ফেরত। এবার আবার গিয়েছিল কাটোয়া, সেখান থেকে ফিরছে করালী আর-এক মূর্তি নিয়ে।

করালী বাড়ি ফিরল পাগলকে নিয়ে। পাগল বললে—তোর এত সাহস ভাল নয় করালী। ওরা খুনের জাত।

—আমরাও খুন ক'রে খুনের জাত হব। সেদিন চন্নপুরে ওকে ঠেলা বুঝিয়ে দিয়েছি। এ তো একা ছিল। সেথা ছিল তিনজনা, জন দশেকে মিলে এস্যা মার দিয়েছি—লাঠি-ফাঠি ফেলে দে দৌড়। শেষে এসে লাইনমিস্ত্রীকে ধ'রে মিটমাট করে। পঁয়ত্রিশ টাকা পেত, পঁচিশ নিয়ে ফারখৎ। ও আমাকে চেনে। বুয়েচ?

পাগল বললে—না ভাই, ন্যায্য টাকা আমি দিয়ে দোব। পরকালে গিয়ে দে—না ভাই সে হবে না।

করালী অসহিষ্ণু ভাবে ঘাড় নাড়লে—সে তুমি দাও গা। কিন্তু ও এসে খপ ক'রে হাত ধ'রে অপমান করবে, আমি থাকতে তা হবে না। টাকা তুমি দাও, আমি ঠিক কাটব পাঁচ টাকা—দেখো তুমি। ও তোমার পরিবার তুলে গাল দিয়েছে কেনে?

—আমার তো পরিবার নাই, তা নিয়ে হাঙ্গামা কেনে?

—আজ নাই, একদিন তো ছিল। ও তুমি যাই বল, আমি শুনব না।—ব'লেই সে একটা গাছের গুঁড়িতে ব'সে পড়ল। পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বার ক'রে একটা দিলে পাগলকে, একটা নিলে নিজে, অন্ত সকলকে দিলে বিড়ি। তারপর মজুরদের বললে—জোরসে ভাই, কাম চালাও।

করালীর ঘর তৈরি হচ্ছে। আজ মাটি তৈরির দিন। কাল দেওয়ালে নতুন পাট চড়বে। প্রায় দুহাত উঁচু দেওয়াল উঠে পড়েছে।

গোটা পাড়াটা তার চারিপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একটা ক্ষুব্ধ হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এতখানি দম্ভ, এতখানি আস্ফালন তারা সহ্য করতে পারছে না। পানা আসেই নাই। সে আপন ঘরে বসে বিস্ফারিত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরব হয়ে ব'সে আছে। নয়ান হাঁপাচ্ছে, আর নখ দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছে। নয়ানের মা আপন মনেই গালাগাল দিচ্ছে; গালাগাল দিচ্ছে পানার উঠানের নিমগাছটাকে।—গাছটা অত্যন্ত উঁচু এবং বিস্তৃতপল্লব হয়েছে, কাক বসেছে, হাড় ফেলছে, ময়লা ফেলছে, হনুমানের বসত হয়েছে; গাঁদা হনুমানটা ওই গাছের মাথাতে এসে ব'সে থ্যাকোর-থ্যাক থ্যাকোর-থ্যাক শব্দে শাসায় কোপাইয়ের জঙ্গলবাসী সন্ন্যাসীর দলকে, এবং মধ্যে মধ্যে কাহারপাড়ার ঘরগুলিতে নজর চালিয়ে দেখে—কার উঠানে, কার চালে, কোন্ গাছে ধরেছে বেগুন কি কলা কি কুমড়ো বা লাউ বা ঝিঙে! দেখতে পেলেই উ-প শব্দে লাফ মেরে নয়ানের মায়ের চালে পড়ে। সেখান থেকে দেবে লাফ —তারপর চালে গিয়ে সেটাকে ছিঁড়ে নিয়ে আবার লাফ মেরে এসে বসবে এই গাছে। নয়ানের মা তাই গাছটাকেই অভিশাপ দিচ্ছে।

কালো বউ—বনওয়ারী বুঝেছে—কালো বউ ইশারা দিয়ে গেল—ওই গাছে সে বাসা বেঁধেছে। হয়তো নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল।

খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হয়েও বনওয়ারী নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইল। আশ্চর্যের কথা!

কোশকেঁধে বনওয়ারী জ্বর ছাড়লে কখনও শুয়ে থাকে না। কাল জ্বর ছেড়েছে, কালই উঠে বসেছে, আজ সকালে কত্তার থান ঘুরে এসেছে। সেই মানুষ অন্নপথ্য ক'রেও শুয়ে রইল।

কালো বউয়ের কথা সে ভাবছে। আটপৌরেপাড়ার বটগাছটার তলায় সে দাঁড়িয়ে আছে। ডালে দোল দিচ্ছে, হয়তো দোল খাচ্ছে। গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নার মধ্যে সে নিশ্চয় এগিয়ে আসবে—বনওয়ারীর ঘরের দিকে। বাঁশবাঁদির বাশবন এবং গাছপালার ছায়ায় অন্ধকারের মধ্যে জ্যোৎস্নার সাদা গুলছাপ গায়ে মেখে ঝরাপাতার উপর পা ফেলে শব্দ তুলে এসে দাঁড়াবে তার ঘরের পিছনে। টুপ টাপ ক'রে ঢেলা ফেলে দেবে ইশারা। আরও গভীর রাত্রে বনওয়ারী উঠছে না দেখে গুনগুন ক'রে গান গাইবে, তারপর ভোরের আকাশে শুকতারা উঠলে সে ফিরে যাবে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে, কোপাইয়ের ধারে ধারে —কত্তার দহে গিয়ে নামবে; সেখান থেকে উঠে আবার আসবে বটতলায়। বটতলা দিয়ে বনওয়ারী গেলে বটফল ছুঁড়ে মারবে কৌতুকভরে; কোপাইয়ের ধারে গেলে নদীর জল অথবা বালি ছিটিয়ে দেবে গায়ে। কোনদিন হয়তো দেখা দেবে মনোহারিণী সাজে সেজে, কোপাইয়ের ধারের শিরীষ কাঞ্চন তুলে খোঁপায় প'রে, অথবা দহের জলে ভিজা চিকন চুলগুলি এলিয়ে অজস্র জোনাকিপোকা তাতে প'রে, কালো মুখে সাদা দাঁতগুলি ঝিকমিকিয়ে হাসবে। কোনদিন হয়তো বা ভয়ঙ্করীরূপে দেখা দেবে; মাথা ঠেকবে শিমুলগাছের মাথায়, চোখ দুটো জ্বলবে আগুনের আঙারের মত, লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে দেবে— হিমের মত ঠাণ্ডা হাত বনওয়ারীর ঘরের দিকে। রুদ্ধ রোষে বাঁশবাঁদির অন্ধকার-চেরা চীৎকার করবে অথবা অতৃপ্ত বাসনায় কাঁদবে, অন্ধকার উঠবে গুমরে।

শিউরে উঠল বনওয়ারী। কোশকেঁধে বনওয়ারী, দুপুর রাত্রে চন্নপুর যায় ঘোষেদের জন্য ডাক্তার ডাকতে। অনাবৃষ্টির বৎসর কোপাই নদী পেরিয়ে ঘোষগোপপাড়ার বিলের ধারে ধারে নিঃশব্দে নির্ভয়ে হাঁটে বনওয়ারী— কোপাইয়ের জল, কোথায় কারা বাঁধ দিয়ে আটকেছে তাই দেখতে। জাঙলে

কোন গোলমাল হ'লে বনওয়ারীই ছোটে সর্বাগ্রে লাঠি নিয়ে; তা সে যত রাত্রিই হোক। জাঙলে একবার ডাকাত পড়েছিল, বনওয়ারী গিয়েছিল পাড়ার লোক নিয়ে ছুটে, সে-ই দাঁড়িয়েছিল সকলের আগে ডাকাতদের মোহড়া নিয়ে। সেই বনওয়ারী আজ এইভাবে শুয়ে আছে? কোন কিছুতে তার রাগ করবার মত মনের অবস্থা কোথায়? করালীর কোঠাঘর নিয়েই বা সে মাথা ঘামাবে কি ক'রে?

হাঁসুলীর বাঁকের উপকথার কালো বউয়ের প্রেতযোনি তো অলীক নয়। পিতিপুরুষের কথার মধ্যে ওরা আছে, তারা চোখে দেখেছে। ঘরের কোণে, বাঁশবনের তলায়, হাঁসুলী বাঁকের মাঠে, জলার পাশে—কেউ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ কাঁদে, কেউ গান করে, কেউ ঘরের চালে ব'সে পা ঝুলিয়ে দেয়, কেউ মাঠে মাঠে আগুন লুফে খেলা ক'রে ছুটে বেড়ায়, কেউ জলে জলে পদক্ষেপের শব্দ তুলে ঘুরে বেড়ায়।. এ ছাড়া আছে 'ভুলো', সে দিক-ভুলিয়ে নিয়ে যায় বিপথে—অপমৃত্যুর সম্ভাবনার দিকে। আরও আছে 'নিশি'—রাত্রে কেউ কাউকে ডাকবার কথা থাকলে, নিশি এসে তার রূপ ধ'রে অবিকল তারই কণ্ঠস্বরে ডাকে। সেও নিয়ে যায় ওই অপঘাত মৃত্যুর পথে। এক এক পুরুষ শেষ হ'লে তবে তাদের সঙ্গে মায়ায় অথবা হিংসায় বাঁধা প্রেতাত্মাগুলি মুক্তি পায়; আবার নতুন পুরুষে নতুন মৃতদের আত্মা—মায়া বা হিংসা যে-কোন কিছুর বশে ঘুরে বেড়ায় বাঁশবাঁদির ছায়ায় ছায়ায়—কোপাইয়ের কূলে কূলে, ঘনপল্লব গাছের আড়ালে আড়ালে, হাঁসুলী বাঁকের মাঠে মাঠে। হাঁসুলী বাঁকের অলৌকিক জগতের পরিধি বহুবিস্তৃত—আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত, প্রেতলোক থেকে নরলোক পর্যন্ত।

সুচাঁদ আজও বলে—ঘরভাঙাদের পূর্বপুরুষ ওর নয়ানের বাবার বাবার বাবা মরেছিল চুরি করতে গিয়ে গেরস্তের ছুঁড়ে-দেওয়া থালা কপালে গেঁথে। গেরস্তরা থালা ভেঙে সাঁই সাঁই ক'রে ছোঁড়ে—কানাভাঙা থালা, সে থালা ঘুরতে ঘুরতে আসে সুদর্শনচক্রের মত। নাগলে আর অক্ষে থাকে না। তাই নেগেছেল কপালে। তাইতে মরল বাড়ি এসে। তা'পরেতে তিনি তাই

হলেন। মা, দিন-আত ঘরের সাঙায়, না হয়তো বাড়ির পাঁদাড়ে, গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকতেন। লোকে ভয়ে টটস্থ! ভয় করত না কেবল তার পরিবার—নয়ানের কত্তাবাবার মা। ঘরে ছেলে শুয়ে থাকত—নয়ানের কত্তাবাবা। কচি ছেলে তখন। কাঁদত তো পরিবার বলত—পোড়ামুখো মানুষ, ম'রেও সুখ দিলি না, জ্বালাতে এলি? শুধু সাঙায় পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকলে হবে না, ছেলে কাঁদছে—চুপ করা। আশ্চয্যি মা, ছেলে উঠে যেত সাঙার ওপরে। দোল খেত ছেলে দিব্যি। তারপর চুপি চুপি বলে—একটি ছেলে নিয়ে মেয়েটি বেধবা হলি—বয়েস কম, তা বলে—সাঙা করিস না, তা হ'লে ঘাড় দুমড়ে দোব। তবে ভদ্দনোকের আশ্চয়ে থাক্, কিছু বলব না। তা তাই সে ছিল। এ অঞ্চলে একজন পশ্চিমে সাউ তামুকের কারবার করত। তার নজরে প'ড়ে তার আশ্চয়ে ছিল। সে আসত, যেত। তাতে কিছু বলত না। একদিন ঘরে জল নাই, এতে তেষ্টা পেয়েছে। বললে—এত এতে আমি জল আনব কি ক'রে? বলতে বলতে মা, এক কলসী জল—কোপাইয়ের বালি-খোঁড়া জল এনে নামিয়ে দিলে। একবার হয়েছিলেন কি—সুচাঁদ মুখখানা গম্ভীর ক'রে বলে—তখন কাত্তিক মাস, ঠাকুরের আসপুন্নিমে, কাঁদির আজবাড়িতে খুব ধূম; ছেলে-মেয়েদের সাধ হ'ল কাঁদির সন্দেশ খেতে, তারা বললে—ভাই কাঁদির আজ-বাড়িতে ভোজের মেঠাই মণ্ডা খেতে সাধ হছে। সেই নয়ানের বাবার বাবার বাবা—তার নাম ছিল অমাই, তার নাম ক'রে বললে—তা অমাই যদি খাওয়াতে পারে, তবেই বুঝি অমাইয়ের ক্ষ্যামতা! খোনা খোনা গলায় বাঁশ-আদাড় থেকে তখুনি অমাই বললে—কাঁল সঁকালে আঁসিস। বললে না পেত্যয় যাবে মা—সকালে নোকে গিয়ে দেখে বাঁশ-আদাড়ের মধ্যে অ্যাই এক চ্যাঙারি অয়েছে, তাতে লুচি-পুরি-মিষ্টি-মণ্ডা-মেঠাই—নানান দব্য। নয়ানের কত্তাবাবার গলার রজ পর্যন্ত খোনা হয়েছিল সেই তার ছোঁয়া লেগে। তার লেগে লোকের কাছে নাম হয়—খোনা কাহার। ভূত বশে থাকার তরেই তো চৌধুরীরা কাজে নিলে ওকে।

এই হ'ল হাঁসুলী বাঁকের সেকালের ভৌতিক লোকের ইতিকথা। তবে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের মত এতেও যেন পরিবর্তন ঘটেছে। ওই সুচাঁদই বলে সে কথা। দেবভক্তি ক'মে যাওয়ার জন্য আক্ষেপ ক'রে বলে—এখন ভূত হ'লে চন্ননপুরের ছোকরাবাবুরা বন্দুক নিয়ে পাহারা দিয়ে পরীক্ষে করে দেখতে আসবে। জাঙলের মোড়ল মহাশয়ের ছোকরারা ঠেঙা-লাঠি নিয়ে আসবে। তাঁদের কি গরজ? কেনে, তাঁরা এই সব ঝামেলায় থাকবেন? তার চেয়ে দূরে দুরান্তরে নদীর ধারে হাঁসুলীর মাঠে দিব্যি থাকেন, শোঁশানের হাড়গোড় নিয়ে বাজি বাজান, সাধ গেলে নদীতে বিলে মাছ ধরেন, চিতের আগুন লুফে খেলা করেন, ই গাছের মাথা থেকে হুঁস ক'রে ভেসে চ'লে যান উ গাছে।

ভয়ার্ত বনওয়ারী ঘরের দরজা, এমন কি দেওয়ালের মাথার দিকে যে দুটো ছোট গোল ঘুলঘুলি ছিল সে দুটোও বন্ধ ক'রে শুয়ে থাকল।

বউ বললে—জষ্টি মাসের গরম, ভেপে যাবা যি।

বনওয়ারী চীৎকার ক'রে ওঠে—ঠাণ্ডা লাগবে—ঠাণ্ডা লাগবে।

বউ বললে—তবে তুমি ঘরে শোও, আমি বাইরে শোব।

—না।

গভীর রাত্রে সে উঠে স্ত্রীর কাপড়ের সঙ্গে নিজের কাপড় বেঁধে তবে নিশ্চিন্ত হ'ল। ঘুম খানিকটা এল শেষরাত্রে। একটু ঘুমের পরই সে ভয় দেখে বু-বু শব্দ ক'রে উঠল। স্বপ্নে দেখলে—কালো বউ গাছতলায় দাঁড়িয়ে কাতরাচ্ছে। তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে বাবার সেই বাহন, করালীর ঘর উড়িয়েছেন বাবার যে বাহন, বনওয়ারীর কালো বউকে ডুবিয়ে মারলেন যিনি—তিনি।

দিনের আলো ফুটল। বনওয়ারী আশ্বস্ত হ'ল। শুধু আশ্বস্ত নয়—একটা রাত্রি অতীত হতেই সে খানিকটা সুস্থও হ'ল। রাত্রেই সে ভেবে-চিন্তে ঠিক করেছে—বাকুলের জাগ্রত মা-শ্মশানকালীর রক্ষাকবচ ধারণ করবে, কত্তাবাবার পুষ্প ও মাদুলীতে পুরে ধারণ করবে। তা হ'লেই নিশ্চিন্ত। ভূত প্রেত যত নিষ্ঠুর—দেবতা তত দয়াল। এই সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়েই চলে

হাঁসুলীর বাঁকের দিন রাত্রি। নিজেই যাবে সে। এ কথা তার প্রকাশের উপায় নাই। প্রকাশ হ'লে হয়তো ডাক আসবে থানা থেকে। আর পাড়াময় গ্রামময় চাকলাময় কেলেঙ্কারীর একশেষ। মাতব্বর সে। লোকে তাকে দেখে হাসবে। আড়ালে নানান কথা বলবে। হয়তো লোকে আর তেমন মান্য করবে না: সে এক কাল গিয়েছে, যে কালে মাতব্বর যা করেছে তাই সেজেছে। একাল সেকাল নয়।

বউ এনে নামিয়ে দিলে মুড়ি।

বনওয়ারী বললে—না। মা-কালীর থানে যাব।

উঠে পড়ল সে। পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল করালীর নতুন ঘরের কাছে। করালী নাই, দেওয়াল দিচ্ছে চন্নপুরের পাকা 'দেওয়াল-বারুইয়ে' অর্থাৎ মাটির দেওয়ালের কারিগর, মাটি কাটছে এখানকার কয়েকজন ছোকরা। তারাও মজুর খাটছে।

বনওয়ারীর কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা দেখা দিল। মনে প'ড়ে গেল, অসুখের মধ্যেই সে শুনেছে করালীর কোঠাঘরের কথা। হারামজাদা শয়তান অশুভক্ষণে করালী! গায়ে জোর হয়েছে, রেলের জাতনাশা কারখানায় যুদ্ধের চাকরিতে টাকা হয়েছে, তাই ধরাকে সে সরা দেখছে। বাবার বাহনকে পুড়িয়ে মেরেছে। বাবার শিমুলবৃক্ষে চেপেছে। তাঁর কোপে নতুন চাল উড়ে গেল, তবু হুঁশ নাই। অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে—পিতিপুরুষের কথা। যে গাছ অতি বাড়ে, ঝড়ে ভেঙেও সে গাছের হুঁশ হয় না। পিতিপুরুষের নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে কোঠাঘর করবে! ঘরকে আরও উঁচু করবে! কাহারপাড়ার সকলকে ছাড়িয়ে উঠবার বাসনা! কাল আগা সায়েবের বৃত্তান্তও শুনেছে। খুব বাড় বেড়েছে। রাগে তার দুর্বল শরীর মস্তিষ্ক অধীর হয়ে উঠল। কোঠাঘরে পরিবার নিয়ে শয়ন করবে! 'হু' অর্থাৎ হাওয়া খাবে! বড়লোকপনা দেখাবে! লোকে পথ দিয়ে যাবে, করালী কোঠার 'বারজালা' অর্থাৎ জানালা থেকে হেসে বলবে—কোথা যাবে গো বনওয়ারীকাকা?

বনওয়ারীকে দেখে 'দেওয়াল-বারুই' মজুর সকলেই কাজ বন্ধ ক'রে তার দিকে তাকিয়েছিল। বনওয়ারী খাতিরের পাত্র। সে যখন দাঁড়িয়ে দেখছে মন দিয়ে, তখন মন্তব্য করবেই; লোকও সে পাকা; তার মন্তব্য শুনবার জন্যই তারা কাজ বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করছিল। বারুই অর্থাৎ কারিগর একটু অপেক্ষা ক'রে প্রশ্ন করলে—দেওয়ালের ধরনডা কেমন হয়েছে মাতব্বর? মাপ ক'রে করেছি, তবু তোমার চোখে দেখ দি-নি—এঁকাবেঁকা ছোটবড় হয়েছে কি না?

তার উত্তরে বনওয়ারী প্রশ্ন করলে—করালী বাবু মহাশয় কই?

সকলে চমকে উঠল।

বনওয়ারী নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলে—চন্নপুরে বুঝি?

তারপর গম্ভীরভাবে বললে—কাজ বন্ধ রাখ। তোমরা ঘর যাও।

সকলের হাত মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল।

বনওয়ারী বললে—করালী ফিরে আসুক, কথাবার্তা আছে। কোঠাঘর করা হবে না। সে ধমক দিয়ে উঠল গাঁয়ের যারা মজুর খাটছিল তাদের—অ্যাই, কথা কানে যায় না, না কি? যা, উঠে যা। ফেল্ কোদাল। নামা জলের টিন। যা—যা—

কোঠাঘর, কোঠাঘর! গাঁয়ে টেক্কা দেবে ছোকরা! আরে, টেক্কা দেওয়া কি সোজা কথা? 'অঙের' খেলায় টেক্কার চেয়ে গোলাম বড়, নহলা বড়। কাহারপাড়ার মাতব্বরি—অঙের খেলা নয়—এখানে টেক্কা বড়। তারপরে সাহেব। টেক্কা হলেন বাবাঠাকুর, সায়েব হ'ল মাতব্বর। এখানে গোলাম করালীর খেলা চলবে না। এই হ'ল বিধাতার নিয়ম; বনওয়ারীকে মাতব্বর করেছে বাবাঠাকুরের দয়া। আরে বাবা, বনওয়ারীর ঘরের দিকে চেয়ে দেখ। সে কি করতে পারত না একখানা কোঠা? পিঁপড়ের পালক উঠেছে। পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে। মঙ্গল অমঙ্গল বুঝতে পারে না, ঝকমকে কিছু দেখলেই ফরফর ক'রে উড়ে যায়; পুড়ে মরে, ধাক্কা খেয়ে মরে, দিশেহারা দেশহারা হয়ে মরে। হাঁসুলীর বাঁকের সোনার মাঠ। এ মাঠ

গ্রীষ্মে যত কঠিন, বর্ষায় চাষ খোঁড়ের পর তত নরম, তত মোলাম। এই মাঠের ধানে পানে, কলাইয়ে পাকড়ে, তরিতে তরকারীতে যার পেট ভরল না, তার পেট দুনিয়ায় কোথায় ভরবে? এ মাটি চ'ষে খুঁড়ে যার পেট ভরে না, বুঝতে হবে তার অদৃষ্টের দোষ, পূর্বজন্মের কর্মফল, এ জন্মের কুটিল মনের—কুড়ে গতরের সাজা। এককাল গিয়েছে, সেকালে কাঁধে ঘাঁটা ফেলে বেহারাগিরি ক'রে বাঁচত কাহারেরা, তারপরে কত্তাঠাকুরের দয়া হ'ল, তিনি মন্বন্তরের মাঝে কাহারদের দিকে ফিরে তাকালেন। চৌধুরী মহাশয়কে স্বপন দিয়ে—ভিটে দেওয়ালেন, ভাগে কৃষাণিতে কাহারদের জমি দিতে বললেন। চৌধুরী মহাশয় মারফতে কর্তার সে আদেশ কাহারদের উপরে। তাঁর দয়াতেই তো গোটা হাঁসুলী মাঠের অর্ধেকের উপর তাদের করতলগত। জাঙলে ঘর কয়েক হাড়ী ডোম আছে, মুচি আছে, আগে তারাই করত জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়ের জমি। আজ তারা হ'টে গিয়েছে। এককালে যে কাহারেরা চাষকর্ম জানত না, আজ তাদের চেয়ে ভাল চাষী 'মুনিষ' এ চাকলায় নাই।

করালী হতভাগা—করালী বদমাস। শুধু তাই বা কেন? করালী অশুভক্ষণে; অশুভক্ষণটিতে ওর জন্ম। ওই চন্নপুর রেল-লাইনে ওর মায়ের কেলেঙ্কারি টেলিগেরাপের খুঁটিতে খুঁটিতে কান পাতলে আজও শুনতে পাওয়া যায়। গাড়ি চ'লে যায় লাইনের উপর দিয়ে, তারে যে শব্দ হয় তাতে শুনতে পাওয়া যায়। এখন ছেলেরা মেয়েরা বলে—গাড়িটা বলছে, কাঁচা তেঁতুল—পাকা তেঁতুল—কাঁচা তেঁতুল—পাকা তেঁতুল। আগে লোকে বলত—সিদ্‌-জগা-পেবাতী, গেল কুল গেল জাতি—সিদ্‌-জগা-পেবাতী। প্রভাতী ছিল করালীর মায়ের নাম। হতভাগা শুনতে পায় না সে ছড়া ওই শব্দের মধ্যে? সেই চন্নপুরের রেল-লাইনে চাকরি ক'রে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়? 'নিলেজো' আর্থাৎ নির্লজ্জ হতভাগা। আবার যুদ্ধ দেখায় সকলকে, যুদ্ধের পোশাক প'রে যুদ্ধের কাজের লোভ দেখায় কাহারপাড়াকে!

যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ তো হাঁসুলী বাঁকের কি? যুদ্ধ কি বনওয়ারী জানে

না? না, শোনে নাই? কটা যুদ্ধের কথা তুই জানিস? রাম-রাবণের যুদ্ধ গিয়েছে, কুরুক্ষেত্র গিয়েছে, বাণ-রাজার সঙ্গে ভগবান হরির যুদ্ধ গিয়েছে, রাবণ নির্বংশ হয়েছে, ধর্মপুত্তু রাজা হয়েছেন, রাজা দুর্য্যোধন মরেছে, বাণ-রাজার বেটীর সঙ্গে হরির নাতির বিয়ে হয়েছে। কাহারদের কি হয়েছে? কাহারেরা বাবা কালারুদ্দুর ভ'জে বেঁচে আছে। বর্গী হাঙ্গামা গিয়েছে, সাঁওতালেরা খেপেছিল জানিস তুই? কি হয়েছে কাহারদের? এই তো বিশ বছর আগেও আর একবার যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তাতে হাঁসুলী বাঁকের কি হয়েছে? ভাল হয় না। মন্দ হয়েছে। অভাব এসেছে, রোগ এসেছে, দুঃখ এসেছে, সুখের কাল ঘুচিয়ে দিয়েছে। আবার লেগেছে যুদ্ধ। লাগুক। আরও খানিকটা মন্দ হবে। তার বেশি কিছু হবে না। হাঁসুলী বাঁকের মাথার উপরে উড়ো-জাহাজ উড়ছে, উড়ুক। কিন্তু যুদ্ধের ঢেউ, বাঁশবাঁদির বুকে আছাড় খাবে না। বাবাঠাকুর আছেন। পৃথিবীর ভালমন্দতে হাঁসুলী বাঁকের কি যায় আসে?

ঘর বন্ধ ক'রে দিয়ে সে কালীর থানে রওনা হ'ল।

কালীর থান থেকে মাদুলী নিয়ে সে ফিরল।

মা-কালী ও কত্তাঠাকুরের পুষ্প নিয়ে স্যাকরা-বাড়ি থেকে কিনে আনা দুটি রুপোর মাদুলীতে পুরে স্নান ক'রে শুদ্ধ কাচা কাপড় প'রে লাল সুতোয় বেঁধে ধারণ ক'রে সে নির্ভয় হ'ল। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে মনে এবং দেহে বেশ সুস্থ হয়ে করালী সম্পর্কে সংকল্প স্থির করলে সে। মনটা এখন শান্ত হয়েছে, মনে হ'ল, ভাগ্য ভাল যে তখন রাগের মাথায় কিছু ক'রে বসে নাই। করালীকে সামনে পেলে তখন হয়তো তাই হ'ত। সে হ'লে বড়ই লজ্জার কথা—কেলেঙ্কারির ঘটনা হ'ত সেটা। কত্তা রক্ষা করেছেন তাকে, পিতি-পুরুষের আশীর্বাদে রক্ষা পেয়েছে বনওয়ারী। সে প্রবীণ মাতব্বর লোক, তার পক্ষে এমন রাগ—বিশেষ ক'রে ওই ছেলে-ছোকরার উপর কি শোভা পায়?

না, উচিত হয় সেটা? পাড়ার মঙ্গল, প্রতিটি লোকের মঙ্গল তাকে দেখতে হবে—প্রতিটি লোককে 'স্নেঁহ' অর্থাৎ ·স্নেহ ক'রে 'কোলগত' ক'রে রাখতে হবে—নইলে সে কিসের মাতব্বর! তা ছাড়া ছোকরার 'এলেম' অর্থাৎ কৃতিত্ব আছে। কাল আগা সায়েবকে শিক্ষা দিয়েছে, এটাকে সে ভালই বলবে। গায়ে ক্ষমতা ধরে, বুকের পাটা আছে। ভবিষ্যতে মরদের মত মরদ হবে! বনওয়ারীর ছেলেপুলে নাই, করালী যদি অনুগত হয়ে থাকে তবে তাকেই শেষ পর্যন্ত সে মাতব্বর ক'রে যাবে পাড়ার। তার জন্য ছোকরার মাথায় 'হিতবুদ্ধি' দিতে হবে। একদিন গোপনে ডেকে বলতে হবে ছোকরাকে খুলে, 'হিয়াখানিকে খোলসা' ক'রে বলতে হবে।

আরাম ক'রে তামাক খেয়ে সে বাইরের দাওয়ায় গড়াল একটু। আটপৌরেপাড়ার বটগাছের মাথাটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দুলছে মাথাটা। যতই দুলিয়ে ইশারা দাও সখি, বনওয়ারী আর ভুলছে না; তোমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এখন বনওয়ারী। মা-কালীর কবচ, বাবা-কত্তাঠাকুরের কবচ বনওয়ারীর হাতে। তবে দুঃখ তোমার জন্যে হয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বনওয়ারী। কিছুক্ষণ পরে সে উঠে গেল সায়েবডাঙায়। দিন যাচ্ছে, না, জল যাচ্ছে। যে জল কোপাইয়ে ব'য়ে চ'লে যায়—সে জল আর ফেরে না। যে দিনটি গেল, সেটি আর ফিরবে না। সায়েবডাঙার জমিটা এবার আর তার হাঁসিল হ'ল না। মনের টানে সে সায়েবডাঙায় গিয়ে উঠল।

সায়েবডাঙা থেকে জাঙলে গেল বনওয়ারী। মনিববাড়িতে আজ পনরো-বিশ দিন যাওয়া হয় নাই। মনিববাড়ি থেকে লোক এসে খোঁজ ক'রে গিয়েছে। ব'লে গিয়েছে, ঘোষবাড়িতে কাজ আসছে। মাইতো ঘোষ আজ রাত্রে আসবেন, মাইতো ঘোষের ছেলের অন্নপ্রাশন হবে। ঘোষবাড়ির কাজে বনওয়ারীর কর্তব্য অনেক। কাঠ কাটা, বাড়ি পরিষ্কার করা, উনোন পাতা, হাট তরিতরকারি আনা-নেওয়া অর্থাৎ মজুরদের কাজের সব ভারই বনওয়ারীকে নিতে হবে। পাড়াতে আবার সে কথাটাও বলতে হবে। মজুরি

পাবে—সে কাজে বাইরের লোক পায় কেন? তা ছাড়া এঁটোকাঁটার প্রসাদের সঙ্গে বাড়তি ভাত-তরকারি-ডাল সেও মিলবে। এঁটোপাতা পরিষ্কার করবে, সকড়ি বাসনগুলো মাজবে মেয়েরা—তার জন্য জনাহি এক পাই অর্থাৎ আধ সের চাল, আঁচলে মুড়ি পাবে। অবিশ্যি কাজের এখনও দেরি আছে, মাস তিনেক। তবু করতে হবে তো। হঠাৎ সে চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে প'ড়ে গেল করালীর কথা। করালী বলেছে—জাত যায় এঁটো খেলে। কাহারেরা সদ্‌গোপদের এঁটো খায়।

বড় ঘোষ বললেন—কি রে! শরীর আবার অসুখ করছে নাকি?

বনওয়ারী মাথা ঝাঁকি দিয়ে বললে—মাথার ভেতর দপ দপ করছে। তা সেরে যাবে।

মাইতো-বউ বললেন—কি গো কাহার দেওর, এই সময় অসুখ করলে? ঘরে কাজ!

বনওয়ারী বড় ঘোষের চেয়ে অনেক বড়, তবু 'ছোটজাত' ব'লে বউয়েরা ওকে 'কাহার-দেওর' বলে। বনওয়ারী হেসে বললে—সেরে উঠেছি বউঠাকরুণ, আর ভাবোনা কি? আর দু-চার দিনে যে-কে সেই হয়ে যাব। হুকুম করেন কি করতে হবে।

বড় বউ বললেন—তোমাকে আজ কিছু করতে হবে না। তুমি মান্দের ছোঁড়াকে ব'লে যাও, কাটা কাঠের উপর যেন তালপাতা ঢেকে দেয়। মেঘ চমকাচ্ছে, আকাশে ছটাও বাজছে। জল হ'লে শুকনো কাঠ ভিজবে।

বড়গিন্নী খুব হুঁশিয়ার গিন্নী। বটে, আকাশ থেকে থেকে যেন চমকে উঠছে। সূর্য ঢাকা পড়ছে পশ্চিমে। বনওয়ারী দাঁড়িয়ে থেকে কাঠ ঢাকা দেওয়ালে। শেষে নিজেও এক-আধবার হাত লাগালে।

ফিরবার সময়ে আঁচলে মুড়ি নাড়ু নিয়ে ফিরল সে। আরও কয়েকটি জিনিস সংগ্রহ করেছে সে—খাটের এক টুকরো ছত্রির ভাঙা ডাণ্ডা, চমৎকার ট্রামনার বাঁট হবে। আর পেয়েছে একটা হাত-পা-ভাঙা কাচের পুতুল—মাটির

মধ্যে চাপা পড়ে ছিল সেটা। ঘরের তাকে দিব্যি সাজানো থাকবে। আরও পেয়েছে খানিকটা সুতো আর একফালি প্যাকিং পেপার। সুতোটায় কাজ হবে, কিন্তু কাগজটায় কি হবে তার কিছু ঠিক নাই। দুটি ঝকমকে ধাতুর বোতামও পেয়েছিল, সে দুটি বউঠাকরুণকে দিয়ে এসেছে; কে জানে সোনা কি না?

ফেরবার পথে কালারুদ্রতলায় কর্তার 'থানে' সে আবার প্রণাম করলে। বিপদে রক্ষা ক'রো প্রভু, মাঠে ফসল দিয়ো, আর যেন কুমতি না ঘটে, কাহারপাড়ার মঙ্গল ক'রো। কর্তার থানে প্রণাম করতে গিয়ে হঠাৎ তার একটা কথা মনে হ'ল। মনে পড়ল, আটপৌরেপাড়ার 'অমনে'র কথাগুলি। সে মানত করলে কর্তার কাছে—যদি আটপৌরেপাড়ায় কাজটি হয়, কাহারেরা যদি আটপৌরেদের সঙ্গে এক 'থাকে' অর্থাৎ স্তরে ওঠে, তা হ'লে সে বাবার বেল-'বিক্ষ'তলাটি বাঁধিয়ে দেবে, যেমন ঘোষেরা দিয়েছে ষষ্ঠিতলা বাঁধিয়ে। কালারুদ্রতলা এখন ফেটেছে, এককালে চৌধুরীরা ওই কালারুদ্রতলা বাঁধিয়েছিল।

প্রণাম সেরে উঠেই বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল। একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে তার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে চ'লে যাচ্ছে—মেয়েটি চলছে যেন হেলে দুলে।

বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল—কে মেয়েটি? মেয়েটির মধ্যে যেন কালোশশীর ঢঙ আছে। অবিকল কালোশশীর মতই দেখতে।

মেয়েটি গিয়ে দাঁড়াল সেই বটগাছতলায়। বনওয়ারী একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। তার বুকের ভিতরটায় যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছে। কালো বউ কি মোহিনী রূপ ধ'রে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে? সে মাদুলীটি ঠেকালে কপালে।

—কে? বনওয়ারী?

—কে?—বনওয়ারী চমকে ফিরে তাকালে। বুড়ো রমণ আটপৌরে আসছে জাঙল থেকে।

রমণ বললে—কথাটা ভেবে দেখো। আজই যাব এতে তোমার পাড়ায়।

—বেশ। এসো।—বনওয়ারী অন্যমনস্ক ভাবেই বললে—সে আবার তাকিয়ে দেখলে গাছতলার দিকে। না, কালো বউ মোহিনী সেজে আসে নাই। তা হ'লে রমণকে দেখে সে নিশ্চয় অদৃশ্য হয়ে যেত। তবে ও কে?

মেয়েটি এবার কথা কইলে। চেঁচিয়ে ডাকলে—এস কেনে গো মেসো। দাঁড়িয়ে থাকব কত?

ও! রমণকে 'মেসো' বলছে। তবে কালো বউয়ের বোনঝি। তাই তার মত দেখতে। সে নিশ্চিত হয়ে আবার প্রণাম করলে বাবাঠাকুরকে।

সবে প্রণামটি সেরে উঠেছে বনওয়ারী, অমনি কোথায় একটি গোল উঠল। দিকনির্ণয়ের জন্য অন্য কোন দিকে তাকালে না, তাকালে কাহারপাড়ার দিকে।

করালী—করালী—করালী। আর কে? একা করালীই কাহারপাড়ার হাজার গোলমাল তৈরি করছে। বনওয়ারী এসে দাঁড়াল করালীর উঠানে। চারিদিকে লোক জ'মে রয়েছে, মাঝখানে করালী অন্য একজনের হাত চেপে ধ'রে ছাতি ফুলিয়ে বুনো জানোয়ারের মত চীৎকার করছে, ফুলছে। লোকটা কে? চৌধুরীবাড়ির মাহিন্দার, আটপৌরেপাড়ার নবীন। ব্যাপার কি? হ'ল কি? কেউ বলে না। লোকের দুঃখে যেন বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছে। বসন্ত বিবর্ণমুখে দাঁড়িয়ে আছে। করালী চীৎকার করছে—মানি না আমি। কারু হুকুমে যাই না আমি। আইন আছে, আদালত আছে, পারে তো আমাকে উঠিয়ে দিতে বলিস। জোর করতে এলে আমারও জোর আছে।

সুচাঁদ তারস্বরে কাঁদছে।

কিন্তু হ'ল কি? চৌধুরী-বাড়ীর নীলের বাঁধ। কাহারেরা বাঁধের পাড়ের চাকরাণ প্রজা। বরাবর নিয়ম, ঘর ভেঙে ঘর করতে হ'লে চৌধুরীদের হুকুম নিতে হয়। মুখে বললেই হুকুম হয়ে যায়—এক টাকা নজর দিতে হয়।

নজর এক টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে করালী বসন্তকে দিয়ে। কিন্তু আজ চৌধুরী-বাড়ির লোক এসেছে করালীকে নিয়ে যাবার জন্য—এক টাকা নজর দিয়ে কোঠাঘর করার কথা নয়। আর কোঠাঘরের শর্তও নাই কাহারদের সঙ্গে। আগেকার বিক্রম থাকলে চৌধুরীদের পাইক এসে গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে যেত। একালে সর্বস্ব গিয়ে চৌধুরীরা বিষহীন সাপ, তাঁরা পাইকের বদলে আটপৌরেপাড়ার নবীন মাহিন্দারকে পাঠিয়েছেন করালীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য। নবীন করালীকে ঠিক ওজন করতে পারে নাই। চৌধুরী-বাড়ির ভাঙা দালানের নোনা-ধরা ইটের দাওয়া থেকে হুকুম নিয়ে আটপৌরে পূর্ব-পুরুষের ঘুণ-ধরা বাঁশের লাঠি হাতে এসে করালীর হাতখানা খপ ক'রে ধ'রে বলেছিল—এই চল্। হুকুম আছে ধ'রে নিয়ে যেতে।

—হুকুম? কার হুকুম?

—চৌধুরী মাশায়ের।

করালীর মেজাজ খারাপ হয়েই ছিল। লাইনের কাজ থেকে ফিরেই সে বনওয়ারীর দেওয়াল বন্ধ করার খবর শুনেছিল। এক কথাতেই মাথা গরম হয়ে গেল তার। আটপৌরে ছোঁড়ার লাঠিটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে, নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ওর হাত চেপে ধ'রে নিজের শক্তির পরিচয়ের ইঙ্গিত দিয়ে চীৎকার করেছে। অসম্বদ্ধ প্রলাপ নয়, রীতিমত আইনের কথা। শিখেছে ওই চন্নপুরের ইস্টিশানে! সেটেলমেণ্ট হয়ে গিয়েছে—পরচা আছে তার। তাতে লেখা আছে, বাস্তুভিটা তার। সেখানে সে যেমন ইচ্ছা ঘর করতে পারে; এমন কি, যে এক টাকা ভালমানুষের মত সে দিয়েছে তার দেওয়ারও কোন প্রয়োজন ছিল না, খাজনার দরুন একটি বেগার তাকে দিতে হবে—সেও সে ইচ্ছে করলে নিজে খেটে দিতে পারে, ইচ্ছে করলে একজন মজুরের মাইনে ঝনাৎ ক'রে ফেলে দিয়েই খালাস পেতে পারে।

চৌধুরীরা সেটেলমেণ্টের সময়—পাল্কী-বহনের দাবির বদলে মজুর বেগারই চেয়েছিলেন। বারান্দার ছাদ ধ্বসে প'ড়ে পাল্কী তাঁদের ভেঙে গিয়েছে। বেহারার চেয়ে বেগারই তাঁদের বেশি উপকারে লাগবে—এই হিসাবই তাঁরা

করেছিলেন। সে কথা যাক, পাড়ার লোকেরা হতবাক হয়ে গেল।—করালীর ঔদ্ধত্য দেখে নয়, তার এই আইনের ব্যাখ্যার অভিনবত্ব এবং দখলের জোর দেখে হতবাক স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বনওয়ারী এগিয়ে এসে নবীন এবং করালীর মাঝখানে প'ড়ে বললে—ছাড়্।

করালী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—এই যে! তাই বলি, মাতব্বর কই? তোমার সাথেও আছে যে একচোট! বলি, তুমিই বা আমার ঘর বন্ধ করেছ কেনে?

বনওয়ারীর মাথায় আগুন জ্ব'লে গেল। সে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। সে অকস্মাৎ একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল—বাজ ডেকে উঠল যেন!

তারপর যে কাণ্ড ঘটল, সে কাণ্ড উপকথায় খাপ খায়, একালের কথায় শোভন হয় না। কিন্তু তবু ঘটে হাঁসুলী বাঁকে।

করালীও সেটা কল্পনা করতে পারে না। প্রহ্লাদ রতন গুপী পানা প্রভৃতি প্রবীণেরা এল কোদাল নিয়ে। জন কয়েক চেপে ধরলে করালীকে। বাকি কয়জন চালাতে লাগল কোদাল। তার কোঠাঘরের বনিয়াদ তছনছ ক'রে দিলে। বনওয়ারী দাঁড়িয়ে রইল স্থিরভাবে। মধ্যে মধ্যে সে আঙুল দেখিয়ে হুকুম দিলে—ওইখানটা অইল, ফেল্ কেটে।

হেঁই-য়ো, হেঁই-য়ো; হুম-হুম; হাঃ-হাঁ—বিভিন্ন মুনিষে বিভিন্ন শব্দ ক'রে কোদালে কোপ মারছে। পানার উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশি। সে কাটছে—হেঁই-হেঁই। হঠাৎ কে চীৎকার ক'রে উঠল তীক্ষ্ণ গলায়—স'রে যাও, স'রে যাও। অবাক হয়ে গেল সকলে। টলতে টলতে আসছে একটা কঙ্কালসার মানুষ। তারও হাতে কোদাল। সে হেঁপো-রোগী নয়ান।

—স'রে যাও, স'রে যাও। আমি কাটব। তার পাঁজরার নীচে হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে—দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে, যেন জ্বলছে।

করালী আর চঞ্চল নয়, তার সর্বাঙ্গে ধুলো, সেও অদূরে দাঁড়িয়ে স্থির

হয়ে দেখছে। পাখীও স্থির হয়ে দেখছে, তার দৃষ্টি একটি লোকের উপর নিবদ্ধ—সে ওই হেঁপো-রোগী নয়ান। সে দৃষ্টি যেন বিষদৃষ্টি।

করালী হঠাৎ পাখীর হাত ধ'রে বললে—আয়, চ'লে আয় চন্ননপুর।

গটগট ক'রে সে চ'লে গেল। নয়ানের তাতেও আনন্দ।

তারপর বসল মজলিস।

বনওয়ারী বসল থমথমে মুখ নিয়ে। বনওয়ারীর এমন চেহারা অনেকদিন কেউ দেখে নাই। বনওয়ারী কথা বলতে লাগল আস্তে আস্তে। বনওয়ারীর এমন কণ্ঠস্বর অনেকদিন কেউ শোনে নাই। শুধু তাই নয়, গোটা পাড়াটার ভাবভঙ্গি যেন আর একরকম হয়ে গিয়েছে। এমন থমথমে অন্ধকারও যেন অনেকদিন নামে নাই। সেই সেকালের হাঁসুলী বাঁকের রাত্রি যেন ফিরে এল।

বনওয়ারী বললে—চন্ননপুরের লাইনে যে খাটতে যাবে, তার ঠাঁই কাহারপাড়ায় হবে না। পিতিপুরুষে যা করে নাই, তা করতে নাই। ছত্তিশ জাতের কাণ্ড। পয়সা বেশির দিকে তাকালে হবে না। সে পয়সা থাকবে না। স্বভাব মন্দ হবে। এত বড় হাঁসুলীর মাঠে যার পেট ভরবে না, তার পেট অভর। পিথিমীর কোথাও সে পেট ভরবে না। এই মাঠে বুক দিয়ে খাট—দু হাতে খাও। মনে কর—ভগমান এই কম্ম করতেই হাঁসুলীর বাঁকে জনম দিয়েছেন। ওই অ্যাল-লাইনের ধারে তো কেউ জন্মায় নাই। যে যাবে তার সব্বনাশ হবে। এ আমার কথা নয়। কত্তাঠাকুরের কথা। আজই সনজেতে এই করালীর ঘরে গোল উঠবার আগে—আমি পেনাম করছি, কথাটি আমার মনে হ'ল। কত্তা আমায় মনে পড়িয়ে দিলেন।

ঠিক এই সময় আটপৌরেপাড়ার রমণ এসে দাঁড়াল। সঙ্গে আটপৌরেরা।

—বনওয়ারী!

—কে?

—আমি অমন, সেই কথাটার তরে এলাম।

—এস এস, এস। ব'স, সব ব'স।

মজলিসে কথা পাড়লে।

এ এক অদ্ভুত রাত্রি! কাহারপাড়ার সায়েব মহাশয়দের আমলে দু ভাগ হয়েছিল তারা। পরমেরা লাঠি নিয়ে আটপৌরে হয়েছিল, বনওয়ারীরা পাল্কী কাঁধে নিয়ে কাহার হয়েছিল, অনেকদিন দু পাড়ারই সে আমল ঘুচে গিয়েছে; চাষই ক'রে আসছে দু দলে, কালে কস্মিনে এরা পাল্কী বয়, ওরা রায়বেশে নাচে। তবু এতদিন ওরা সেই ভিন্নই ছিল। আজ সেই ভেদ ঘুচেছে। পরমের জমিটা ব'লে ক'য়ে আটপৌরেদের ক'রে দেবে বনওয়ারী। আর যাবে থানায়, বলবে—হলফ ক'রে বলবে—আটপৌরেরা আর চুরিতে নাই, ডাকাতিতে নাই, পাপের ছায়া মাড়ায় না। তা ছাড়া পরম বিদেয় হয়েছে, পাপের জড় মরেছে। খালাস দেন হুজুর। তাতে হুজুরদের সম্মান আটপৌরেরা করবে। মুরগী, খাসি, দুধ—তা ছাড়া পান খেতে কিছু, তাও দেবে। অবিশ্যি একদিনে এ কাজ হয় না, এক বছর দু বছর লাগবে। লাগুক। বনওয়ারী নিজে জামিন থাকবে। তবে আটপৌরেপাড়াকে তার 'রূপদেশ' মেনে চলতে হবে।

বনওয়ারী বললে—আজী থাক তো দেখ।

রাজী না হয়ে আটপৌরেপাড়ার আর উপায় নাই। আটপৌরেদের অবস্থা যে মারাত্মক রকমে খারাপ হয়ে পড়েছে। সংখ্যায় তারা চিরদিনই কাহারদের চেয়ে কম। তার উপর লাঠি ধরার কাজ ক'রে কুলীন হওয়ার অহঙ্কারে আজও পর্যন্ত তারা গোঁফে তা দিয়ে আর মুখে হুঙ্কার দিয়ে কাল কাটিয়ে এসেছে। করলেও আটপৌরেরা কোন কালেই ভাল ক'রে চাষ করে না, চাষের কাজে তাদের মন নাই। চুরি-ডাকাতিতে তাদের নাম আগে হয়। আগে এ নাম ছিল গৌরবের, এখনও অবশ্য তারা খুব অগৌরবের মনে করে না; কিন্তু এখন ও নামটা আতঙ্কজনক হয়ে উঠেছে পুলিসের চাপে, পৃষ্ঠপোষকের অভাবে, মার খেয়ে সহ্য করার ক্ষমতা ক'মে যাওয়ায়। সে রামও নাই সে

অযোধ্যাও নাই। সেকালের ডাকাতদের রক্ষাকর্তা মাল-সামালদার বড় বড় বাড়ির মোটা মোটা কর্তারা যে আজ আর নাই; মাতব্বর পর্যন্ত নাই। নামে মাতব্বর পরম, সেও পালিয়েছে, কোনও সন্ধান নাই তার। সন্ধান পেলেও তার রক্ষা নাই, এবার পুলিস তাকে কালো বউকে খুন করার অপরাধে ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়ে দেবে। এ দিকে দিন দিন অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে উঠছে। বিলাতে যুদ্ধ লেগেছে। ধান-চালের দর বাড়ছে, নুন তেল কাপড়ের দরে আগুন লেগেছে; অনেক দ্রব্য বাজারেই নাই। আটপৌরেদের বাঁচতে হবে। এ কাজ বনওয়ারী পারে—এ ভরসা তাদের আছে। সে জামিন হ'লে আট-পৌরেরা জাঙলে সদ্গোপ মহাশয়দের বাড়িতে কৃষাণি পাবে। বনওয়ারী থানায় গেলে দারোগা তার কথা বিশ্বাস করুক আর না করুক, অন্তত কানে শুনবে। কানে দু-দশ বার যেতে যেতেই বিশ্বাস জন্মাবে। হরি বলতে বলতে চোর সাধু হয়, সাধুকে দশে চোর বললে সে চোরই হয় দেশের কাছে। তা ছাড়া একটা সন্থ প্রলোভনের সামগ্রী ওই সায়েবডাঙার জমি। পরম যে জমিটা নিয়েছিল সেই জমিটা। পরম ফেরার, কালো বউ মরেছে, ওয়ারিশ কেউ নাই। এখন ওই জমিটার দৃষ্টি পড়েছে আটপৌরেদের। মালিক চন্নপুরের বড়বাবু। তাঁর হুকুম চাই। আটপৌরেদের চাষী হিসেবে সুনাম নাই আর বড়বাবুর 'ছামুতে' গিয়ে দাঁড়াতে তাদের সাহসও নাই। সাহস ক'রে দাঁড়াতে পারত পরম, আর পারে বনওয়ারী। আজ সেই কারণে বনওয়ারীকে তাদের মাথায় নিতেই হবে।

আটপৌরেপাড়ার সকলেই বললে—আজী। হ্যাঁ, তা আজী।

রমণ জোর গলায় সায় দিলে—নিচ্চয় আজী।

নিমতেলে পানা-শয়তানের বুদ্ধি মন্দ, কিন্তু ভারি হিসেব তার। পানা বললে—আপনার গরজে ধান ভানে মরদে। বনওয়ারীকাকাকে মাতব্বর তো করলে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে চলবে তো? আর ঘোড়াগোত্ত ব'লে পেথক হয়ে থাকবে না তো? তা বল। লইলে বনওয়ারীকাকার মাতব্বরির লোভ থাকলেও আমরা হতে দোব না। হুঁ-হুঁ।

কথাটায় আটপৌরেরা চুপ ক'রে গেল। এদিকে কাহারদের সকলে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে উঠল—ঠিক বলেছে, পানা ঠিক বলেছে। কিসের দায় আমাদের ?

পানা বললে—ব্যানোকাকা নিজেই লিতে পারে পরমের জমি। আমাদিগে ক'রে দিতে পারে।

রমণ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—'পেটে ভাত নাই ধরমের উপোস'। জাত বেজাতের কম্ম ক'রে যাওয়ার চেয়ে কাহারদের সঙ্গে চলা ঢের ভাল। আটপৌরেরা কাহারেরা—এক হাতের দুটো আঙুল, এক বংশের দুই গোত্ত। তোমরাও যা, আমরাও তাই। খেতে-দেতে মানা নাই। করণ-কারণ বিয়ে-সাদীই হয় না। তা তোমরাও পাল্কী বহনটি ছাড়, আমরাও তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে যাই। কি বল সব ?

আটপৌরেরা সায় দিলে এবার।—ছাড়, পাল্কী বহন ছাড়।

বনওয়ারী ঘাড় নাড়লে—উঁহু। সে হয় না। বেবাহ আর জ্ঞানগঙ্গা এ দুটিতে ডাকলে যেতেই হবে। লক্ষ্মী আর লারায়ণের দুই হাত এক হয়, তাদের বহন করতেই হবে। জ্ঞানগঙ্গা যায় পুণ্যাত্মা—লক্ষ্মীমান। পুণ্যবলে সশরীরে স্বগ্‌গোযাত্তা। তাকে কাঁধে বহন করলে পরলোকে গতি হয়। ও দুটিতে ডাকলে যেতেই হবে। সে 'না' বলতে পারব না। তাতে, তোমরা আলাদা থাকতে চাও, থাক। খুশি তোমাদের।

রমণ একটু ভেবে বললে—তাই—তাই।

পানা বললে—হরি হরি বল ভাই! বল—জয় বাবা কত্তাঠাকুর!

সমস্বরে ধ্বনি দিয়ে উঠল কাহার এবং আটপৌরেদের দুই দলেই।

ধ্বনি থামলে পানা বললে—বেশ, তবে আজই মজলিসে একটা করণের কথা ক'য়ে ফেল। হয়ে যাক—সব কথার স্যাষ ত্যাশ।

—করণ ?—ঢোক গিলতে হ'ল আটপৌরেদের।

পানু বললে—হ্যাঁ, করণ। আমি বলছি। এগিয়ে এসে মজলিসের মাঝখানে সে চেপে বসল। পানু আজ ভারি খুশি—করালী দূর হয়েছে গ্রাম

থেকে। সে আবার বনওয়ারীর কাছ ঘেঁষে বসবার সুবিধে পেয়েছে। সে বললে—তোমার যে শালীর বিধবা কন্যেটি এসেছে অমনকাকা, তার সঙ্গে বনওয়ারীকাকার সাঙা হোক। কাকার ছেলেপিলে হ'ল না, পাড়ার মাতব্বর বংশ লোপ পাবে—তা হবে না। কি বল গো সব? পানা চতুর, সে ঠিক লক্ষ্য করেছে যে মেয়েটির মধ্যে কালোশশীর ঢঙ রয়েছে। বনওয়ারী আজ করালীকে তাড়িয়েছে, সে বনওয়ারীকে আজ খুশি করতে চায়।

রমণের স্ত্রীর বোনঝি—কালো বউয়েরও বোনঝি—বনওয়ারী তাকে আজই দেখেছে বিকেলবেলায়। কালো বউয়ের ঢঙ তার সর্বাঙ্গে। মেয়েটি যুবতী। কালোশশীর রঙ ছিল কালো—এ মেয়েটির রঙ মাজা। মেয়েটি বিধবা হয়েছিল একটি সন্তান নিয়ে। সন্তানটিও মারা গিয়েছে। মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। মায়ের ইচ্ছা ছিল, সাঙা দেবে। কিন্তু তার আগেই মা গেল ম'রে। মেয়েটি এসে রমণের ঘাড়ে পড়েছে।

রমণ ভাবছিল। জালের বন্ধনে তাকেই প্রথম পড়তে হবে—একথা সে ভাবে নাই। তবে ভরসার মধ্যে, সুবাসী—তার শালীর কন্যে, নিজের বোনও নয়, বেটীও নয়, ভাইঝিও না, বোনঝিও না, ওর দায়ে তার জাত যাবে না।

বনওয়ারী চুপ ক'রে ব'সে ছিল। সে ভাবছিল, কনেবউয়ের কথা। ভাবছিল, মেয়েটিতে তার কালোশশীর অভাব মিটবে। ভাবছিল, এমন ভাবে যেচে উঁচু কুলের মেয়ে যখন আসছে, তখন তাকে ঠেলা তার উচিত নয়। আর এমন ক্ষেত্রে আটপৌরে-ঘরের মেয়ে সর্বপ্রথম তারই ঘরে আসা উচিত। তা ছাড়া পানা এ কথাও খুব ঠিক বলেছে—তার মত মাতব্বরের বংশটা লোপ পেতে দেওয়া কখনও ঠিক নয়। বাবা সদয় তার উপর। আজ দুঃখের মধ্য দিয়ে সুখ দিলেন তিনি, গোটা আটপৌরেপাড়াকে এনে দিলেন তার অধীনে। যা আজ এতদিন ধ'রে হয় নাই, তাই হ'ল বনওয়ারীর ভাগ্যে। জয় কর্তাঠাকুর! জয় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা! সূক্ষ্ম বিচার তোমার। ওই করালী তোমার বাহনকে মেরেছিল, তাকে সে সাজা দেয় নাই, তাই তুমি বনওয়ারীকে সাজা দিয়েছিলে, কালোশশীকে কেড়ে নিয়েছিলে। আজ করালীকে সে সাজা

দিয়েছে, তুমি খুশি হয়েছ—বনওয়ারীকে পুরস্কার দিলে আটপৌরেপাড়ায় মাতব্বরি; ফিরে দিলে তার কালোশশীকে—তোমার আদ্যিকালের বেলগাছটাকে যেমন বোশেখ মাসে নতুন পাতায় সাজিয়ে নতুন ক'রে তোল, তেমনি মোহিনী যুবতী ক'রে কালোশশীকে ফিরে দিলে। কত্তাঠাকুরের কোপ 'দিষ্টিতে' কাঁচা জীবন পুড়ে ছাই হয়ে যায়, মুখের গ্রাস যায় উড়ে, ভরা নৌকো যায় ডুবে; আবার কত্তাঠাকুর তুষ্ট হয়ে মিষ্টি হাসি হেসে 'পেসন্ন দিষ্টিতে' চাইলে—মরলে 'জীয়োয়', হারালে পায়, নিরুদ্দেশ ঘরে ফেরে, একগুণ হয় দশগুণ। উপকথায় বনওয়ারী যা শুনেছিল, তাই আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল!

রমণ রাজী হ'ল। পানা তাকে বুঝিয়ে দিলে গোপনে ডেকে—করণও হবে, তোমারও কুলভাঙার পাপ অর্শাবে না। স্ত্রীর বোনের কন্যে আর পালতে-দেওয়া গাইয়ের বাছুর—ও দুই সমান। ভদ্রলোকে গাই-গরু কিনে কাহারদের পালন করতে দেয়, কাহারেরা গাইটিকে খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে, গাই বাচ্চা প্রসব করে, কাহারেরা দুধ পায় আর পায় ওই বাছুরটির অর্ধেক স্বত্ব। ভদ্রলোকে দু টাকা চার টাকা কাহারদের দিয়ে বাছুরটিকে কিনে নেয়। না নিলে পাইকার ডেকে বাছুরটিকে বেচে টাকাটা ভাগ ক'রে নেয় ভদ্রলোকের সঙ্গে। স্ত্রীর বোনের কন্যে ঘাড়ে এসে পড়েছে, বনওয়ারীর হাতে দিয়ে দাও, ঘাড় থেকে বোঝাও নামবে, আটপৌরে-কাহারদের মিলনে করণও হবে। পরমের জমিটা যখন বনওয়ারী বাবুর হুকুম নিয়ে আটপৌরেদের মধ্যে বেঁটে দেবে, তখন কি আর ভাগের বাছুরের আধাদামের পাওনার মত কিছু বেশি পাবে না তুমি? ছোকরা পানু কথাটা ব'লে একেবারে ইয়ার বন্ধুর মত রমণকে কাতুকুতু দিয়ে দিলে। রমণও হাসলে এবং সানন্দেই রাজী হয়ে গেল।

কথাটা স্থির হয়ে গেল।

রতন, গুপী সবাই খুব খুশি হ'ল ব'লেই মনে হ'ল। সবাই বললে—খুশি, আমরা খুব খুশি।

অল্পবয়সী মেয়েরা মুখ টিপে হাসতে লাগল। সুচাঁদের ইচ্ছা হচ্ছিল, ছুটে

এসে বলে—খুব ভাল হ'ল বাবা, খুব ভাল হ'ল। কিন্তু আজই বনওয়ারী করালী এবং পাখীর ঘর ভেঙে দিয়েছে, তাদের কাহারপাড়া থেকে দূর ক'রে দিয়েছে। কোন্ মুখে যাবে সে? কেমন ক'রে সে বলবে ভাল কথা?

পাগল এই সময়টিতে মজলিসে এসে হাজির হ'ল। কোথায় গিয়েছিল সে আজ সারাদিন, সেই জানে। এসে ব'সে বললে—কি বেপার?

পানা মদ ঢেলে পাগলকে দিয়ে বললে—খাও। জমিয়ে ব'স, শোন।

শুনতে শুনতে পাগল গুনগুন ক'রে গান ভাজতে লাগল। সুচাঁদ বলে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পাগল বাঁধে হাঁসুলী বাঁকের ছড়া পাঁচালী।

হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী—যাই বলিহারি,
বাঁধিল নতুন ঘর দখিনদুয়ারী।
সুবাসী বাতাসে ঘর উঠিল ভরি, মরি রে মরি!

বনওয়ারী হেসে ধমক দিয়ে বললে—থাম্ বলছি।

পাগল ঘাড় নেড়ে গানের নতুন কলি গাইবার উদ্যোগ করছিল, এমন সময় বুক চাপড়ে কেঁদে ছুটে এল নয়ানের মা।

ওগো, আমার নয়ান কি করছে—দেখে যাও গো! ও গো! ও গো! ও গো!

সে কি? এই যে সন্ধ্যার মুখে কঙ্কালসার দেহে হাতীর বলের মাতন নিয়ে করালীর ঘর ভেঙে এল নয়ান।

অন্ধকার দাওয়ায় প'ড়ে ছিল নয়ান। সর্বাঙ্গে ঘাম। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। পাগল হাত দেখতে বসল। সে নাড়ী দেখতে জানে। বনওয়ারী চেহারা দেখে বুঝতে পারে অনেকটা। সে চেঁচিয়ে বললে—আলো কই? আলো?

আলো নাই। কেরোসিন তেল পাওয়া যায় না। যুদ্ধের বাজার। পানা তার বাড়ি থেকে নিয়ে এল নিজের ডিবেটা। সেটা সে নিভিয়েই রাখে।

একটু তেল এখনও আছে তার মধ্যে। বনওয়ারী দেখলে। হরি—হরি—হরি!

নয়ান সেজেছে। ওই কোদাল চালিয়ে এসে শুয়েছিল, তারপর ক্রমশ এই অবস্থা। নয়ান কিন্তু এর মধ্যেও হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছে—শালোর ঘর ভেঙে মরছি, এতেও আমার সুখ। সেই সুখ নিয়ে সে চলবার পথে সেজেছে।

কাহারপাড়া নয়ানকে ঘিরে ব'সে রইল। এই নিয়ম। বনওয়ারী দূরে দাঁড়িয়ে ব্যবস্থা করলে কাঠের বাঁশের। নয়ানের মা কাঁদলে, নয়ানের আপনার জনেরা কাঁদলে। সকলের শেষে এল সুচাঁদ এবং বসন্ত। তারাও কাঁদতে বসল। অল্পবয়সী মেয়েরা নীরবে চোখের জল মার্জনা করছে; করালীর বাড়ি থেকে এল কেবল নসুবালা। করালী পাখী নাই, তারা চন্নপুরে। নসুবালাও কাঁদলে। তার আক্ষেপের কথাগুলির মধ্যে অকৃত্রিম আক্ষেপ—কত কথা সে বলছে! নয়ানের বাল্য কৈশোর যৌবনের কথা; তারই সমবয়সী ছিল, একসঙ্গে খেলেছে, একসঙ্গে বড় হয়েছে, তারই স্মৃতির কথা; তার মধ্যে নয়ানের দোষের কথা একটিও নাই, সব গুণের কথা।

হঠাৎ আলোটা নিবে গেল। তেল নাই আর। অন্ধকারের মধ্যেই সকলে ব'সে রইল। নয়ানের বুকে হাত দিয়ে তার মা ব'সে কাঁদছে। তাতেই বুঝতে পারবে। বুক থামলেই জানাবে চীৎকার ক'রে। আলো হয় তো পাওয়া যায়, কিন্তু আর সে কথা মনে হচ্ছে না তাদের। আলোর প্রাচুর্য কাহারদের চিরদিনই কম। অন্ধকারে জন্মায়, অন্ধকারে থাকে, অন্ধকারেই মরণ হয়। পাগল ছড়া কেটে বলে—কি হবে আলো?

অন্ধকারের ভাবনা কেনে হায় রে!
অন্ধকারেই পরাণপাখী সেই ছাশেতে যায় রে!
চোখ মুদিলেই হায় রোশনাই, এই আছে এই নাই রে

বনওয়ারী সংকারের লোক ঠিক করেছিল। লোকের আজ অভাব নাই। আজ আটপৌরেরাও যাবে।

হাঁসুলীর বাঁকে এমন রাত্রে কেউ একা নয়। আটপৌরেপাড়াতেও এমন ক্ষেত্রে কাহারপাড়ার সকলে যায়। কাহারপাড়ায় আসে আটপৌরেরা। আজ আবার তার উপর নতুন বাঁধন পড়েছে দুই পাড়ায়। আজ আটপৌরেরা শ্মশানেও যাবে। বনওয়ারীর মাতব্বরির আমলে দুই পাড়ায় চলনের ক্ষণে নয়ান প্রথম যাত্রী। সেই প্রথম যাবে দুই পাড়ার কাঁধে চেপে। আজ পুরনো মাতব্বরবংশ নির্বংশ হ'ল।

কত মাতব্বর কাহারদের নির্বংশ হয়েছে কে জানে তা, কে তার হিসেব রাখে? কাহারপাড়ার উপকথার কি আদি আছে, না অন্ত আছে? পিথিমী 'ছিষ্টি' হ'ল, কাহার ছিষ্টি করলেন বিধেতা, কাহারদের মাতব্বরও ছিষ্টি হয়েছে সেই সঙ্গে। বাবা কালারুদ্দের গাজনের পাটা ঘুরছে বনবন শব্দে, সেই পাটায় ঘুরে দিন রাত্রি মাস বছর এক এক ক'রে চ'লে যাচ্ছে। বছর যাচ্ছে, যুগ যাচ্ছে। তার সঙ্গে কত যাচ্ছে—মাতব্বর যাচ্ছে, মাতব্বরের ঘর যাচ্ছে, ঘরভাঙাদেরও ঘর গেল নয়ানের সঙ্গে। বাবার পাটা ঘুরছে, সেই পাটায় বছর ঘুরছে। সেই ঘুরনের পাকে এবার প্রথম গেল নয়ান। আর কে যাবে, কে জানে? নতুন বছরে কালোশশীও মরেছে, কিন্তু সে আটপৌরেপাড়ার। তখনও দুই পাড়ায় এক হয় নাই।

কথাগুলি শ্মশানযাত্রীদের মধ্যেই আলোচনা হচ্ছিল। বনওয়ারীও চলেছে সঙ্গে। হাজার হোক পুরনো মাতব্বরের বংশ। তার খাতির করতে হবে বইকি! আর নয়ান বলতে গেলে নিঃস্ব। তার সব খরচও দেবে বনওয়ারী। নিয়ম। পাগল ধ'রে নিয়ে গেল নয়ানের মাকে। নয়ানের মায়ের সব অভিসম্পাত আজ নীরব হয়ে গিয়েছে। নিভে গিয়েছে তার সব তেজের আগুন।

বনওয়ারী অন্ধকারের মধ্যে ভারী পা ফেলে চলছে আর ভাবছে—বছরটি ভালয় ভালয় গেলে হয়! বাবাঠাকুরের রোষ যে ভয়ানক! ভাবতেও শিউরে

ওঠে বনওয়ারী। আঃ, কবে বাজবে আবার গাজনের ঢাক, কালারুদ্দের চড়ক চক্রপাক খেয়ে এক পলক থামবে। বলবে—চন্দ্র থাম, সূর্য থাম, এক লহমার জন্যে আমার সঙ্গে থাম। বছর শেষ হোক। কতজনে সে দিন কাঁদবে হারানো পরাণধনের জন্যে, কে জানে! বাবাঠাকুরের কাছে অপরাধ হয়েছে—এ বছরটা গোটা বনওয়ারীর ভাবতে ভাবতেই যাবে। সৌভাগ্য সত্ত্বেও ভাবনা তার যাচ্ছে না।

পঞ্চম পর্ব

এক

ড্যাড্যাং—ড্যাড্যাং—ড্যার‍্যাড্যাং—ড্যাড্যাং—

আবার বাজল গাজনের ঢাক। চড়কের পাটায় শুয়ে আকাশপানে চেয়ে বনওয়ারী কালারুদ্দকে প্রণাম করলে। যাক। বছর শেষ, বছর শেষ, পরম-দয়াল ক্ষ্যাপা বাবার দৌলতে ভালয় ভালয় কেটে গিয়েছে কাহারদের বছর। বনওয়ারী যা আশঙ্কা করেছিল, তা ঘটে নাই। কাহারপাড়ায় যুবা বা প্রবীণ মাতব্বরেরা সকলেই বেঁচে রয়েছে। 'মিত্যু' অর্থাৎ মৃত্যু আর হয় নাই। হয়েছে, যেমন হয় যেমন নিয়ম, তেমনি হয়েছে, তার বেশি কিছু নয়। অঘটন ঘটেছে একটি, তাও আটপৌরেপাড়ায়—ওই কালো বউ মরেছে। আর নয়ানও মরেছে হঠাৎ। তা ছাড়া, দু-চারটে ছেলে মরেছে ম্যালিরিয়ার জ্বরে, বুড়ো বুড়ী মরেছে চারজন—গুপীর মাসী, রতনের মা, প্রাণকেষ্টর কাকা গোবর্ধন—সে লোকটাই ছিল হাবা, আর মরেছে গোপালের পিসে। গোপালের পিসে বাইরের গেরামের লোক, এসে গোপালের ঘাড়ে ভর করেছিল, তাকে ঠিক ধরা যায় না হিসেবের মধ্যে। 'কচিকাঁচা' অর্থাৎ আঁতুড়ের ছেলের মরার হিসেব কেউ কখনও কোন কালে করে না, শুধু চৌকিদারে জন্মমৃত্যুর খাতায় লিখে নিয়ে যায়, থানায় দাখিল করে, থানায় তার হিসেব থাকে। সে হিসেবও বাজে হিসেব—কাহারপাড়ায় চৌকিদার কালে-কস্মিনে আসে, তাও দিনের বেলা, ওই হিসেবের জন্তেই আসে। ছেলে মরার হিসেব কেউ মনেও রাখে না, বলতেও ভুল করে। চৌকিদারও সেই ভুল হিসেব মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে জাঙলে গিয়ে সদ্‌গোপ মহাশয়দের কোন ছেলেকে ধ'রে লিখিয়ে থানায় ইউনিয়ন-বোর্ডে দাখিল করে।

এবার গাজনে পাগল হাজির আছে। সে ভাল সঙ দিয়েছে। নিজে সেজেছে মহাদেব, দু পাশে দুটো ছেলেকে সাজিয়েছে দুর্গা আর গঙ্গা। বনওয়ারীকে ঠাট্টা করেছে। তা কর ভাই পাগল, তা কর। বনওয়ারীরও বেশ ভালই লাগছে।

বনওয়ারী সেদিনের সেই মজলিসের কথামত কালোশশীর বোনঝিকে সাঙা করেছে। তার ঘরে এখন দুই বউ। বড়কী আর ছোটকী—গোপালীবালা আর সুবাসী। বছর ফিরে গেল, বিয়ের বছর পুরতেও দেরি নাই, তবুও মনে হচ্ছে, এই তো সে দিনের কথা। পাগল মিতের গান যেন কানে বাজছে। মনে হচ্ছে, এই তো শেষ করলে গান! আঃ পাগল মিতে উদার মানুষ, গুণী লোক, যেমন গলা তেমন গান! হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বলে সুচাঁদ পিসী। হাঁসুলী বাঁকের কথা নিয়ে পাঁচালী তৈরি করে পাগল মিতে। বিয়েতে সাদিতে গান বাঁধে, ভাঁজোতে গান বাঁধে, ঘেঁটুতে গান বাঁধে, গাজনে গান গেয়ে সঙ সেজে নাচে। এবারে দুর্গা আর গঙ্গায় কোন্দল, অর্থাৎ সুবাসী আর গোপালীবালার ঝগড়া, মাঝখানে বুড়োশিব অর্থাৎ বনওয়ারী—খায় এর হাতে ঠোনা, ওর হাতে ঝাঁটা।

*　　*　　*

হাঁসুলী বাঁকের পাঁচালীকার পাগল কাহার মজার মানুষ। মনখানি তার নীলের বাঁধের জলের মত। আকাশের রঙেই তার রঙ। আকাশে সূয্যি উঠলে কালো জল ঝকমক করে, তার সঙ্গে বাতাস উঠলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে গলানো রূপোর মত 'টলমলিয়ে' ওঠে, রাত্রে চাঁদ থাকলে নীলের বাঁধের ছায়া-মাখানো কালো জলে চাঁদ ওঠে, চাঁদের সঙ্গে তারাও ফুটে ওঠে, আকাশে মেঘ নামলে নীলের বাঁধের জল হয় 'গহিন' কালো, মনে হয়—আকাশ কাঁদছে, তারই দুঃখে নীলের বাঁধের জলও কাঁদছে। তা হবে না কেন? আকাশ থেকেই ঝ'রে পড়ছে নীলের বাঁধের জল—ও তো ওরই এক কষ্টে। পাগল কাহারই বলে কথাটা। নইলে এমন সাজিয়ে গুছিয়ে কে বলতে পারে 'অমৃতির' মত বাক্যি! বনওয়ারী হেসে বলে—পাগল মিতের মনটিও নীলের বাঁধের জলের মত।

কাহারপাড়া তার কাছে আকাশ। কাহারপাড়া হাসলে সে হাসে, কাঁদলে সে কাঁদে। হাসিও না, কান্নাও না—এমন অবস্থায় কাহারপাড়া ঝিমিয়ে থাকলে, অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাসের কুয়াশায় ঢাকা নীলের জলের মত, পাগলের মনের চেহারাও বুঝতে পারা যায় না; সে উদাস হয়ে থাকে।

নয়ানের 'মরণশয্যের' পাশে ব'সে পাগল ছড়া কেটেছিল—

ভাই রে! অন্ধকারের ভাবনা কেনে হায় রে!
অন্ধকারেই পরাণ-পাখী সেই দ্যাশেতে যায় রে!

তার মাস খানেক পরে বনওয়ারীর সাঙা হ'ল আটপৌরে-কন্যে সুবাসীর সঙ্গে। পাগল তখন রসের গানে ছড়ায়-পাঁচালীতে মাতিয়ে তুললে কাহারপাড়া। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত এক নসুবালা; কিন্তু নসুবালা বললে—শরীর খারাপ। শরীর খারাপ নয়, আসল কথা সবাই বুঝেছে। যে বনওয়ারী তার করালী-দাদা পাখী-বউকে গাঁ ছাড়া করেছে, তার বিয়েতে নাচতে গাইতে মন তার উঠবে না। নসু বলে—কাহারকুলে জন্মেছি, কাহারপাড়ায় বাস করি, বনওয়ারী কাহারপাড়ার মাতব্বর, দণ্ডমুণ্ডের মালিক, তার হুকুম যেন মানতে হবে বাইরে; কিন্তু মন তো কারুর দাসী বাঁদী নয়, সে কাহারও নয়, আটপৌরেও নয়, সেই হ'ল শুধু মানুষ—সে রাজারও প্রজা নয়, মহাজনেরও খাতক নয়, সে মানবে কেনে বুন? তা না-নাচুক নসুবালা, পাগল একাই একশো। সে যত্ন ক'রে মদ তৈরি করলে। সে মদের 'তার' কি! তার 'ঘোর' অর্থাৎ নেশা কত! নাম-করা মদ-খাইয়েরা টলতে লাগল। পাগল কিন্তু ঠিক রইল। সেই করলে রান্না। ঘুরলে ফিরলে 'ঢুক-ঢাক' মদ ঢেলে খেলে, হাঁড়ি নামালে, কড়ায় হাতা দিলে, উনোনে কাঠ দিলে আর সারাক্ষণ গাইলে গান—

হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী, যাই বলিহারি—
বাঁধিল নতুন ঘর দখিন-দুয়ারী।
সে ঘর বাঁধিতে এল (যত সব) অষ্টপ্রহরী।

অষ্টপহরী পাড়ার সুবাসী-লতা
কাহারপাড়ায় আজ হ’ল পোঁতা।
বুড়া মালী বনওয়ারী (যতনে) সাজায় কেয়ারী।

প্রহ্লাদ রতন গুপী এরা খুব বাহবা দিলে। এ বিয়েতে বুড়োদেরই হয়েছিল বেশি মাতন।

পাগল গেয়েই চলেছিল—

সুবাসী-লতার ফুল পরিবে কানে
সুবাস জাগিবে রস বুড়ানো প্রাণে
ও পথে যাস না তোরা বারণ করি—
(বুড়া আসিবে তেড়ে,
খেঁটে হাতে বুড়া আসবে তেড়ে)

এই সময় বনওয়ারী তার পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল—শোন পাগল।

—কি? মুখ এমন কেনে?

—বলব ব’লেই ডাকছি। পেল্লাদ অতন গুপীকে ডাক।

বনওয়ারীর প্রথম স্ত্রী গোপালীবালা কেঁদেছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। বনওয়ারী তাই এসেছিল—কি করি এখন বল দি-নি?

গোপালীবালা কাঁদছে? চমকে উঠেছিল পাগল। এ কথাটা তো সে ভাবে নাই! কাহারপাড়ায় এ কথা কেউ কোন কালে ভাবে না। কাহারপাড়ায় স্বামী যদি স্ত্রী থাকতে বিয়ে করে, তবে স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে শাঁখা আর নোয়া খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীকে গাল দিতে দিতে চ’লে যায়—অন্য কোন কাহার-মরদের ঘরে গিয়ে ওঠে। সতীনের সঙ্গে ঘর কাহার-মেয়েরা করে না। স্বামী যদি তেমন পয়সাওয়ালা হয়, তেমন ‘বেক্কমশালী’ অর্থাৎ বিক্রমশালী মোড়ল মাতব্বর হয়, সে যদি কোন মেয়েলোককে ঘরে আনে, বিয়ে-না ক’রে এমনি রাখে তাতে বরং কাহার-মেয়েরা আপত্তি করে না; কিন্তু বিয়ে করলে

সহ্য করে না। কাহারপাড়ার মেয়েরা ফেলনা নয়, স্বামীকে তাদের ভাত দিতে হয় না, নিজেরাই তারা খেটে খায়, রূপযৌবন ছাড়া 'গতরের' অর্থাৎ পরিশ্রমের ক্ষমতার একটা কদর আছে; সেই দরে কানা খোঁড়া বুড়ো কতজনের ঘরে ষোল আনা গিন্নীর 'পিঁড়ি' তাদের আদর ক'রে ডাকে, তারাও গিয়ে সে পিঁড়ে দখল করে বসে। ঘরের পাটকাম করে, অক্ষম পুরুষকে রাঁধা ভাত দেয়, খেটে খুটে রোজকার নয়! গোপালীবালা যদি চ'লে যায়, তবে সে হবে তার অপমান। তা ছাড়া গোপালীবালা লোকটি বড় ভাল। গোপালীবালার মধ্যে কোপাইয়ের ঢেউ নাই, মনে সে দোলা লাগাতে পারে না, সে হ'ল নীলের বাঁধের জল—না আছে সাড়া, না আছে ধারা, চুপচাপ ঠাণ্ডা 'শেতল'; বুক ডুবিয়ে ব'সে থাকলে নড়বে না, জড়িয়ে ঘিরে নিথর হয়ে থাকবে তোমার চারিপাশ। নীলের বাঁধের মতই বনওয়ারী ওকে ভালবাসে; কিন্তু কোপাইয়ের মতন মাতন নাই ব'লে ওর উপর নেশা কোন কালে জমে নাই। সেইজন্যই বিবেচনা ক'রেও বনওয়ারী নিজের মনকে মানতে পারে নাই। কোপাইয়ের মত ছিল কালো বউ, সুবাসী ঠিক কালো বউয়ের মতই। সে যেন কোপাইয়ের বুকে নূতন বছরের বান হয়ে ফিরে এসেছে। তা ছাড়া সুবাসী হ'ল আটপৌরে-ঘরের মেয়ে। আটপৌরেরা কাহারদের সঙ্গে চলতে রাজী হয়েছে বনওয়ারীর মাতব্বরির গুণে, সেই চলনের প্রথম কারণ আটপৌরের কন্যে ঘরে আনবার 'গৈরব' সে আর কাউকে দিতে পারবে না। তাই সে গোপালীবালার কথা ভেবেও সাঙা করতে সম্মত হয়েছে। গোপালীবালাকে একদিন সে বুঝিয়ে বলেছিল, প্রহ্লাদ রতন এরাও বলেছিল, তখন গোপালীবালা নিজেই বলেছিল—তা কর, সাঙা কর, আমি যাব না। তবে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না। তোমরা বেটা-ছেলে হোক আমি মানুষ করব। তোমরা দুজনায় 'রামোদ-বাল্লাদ' করবা। আমি দেখব, হাসব। বিয়ের দিন কিন্তু গোপালীবালা কাঁদতে লেগেছে।

পাগল বনওয়ারীর মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বনওয়ারী বলেছিল—কি করি বল এখন?

অনেকক্ষণ ভেবে পাগল উত্তর দিয়েছিল—গোপালী যদি আজী থাকে, তবে আমি ওকে মাথায় ক'রে আখব। বুল্লি—বলগা তাকে।

বনওয়ারীর মুখটা থমথমে হয়ে উঠেছিল।

পাগল বুঝে বলেছিল—আগ করিস না। লতুন করণ আটপৌরেদের সাথে, সেটাও হবে—তোরও ছেলেপুলে ঘর সংসার হবে, সাধ মিটবে, গোপালী-বউকেও সতীন নিয়ে ঘর করতে হবে না।

গোপালী-বউ কিন্তু আশ্চর্য। সে তাতেও বলেছিল—না।

প্রাণকেষ্ট উপকার করেছিল, সে, বনওয়ারীকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে হদিস বাতলে দিয়েছিল—এক কাজ কর কাকা। দশটা টাকা কাকীর হাতে দাও। বল—ঘর কর, সংসার কর, পাড়ায় ধার দাও, মহাজনী কর। তুমিই ঘরের আসল গিন্নি; যেমন ছিলে তেমনি রইলে, আটপৌরের মেয়ে ঘরে আসছে, ছেলেপুলে হবে, খাটবে খুটবে খাবে। বুঝলে?

বনওয়ারীর কথাটা মনে ধরেছিল। পানার বুদ্ধির সে তারিফ না ক'রে পারে নাই। টাকা তার আছে, কিন্তু কথাটা তার মনে হয় নাই। টাকাতে মন ভোলে বইকি! কতজন কাহার-মরদ পরিবারের দাবি ছাড়তে দাঙ্গা করে, হাঙ্গামা করে, শেষে টাকাতে রফা হয়। টাকাতে আরও কত হয়, সে বনওয়ারীর অজানা নয়। ছেলের হাতে 'অঙচঙে' খেলনা, মিষ্টি নাড়ু দিলে তার কান্না থামে; বড় মানুষের হাতে টাকা দাও আঁজলা ভ'রে, বড় মানুষ ভুলে যাবে সব দুঃখ।

পানা বলেছিল—টাকাতে বলে পুত্তুশোক ভোলে, তা এ তো—। ব'লে সে একটা পিচ কেটেছিল।

বনওয়ারী দশটার বদলে এক কুড়ি টাকা নিয়ে গোপালীবালার দুই হাতের আঁজলা টেনে তার উপর ভ'রে ঢেলে দিয়েছিল।

গোপালীবালা চমকে উঠে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিল। সে দৃষ্টি

বনওয়ারী গাজনের পাটায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েও যেন দেখতে পাচ্ছে।

বনওয়ারী হেসে বলেছিল—সব তোমাকে দিলাম। গয়না,গড়িয়ো তুমি। না হয় যা খুশি ক'রো।

গোপালীবালার মন ভুলেছিল। আঁজলা-ভরা ঝকঝকে টাকা! স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সে হেসে বলেছিল—আর দুটি সোনার কানফুল গড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু।

বনওয়ারী বলেছিল—দোব, নিচ্চয় দোব। সোনা একটুকু সস্তা হোক, যুদ্ধুতে দর চড়েছে বিষম, একটুকুন নামুক দর, দোব।

পানা বলেছিল—একটি ঢোক মাল খাও খুড়ী এইবার। নাচতে হবে তোমাকে।

সত্যিই পানা গোপালীবালাকে মদ খাইয়েছিল। পানার উপর এর পর বনওয়ারী খুশি না হয়ে পারে নাই।

—চল, এইবার আটপৌরেপাড়ায় যাবার আয়োজন কর।

কাহারদের আজ আটপৌরেপাড়ায় যাওয়া যেমন-তেমন যাওয়া নয়, এমন যাওয়া কখনো যায় নাই আজ পযন্ত। প্রহ্লাদ রতন গুপী পানু—সকল কাহার মাথায় বেঁধেছিল ক্ষারে-কাচা গামছা,গায়ে দিয়েছিল বহুকালের সযত্ন-রক্ষিত ফতুয়া, হাতে নিয়েছিল লাঠি; গোঁফে চাড়া দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে সকলে গিয়েছিল। ঢোল বেজেছিল, সানাই বেজেছিল, কাঁসি বেজেছিল। বনওয়ারী গায়ে দিয়েছিল একখানা নতুন চাদর। যুদ্ধের বাজারে অগ্নিমূল্য দিতে হয়েছিল। সেই চাদরখানি গায়ে দিয়ে সে খুঁজেছিল পাগলকে।

—পাগল! পাগল!

সকলকে সামলে নিয়ে যেতে হবে। শুভকর্মে ব্যাঘাত না ঘটে। কাহারেরা মদ খেয়েছে, আটপৌরে পাড়ায় মেয়ে আনতে চলেছে—সেই গরম নেশার সঙ্গে এক হয়ে মাথার মধ্যে পাক খেয়ে ঘুরছে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় যা কখনও ঘটে নাই, আজ রাত্রে তাই ঘটবে। তার মধ্যে অঘটন

ঘটিয়ে না বসে কাহারেরা! পাগল হুঁশিয়ার মানুষ। তাকে ভার দিতে হবে।

পাগল! পাগল!

পাগলকে পাওয়া যায় নাই। গোটা গাঁয়ের মধ্যে না।

পানা হাসতে হাসতে বলেছিল—আঁ, কত সাধ ক'রে কথাটা বললে! শেষে লাজে হয়তো পালাল্ছে।

ঠিক এই সময়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠেছিল।

কে যেন বলেছিল—মেঘ চিকুরছে, চল চল।

ওঃ সে কি মেঘ! বর্ষার মেঘ। বিয়ের রাত্রে নেমেছিল বর্ষা, কাড়ান।

কাড়ানের মেঘ; ঘন কালো। বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গুরু গুরু ডাকে হাঁসুলী বাঁকের বাঁকে বাঁকে, বাঁশবাঁদির বাঁশের বনে যেন ডঙ্কা বাজিয়ে দেয়। ঝির ঝির ক'রে মৃদুমন্দ বাতাস বয়। নীলের বাঁধের স্থির জলে কাঁপন লাগে। বাঁশবনের কোন পাতা-ঢাকা গর্ত থেকে মোটা গভীর গলায় 'গ্যাঙোর গ্যাঙ, গ্যাঙোর গ্যাঙ, গ্যাও—গ্যাও' শব্দ ক'রে ওঠে হেঁড়েব্যাঙ মহাশয়। ছোটখাটো হাঁড়ির মত চেহারা—এমনি বড় আকারের ব্যাঙ, তাই ওদের নাম হেঁড়েব্যাঙ। গাছের ডাল থেকে অপেক্ষাকৃত মিহি গলায় সাড়া দেয় গেছোব্যাঙ—অ্যা—ও! আ—ও! পুকুর ডোবার কোণ থেকে সোনাব্যাঙগুলো কলরব জুড়ে দেয়। কর্‌র্—কর্‌র্—কর্‌র্—শব্দে হাঁসুলী বাঁকে যেন হাজার ব্যাঙ-টুনটুনির বাজনা বেজে ওঠে। মাথার উপরে কিচির-কিচ-কিচির শব্দ ওঠে। ফটিকজল পাখীগুলো রাত্রেও ডাকতে শুরু করে মেঘরাজার হাঁক শুনে। তেমনি মেঘ উঠেছিল সেদিন।

বরযাত্রী কাহারেরাও হাঁক দিয়ে উঠেছিল সে মেঘের ডাক শুনে। এ কি ডাক! অ্যাঁ! জয় জয় বাবাঠাকুর। আষাঢ়ের প্রথম—অম্বুবাচীর দু দিন বাকি, এরই মধ্যে মেঘের হাঁকে বর্ষার থমথমে আওয়াজ বেজে উঠল যে! হাঁসুলী বাঁকের চষা-খোঁড়া মাটি 'শির-শির করছে' অর্থাৎ শিউরে উঠছে বোধ হয়।

রতন গুপী আহ্লাদে লাফ দিয়ে ঢুলীকে বলেছিল—বাজা রে ভাই, বাজা, গুরগুরিয়ে বাজা।—গুর-গুর-গুর-গুর তাক-তাক-তাক-তাক—

পানু বলেছিল—বনওয়ারীকাকার নতুন বউয়ের পয়।

—নিচ্চয়। মঙ্গল হবে, মঙ্গল হবে, আটপৌরেদের সাথে কাহারদের চলনে দু পাড়ারই মঙ্গল হবে। 'আষিড়ে কাড়ান' পায় কে? অর্থাৎ আষাঢ় মাসে চাষের উপযুক্ত পর্যাপ্ত বর্ষণ পায় কে?

বনওয়ারী প্রথমটা ভয় পেয়েছিল; আকাশের দিকে চেয়ে বলেছিল—হে বাবা! তোমার বাহন যেন সেদিনের মত কোড়ল পাকিয়ে লকলকিয়ে জিভ মেলে ফুঁসিয়ে না ওঠে! বনওয়ারীর মন আশ্বস্ত হয়েও হচ্ছিল না। জষ্ঠি মাসের শেষে তো বর্ষা দেখা দেয় না, আষাঢ় মাসেই বর্ষা দুর্লভ। তবে? এই অকালে ঠিক তার বিয়ের লগ্নের মাথার উপরে অকাল বর্ষা হাঁক মেরে উঠল কেন? বাবার বাহন সেদিন কালবৈশাখীর মেঘের মধ্যে ফুঁসিয়ে উঠেছিল। সেই বিচিত্র বরণ ফুটে উঠেছিল সাদা-কালো মেঘে মেঘে। আজও আবার—?

বনওয়ারী! ব্যানো! ব্যানো!

বনওয়ারী সম্বিত ফিরে পেয়েছিল রতনের ডাকে। আর আশ্বাস পেয়েছিল মেঘ দেখে চিনে, বাবার বাহনকে সে মেঘের মধ্যে দেখতে পায় নি। একটানা ঘনশ্যাম মেঘ উঠছে আকাশ ভ'রে। ইনি বর্ষার মেঘ। বনওয়ারী বলেছিল—চল।

* * *

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় ওই রাত্রি থেকেই বেজে উঠেছিল চাষের বাজনা; এবারের বর্ষা—ভাগ্যের বর্ষা গিয়েছে। আষাঢ়ের বর্ষা। "আষাঢ়ে কাড়ান পায় কে? শাওনে কাড়ান ধানকে। ভাদুরে কাড়ান শীষকে। আশ্বিনে কাড়ান কিসকে?" আষাঢ় মাসে চাষের উপযুক্ত ভাসান জল কোন্ ভাগ্যবান পায়? কালে কস্মিনে কখনও-সখনও হয়। এবার পেয়েছে কাহারেরা।

গুরু গুরু শব্দে গম্ভীর গলায় মেঘের সে ধ্বনি কি! কোপাইয়ের জল

হয় ঘোলা ; তার কূলে কূলে মেঘের ডাক যেন ডঙ্কার মত শোনায়। বাঁশবনের নতুন বাঁশগুলির 'খুঙি' অর্থাৎ আবরণ খ'সে পড়েছে, ফিকে সবুজ রঙের পাতা দেখা দেয়, পুরানো বাঁশের পাতার সবুজে কালচে আমেজ ধরে। শিমুল শিরীষ-বট-অশথ-পাতাগুলিতেও কালো রঙের ঘোর ধরে, পাতাগুলি পুরু হয়। বাঁশবনের তলায় ভিজে পাতা চাপ বেঁধে সপ সপ করছে, পা দিলে 'বুড়বুড়ি' কেটে লালচে রঙের জল ওঠে। কত নতুন নতুন চারা গজায়। কোপাইয়ের কূলে শরবন, কাশবন, বেনাবনে লম্বা কচি পাতা গজিয়ে উঠে ঝাড়বন্দী হয়ে বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে নাচতে থাকে। সবচেয়ে বাহার হয় কোপাইয়ের ঘাটের উপরের ছাতিম গাছটির। চোখ-জুড়ানো সবুজ বরণ টোপরটির মত চেহারা হয়। গাছের মধ্যে ও হয় নটবর। ঘাসে ঘাসে ভ'রে যায় চারিদিক। কাহার-পাড়ার উঠানগুলির চারি পাশে, ঘরগুলির 'পোঁতায়' অর্থাৎ ভিত পর্যন্ত কেউ যেন সবুজ রঙের পাড় বুনে দেয়। মাঠ জলে থৈ-থৈ করে, আলে আলে ঘাস। কাহারেরা তারই মধ্যে কাজ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে—কেউ চালায় হাল, মাটির উপর হালের মুঠো ধ'রে চলে পিঠ বেঁকিয়ে ঘাড় নামিয়ে অসুরের মত। কেউ জমির কাদায় জলে হাঁটু গেড়ে বীজচারা তোলে, কাদানো জমিতে ঘাস আগাছা তুলে দুমড়ে মাটির মধ্যে পুঁতে দেয়। রাত্রি এক প্রহর থাকতে মাঠে ছোটে, বাড়ি ফেরে রাত্রি এক প্রহর পার হলে তবে।

'আষাঢ়ে কাড়ান পায় কে?' এবার পাওয়া গিয়েছিল, কাহারেরা তার চরম সদ্ব্যবহার করেছে। চাষ এবার তাদের ভাল গিয়েছে। ক্ষেতভরা ধান হয়েছিল, মুনিবেরা পেয়েছেন প্রচুর, তারাও যে যেমন সে তেমন পেয়েছে। পিথিমীতে যুদ্ধ লেগেছে—আক্রা-গণ্ডার সীমা-পরিসীমা নাই। কাহারদের সম্বল এক ধান। ধানের দর ছিল আঠারো আনা—এখন বেড়ে হয়েছে পাঁচ টাকা। আষাঢ়ে কাড়ানে ফসল বেশি ফলেছে, এবার বেঁচেছে কাহারেরা।

বনওয়ারী এবার অনেক ধান পেয়েছে। ভাগের চাষে বেশি ফেলেছে, তাতে আর কত বেশি পেয়েছে! এবার সায়েবডাঙার জমির ধান যে তার ঘরে উঠেছে। পাঁচ বিঘে ডাঙার কাটানো হয়েছে দু বিঘে, তার থেকে ধান পেয়েছে

চার বিশ দু আড়ি অর্থাৎ সাড়ে দশ মণ, কাউকে ভাগ দিতে হয় নাই, খাজনা লাগে নাই। এই সাড়ে দশ মণ তার কাছে হাজার মণের সমান। আজ বিক্রি করলেই পঞ্চাশ টাকার করকরে নতুন 'লোট' গুনে দেন মহাজনেরা। দেশে টাকা নাই, সব 'লোট' সব 'লোট'; নইলে কিছুখানি বিক্রি করত বনওয়ারী, কিন্তু লোট তো মাটিতে পুঁতে রাখা যায় না! আরও একটা কথা আছে, ছুটকী অর্থাৎ নতুন বউ সুবাসীর মতিগতি না বুঝে টাকাকড়ি পুঁতে রাখা ঠিক নয়।

বাবু মহাশয়দের সায়েবডাঙার জমিতেও প্রচুর ধান হয়েছে। ওঁরা জমি কাটিয়ে জমিতে পুকুরের পাঁক দিয়েছিলেন, সার দিয়েছিলেন, বনওয়ারী তো তা পারে নাই। তবে সে এবং গোপালীবালা পথে ঘাটে যেখানে যত গোবর দেখেছে, কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে জমির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। গোপালী আর এক কাজ করেছে, সে কথা বনওয়ারী ছাড়া কেউ জানে না; মাঠে লোকজন না থাকলে, সে বাবুদের জমিতে নেমে পাঁকের ঢেলা তুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে বনওয়ারীর জমিতে। গোপালীবালা তার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। সুবাসীর রূপ যৌবন বনওয়ারীকে নেশায় আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে বটে, কিন্তু সে এই নেশার মধ্যেও বুঝতে পারে, এ নেশায় সংসারের কল্যাণ নাই। মেয়েটা অবিকল কালোশশী—তেমনি বিলাসিনী, তেমনি ঢঙ, তেমনি হাসি, তেমনি ঢ'লে-পড়া। মধ্যে মধ্যে বনওয়ারীর মন খাপ্পা হয়ে ওঠে।

আবার নবান্নর সময় একটা কাণ্ড ঘটেছিল। সেই কাণ্ডেই বুঝতে পেরেছে, এ মেয়ের হাতে লক্ষ্মী নাই। নবান্নে এবার হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদিতে খুব ধুম গিয়েছে। নবান্নে তাদের ধুম চিরকালের। সদ্‌জাতের অনেক ধুমধাম, এক পূজোর পর আর এক পূজো, তাতে কাহারেরা আনন্দ করে, পূজাস্থানে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তাদের নিজের ঘরে সে ধুমের দেবতার চরণের ছাপ পড়ে না। ওদের ধুম গাজন, ধরম পূজো, আমুতি অর্থাৎ অম্বুবাচী, মা-বিষহরির পূজো, ভাদ্র মাসে ভাঁজো পরব, অগ্রহায়ণে নবান্ন, পৌষে লক্ষ্মী। মোটমাট সাতটা পরব। এ ছাড়া ষষ্ঠী আছে, মঙ্গলচণ্ডী আছে,—সে শুধু মেয়েদের

‘বেরতো’, তাও তাদের করতে হয় ওই সদ্‌জাতদের মা-লক্ষ্মীদের বেরতোস্থানের ‘পাটাগনে’ অর্থাৎ পাট-অঙ্গনের এক প্রান্তে ব’সে। নবান্নই ওদের বড় পরব। নতুন ধান কেটে লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার পূজা করে, কালারুদ্দু বাবা-ঠাকুরের ভোগ দিয়ে নতুন অন্নের পাঁচ ‘দব্য পস্তত’ করে আনন্দ ক’রে খাওয়ায়। আর কালারুদ্দুর কাছে বলা—বাবা!—

‘ল’ লাড়লাম—‘ল’ চাড়লাম
‘ল’ পুরনোয় ঘর বাঁধলাম
লতুনে বাখার বাঁধি পুরানো খাই—
এই খেতে যেন জনম যায়—
লতুন বস্ত পুরোনো অন্ন—
তোমার কৃপাতে জীবন ধন্য।

‘ল’ অর্থাৎ ‘ন’, ‘ন’-কে ওরা ‘ল’ হিসেবে উচ্চারণ করে, ‘ন’ অর্থাৎ নতুন। খাওয়াদাওয়ার খুব ধুম। সবার বাড়িতে সবার নিমন্ত্রণ। খেয়েদেয়ে বিকেলবেলা হয় ড্যাং-গুলি অর্থাৎ ডাণ্ডা-গুলির পাল্লা। জোয়ান ছেলেরা সায়েবডাঙায় গিয়ে দেড় হাত লম্বা ডাং এবং বিঘৎ প্রমাণ মোটা গুলি নিয়ে খেলতে আরম্ভ করে, সন্ধ্যে পর্যন্ত খেলে খাদ্য হজম ক’রে বাড়ি ফেরে। এক এক ডাণ্ডা মেরে গুলিকে পাঠিয়ে দেয় হুই—লম্বাপার, দেখিয়ে দেয় সাত ভুবন। বারি দুরি তেরি চাল চম্পা ঢেক লঙ্কা—মাপতে মাপতে সাত মাপে গজা দিয়ে, পিটিয়ে দেয় ‘গজা’ অর্থাৎ এক দানের হার। আবার যারা খাটুনি দেয়, তারাও কম যায় না, ওই বোঁ-বোঁ শব্দে ছুটন্ত গুলি দুই হাতে খপ ক’রে লুফে নিয়ে মুখে ঠেকিয়ে বলে—খেয়ে নিয়েছি অর্থাৎ গেল খেলনদারের হাত। সে এক মাতন। বুড়োরাও মধ্যে মধ্যে লোভ সামলাতে পারে না, তারাও দু-এক দান খেলে নেয়। ছেলেরা বার হয় তীর ধনুক নিয়ে—বাঁখারির ধনুক, নতুন শরকাঠির তীর তৈরি ক’রে তারা হৈ-হৈ ক’রে বেড়ায় মাঠময়, তাড়িয়ে বেড়ায় ধান খেতে নামে যে সব পাখীর ঝাঁক—কাক, শালিক, চড়াই, টিয়া তাদের।

সন্ধ্যেবেলা মদের পর্ব। ঢোলক বাদ্যি, গান, নাচ। এবার বনওয়ারী

গোটা আটপৌরেপাড়াকে নিমন্ত্রণ করেছিল। নতুন মিলন হয়েছে ওদের সঙ্গে, কুটুম্বিতাও হয়েছে। বনওয়ারীরও এবার বাড়-বাড়ন্তর বছর, এ তার কর্তব্য। দিনের বেলা চুকে গেল সব, সন্ধ্যেয় মদের আসর বসল—জমলও খুব, পাগল বাহারের গান ধরলে—

ও লবানের লতুন ধানের পিঠে—
আজ কাজ কি মাছের ঝোলে!

অমনি নৃত্য আরম্ভ হয়ে গেল। পাগলের গান চলল—

লতুন কাপড় খসখসিয়ে বউরা এসেছে—
আঙা লতুন ছাওয়াল ল'য়ে কোলে!

সঙ্গে সঙ্গে সকলে হৈ-হৈ ক'রে উঠল। হিসেব কর, কার কার ছাওয়াল হবে? লতুন ছাওয়াল কোলে কে কে লবান্ন করলে। বনওয়ারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। বাবাঠাকুর কবে তাকে বংশ দেবেন তিনিই জানেন। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নজরে পড়ল, সুবাসী যেন নাই মনে হচ্ছে। ভাল ক'রে দেখতে দেখলে, হাঁ বটে। সে নাই। কোথায় গেল? অজুহাত তুলে বাড়ি এসে সেখানেও পেলে না তাকে। কোথায় গেল? বেরিয়ে পড়ল মাঠে। চারিদিক খুঁজতে লাগল। করালীকে মনে পড়ে গেল হঠাৎ। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, যেন সে বাতাসে সিগারেটের ক্ষীণ গন্ধ পাচ্ছে। সে পাগল হয়ে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ মনে হ'ল, কে যাচ্ছে দূরে দূরে—আটপৌরেপাড়ার কোলটাতে। সে চীৎকার ক'রে উঠল—কে? ছুটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কেউ মানুষ নয়, একটা মরা শ্যাওড়াগাছের বাকল-উঠে-যাওয়া গুঁড়ি, একটা ঝোপের সামনে খাড়া হয়ে রয়েছে, সেটাকে ঠিক মনে হচ্ছে মানুষ। সেখান থেকে ফিরবার পথে হঠাৎ সে আতঙ্কে অভিভূত হয়ে দাঁড়াল। কালোশশীর ভাঙা ঘরের উঠানে এসে পড়েছে সে, এবং ভাঙা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কার সাদা মূর্তি! বাক্যহারা হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল তার মনে নাই। চেতনা হ'ল তার সাদা মূর্তিটির কথা শুনে। অতি মৃদু খোনা স্বরে বললে—পালাও তুমি পালাও—আঁমার—লোঁভ লাঁগছে তোঁমার ওঁপর—

মুহূর্তে বনওয়ারীর ভয় ভেঙে গেল। চেতনা ফিরে এল। লাফ দিয়ে সে ধরলে তাকে। সে সুবাসী।

—হারামজাদী—

আশ্চর্য সুবাসী, সে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। উন্মত্ত ক্রোধে বনওয়ারী তার গলা টিপে ধরে বলল—বল্, কি করছিলি এখানে? বল্, আর কে ছিল?

সুবাসী বহু কষ্টেই বললে—সন্দেশ—

—সন্দেশ?

—সন্দেশ খেছিলাম লুকিয়ে। এই দেখ। সে কাপড়ের ভিতর থেকে বার করলে রসগোল্লার বাটি।

গলা ছেড়ে দিলে বনওয়ারী।—সন্দেশ খেছিলি লুকিয়ে?

—হঁ্যা। নতমুখে সে বললে—দিদি—মোটে দুটি দিয়েছিল, তাই—

এবার হেসে ফেললে বনওয়ারী।—তাই লুকিয়ে এখানে খেতে আইছিলি? তা ঘরে খেলেই তো পারতিস?

—কেউ যদি দেখে ফেলত!

—তাই ব'লে এই ভাঙা ঘরে—সাপ, না, খোপ—

—ভালই হ'ত, মরতাম। তুমি আজলক্ষ্মী গোপালী বুড়িকে নিয়ে ঘর করতা।

হাসলে বনওয়ারী। বললে—চল্, কত সন্দেশ তু খেতে পারিস দেখব? এখুনি সন্দেশ আনাব।

—না।—এবার কাঁদতে লাগল সুবাসী।

—কাঁদিস না, চল্।

অনেক কষ্টেই সুবাসীর মান ভাঙিয়েছিল সে। কিন্তু এমন যে মেয়ে—যে লোভের বশে, দেবতার কথা না ভেবে, স্বামীকে বঞ্চিত করে, চুরি ক'রে ভূতুড়ে ঘরে ব'সে পেটপূরণ করে, সে তো ভাল মেয়ে নয়। ওই মিষ্টি পরের দিন দেবতাকে দেওয়ার কথা ছিল। বনওয়ারী মুখে তোলে নাই তখনও পর্যন্ত।

দ্বিতীয় বছর চড়কের পাটায় শুয়ে বনওয়ারী এই সব কথাই ভাবছিল। গত বছরের কথা। কাহিনী হয়ে গেল। বাজনা থামল, পাটা নামছে, উপরে শিমুলবৃক্ষের ডগার ডালটি দুলছে; বাবাঠাকুরের দহের ধারে পাটা নামছে। বাবা জলশয়ানে যাবেন বছরের মত। এক বছর গেল, নতুন বছর শুরু হ'ল।

পাটা নামতেই বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল।

এক লালমুখ সায়েব আর তার পাশে করালী। দু জন সিগারেট খাচ্ছে। জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়েরা মায় মাইতো ঘোষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে। করালীর ভ্রূক্ষেপও নাই। সায়েবটা কটমট ক'রে কি বলছে। মাইতো ঘোষ ইংরিজীতে জবাব দিচ্ছেন। বনওয়ারীর ইচ্ছে হ'ল, লাফিয়ে উঠে ছোঁড়ার বুকে প্রচণ্ড এক কিল মারে। ভেঙে দেয় ওর বুকের পাটা, চুরমার ক'রে দেয়। কিন্তু সে শুয়ে আছে চড়কপাটায়, এবং ওই সায়েবটা রয়েছে করালীর পাশে।

অবাক! করালী বলছে—হ্যালো ম্যান! ব'লেই ঘাড়টা উল্টে দিল। এ ইশারার মানে—চল। তাই বটে। সায়েবটা চলে গেল করালীর সঙ্গে।

* * *

করালী পাপ, করালী সাক্ষাৎ 'দানো' অর্থাৎ দানব। কাহারকুলের অনেক পাপে হাঁসুলী বাঁকে ওর আবির্ভাব হয়েছে। বনওয়ারীর বয়স প্রায় তিন কুড়ি হ'ল, সুচাঁদ পিসীর চার কুড়ি হবে, চোখে তো দুজনের একজনও দেখে নাই, এমন 'দানোর' আবির্ভাব।

সুচাঁদ পিসী জানে হাঁসুলী বাঁকের যে উপকথা, সে উপকথার মধ্যেও নাই। বজ্জাত দুষ্টু চিরকালের আছে, থাকবেও চিরকাল, হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়, কিন্তু এ যে সাক্ষাৎ দানো। আদ্যিকালের কথায় দত্যি-দানোর কথা শোনা যায়, পৃথিবীতে তারা জন্ম নিত মনুষ্য হয়ে, পাড়া-গেরাম-দেশ লণ্ডভণ্ড ক'রে দিত, নিজে পাপ করত, পরকে দিত পাপমতি, মানুষ পরিত্রাহি ডাক ছাড়ত মনে মনে। মা ধরণীর বুক উঠত টাটিয়ে, তিনিও কাঁদতেন। তখন দেবতা আসতেন, এসে বধ করতেন মনুষ্যবেশী দানোকে।

মনুষ্যের সাধ্য নাই দানোকে বধ করতে। বনওয়ারী অত্যন্ত সাবধান হয়েছে। মনে মনে বেশ বুঝেছে; একটি ব্যাপারেই চোখ খুলে গিয়েছে।

করালীর সেই কোঠাঘর করা নিয়েই ব্যাপার। গোটা কাহারপাড়ার বারণ মানলে না, মাতব্বরের শাসন নিলে না। বসনের মত শাশুড়ী, তার কথা রাখলে না। সুচাঁদের মত আদ্যিকালের প্রবীণ মানুষের হিতবাক্য কানে তুললে না। সেই কোঠাঘর বানালে সে! গোটা কাহারপাড়ার ক্ষমতা তাকে আটক করতেও পারলে না।

আজ কাহারপাড়ার মাথার দিকে তাকিয়ে দেখ, করালীর কোঠাঘর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কোঠাখানা কাহারপাড়ায় জোর ক'রে পোঁতা করালীর জিদের ধ্বজার মত উঠে রয়েছে—সন্ধ্যাবেলা এসে ওরা আলো জ্বেলে ঢোল বাজিয়ে 'জানান' দিয়ে যায়। জিদের ধ্বজাই নয় শুধু, অধর্মের—কলিকালের ধ্বজা। হতভাগা জানে না, উঁচু মাথায় বিপদ কত! তালগাছে বজ্রাঘাত হয়, লাঠি পড়লে উঁচু মাথাতেই পড়ে, ঝড়ে উঁচু ঘর ওড়ে, উঁচু ঘরে আগুন লাগলে সে আর নিবানো যায় না। চোর-ডাকাতের নজর উঁচু ঘরের মাথা দেখে ফেরে, হিংসুটে লোক উঁচু ঘর দেখেই বিষমন্তর আওড়ায়। ভূত বল, প্রেত বল—আকাশে আকাশে যাঁরা ফেরেন, তাঁদের পথে যে ঘরের মাথা উঁচু সেই ঘরের মাথাতেই তাঁরা বসে পড়েন, বাধা পড়লে সে ঘরে মন্দ দৃষ্টি দিয়ে যান। পিতিপুরুষে যা করে নাই, তাই করলে অশুভক্ষণে, তার ফল ওকে পেতেই হবে।

চড়কপাটায় শুয়ে বনওয়ারী স্মরণ করলে ওই ঘর করার বৃত্তান্ত।

যে দিন করালীর ঘরের তৈরি বনিয়াদ কাহারপাড়ার সবাই জুটে হৈ-হৈ ক'রে কেটে সমান ক'রে দিলে মাটির সঙ্গে, সেই দিনই সন্ধ্যেবেলায় করালী চ'লে গেল পাখীকে নিয়ে চন্নপুর। রাত্রে নয়ান মারা গেল, ভোরে শ্মশান থেকে বনওয়ারীরা ফিরতেই গোপালী বললে—বেপদ হইছে। করালী পুলিস নিয়ে আইছিল। জমাদার ব'লে যেয়েছে—তোমাকে থানাতে যেতে।

—থানায় যেতে। বুকটা গুর-গুর ক'রে উঠল বনওয়ারীর।

অনেক ভেবে সে সাহস সঞ্চয় করলে। চুরিও করে নাই সে, ডাকাতিও না, খুনও না, কিসের ভয় তবে? সরকারের একটা আইন আছে, পাড়াঘরে জাতধর্মের একটা নিয়ম আছে। সে মাতব্বর হয়ে অনিয়ম করতে দেবে কি ক'রে—থানাওলারা আইন দিয়ে তাই হিসাব করুক, বিচার হোক। সে সঙ্গে নিলে প্রহ্লাদ এবং রতনকে, আরও নিলে চৌধুরী মহাশয়ের পাইক নবীনকে। জমিটা চৌধুরী মহাশয়ের, ঘর ক'রে আছে ব'লে জায়গা করালীর বাপের নয়, সুতরাং তাদের বিনা হুকুমে করালী ঘর করে কি ক'রে? আর নবীনকে করালী গাল দিয়েছে, মেরেছে। এ বুদ্ধিটা দিলেন ঘোষেরা। মাইতো ঘোষ ব'লে দিলেন—বলবি, চৌধুরী মশায়ের হুকুমে কেটে দিয়েছি বনেদ।

কিন্তু দারোগাবাবু বললেন—উঁহু! ও সব কথা চলবে না। বুঝলে! ঘর ওর ছিল ওখানে, সেই ঘর ভেঙে নতুন করছে, জমি চৌধুরীদের হোক আর যারই হোক, তারা খাজনার মালিক, খাজনা পাবে; ঘর করতে বাধা দিতে কেউ পারবে না। আর পাড়া-নিয়মের কথাও চলবে না। কোঠাই করুক আর গম্বুজই করুক, ওকে করতে দিতে হবে।

বনওয়ারী হাত জোড় ক'রে শেষ চেষ্টা ক'রে বলেছিল—আজ্ঞে, খ্যানত হয়, কিছু হয়—

করালীই ওপাশ থেকে জবাব দিয়েছিল—হয়, আমার হবে।

দারোগা হেসেছিলেন। বনওয়ারীরা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে করালীর দিকে তাকিয়েছিল, কথা বলতে পারে নাই। অবশেষে তাই স্বীকার ক'রে ফিরে এসেছিল। দারোগাবাবুকে একটা খাসিও দিতে হয়েছে। অন্যথায় করালীকে ক্ষতিপূরণ দেবার হুকুম দিতেন দারোগাবাবু। করালী উঠে গেলে জমাদার বনওয়ারীকে ডেকে বলেছিলেন—ক্ষতিপূরণের কি করবি?

ক্ষতিপূরণ! লজ্জায় ক্ষোভে বনওয়ারীর চোখে জল এসেছিল। করালীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হ'লে তার মাথাটা যে কাটা যাবে! তার চেয়ে তার 'মিত্যু' ভাল।

শেষ জমাদারবাবুই মান রক্ষে করেছিলেন, বলেছিলেন—যাক, সে অপমান

তোর হতে দোব না। আমি তো তোকে জানি। দারোগাবাবু না-হয় নতুন লোক। ব'লে দোব ওঁকে আমি। তা নতুন বাবুকে একটা খাসি দিস। উনিও খাবেন, আমরাও খাব।

সেই দিনই বিকেলবেলা করালী এসে করেছিল ওই ঘরের পত্তন। সেই মরা গাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে বসে সিগারেট ধরিয়ে হুকুম দিয়েছিল—লাগাও।

সঙ্গে সঙ্গে হো-হো ক'রে হাসলে।

লোকজন সব এনেছিল চন্নপুর থেকে। তারা কাজ আরম্ভ ক'রে দিলে। কাহারপাড়ার লোক দূরে দাঁড়িয়ে নির্বাক হয়ে দেখলে। সুচাঁদ যে সুচাঁদ, সেও নির্বাক হয়ে রইল। তার বাবাকে স্মরণ ক'রে আনন্দেও কাঁদতে পারলে না, ভবিষ্যতের অমঙ্গল কল্পনা ক'রে আশঙ্কাতেও কাঁদতে পারলে না দারোগার ভয়ে।

শুধু মাথলা নটবর এরা এসেছিল। ওরা দু-তিনজন প্রকাশ্যেই করালীর দলে গিয়ে যোগ দিয়েছে। খাসির কথা ওরাই বললে করালীকে। খুব কৌতুকের সঙ্গেই বললে। বললে—আচ্ছা দাঁড় হইছে! খুব হাসলে।

করালী কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে—দিলে কেনে?

—না দিলে?

—না দিলে কি?

—তোকে ক্ষতিপূরণ দিতে হ'ত। তাতে যে রপমান হ'ত!

—আমি তো ক্ষতিপূরণ চাই নাই!

—তু না চাইলে কি হবে? আইন—

করালী মুখ ভেঙিয়ে ব'লে উঠল—আইন! ভাগ শালো বেকুব কোথাকার! ঠকিয়ে নিয়েছে। মাতব্বরকে ঠকিয়ে নিয়েছে। বলিস—রাজী থাকে তো আমি নিয়ে যাব স্বদেশীবাবুদের কাছে। খাসি পেট থেকে বার করব দারোগার।

কথাটা বনওয়ারী শুনেছিল। কিন্তু সে করালীকেও বলে নাই, কারও

কাছেই যায় নাই। ছি! শুধু তাই নয়, করালীর ঘরের দিকেই আর সে তাকায় না। ওদিক দিয়ে সাধ্যমত খাটে না, ওদিকে যেতে হ'লে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়। ঘর যখন পাড়া ছাড়িয়ে মাথা তুলে উঠেছে, তখন অবশ্য না দেখে উপায় নাই, তবু সাধ্যমতে তাকায় না। কিন্তু করালী আশ্চর্য —ঘর তৈরী ক'রে ঘরখানার ভিতর মেরামত আর করলে না। করবে কেন? ঘর করাটা তো তার জেদ। কাহারপাড়ায় কোঠাঘর তোলা হ'ল। চিরকালের নিয়ম-আচারে লাথি মারা হ'ল, হয়ে গেল কাজ। সে বাস করছে চন্নপুরের সেই পাকা খুপরি কোয়ার্টারে। যুদ্ধের কাজ, তাকে থাকতেই হবে। আরও একটা কারণ আছে। সেটা বনওয়ারী বুঝতে পারে। তারও বয়স অনেক হ'ল। করালী এখানে বাস করতে ভয় করে। করালীর ঘরে এখন বাস করছে নসু। সে থাকে, সাঁজ পিদীম জল মাড়ুলী দেয়, সকালবেলায় চ'লে যায় চন্নপুর, ফেরে সন্ধ্যায়। বিকেলে যেদিন ফেরে, সেদিন করালী-পাখীও আসে। সন্ধ্যের আগেই আবার চ'লে যায়।

ড্যারাড্যাং—ড্যাং—ড্যারাড্যাং—ড্যাং।

ড্যাং-ড্যাং—ড্যাডাং

কালারুদ্দের শিলারূপ জলশয়ানে গেলেন। গত বছরের কথাগুলি স্মরণ করা বন্ধ ক'রে বনওয়ারী চড়কচক্রের পাটা থেকে নামল। ভয়ের বছর শেষ হ'ল। নির্ভয়ে কেটে গেল। জয় বাবা কালারুদ্র! আটচল্লিশ সাল শেষ হলেন, উনশঞ্চাশ সাল এলেন। সুচাঁদ বলে—ক'কুড়ি ক'বছর তাই বল্! তারপর ঘস ঘস ক'রে মাথা চুলকে বাঁ হাতের আঙুলে টিপে উকুন বার করবার চেষ্টা করতে করতে আবার বলে—বিধেতার তো চুলও পাকে না, দাঁতও ভাঙে না। তার কি? বছর পার করলেই খালাস। সেই আদ্বিকাল থেকে—। ব'লে সে পিছনের দিকে ডান হাতের তর্জনীটি বাড়িয়ে দেয়, চোখে ফুটে ওঠে এক বিচিত্র বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি; কয়েক মুহূর্ত সে চুপ ক'রে থাকে, গোটা

কাহারপাড়াও তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে থাকে। সুচাঁদ আবার বলে—কত বছর হ'ল কে জানে! মাথার চুলের সংখ্যে হয়—তার আর সংখ্যে নাই। ব'লে সে ঘাড় নাড়তে থাকে।

দুই

উনপঞ্চাশ সাল এলেন বাতাস নিয়ে। পয়লা বোশেখ শুভদিনে একটা কালবৈশাখী হয়ে গেল। দোসরাও একটা ঝাপটা দিলে। তেসরা চৌঠা বাদ দিয়ে পাঁচুই আবার ঝড় এল বেশ সেজেগুজে হাঁকডাক ক'রে। দুদিন চারদিন অন্তর একটা ক'রে ঝাপটা প্রায় নিত্যই চলছে। উনপঞ্চাশ সালে পাগলও ফিরেছে।

সায়েবডাঙার জমির বাকিটা এবার আবার কাটতে আরম্ভ করলে বনওয়ারী। সন্ধ্যের পর চাঁদ যতক্ষণ ততক্ষণ কোদাল চলতে লাগল কাহারদের, এবার কাহারদের সঙ্গে আটপৌরেরাও যোগ দিয়েছে। পরমের জমি আট ঘর আটপৌরে ভাগ ক'রে নিয়েছে, কেবল রমণ নেয় নি, সে বুড়োমানুষ, সন্তান নাই; সেই এখন আটপৌরেদের মাতব্বর হয়েছে; বনওয়ারীর নীচে অবশ্য। রমণ এখন একরকম ব'সেই খাচ্ছে। জোগাচ্ছে বনওয়ারী। সুবাসীর মেসো, বনওয়ারীরও মেসো। রমণ বনওয়ারীর গরু-বাছুর চাষবাস দেখে—এটা ওটা যা হয় করে। বনওয়ারী, কাহারদের জন্যও জমির চেষ্টা করছে, চন্ননপুরের বাবু মহাশয়ের কাছেও গিয়েছিল। বাবু আশা দিয়েছেন।

সায়েবডাঙার জমি কাটতে কাটতেই ওই সত্যটা আবিষ্কার করলে বনওয়ারীরা। উনপঞ্চাশ সাল বাতাস নিয়ে 'আইছেন লাগছে' অর্থাৎ এসেছে মনে হচ্ছে।

পাগল জমির ধারে ব'সে ব'সে তামাক খায়, আর সকলকে খাওয়ায়। ও কোদাল ধরে না। মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে পড়ে বাউল-ফকিরের মত বেশ ক'রে।

দু'দিন পাঁচদিন ঘুরে ঝোলার পেটটি মোটা ক'রে ফেরে, ব'সে পাঁচ সাত দিন খায়; বলে—এতেই চ'লে যাবে দিন কটা। ও কোদাল ধরবে কেন? বনওয়ারীও বলে না কোদাল ধরতে। পাগল গুণী মানুষ। গবেষণাটা শুনে পাগল বললে—তা আসবে না কেনে হে! উনপঞ্চাশ যে পবনের বছর। বুয়েচ! তারপর বললে—এবার হনুমানেরও উপদ্রব হবে, দেখো। উনিই তো পবন-নন্দন। পাগলের কথাটা সত্য। পবনের নন্দন ব'লে নয়, ঝড় হ'লে গাছের ডালে বসে ভিজে হনুমানগুলির যত শীত ধরে, তত বেশি লাফালাফি ক'রে ফেরে। ঝড় জল থামলেই উন্মত্তের মত লাফ দিয়ে বেড়াতে শুরু ক'রে দেয়।

উনপঞ্চাশের পবনে আর পবননন্দনদের 'বিক্যমে' অর্থাৎ বিক্রমে কাহার-পাড়ার এবার আর দুর্দশার সীমা রইল না। চালের খড় তছনছ হয়ে গেল। ঝড়ের সময় শেষ হ'লে তালপাতা কেটে চালে চাপাতে হবে না। খড় আর নাই। থাকবার মধ্যে আছে বনওয়ারীর। কাহারপাড়ার সকলেই করে কৃষাণি। কৃষাণদের ভাগে খড় প্রাপ্য নয়, তিন ভাগের এক ভাগ ধান পাওনাই সেই আদ্যিকালের নির্দিষ্ট নিয়ম। খড় দু-চার গণ্ডা মনিবের কাছে চেয়ে নেয়। আর মাঠ থেকে সরানো ধানগুলি থেকে কিছু খড় হয়। খড় এবার কেনাও দুঃসাধ্য। খড়ের দরে আগুন লেগেছে। কাহন বিশ টাকা চড়িয়ে গিয়েছে। যুদ্ধ! কাল যুদ্ধ রে!

চন্নপুরে যাও, বুঝতে পারবে কি রকম যুদ্ধ লেগেছে পৃথিবীতে। কারখানাটা বেড়ে যেন ভীমের বেটা ঘটোৎকচ হয়ে উঠেছে। আর সে কি গর্জন! লোহার যন্ত্রপাতিগুলো ঘড়-ঘড়, ঘং-ঘং, ঘটা-ঘং, ঘটা-ঘটা-ঘং—ধড়াম-ধুম—শব্দ ক'রে যেন মহামারণ লাগিয়ে দিয়েছে। মধ্যে মধ্যে আবার উঁ—উঁ—উঁ ক'রে ডেকে ওঠে। শরীরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সিরসির করে। সেখানে দাঁড়ালে কানে তালা ধ'রে যায় শব্দে। ভিতরে ঢুকলে নাকি গরমে সিদ্ধ হয়ে যায় মানুষ। দুটো চারটে লোক প্রতিদিনই জখম হচ্ছে। দু-দশ দিন অন্তর মরছেও একটা দুটো। কাউকে টেনে নিচ্ছে কলের চাকায়, কারও

মাথায় খসে পড়ছে লোহার টুকরো, কেউ মরছে উপর থেকে মুখ থুবড়ে প'ড়ে মরলে পরে নাকি ক্ষতিপূরণ দেয়। সে নাকি অনেক টাকা! হোক অনেক টাকা। জীবনের চেয়ে তার দাম বেশি?

করালী সেই কারখানার ভিতর কুলি-সর্দার হয়েছে। কোট পরেছে, পেণ্টুলন পরেছে, জুতো পায়ে টুপি মাথায় দিয়ে হুকুম চালায়। বনওয়ারী আশ্চর্য হয়ে যায়, করালী আজও শাস্তি পেলে না কেন? বাবাঠাকুরের বিচার ন্যায়বিচার, যমদণ্ডের আঘাতে সাজা। সে সাজা কি করালীর আজও পাওনা হয় নাই? হবে হয়তো। আজও হয়তো সময় হয় নাই, হতভাগার পাপের ভারা এখনও পূর্ণ হয় নাই। এবারে ঝড়ে সকলের ঘর উড়ল, কিন্তু করালীর ঘর প্রায় ঠিকই আছে। অবশ্য লোহার তার দিয়ে চালাকে বেঁধেছে মাটির সঙ্গে, চালের উপরে আবার দড়ির জাল দিয়ে খড়ের ছাউনিকে ঢেকে বেঁধেছে, কিন্তু বাবাঠাকুরের কোপ তালগাছের মাথা ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে দেয়, পাকা রেলের পুলকে ভাসিয়ে দেয়, তার কাছে ও বাঁধন কি? ওই পাপের ভারা পূর্ণ হয় নাই—এই কথাই ঠিক।

করালীর দঙ্গলে কতকগুলো ছোঁড়াও ভিড়েছে। ভিড়ুক। ওদেরও সাজা হবে। বাবাঠাকুর আছেন।

হঠাৎ এসে দাঁড়াল ঘোষ-বাড়ির চাকর।—বড়কর্তা ডেকেছেন বনওয়ারী।

—বড়কত্তা। এত এতে? কাল সকালে—

—না না। আজই রাত্রে যেতে হবে। তা নইলে, এই সায়েবডাঙায় আসব কেনে?

—কি বেপার কি?

—বাড়িতে খাওনদাওন, জান তো?

—হ্যাঁ। তার তো সব জোগাড় হয়েই যেয়েছে।

—তুমি যেয়ো, সেখানেই শুনবে সব।

চাকরটা চ'লে গেল।

ঘোষ-বাড়িতে প্রতি বৈশাখী-সংক্রান্তিতে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

পুণ্য কর্মটির রেওয়াজ ক'রে গিয়েছেন স্বয়ং কর্তা মহাশয়। ব'লে গিয়েছেন—নেহাত মন্দ অবস্থা না হ'লে এটি বন্ধ ক'রো না।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদ্‌গোপ মহাশয়েরা ভোজন করেন। কাহারেরা প্রসাদ পায়, এঁটোকাঁটা সাফ করে, পাতায়-প'ড়ে-থাকা খাবার গামছায় বেঁধে বাড়ি আনে, আনন্দ ক'রে খায় পরের দিন।

পাগল বললে—তা হ'লে ওঠ আজকের মত। উদিকে আকাশের গতিকও মন্দ হে। পচিমে চিকুরছে, বাতাস থম ধরেছে। আজ চার-পাঁচ দিন দেবতা হাঁকাড় দেন নাই। আজ বোধ হয় এতে আসবেন বা!

পাগল ব'সে ব'সে ঠিক দেখেছে। পশ্চিমে মেঘ উঠেছে। মাঝ-আকাশে চাঁদ আছে ব'লে এখনও আলো রয়েছে।

বড় ঘোষ মহাশয় থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভয় পেলে বনওয়ারী। চন্ননপুরের বাবুদের কাছে জমি নিয়ে ঘোষ মহাশয়দের জমির কাজে কিছু অবহেলা তার হচ্ছে, এ জন্য বড়কর্তা একদিন রোষ করবেন—এ অনুমান বনওয়ারী কিছুদিন ধ'রেই ক'রে আসছে। আজ বুঝলে, খাওয়ান-দাওয়ানের কোন কর্মের খুঁত ধ'রে সেইটা আজ মাথায় পড়ছে। সে সভয়ে সবিনয়ে বললে—আজ্ঞে?

বড়কর্তা ফেটে পড়লেন—তোমাদের কাহারদের আমি সোজা ক'রে দোব।

—আজ্ঞে?

—কেরোসিনের জন্য খবরদার আসবে না তুমি। চিনির জন্যে না। কাপড়ের জন্যে না। কুইনিনের জন্যে না। খবরদার। দোব না আমি।

বড়কর্তা ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বর। কাহারপাড়া জাঙলের হুকুমচিঠির ভার ওঁর উপরে। যুদ্ধের জন্য 'কেরোচিনি', চিনি, কাপড়, 'কণ্টোল' না কি হয়েছে! বাজারে গিয়ে পয়সা দিয়ে মেলে না। হুকুমচিঠি পেলে, সেইটি দেখালে, তবে পাওয়া যায়। কাহারেরা 'কেরোচিনি' চিনি বড় একটা পায় না। সাত দিনে এক ছটাক দু ছটাক বরাদ্দ। তাও বন্ধ ক'রে দেবেন বলছেন।

চিনি গেলে ক্ষতি নাই। চিনি ওরা খায় না, ওদের চিনিটা নিয়ে থাকেন ওদের মনিব মহাশয়েরা। কিন্তু 'কেরোচিনি' খানিক আদেক না হ'লে চলবে কি ক'রে? 'কুনিয়ান পিল' ইউনিয়ন-বোর্ড দেন মেম্বরের হাতে, ম্যালেরিয়ার সময় ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক—তখন কুনিয়ান না হ'লে মরণ! কিন্তু অপরাধটা কি হ'ল?

বড়কর্তা বললেন— গলায় তোরা পৈতে নে। বুঝলি? তোদের মেয়েরা চন্নপুরে গিয়ে—

বড়কর্তা একেবারে কাহার-মেয়েদের যত কেলেঙ্কারি প্রকাশ ক'রে দিলেন। চন্নপুরে গিয়ে ব্রাহ্মণ ছেলেদের সঙ্গে, ভদ্রলোকের সঙ্গে গোপন রঙের কথা প্রকাশ ক'রে বললেন—কাহারেরা আর কাহার নাই, বামুন। তা পৈতে নিক কাহারেরা। শেষে একেবারে ক্ষেপে গিয়ে বললেন—এঁটো ভাত খাবে না, নেমন্তন্ন চাই! জুতো না-খেয়ে সব মাথায় উঠেছে!

বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল।—সে কি? এ সব কথা কে বললে আপনকাকে?

বড়কর্তা উঠে এলেন। বললেন—তোদের ওই করালী বলেছে। হারামজাদাকে আমি একদিন জুতোব। শালার ভয়ানক বাড় হয়েছে। চন্নপুর ইস্টিশানে ছোটকা অর্থাৎ ছোট ভাই আজ বাজার ক'রে নেমেছিল। তোদের সিধু ছিল সেখানে। সিধু জিজ্ঞেস করেছে অন্নপ্রাশনের কথা। বলেছে—আমাদিকে পেসাদ দেবেন তো? ছোটকা বলেছে—নিশ্চয় পাবি। যাবি তোরা। তুই করালী পাখী যাবি, কাহারপাড়ার সবাই আসবে। করালী দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই। সে বেটা বলেছে—করালী কারও এঁটোকাঁটার পেসাদ খায় না। কাহারপাড়ার ছেলেছোকরারাও বলছে—তারাও যাবে না। সিধুকে বলেছে—তু যদি যাস তো তোর সঙ্গেও আমরা খাব না।

অবাক হয়ে গেল বনওয়ারী। এমন স্পর্ধা সে কল্পনাও করতে পারে না।

বড়কর্তা বললেন—যে শালা কাহার না আসবে, তাকে দেখব আমি। আবার পাড়াতে মজলিস জুড়েছে!

কথাটা সত্য। সেই রাত্রেই করালীর বাড়িতে কাহারছোকরাদের মজলিস চলছিল। করালী বলছে তার সেই কথা।—ছোঁয়া খেলে জাত যায় না। এঁটো খেলে জাত যায়। যে কাহার পরের এঁটো খাবে, সে পতিত। তার জাত নাই।

করালীর আপসোস—বুড়ো কাহারেরা এই সহজ কথাটা বুঝছে না। তার আপসোস—তারা চন্নপুরের কারখানায় গিয়ে একবার পরখ ক'রে দেখছে না, সেখানে সুখ কি দুখ! সেখানে মানুষের ভাল হয় কি মন্দ হয়!

মজলিসটা জ'মেই উঠেছিল। বনওয়ারী এসে হাজিরও হ'ত। কিন্তু জাঙল থেকে পথে ফিরতে ফিরতেই এল ঝড়। হাঁকডাক ক'রে এল। গোঁ-গোঁ—সোঁ-সোঁ! ঐ বছর এমন জোরে আসেন নাই ঠাকুর। আজ নিশ্চয় আসছেন করালীর তালগাছটার মাথা ভাঙতে। নিশ্চয়। সে আকাশের দিকে চাইলে। মেঘের নীচে চাঁদ এখনও দেখা যাচ্ছে। মেঘ কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, সাদা কালো। চমকে উঠল বনওয়ারী। সেই বরণ, সেই চিত্রবিচিত্র! তেমনি এঁকেবেঁকে পাকিয়ে পাকিয়ে ঘুরছে। জিভের মত লকলকিয়ে খেলে যাচ্ছে বিদ্যুৎ। হে বাবাঠাকুর, রক্ষা কর। হে বাবাঠাকুর! গাছ ভাঙছে, বাঁশে বাঁশে কট কট শব্দ উঠছে, কড় কড় ক'রে মেঘ ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে নয়ানের মায়ের গলায় আজ আবার অনেকদিন পরে সাড়া জেগেছে।

ওদিকে নয়ানের মা তীব্র স্বরে ব'লে যাচ্ছে, সুচাঁদের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলছে— হে বাবাঠাকুর, তুমি ধ্বংস কর বাবা, যে তোমার বাহনকে মারলে, যে পরের ঘর ভাঙলে, গাঁয়ের বিধান না মেনে যে উঁচু ঘর বাঁধলে, একবার ফুঁসিয়ে তার ঘর উড়িয়েছ, আবার ভেঙে দাও। মড়মড় ক'রে ভেঙে দাও। মাথায় তাদের দংশন কর। হে বাবা! যে যে নোক তোমার বাহনকে মারার অপরাধকে ক্ষমা করেছে, তাদের কামড়ে মেরে ফেল। চোখ ফেটে যাক অক্তের ডেলা হয়ে; গায়ে অক্তমুখী চাকড়া চাকড়া দাগ ফুটে উঠুক। কাহারপাড়ায় যার যত অপরাধ, বিচার কর। শ্যাষ ক'রে দাও, শ্যাষ ক'রে দাও,

শ্যাষ ক'রে দাও। আমার নয়ানের সঙ্গী কর সবাইকে। আমাকে যেন বাঁচিয়ে একো। আমি নি-মনিষ্যি কাহারপাড়ার ঘরে ঘরে নেচে বেড়াব—কেঁদে বেড়াব পেত্নীর মত।

বনওয়ারী চুপ ক'রে ব'সে রইল মেঘের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে শব্দ উঠল।

পড়ল? করালীর ঘর পড়ল? উঠে দাঁড়াল বনওয়ারী। নয়ানের মায়ের কণ্ঠস্বর নীরব হয়েছে।

ঝড় থামতেই সে বেরিয়ে পড়ল পাড়ায়।—কার ঘর পড়ল?

—নয়ানের ঘর গো।

—নয়ানের ঘর? স্তম্ভিত হয়ে গেল বনওয়ারী।

—বনওয়ারী! ব্যানো!

—কে? বিরক্ত হ'ল বনওয়ারী;—পিছনে ডাকে কে?

—আমি, পাগল।

—কি?

—খ্যানত হয়ে গেল ভাই। সব্বনাশ হয়েছে।

—কি তাই বল?

—করালী চন্ননপুর যাবার পথে হেঁকে ব'লে গেল—বাবাঠাকুরের মুড়ো বিল্ববিক্ষটি প'ড়ে গিয়েছে।

হে ভগবান! বাবা গো! তুমি কি করলে গো! শেষে কি তুমি আমাদের ছেড়ে গেলে? কলিকাল। অধর্মের পুরী, কাহারপাড়ায় পাপ পরিপূর্ণ ক'রে তুললে করালী। সেই পাপ সইতে না পেরে চ'লে গেলে তুমি?

জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে গোটা কাহারপাড়া দেখলে। মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ আবার উঠেছে আকাশে। ফুটফুট করছে চাঁদের আলো। বনওয়ারীর হাতে লণ্ঠনও ছিল একটা। বাবাঠাকুরের বৃক্ষটি কাত হয়ে শুয়ে গিয়েছে।

বনওয়ারী বললে—চান কর সব।

—চান?

—হ্যাঁ, চান কর। চল, ঠেলে বিক্ষটি তুলব। ছোট বিক্ষ, গোটা কাহারপাড়ার কাঁধ, দিব্যি উঠে যাবে। তা'পরেতে ওকে বাঁধিয়ে দোব। ভয় নাই, পাশের বিক্ষটি ঠিক আছে।

গোটা কাহারপাড়া কাঁধ দিলে।

জয় বাবাঠাকুর! জয় কালারুদ্দ্‌! বলো—শিবো—ধম্মরঞ্জো—! উঠেছে, উঠেছে। আবার বলো ভাই। আবার। হয়েছে। হয়েছে। দাও মাটি চারিদিকে—বেঁধে দাও। শক্ত ক'রে বেঁধে দাও।

হঠাৎ তীব্র আর্তনাদ ক'রে উঠল কেউ! শিশুকণ্ঠ। চমকে উঠল সবাই। বুক ধড়ফড় ক'রে উঠল। বাবাঠাকুরের থানে কার কি হ'ল?

—কি? কি হ'ল?

—সাপ! ও বাবা, সাপ!

—সাপ? কার ছেলে রে? কে? কি সাপ? বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল পানা—নিমতেলে পানা।—ওগো—সেই গো, সেই। ঠিক সেই তিনি গো!

একটা ঝোপের মধ্যে একটা চন্দ্রবোড়া ঢুকছিল তাদের স্বভাবমন্থর গতিতে।

কাহারপাড়া স্তম্ভিত হয়ে গেল। পানার ছেলেটা ম'রে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই, ঠিক যেমন ভাবে মরেছিল করালীর কুকুরটা তেমনি ভাবেই চোখ ফেটে রক্ত পড়ল, শরীরে চাকা চাকা রক্তমুখী দাগ বার হ'ল। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত গড়াল! সুচাঁদ চীৎকার ক'রে উঠল—ওরে, আমি তখুনি বলেছিলাম রে। বছর পেরুলে কি হবে রে? বাবা ঠাকুরের কাছে বছর নাই রে! ওরে বাবা রে!

নয়ানের মা ভাঙা ঘরের দাওয়া থেকে উত্তর দিল—আঃ, কে করলে বেহ্মহত্যে, কার পরাণ গেল রে? পানা তো পাঁটা দিয়েছিল রে? যে ডাকাবুকো বাবার বাহনকে মেলে রে, তার কিছু হোল না কেনে রে? অর্থাৎ করালীর কিছু হ'ল না কেন? তার নিজের ঘর ভাঙায় কোন দুঃখ নাই, দুঃখ থাকলেও সেজন্য সে আক্ষেপ করলে না। তার আক্ষেপ—পাপীর দণ্ড হ'ল না।

পানা এবং পানার স্ত্রী ভয়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। এ সাজা বাবাঠাকুরের দেওয়া সাজা। এতে কথা বলবার নাই।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার বিধাতাপুরুষ কাহারপাড়ার লোকের ‘নেকনে’ অর্থাৎ লিখনে ষষ্ঠীপূজোর দিনে তার ভাগ্যফল ‘নিকে’ দেন। গত জন্মের যেমন কাজ তেমনি ভাগ্যফল দেন। নইলে চন্দ্রবোড়া সাপ এখানে বিরল নয়। যথেষ্ট আছে। তার বিষে মরেছেও অনেকে। কিন্তু পানার ছেলের এই মরণ, এই বাবাঠাকুরের থানে, বাবাঠাকুরের গাছ পড়ল যেদিন, সেই দিন এই মরণ—এর কারণ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। পানার ঘরের কুকুরে-ধরা উচ্ছিষ্ট পাঁঠা জরিমানা স্বরূপ আদায় ক’রে চৌধুরীবাবুরা বাবার থানে বলি দিয়েছে, শাস্তি যাবে কোথা? এ নিশ্চয় বাবাঠাকুরের দণ্ড; ভুল নাই তাতে, কোন ভুল নাই। এ মিত্যু বাপের পাপে বেটার মিত্যু।

বনওয়ারী মাথায় হাত দিয়ে বসল। বছর পার হয়েছে, তাতে দণ্ডকাল ফুরায় নাই। জন্মান্তরে শাস্তি হয়, যুগ পার ক’রে শাস্তি হয়, আদিকাল থেকে হাঁসুলী বাঁকের কর্মফলে কোন্ শাস্তি কবে আসবে কে জানে? তবে আসবে নিশ্চয়।

তিন

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার মানুষেরা—অন্ধকার রাত্রে বটতলায় আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষের দল। এ রাত্রি আদ্যিকালে আরম্ভ হয়েছে, শেষ কবে হবে জানে না। তবে শেষ যে দিন হবে, সে দিন হাঁসুলী বাঁকেরও শেষ হবে। কাহার-জীবন যতদিন, এ রাত্রি ততদিন, হাঁসুলী বাঁকও ততদিন। তারপর হয়তো দহে পরিণত হবে কোপাইয়ের কোপে, নয়তো কিছু হবে, কি হবে কে জানে? রাত্রে আকাশে তারা খসে, বাদল নামে, কাহারেরা ফল ভোগ করে, এর শেষ কি হয়? বনওয়ারী ভুল করেছিল, বছর শেষ হওয়ায় ভেবেছিল, বিপদ কেটে গেল। তাই কি হয়? বিপদ কাটে না। দু দণ্ড জ্যোৎস্না দেখে

যে ভাবে, বাদল আর হবে না, আকাশে তারা আর খসবে না, সে কিছুই জানে না। বনওয়ারী জানে, জেনেও ভুল করেছিল। কাহারপাড়ার আরও অনেকে ভুল করেছিল। এই ঘটনাটিতে ভুল সকলের ভাঙল। তাতে একটি সুফল হ'ল কিন্তু।

পাঁচ জন ছাড়া করালীর দল সকলেই ছাড়ল। শেষাশেষি বহুজনই গোপনে গোপনে করালীর দিকে ঝুঁকেছিল। বনওয়ারী সকলকে বার বার সাবধান ক'রেও মানাতে পারে নাই; এইবার সব থমকে গেল। ফিরল।

রতন প্রহ্লাদ সকলেই ঘাড় নাড়লে। পাগল গান গাইলে—পুরনো গান—

মন চাহে যাও হে তুমি—আম যাইব না—
কেলি-কদমতলায়, বৃন্দে গো!
মানিক পেলে তুমিই লিয়ো—আমি চাইব না—
কালোমানিক কালায়, বৃন্দে গো!

ঠিক কথা। পাগল নইলে এ সকল কথা শোনায় কে, আর বাবাঠাকুরের শাসন ভিন্ন ভালর পথ ধরায় কিসে? পানার ছেলের এই সর্পাঘাত—বাবাঠাকুরের বাহন যে সাপটি, সেই বংশের সাপের দণ্ডাঘাতের দণ্ডে কাহারপাড়া থমকে গেল। করালীর হাসি, বেপরোয়া কথা, সাজসজ্জা—সবেরই রঙের উপর ভয়ের কালো রঙ মাখিয়ে দিলে। মাথার উপরের উড়ো-জাহাজের লাল নীল আলো বাবাঠাকুরের এক ফুঁয়ে নিবে যাবে একদিন—এই সত্য উপলব্ধি ক'রে উদাস দৃষ্টিতে তাকাতে তাদের আবার মনে পড়েছে। ফলও হ'ল। ঘোষ-বাড়িতে বনওয়ারীর মুখ থাকল।

ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে সকলেই গেল শ্রদ্ধার সঙ্গে। কৌলিক কাহার-ধর্ম, সে কি ছাড়া যায়! শুধু করালীরা ক'জনে গেল না।

সে বললে—যা যাঃ! তোরা পতিত। কাহারপাড়াকে পতিত করলাম আমি। আরও ব'লে দিলে—ঘোষকর্তা যদি কারুরও কেরাচিনি বন্ধ করে, চিনি বন্ধ করে, তবে আমিও দেখব। সদরে দরখাস্ত দোব আমি। ম্যানকে নিয়ে চ'লে যাব ম্যাজিস্টর সাহেবের কাছে।

‘ম্যান’ মানে রাঙামুখো যুদ্ধের সাহেব, যে করালীর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে কাহারপাড়ায় আসে।

বনওয়ারী শুনে হাসে। পতঙ্গের পাখা উঠলে সে মাতঙ্গ হয় না বাবা, মাতঙ্গ দূরের কথা পক্ষীও হয় না। বাবাঠাকুরের গাছতলাটি বাঁধানো হচ্ছে—বনওয়ারীই বাঁধিয়ে দিচ্ছে, সেইখানে ব’সে তদারক করতে করতে করালীর মাতঙ্গপনা দুবেলা সে দেখে। হেলে দুলে যায়, মধ্যে মধ্যে ‘ম্যান’ সাহেবটাকে সঙ্গে নিয়ে চারিপাশ ঘুরে বেড়ায়। লোকটা গলায় ঝুলানো একটা বাক্স নিয়ে কিলিক্ কিলিক্ ক’রে ছবি তোলে—‘ফটোক্’ অর্থাৎ ফোটো।

সেদিন বনওয়ারী মেঘের দিকে তাকিয়ে ছিল। ১৩৪৯ সাল।

গোটা জ্যৈষ্ঠ কাঠফাটা রৌদ্র গেল। বৈশাখের সঙ্গে সঙ্গে পবনদেব ক্ষান্ত হয়েছেন। যোগাড়যন্ত্র ক’রে বাবাঠাকুরের গাছটিকে খাড়া ক’রে থানটি বাঁধাবার কাজ শেষ হয়েও হচ্ছে না। বিলাতী মাটির জন্যে চৌদ্দভুবন দেখলে বনওয়ারী। বিলাতী মাটি ‘কণ্টোল’ হয়েছে। ‘রবশ্যাষে’ অর্থাৎ অবশেষে তিন গুণ দাম দিয়ে দু বস্তা মাটি সে পেয়েছে। আষাঢ় এসেছে। আকাশ যেন কেমন করছে। চারিদিকটা মধ্যে মধ্যে থমথমিয়ে উঠছে, আবার ক্ষান্ত হচ্ছে। এইবার নামবারই কথা।

“চৈতে মথর মথর, বৈশাখে ঝড় পাথর
জষ্টিতে মাটি ফাটে, তবে জেনো বর্ষা বটে।”

হবার সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছে। কিন্তু আর দুটি দিন, বাবাঠাকুর, আর দুটি দিন—দু দিন হ’লেই ঠাঁইটি বাঁধানোর কাজ শেষ হবে। বিলাতী মাটি দেওয়া হচ্ছে আজ। কাল হ’লেই শুকিয়ে যাবে। বিলাতী মাটির ওই আশ্চর্য গুণ।

করালী এসে দাঁড়াল।

—কি ?

—একটা কথা বলতে এলাম।

—তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা না।

—তোমার নাই, আমার আছে। গোটা পাড়ার আছে।

—গোটা পাড়ার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি ?

—তোমারও যা সম্বন্ধ, আমারও তাই

—না।

—'না' বললে আমি শুনব কেনে ?

—ভাল। কি বলছ বল ?

—বলছি, পাড়ার লোকের ঘরে ধান নাই, মনিবে ধান বন্ধ করেছে। তুমি হয় ব্যবস্থা কর, নইলে বল—ওরা কারখানাতে চলুক।

বনওয়ারী হুঙ্কার দিয়ে উঠল। করালী হাসলে, বললে—উ সব ভয় আমাকে দেখিও না। যা বলবার বললাম। যা করবার ক'রো।

গট গট ক'রে চলে গেল করালী। বনওয়ারী আক্রোশভরে চেয়ে রইল তার দিকে। কাল যুদ্ধ! যুদ্ধের গতিকে দু মাসের মধ্যে ধান পাঁচ টাকা থেকে দশ-বারোতে উঠেছে। সদ্‌গোপেরা হুড় হুড় ক'রে ধান বেচে টাকা করছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে জল না-হওয়ার ছুতো ধ'রে ধান বন্ধ করেছে। পাড়ার লোকের অভাব হয়েছে সত্যি। কিন্তু সে কষ্ট স্বীকার করতে হবে।

হঠাৎ চোখ ধেঁধে গেল। গুর গুর ক'রে ডেকে উঠল মেঘ। বনওয়ারী আশ্বস্ত হ'ল। বুকটা ফুলে উঠল। মেঘের এ ডাক বর্ষার মেঘের ডাক। বৈশাখে পবনদেবের মেঘ ডাকে—কড়-কড়-কড় শব্দে।

বর্ষার মেঘ ইন্দ্ররাজার মেঘ। এ মেঘ ডাকে গুরু-গুরু-গুরু-গুরু শব্দে। পশ্চিম থেকে দেয় মৃদু মৃদু বাতাস। ঝরঝর ঝরঝর ধারায় মেঘ যেন ভেঙে নেমে আসে মা-পৃথিবীর বুকে।

* * *

উনপঞ্চাশ আবার নামল আষাঢ় কাড়ান। জয় বাবাঠাকুর! কাহারেরা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল হাঁসুলী বাঁকের মাঠে। হাল গরু নিয়ে ছুটল। পাগল পালাল গ্রাম ছেড়ে। কি করবে সে এখন আর গ্রামে থেকে ? কাহারেরা পড়েছে চাষ নিয়ে, সে গাঁয়ে একলা কাকে নিয়ে দিন কাটাবে ? গোটা কাহারপাড়া মাঠে —গরু মানুষ মেয়ে পুরুষ সব।

যে জমিতে হাল চলছে, তার চারি পাশে ঝাঁকবন্দী বক নেমেছে, লম্বা পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ লম্বা গলা বাড়িয়ে লম্বা ঠোঁটে জমির ঘোলা জলে ঠোকর মেরে ব্যাঙ পোকা কেঁচো কাঁকড়া ধ'রে খাচ্ছে। লাঙলের ফালে জমির মাটির তলার পোকা-মাকড় ভেসে উঠছে। মাথার উপর উড়ছে ফিঙে আর কাকের দল। তারাও ছোঁ মারছে। কাকে আর ফিঙেতে চিরকেলে ঝগড়া; খাবার লোভে তাও ভুলছে ওরা। বনওয়ারী বলে—উদর এমনি বটে! উদরের দায় বড় দায়!

কাহারদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা জমির আলের গর্তের ভিতর কাঁকড়া ধ'রে বেড়াচ্ছে। কাহার-মেয়েরা ঘরের পাট-কাম সেরে, গাই-গরুর দুধ দুইয়ে, চন্নপুরে যারা দুধের যোগান দিতে যায় তাদের দিয়ে, মরদদের জন্যে জলখাবার নিয়ে মাঠে আসছে। সঙ্গে আছে ঝুড়ি কাস্তে, পুরুষদের জলখাবার খাইয়ে আলে আলে ঘাস কাটবে। বোঝা বোঝা ঘাস। কতক খাওয়াবে নিজেদের গরুকে, কতক পাঠাবে চন্নপুরে বিক্রির জন্যে।

চন্নপুরে যাবার আলপথটি ঘাসে প্রায় ভ'রে গিয়েছে। ওই পথটার দিকে তাকিয়ে সবচেয়ে খুশি হয় বনওয়ারী। ওপথে করালীর দল ছাড়া কাহারপাড়ার লোকেরা বড় কেউ হাঁটে না।

দুধ ঘাস ঘুঁটে যোগান দিতে যাওয়া ছাড়া ওপথে নিত্য কেউ হাঁটে না। তাও সে চন্নপুরের কলের কারখানার এলাকায় নয়। ভদ্রলোকের বাবু মহাশয়দের পাড়াতে যায় তারা। মেয়েরাই যায়। পুরুষদের মধ্যে যার যেদিন মাঠের কাজ কম থাকে, সে যায় বিকেলবেলা আবগারীর পচুই মদের দোকানে। বড় একটা জালায় আনে রশি মদ, ধেনো পচাইয়ের সবচেয়ে তেজস্কর অংশটা। সেটা তারা জল মিশিয়ে পরিমাণে বাড়িয়ে যার যেমন পয়সার সামর্থ্য সে তেমনি ভাগ নিয়ে খায়। করালী চন্নপুর যাওয়া-আসার একটা নূতন আলপথ তৈরি করেছে। পথটা একেবারে মাঠের বুক চিরে সোজা চ'লে গিয়েছে।

করালীর পিছনে পিছনে মাথলা নটবর, তাদের পিছনে পিছনে আরও কজন ওই পথে যাওয়া-আসা করে। পিতিপুরুষের আমলের জাঙল-ঘেঁষা

পথকে বাঁয়ে রেখে নতুন পথ ফেলেছে তারা। সে পথ কিন্তু আজও ঠিক হয়ে ওঠে নাই। মাথলা নটবর গোপাল ছাড়া আর সকলে সায়েস্তা হয়ে গিয়েছে, তারা আবার মাঠের কাজে লেগেছে। কাজ জুটিয়ে দিয়েছে বনওয়ারীই। কাজের ভাবনা কি ? নতুন মাঠ হচ্ছে সায়েবডাঙায়। বাবুদের অঢেল পয়সা, জমি কাটিয়ে ফেলেছে অনেক, তাতে ঢেলেছে মরা পুকুরের পাঁক মাটি। চাষ চালিয়েছে জোর। কিন্তু বাবুরা তো নিজে হাতে চাষ করে না, চাষ করে কাহারেরা, আর করে কাহারদের মতই হাতে-নাতে চাষ করতে যাদের নীচু কুলে জন্ম তারাই। এ হ'ল ভগবানের বিধান, বাবাঠাকুরের হুকুম। খাট, খাও। বুক পেড়ে দু হাতে খাট, সোনার লক্ষ্মীতে ভ'রে উঠুক হাঁসুলীর মাঠ; বাবু মহাশয়দের, সদ্গোপ মহাশয়দের ভাগ্য আর তোমাদের 'হাতযশ। মনিবের খামারে ধান তুলে দাও, মনিবান শাঁখ বাজিয়ে জল ধারা দিয়ে লক্ষ্মী ঘরে তুলুক। তুমি আঁচলে খামার ঝেড়ে তুলে নিয়ে এস মা-লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো। তাই তোমার ঢের, তার চেয়ে আর বেশি কি চাও তুমি ? 'যেমন বিয়ে তেমনি বাজনা'। কাহারকুলে জন্ম যখন হয়েছে, তখন এ জনমের এই বিধান। চুরি কর, ডাকাতি কর, এর চেয়ে বেশি কিছুতেই হবে না। চুরি-ডাকাতি ক'রেও তো দেখেছে কাহারেরা। এই তো পরম—সেদিন পর্যন্ত ডাকাতি করেছে। কি হয়েছে ? তাতেও এই। চুরি-ডাকাতি ক'রে মাল তুলে দাও সামালদার মহাশয়ের ঘরে, চুরির লক্ষ্মী তার ঘরে তুলে দিয়ে নিয়ে এস শুধু সেই লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো। আর নিয়ে এস অধর্মের বোঝা। তার চেয়ে বহু ভাগ্যে চাষের পথ খুলে দিয়েছেন কর্তাঠাকুর, সেই পথে হাঁট, ধর্মকে মাথায় রাখ। সকাল সন্ধ্যে দেবতাকে প্রণাম ক'রে বল—এ জন্মে এই হ'ল, আসছে জন্মে যেন উঁচু কুলে জনম দিয়ো দয়াময় হরি হে।

গোপালীবালা এসে দাঁড়াল মাঠের আলের উপর। জলখাবার নিয়ে এসেছে। বনওয়ারী ঘোষেদের ভাগের জমির একটা কোণ 'চৌরস' অর্থাৎ সমান করছে, হাঁস-হাঁস শব্দে কোদাল চালাচ্ছে। সদ্গোপ মহাশয়দের গরুগুলি এই পথে নদীর ধারে চরতে যায়। জমিখানার একটি কোণকে খানিকটা

যেন দুমড়ে দিয়ে গোপথটা চ'লে গিয়েছে। চারটি কোণ সমান একখানি 'দেখনসারি' অর্থাৎ দেখতে সুন্দর জমিতে পরিণত করবার জন্য বনওয়ারী প্রতি বৎসরই খানিকটা কেটে জমির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে থাকে অন্যের অগোচরে। জাঙলের সদ্গোপ মশায়দের গোচরে এলে তুমুল কাণ্ড করবে তারা। ঘোষ মশায়দের কানে উঠলেও তাঁরা বলবেন—কতবার তোমাকে বারণ করেছি বনওয়ারী। কি দরকার আমার খানিকটা জমি বাড়িয়ে নিয়ে? মেজ ঘোষ বলবে—আশ্চর্য! জমিটা যদি তোমার হ'ত তো বুঝতাম। এতে তোমার লাভটা কি বল তো? বনওয়ারী এ সবের জবাব দিতে পারে না, মাথা চুলকায়, কিন্তু চাষের সময় এলে খানিকটা বাড়িয়ে না নিয়েও তার মন পরিতুষ্ট হয় না।

গোপালীবালা বসল। বনওয়ারীর এখন কোন দিকে তাকাবার অবসর নাই। এই সময়টায় এদিকে কেউ নাই ; কাহারেরাও না। এই উপযুক্ত সময়। কাহারেরা তার অনুগত বটে, কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্বাস নাই। নিজেরা কিছু বলবে না, কিন্তু ফুস ফুস ক'রে সদ্গোপ মনিবের কানে তুলে দেবে। দশ-পনরো হাত লম্বা আলটার কোথাও আধ হাত কোথাও তিন পোয়া জমি কেটে কুপিয়ে ছেঁটে জমিটার চষাখোঁড়া মাটির সঙ্গে মিলিয়ে বনওয়ারী উঠে মাথা ঝাড়লে। ঝাঁকড়া চুল থেকে জল ঝ'রে পড়ল—ঝরে পড়ল কালো বনওয়ারীর চুল থেকে মুক্তোবরণ টোপা টোপা জলের ফোঁটা। কোমরটা টাটিয়ে উঠেছে। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। বেঁকে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চাইলে বনওয়ারী। জলখাবারের বেলা হয়েছে। আকাশে ঘন ঘোর মেঘ আজ। বেলা বুঝবার উপায় নাই। কাল রাত্রি থেকে জোর বর্ষা নেমেছে। বাঁশবাঁদির বাঁশবন বট পাকুড় শিরীষ গাছের মাথায় ছাইরঙের মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক যাচ্ছে, এক আসছে—কেউ ফুলছে, ফাঁপছে—ক্রমশ আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, কেউবা ছুটে চ'লে যাচ্ছে সন-সন ক'রে কোন্ দেশ থেকে কোন্ দেশে, কে জানে! কাহারপাড়ার চালে চালে বড় বড় গাছের গায়ে গায়ে বাঁশবনের ঘনপল্লবে কাহারবাড়ির উনোনের ধোঁয়া হালকা কুণ্ডলী পাকিয়ে জ'মে রয়েছে, যেন পেঁজা

শিমুল-তুলোর রাশি ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ। মেঘে মেঘে এমন ঘোরালো হয়ে আছে চারিদিকে যে, বেলা ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কেবল পেটে ক্ষিধে লেগেছে আর গরুবাছুরের ডাক শুনে মনে হচ্ছে যে, হাঁ, জলখাবারের বেলা হয়েছে। কিন্তু গোপালীবালাকে দেখে খুব খুশি হ'ল না বনওয়ারী। সুবাসী এল না কেন? সে এলে যে তাকে দু দণ্ড দেখতে পেত, দুটো হাসি-খুশির কথা হ'ত; পেট ভরার সঙ্গে মন-মেজাজ ভ'রে উঠত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বনওয়ারী। সে কথা বলাই বা যায় কি ক'রে গোপালীবালাকে? তবে গোপালীবালা লোকটি বড় ভাল। সেই যে কুড়িটি টাকা নিয়ে বলেছিল, কোন আপত্তি অশান্তি করবে না—সে কথা সে রেখেছে, কোন আপত্তি অশান্তি করে না। ঘর দুয়ার গরু বাছুর হাঁস মুরগী নিয়ে আছে, ঘুঁটে দিচ্ছে, গোবর কুড়িয়ে আনছে, ধান ভেনে চাল করছে। সুবাসী শুধু ঘর নিকোয়, বাসন মাজে, ভাত রাঁধে, আর নিজের তরিবৎ সাজসজ্জে নিয়েই আছে। চুল বাঁধছে, খুলছে, আবার বাঁধছে। রাত্রিবেলা দেখতে পায় না বনওয়ারী, ভোরবেলা যখন ওঠে, তখন নজরে পড়ে—সুবাসীর হাতে আলতার রঙের দাগ লেগে আছে, বনওয়ারীর নিজের অঙ্গেও তার দাগ লেগে থাকে প্রত্যহ। লজ্জার কথা। পাড়ার ছেলেছোকরা মেয়েরা মুখ টিপে হাসে, রতন প্রহ্লাদ গুপী দেখতে পেলে আর বাকি রাখে না। ঘোষবাড়ি বউঠাকরুণ সেদিন দেখে যে ঠাট্টাটা তাকে করেছেন, তাতে বড়ই লজ্জা পেয়েছে বনওয়ারী। তবু তো পাগল নাই! সে যে সেই কাড়ান লাগতেই গেরাম ছেড়ে কোথায় পালিয়েছে, আর ফেরে নাই। সে থাকলে গান বাঁধত।

বনওয়ারী মাঠের ঘোলা জলেই হাত মুখ ধুয়ে আলের উপর বসল। গোপালী তার সামনে খুলে দিলে মস্ত একটা খোরায় রাশিকৃত মুড়ি, খানিকটা গুড়, দুটো লঙ্কা, দুটো পেঁয়াজ। একটা বড় ঘটি থেকে ঢেলে দিলে জল। ভিজিয়ে মোটা মোটা গ্রাসে খেতে লাগল বনওয়ারী।

—হ-হ-হ! অই-অই! বারণ করলে শোনে না! চলল দেখ, পরের ভূঁয়ের পানে, চলল দেখ। মেরে তোমার পস্তা উড়িয়ে দোব, পম্বা লড়িয়ে দোব।

শাসন করছিল ছুটোকে। সে গরুজোয়ালে জোতা অবস্থাতেই তার অন্য একজনের বীজধানের জমির দিকে যাবার উদ্যোগ করছিল।

গোপালীবালা উঠল, গরু ছুটোর জোয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বনওয়ারী কিছুটা মুড়ি ফেলে রেখেই উঠল। এই নিয়ম। ওই কটি খাবে পরিবার। গোপালীবালা বনওয়ারীর দিকে পিছন ফিরে ব'সে খেতে লাগল। বনওয়ারী বললে—মুনিববাড়ি হয়ে যেয়ো। কদিন যাই নাই আমি। পাট কাম থাকে তো ক'রে দিয়ে যাবা।

গোপালী ঘাড় নেড়ে জানালে, তাই হবে।

গোপালী কেমন হয়ে গিয়েছে, সে কথা কয় না তেমন ভাল ক'রে। বনওয়ারী আবার বললে—একটা কথা বলছিলাম। যে টাকাটা দিয়েছি তাতে ধান কিনে আথ কেনে! যুদ্ধুর বাজারে ধানের দর হু-হু ক'রে বাড়বে বলছে সবাই। তোমার ধান তুমিই 'আথবা' আমি তাতে হাত দোব না। লাভ যা হবে তুমিই নেবে।

গোপালী আবার ঘাড় নেড়ে জানালে, তাই হবে।

বনওয়ারী রসিকতা ক'রে আবার বললে—তবে যদি অভাব অনটন লোব তোমার কাছে চেয়ে। তুমিই তো ঘরের গিন্নী, তুমিই তো নক্ষী আমার। তোমার দৌলতেই তো সব। আমি তো ভিখিরী, খাটি, খাই।

গোপালী এবার কথা বললে—তা লিয়ো।

বনওয়ারী বললে—ছুটকীকে ঘরে এনেছি আটপৌরের মেয়ে ব'লে, বুঝে

গোপালী ঘাড় ঘুরিয়ে এবার মুখ মুচকে হেসে বললে—আর কালোশশীর বুনঝি, কালোশশীর মতন দেখতে শুনতে ব'লে!

বনওয়ারী অবাক হয়ে গেল। গোপালী এ কথা জানলে কি ক'রে?

অনেকক্ষণ পরে সামলে নিয়ে সে বললে—ইসব কি যা-তা বলছ তুমি?

—যা-তা লয়, ঠিক বলছি আমি। আমি শুনেছি।

—শুনেছ? কে—কে বললে?

গোপালী বনওয়ারীর দিকে চেয়ে ভয় পেলে খানিকটা, সে বললে—ই-উ-

পাচজনায় বলে। আর কালোশশী আমাকে দেখে হাসত যে মুখ টিপে টিপে। আর মেয়েলোক ঠিক বুঝতে পারে, বুয়েচ!

কালোশশী হাসত, নিশ্চয় হাসত, এবং গোপালী যত বোকা হোক সে হাসির মানে নিশ্চয় বুঝত। সে সম্বন্ধে কোন কথা ব'লে ফল নাই। পাঁচজনটা কে?

হঠাৎ কানে এসে পৌঁছুল একটি কান্নার শব্দ। মড়াকান্না। কে কাঁদছে? মানের মা? চাষের সময় কাহারদের জোয়ান ছেলেরা চাষে খাটে, এ সময় জোয়ান ছেলের কথা মনে পড়ার কথা বটে। নিত্যই মনে পড়বে। কিন্তু—কিন্তু কান্নাটা তো তেমন পুরানো কান্না নয়। তেমন সুর ক'রে গানের মত বিনিয়ে বিনিয়ে তো কাঁদছে না!—ওরে আমার সোনা মানিক বাবাধন রে, কোথা গেলি রে? তোর জলভরা ভূঁই প'ড়ে বাবা, তু কোথা গেলি রে?—এ সব কথার তো কিছুই শোনা যাচ্ছে না? এ যে আছাড়িপিছাড়ি কান্না, যেন এখনই কারও কিছু হয়েছে।

গোপালীবালা কান পেতে শুনে বললে—হেই মা!

--কার কি হ'ল বল দি-নি?

—মাথলাদের বাড়িতে গো।

—মাথলাদের বাড়িতে?

—হ্যা। মাথলার বউয়ের গলা।

—কি হ'ল?

—তা তো জানি না।

—তুমি যাও দি-নি। একটা খবর দিয়ো।

মাথলার বাড়িতে কি হ'ল? মাথলার বাড়িতে তিনটি মানুষ—বউ, বেটা, নিজে। মাথলা চন্নপুরে। বউ কাঁদছে। তবে কি ছেলেটা—? কি সর্বনাশ! রোগ নাই, বালাই নাই, কি হ'ল হঠাৎ? কিছু হওয়ার মানে বাবাঠাকুরের রোষ। তবে কি করালীর ওপর বাবার রোষ গিয়ে পড়ল এইবার? মাথলা করালীর সঙ্গে চন্ননপুরের কারখানায় গিয়েছে—কলির পাপপুরীতে। তবে কি—?

সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে যেন কে ঢেঁকি কুটতে আরম্ভ ক'রে দিলে। হে বাবা, হে বাবাঠাকুর!

ছুটতে ছুটতে এল একটি ছেলে। পেল্লাদের ছোটটা। মাথলার ছেলেকে কিসে কামড়েছে। মাঠে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল আলের গর্তের মধ্যে হাত পুরে। কিসে কামড়ে দিয়েছে। ছেলেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

বনওয়ারী ছুটল।

পাড়ার মাতব্বর গুণী লোক সে। সাপের কামড়ের ওষুধও দু-চারটে জানে সে। জানতে হয়। আর জানত পাগল। সে বড় ওস্তাদ।

বর্ষার সময় কাহারপাড়ায়—হাঁসুলী বাঁকে—দু-চারটে এমন হয়। নিয়তি। 'সাপের লেখা বাঘের দেখা'। কপালের লিখনে না থাকলে সর্পাঘাত হয় না, আর বাঘ লিখন মানে না—দেখা হ'লেই খায়। তাই হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় বাঘ সম্বন্ধে যত সাবধান হয়, সাপ সম্বন্ধে সাবধান তত নয়। সাবধান হয় বইকি, কিন্তু ওটাকে তারা লিখন ব'লেই মানে। চিরকালই তো বর্ষার সময় কাঁকড়া ধরে কাহারেরা; মধ্যে মাঝে এমন হয় একটা আধটা। কিন্তু সবাই তো মরে না। তা হ'লে হয় 'নিয়ত' অর্থাৎ নিয়তি, নয় দেবরোষ কি ব্রহ্মরোষ। রোজই তো সবাই আঁচল ভর্তি কাঁকড়া নিয়ে ঘরে ফিরছে। লঙ্কা নুন দিয়ে চমৎকার হয় কাঁকড়ার ঝাল। শুধু ওই দিয়েই ভাত চ'লে যায়। হঠাৎ বনওয়ারী দাঁড়াল। একটা ওষুধ নজরে পড়েছে তার। ছেলেটাকে এগিয়ে যেতে ব'লে সে শিকড় তুলতে বসল।

সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার ডাকলে ছেলেটাকে। আর একটা জরুরী কথা মনে পড়েছে।—যা তো রে ঘোষ মাশায়দের বাড়ি—আমার মনিব-বাড়ি। বড় ঘোষ মাশায়কে বলবি, মুরুব্বি পাঠালে সেই মিহিজামের ওষুধ—সপ্যাঘাতের ওষুধ, 'নেউনাইন-বোডের' ওষুধ যদি থাকে তো আন।

ইউনিয়ন-বোর্ডের মেম্বর বড় ঘোষ মশায়ের হাতে মিহিজামের সাপের ওষুধ দেওয়া হয়েছে বোর্ড থেকে। এই কঠিন মাটির দেশে সাপের উপদ্রব বড় বেশি।

তার মধ্যেও প্রকোপ বেশী হাঁসুলী বাঁকে। বাঁশবাঁদির ছায়ার মধ্যে শীতলতার আরামে এখানে আদিম কালের আবহাওয়া ভোরের ঘুমের মত এখনও বেঁচে রয়েছে। তার মধ্যে থাকতে ভালবাসে সাপ, বিছে, পোকা-মাকড়। মাছি মশাও এখানে ওই বাঁশবনের বাঁশপাতা-পচা ভাপানির মধ্যে ভন ভন করে। মানুষের দেহে সঞ্চারিত ক'রে দেয় নানা বিষ। কাহারপাড়ার মানুষের দেহে যখন ছিল ভীমের বল, তখন সে সব বিষ তারা হজম করত। এখন শ্রাবণ মাস না আসতেই কাঁপন-লাগানো 'মালোয়ারী'তে পড়ে। তখন 'কুনিয়ানের' বড়িও পাওয়া যায় 'নিউনাইন-বোডের' মেম্বর ঘোষ মশায়ের কাছ থেকে। বনওয়ারী সুপারিশ ক'রে দেয়। কিন্তু এ বছর নাকি দুটোর একটাও আর দেবে না 'নিউনাইন-বোড'। যুদ্ধ লেগেছে। আক্রাগণ্ডার জন্য বোর্ডের খরচ চলাই দায় হয়েছে—সাপের ওষুধ, কুনিয়ানের বড়ি দেবে কোথা থেকে? তবু বনওয়ারী ছেলেটাকে পাঠালে—যদি পুরানো শিশিতে 'খানিক আদেক' পড়ে থাকে।

বনওয়ারী উঠে দাঁড়িয়ে কাছায় হাত দিলে। কাছাটা ঠিকই আছে। খুলে গেলে শিকড়ের ওষুধে কাজ হ'ত না। এ সব হ'ল ওস্তাদি তুক। আহা-হা! একটা তুক করতে ভুল হয়ে গেল! যে ছোঁড়াটা খবর নিয়ে এসেছিল, ওকে মেরে তাড়িয়ে দিতে হ'ত। যে খবর দিতে আসে, সে যদি ছুটে পালায়, তবে রোগীর বিষও ঘরে নামতে আরম্ভ করে। এঃ, বড়ই ভুল হয়ে গিয়েছে! কিন্তু কি সাপ? বাবাঠাকুরের রোষ হ'লে নিশ্চয় সেই বাহনের দাঁতের দংশন। হবেই যে! পানার ছেলেটাকে দিয়ে আরম্ভ হয়েছে এবার। না, মঙ্গল নাই। মঙ্গল নাই। মঙ্গল নাই।

চার

মঙ্গল নাই, মঙ্গল নাই।—ঘাড় নেড়ে বললে বনওয়ারী। সঙ্গে সঙ্গে গোটা কাহারপাড়া ঘাড় নাড়লে, ঠিক বনওয়ারীর মত ক'রে। মঙ্গল নাই আর।

মাথলার ছেলেটা মরল। মুখে গ্যাজলা ভেঙে কালো ছেলেটাও কেমন কালচে হয়ে গিয়েছে। হাতের তালু কালচে, ঠোঁট কালচে, নখগুলো পর্যন্ত নীল হয়ে গিয়েছে। বাবাঠাকুরের বাহনের জাতের দংশন নয়, এ সম্ভবত খরিস অর্থাৎ গোখুর বা কালকেউটের দংশন। কালকেউটে হওয়াই সম্ভব।

রতনের ছোট ছেলে টেবা খুব 'টাটোয়ার' অর্থাৎ চতুর বুদ্ধিমান, দিগম্বর ছেলেটা নিজের ঘুনসী টানতে টানতে বললে—হেঁ গো! কালোপারা, নিস্কেলে এই এতু বড়ি। সে দুই হাত মেলে দেখালে মধ্যম আকারের, এবং নিস্কেলে অর্থাৎ ঘোর কৃষ্ণ তার রঙ।

রতন বুক চাপড়ে কাঁদল। নাতিটির জন্য তার গভীর স্নেহ ছিল। ছেলে অর্থাৎ মাথলা তার সঙ্গে পৃথক হ'লেও ছেলেটা তার কাছেই প্রায় থাকত।

টেবা বললে—যেই গত্তের ভেতরে হাত ভরাল্‌ছে, অমনি কামুড়ে ধরেছে। ভাইপো বললে—কাকা রে, মোটা কাঁকুড়ি। খুব কামড়াল্‌ছে তা কামড়াক; আমিও ছাড়ব না শালোকে। ব'লে বেশ জুৎ ক'রে ধরে টেনে বার ক'রে নিয়ে এল তো—সাপ। হাতে ঝরঝর ক'রে অক্ত পড়ছে। ছেড়ে দিলে ছাড়ে না শালো। তা'পরেতে জলে প'ড়ে শুঁষিয়ে চ'লে যেল সোঁ ক'রে।

না হোক বাবাঠাকুরের বাহনের জাত। তবু সর্পাঘাত। ওই মাথলার ছেলেকে সর্পাঘাত—সাবধান ক'রে দিয়ে গেল। প্রথমে পানার ছেলে, তারপরে মাথলার ছেলে। যার চোখ আছে সে দেখুক, যার জ্ঞান আছে সে বুঝুক। যার কান আছে সে শুনুক, বাবাঠাকুর বলছেন—সাবধান, সাবধান!

নইলে সাপের ভয় হাঁসুলী বাঁকে বড় ভয় নয়। এখানে সাপ প্রচুর। মনসার কথায় আছে 'লাগে-লরে' অর্থাৎ নাগে-নরে একত্রে বাস করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু হাঁসুলী বাঁকে সম্ভবপর।

আদাড়ে সাপ, পাঁদাড়ে সাপ, ঘরে সাপ, মাঠে সাপ, গাছের ডালে সাপ—সাপ নাই কোথা, সাপ নাই কবে? সুচাঁদ বলে—হাঁসুলী বাঁকের পিতিপুরুষ ব'লে গিয়েছে, উনি সব্বত্র আছেন—মা-বসুমতীকে ধরে অয়েছেন মাথায় ক'রে।

সুচাঁদ পিসী বলে—ছেরকাল, ছেরকাল আছেন ওরা। মা-মনসার পল্লব ছড়িয়ে আছেন পিথিমীময়। বনে বাদাড়ে, ঘরে পাঁদাড়ে, ঘাটে মাঠে, ঝোপে ঝাড়ে, জলে স্থলে সব্বত্র। লাগ আর লর—ইনি ওকে এড়িয়ে চলেন, উনি ওকে এড়িয়ে চলেন। মাঝে মাঝে ছামু-ছামু প'ড়ে এ বলে—গেলাম, ও বলে—গেলাম। সেই সময় 'ধয্য' ধ'রো বাবা। হাতে তালি দিয়ে ব'লো—চ'লে যা, চ'লে যা। আর পেনাম ক'রো। ওঁরা সামান্যিতে অনিষ্ট করেন না; মাথায় পা লেজে পা দিলে তবে ওঁরা চন্দ সুজ্জিকে সাক্ষী এথে ছোবল মারবেন। আর মারেন কালের হুকুমে—বাবার হুকুমে, লইলে ওঁরা মন্দ লন। মানুষের উপকার করেন ইঁদুর ধ'রে। বাস্তু হয়ে কল্যেণ করেন ভিটের।

খুব মিথ্যে কথা বলে না পিসী। নইলে মানুষ যত সাপ মারে, সাপে কি তত মানুষ মারে? মারে না। এই সেদিন নয়ানের মা ঘাস কাটতে গিয়ে ঘাসের সঙ্গে একটা কালো সাপের বাচ্চার মুণ্ডু কেটে নিয়েছে। একেই বলে—'নেকন'। ঘাসের মধ্যে মুখ লুকিয়ে, নয়ানের মা ঘাসের সঙ্গে মুঠো ক'রে ঠিক ধরেছে মাথাটি। চারিদিকে ঘাস, মধ্যখানে ছিল মাথাটি—তাই কামড়াতে পারে নাই। তারপর ঘ্যাস ক'রে কাস্তে দিয়ে কেটে ঝুড়িতে ফেলেছে। তখন বেরিয়ে পড়ে কাটা মুখটা; তখনও সেটা কামড়াবার জন্য হাঁ করছিল; ওদিকে মুণ্ডু-কাটা ধড়টা এঁকেবেঁকে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছিল। হতভাগী ব'লেই সে বেঁচেছে নইলে মরলে যে খালাস পেত; কিন্তু তা হবে কেন?

বনওয়ারীর নিজের বাড়িতে তো একটা বুড়ো খরিস প্রায় কুটুম্বিতে পাতিয়েছেন। প্রায়ই দেখা দেন। আসেন যান, ইঁদুর ধরেন, ব্যাঙ খান, পেট ফুলিয়ে মাঝ-উঠানে প'ড়ে থাকেন। বনওয়ারী তাঁকে মারে না, মারবেও না। আবার নিজেই একটু সতর্ক হয়ে থাকে, গোপালী এবং সুবাসীকেও সতর্ক ক'রে দিয়েছে, হাতে তালি না দিয়ে যেন ঘরে না ঢোকে, বাইরে না

বের হয়। হাতে তালি দাও তুমি, উনি স'রে যাবেন, যদি 'এগে' থাকেন তবে গুড়িয়ে সাড়া দেবেন, বলবেন—সাবোধান, আমি এগেছি। কাহারদের এ শিক্ষা আছে। ধৈর্য তাদের অপরিসীম। বনওয়ারীর ছেলেবেলায়, পরম আটপৌরের বাবার ধৈর্যের গল্প ও চাকলায় সবাই জানে। বর্ষার সময়, কোপাইয়ে হয়েছিল বড় বান, চারিদিক 'জলাম্পয়' অর্থাৎ জলময়; পরমের বাপ শুয়ে ছিল ঘরের বারান্দায়। হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল কিসের ঠাণ্ডা পরশে। কিন্তু নড়ল না সে। প্রথমটা বুঝে নিলে—কার পরশের ঠাণ্ডা এটা! যাঁরা ম'রে গিয়ে 'বা-বাওড়' অর্থাৎ ভূত হয়েছেন, তাঁদের কেউ ঠাণ্ডা হাত দিয়ে তাকে ডাকছে, না 'লতা-টতা' কিছু? রাত্রে সাপের নাম করতে নাই, বলতে হয়—লতা। ততক্ষণে ঠাণ্ডা হিম একগাছা মোটা রশি তার কোমরের উপরে পেটের উপর দিয়ে কাঁধের কাছ বরাবর চলেছে। কাঠ হয়ে প'ড়ে রইল পরমের বাপ। আস্তে আস্তে তিনি চ'লে গেলেন পরমের বাপকে পার হয়ে। একবার পরমের বাপের একটা নিশ্বাস জোরে পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন; তারপই যেই বুঝলেন, পরমের বাপ তাঁর অনিষ্ট করতে চাইছে না—তখন আবার চলে গেলেন সরসর শব্দে পার হয়ে। বনওয়ারী নিজেই একবার বাড়ির দোরে 'মাঝলা' অর্থাৎ মাঝারি আকারের খরিসের ঠিক মাথার উপর পা দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সাপটা পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল পায়ে। সে কী পাকের 'কষণ' অর্থাৎ পেষণ! তবু বনওয়ারী মাথার উপর পায়ের চাপ আলগা করে নাই। আলগা করলেই কামড়াত। শেষে কাস্তে দিয়ে সাপটাকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সাপকে ভয় নাই, ভয় বাবা-ঠাকুরের রোষকে আর কালের আদেশকে। ও দুটো মাথায় নিয়ে যখন সাপ বার হয়, তখন তাকে কেউ আটকাতে পারে না।

বাবার রোষ এবার ওঁরা যেন পেয়েছেন মনে হচ্ছে। ঢালাও হুকুম দিলেন নাকি বাবা? একটা অমঙ্গলের আঁচ যেন সকলের মনেই লেগেছে।

কাহারপাড়ায় একটা আতঙ্ক দেখা দিল। সাপের ভয় কাহারেরা করে না। কিন্তু এ যে বাবার কোপ ব'লে মনে হচ্ছে। বাবার কোপ কোন সময়ের বাঁধ মানে না। বলছ, বছর ঘুরেছে? কিন্তু তোমার বছর আর বাবার বছর তো এক নয়।

প্রহ্লাদ রতন গুপী বললে—বনওয়ারী, রুপায় তোমাকেই করতে হবে। তোমার মুনিব নিউনাইন-বোডের হাকিম; তুমি ধ'রে পেড়ে এক লম্প ক'রে কেরাচিনির ব্যবস্থা কর। আতবিরেত—মাথার গোড়ায় নিবোনো অইল, জেসলাই অইল। সন্দ হ'লেই ফস ক'রে জ্বেলে ফেললাম।

যুদ্ধের জন্য কেরোসিন তেল পাওয়া যাচ্ছে না। বাবুদের পর্যন্ত টিকিট হয়েছে। যে যেমন ট্যাক্স দেয় 'নিউনিয়ন-বোডে'—সে তেমন 'কেরোচিনি' পায়। কাহারপাড়ায় 'নিউনাইন-বোডে'র কাজও নাই কর্মও নই, রাস্তাঘাটও নাই, কাহারেরাও নগদ ট্যাক্স দেয় না, একদিন গতরে খেটে বেগার ট্যাক্স দেয় অন্য 'গেরামের' পথ ঘাট মেরামত ক'রে। তাদের জন্য টিকিটও নাই। লুকিয়ে চুরিয়ে তেল পাওয়া যায়, কিন্তু সে দাম পাঁচগুণ। চোরাই বিক্রি। করালী বলে—ওর নাম হ'ল 'বেলাক মারকাটি'। কে জানে কি নাম! ও নাম তাদের জেনেও কাজ নাই, ও দাম দিয়ে তেল কিনবার তাদের ক্ষমতা নাই। করালী দু-একজনকে তেল দিচ্ছে। যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছে, 'ধরমকে' বেচেছে, কুলকর্মকে ছেড়েছে, সে তেল পাচ্ছে। তেল পায়, চিনি পায়, আটা পায়, ঘি পায়, কাপড় পায়—পায় জলের দামে। বাজারে চালের দর ষোলো টাকা উঠেছে—করালী পায় পাঁচ টাকায়। পায়, পেতে দাও। আর কেউ পাবার জন্য হাত পেতো না, মনে মনে আশও ক'রো না। সাবোধান! সাবোধান! তবে বনওয়ারীর কর্তব্য বনওয়ারী করবে। যাবে সে বড় ঘোষের কাছে। কাহারপাড়াকে বাঁচাতে হবে, বাবাঠাকুরের বাহনের রোষ থেকে বাঁচাতে হবে—মনে মনে তিন সন্ধ্যে তাঁকে ডাক, মাথার গোড়ায় 'লম্পও' রাখ। তার উপর পড়েছে বর্ষা—আরম্ভ হবে 'মালোয়ারী', 'কুনিয়ান' চাই, সাবু চাই, চিনি চাই। সাবু-চিনিও বাজারে পাওয়া যায় না। গেলে ওই আগুনের দর

যুদ্ধুর বাজার। এ বাজারে 'নিউনাইন-বোডের' হাকিমের হুকুমে কাজ হবে।

বিকেলবেলায় মাঠের কাজ ফেলেই সে গেল ঘোষ মশায়ের কাছে। সন্ধ্যের পর, কি রাত্রে মদ খেয়ে এসব কথা ঠিক গুছিয়ে বলা হয় না।

বড়কর্তা শুনে একটু হাসলেন। বললেন—কেরোসিন! পেলে আমিই নিই।

বনওয়ারী কাতরকণ্ঠে বললে—আজ্ঞে, তা হ'লে আমরা কি করব? সপ্যভয়, আর কিছু নয়। সাধারণ সপ্যভয় হ'লেও হ'ত আজ্ঞে, এ হ'ল দেবকোপ!

—দেবকোপ?—বড়কর্তা একটু হেসেই প্রশ্ন করলেন। কাহারকুলের কৌতুকজনক কুসংস্কারের কথা শুনে আনন্দ আছে।

—আজ্ঞে বড়বাবু, বাবাঠাকুর দণ্ড দেবেন ব'লে মনে হচ্ছে। করালী মারলে বাবার বাহনকে, পানার কারণে খুঁতো পাঁঠা বলি হ'ল ওঁর কাছে, করালী বাবার শিমুলগাছে চ'ড়ে নিদ্রেভঙ্গ করলে বাবার—

খুব সহৃদয় এবং গভীর উপলব্ধির ভান ক'রে বড়কর্তা বার বার ঘাড় নাড়লেন—হুঁ, তা বটে, কথাটা তুমি বাজে বলনি বনওয়ারীচরণ—

বনওয়ারীর চোখে জল এল তাঁর সহানুভূতিতে। চোখ মুছে বললে—বড়বাবু, চরম খ্যানত হয়ে গেল বাবার বিল্ববিক্ষটি প'ড়ে গিয়ে। অ্যানেক কষ্টে তুললাম, গোড়া বাঁধিয়ে থাড়াও একেছি, কিন্তু বাবা তো ইশারা দিলেন যে, বিমুখ হয়েছি আমি। চললাম আমি তোদের থান থেকে।

বনওয়ারীর সঙ্গে কৌতুক বড়কর্তার বেশিক্ষণ ভাল লাগার কথা নয়, তার উপর বনওয়ারী চোখ মুছতে শুরু করেছে, এর পর যদি হাউহাউ ক'রে কাঁদে তখন একেবারে অসহ্য হয়ে উঠবে। সময়ে সাবধান হয়ে তিনি গম্ভীর হলেন, বললেন—হ্যাঁ। তা, একটু সাবধানে থাকবে তোমরা।

আবার এক ঝলক রসিকতা ঠেলে যেন বেরিয়ে এল, বললেন—এবার আর মাঠ থেকে ধানপান চুরি ক'রো-ট'রো না যেন। বুঝেছ?

—আজ্ঞে না। এবার বাবাঠাকুরের থানে হলপ করাব সব্বাইকে।

—ভাল। খুব ভাল। এখন বাড়ি যাও।

—আজ্ঞে, কেরাচিনি?

—কেরাচিনি তো নাই বনওয়ারী। গভীর দরদের সঙ্গে বড়কর্তা বললেন —ভদ্রলোকের ছেলেরা পড়তে তেল পাচ্ছে না। এবার বুঝলে, চন্ননপুরের বড়বাবু মাথা ঠুকে দু টিন কেরোসিন পেলেন না, শেষে বহুকষ্টে এক টিন। তা, বুঝেছ, কোথায় পাব আমি বল?

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠল। তা হ'লে আর কি হবে? যুদ্ধের ঢেউ এমন ভাবে কখনও বোধ হয় হাঁসুলী বাঁকে আছাড় খেয়ে পড়ে নাই।

বড়কর্তা বললেন—আর আলো জ্বেলেই বা কি করবে বনওয়ারী? বলছ বাবাঠাকুরের কোপ। তাই, হ্যাঁ, যা শুনলাম, তাতে তা-ই বটে। তা হ'লে আলোই বল আর অন্ধকারই বল, সে কোপ কি এড়ানো যায়? একটু আধ্যাত্মিক হাসি হাসলেন বড়কর্তা, কপালে হাত দিয়ে বললেন—সব এই, বনওয়ারী, সব এই। লোহার বাসর-ঘরে লখাইকে কালনাগিনী দংশন করেছিল। দেবকোপ, ও কিছুতেই আটকায় না।

ঠিক কথা বলেছেন বড়কর্তা। বনওয়ারী ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়েই উঠে এল। পথে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল সে। তবু আলো—একটু আলো না হ'লে কি ভাবে চলবে? দেবকোপ বটে। কিন্তু মরণের আগে একটুখানি জল মুখে দেওয়া, একবার শেষ নজরের দেখা—আলো না হ'লে সেটুকু কি ক'রে হবে?

সে বাবাঠাকুরের থানে এসে দাঁড়াল।—হে বাবাঠাকুর! বহুক্ষণ সে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তার সে তন্ময়তা হঠাৎ এক সময়ে একটা লালচে আভায় ঢেকে গেল। চোখে লাগল লাল ছটা। মাঠ ঘাট আকাশ সব লাল হয়ে উঠেছে—হুই দূরে দেখা যাচ্ছে কোপাইয়ের বাঁকের জলে লালচে ছটা ঢেউয়ের মাথায় স্রোতের টান যেন নাচছে।

প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়; একে বলে—'ঝিকিমিকি বেলা'। মেঘ কেটে গিয়ে

লাল আলোয় ভ'রে গেল আকাশ। 'চাকি' অর্থাৎ অস্তোন্মুখ সূর্য এখনও ডোবে নাই; পাটে ব'সে লালবরণ রূপ নিয়ে হিলহিল ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ঘুরছে। আকাশের মেঘে লাল রঙ ধরেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বনওয়ারী একটু চিন্তিত হ'ল। কাল আবার জল নামবে। সকালবেলায় পশ্চিম দিকে 'কাঁড়' অর্থাৎ রামধনু উঠেছিল, সন্ধ্যাবেলা রক্তসন্ধ্যা। জল নির্ঘাত নামবে। এর উপরে জল হ'লে কিন্তু চাষের ক্ষতি হবে।

পশ্চিম আকাশের দিকে মুখ তুলে সে ভাবছিল। পিছন থেকে কে তাকে ডাকলে।—ব্যান্যোমামা!

কে ডাকে? 'মামা' ব'লে কে ডাকে? গাঁয়ের কন্যের কোন ছেলে তো নাই গেরামে! সে ভ্রূভঙ্গি ক'রে মুখ ফেরাল। হ্যাঁ; সেই করালীই বটে। গাঁয়ের কন্যে বসনের কন্যে পাখীর সম্বন্ধ ধ'রে হারামজাদা বনওয়ারীকে মামা বলে আজকাল। ডাক শোনবামাত্র এই সন্দেহই তার হয়েছিল। সে কোন উত্তর দিলে না, গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা ক'রে রইল।

করালী হেঁকে বললে—পাড়ায় গিয়েছিলাম আমি, ব'লে এলাম সকলকে। আজকালের মধ্যে খুব জোর বিষ্টি হবে। পবল বিষ্টি। চন্ননপুরে তারে খবর এসেছে।

বনওয়ারীর হাসি পেল। তারে খবর এসেছে বৃষ্টি নামবে। চন্ননপুর থেকে করালীচরণ বিষ্টি বলছেন আজকাল। বল, বাবাধন বল। তারে খবর এসেছে! বনওয়ারীর তারের খবরে প্রয়োজন নাই বাবা কাহারকুলের পেল্লাদ। বনওয়ারীর কাছে বাবাঠাকুর আকাশময় খবর ছড়িয়ে দিয়েছেন। ঝড়, বাদল—এর খবর কাহারেরা পিতিপুরুষ থেকে পেয়ে আসছে আকাশের কাছ থেকে, পিঁপড়ের কাছ থেকে, কাক-পক্ষীর কাছ থেকে, রামধনুর কাছ থেকে, বাতাসের গতিক থেকে; তুমি কাহারকুলের জাত হারিয়ে মেলচ্ছ হয়েছ; তুমি চন্ননপুরে টেলিগেরাপের খুঁটিতে কান লাগিয়ে শোন গিয়ে এসব খবর।

করালী প্রশ্ন করলে—শুনছ?

বনওয়ারী তাচ্ছিল্যভরে বললে—সে আমি জানি হে, সে আমি জানি।

করালী ঠোঁটটা ওল্টালে, ভুরু কোঁচকালে, তারপর ফিরল। কিন্তু আবার ফিরে বললে—মাথলার ছেলেটা সাপে খেয়ে মরল। যদি কেউ কোলে ক'রে হাসপাতালে নিয়ে যেতে!

বনওয়ারী কি বলবে এ বেহায়াকে! মাথলার ছেলেটা মরল! আরে, মরল তো তোরই পাপে, তোরই শয়তানির কারণে।

করালী বললে—এবার যদি এমন হয় তো সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো মিলিটারী হাসপাতালে সাপের বিষের ইনজেশন আছে।

এবার বিরক্তিভরে বনওয়ারী বললে—ওরে, তু যা, যেখানে যেছিস যা বুঝেছিস। যা, আপন পথে সোজা চ'লে যা।

—যাব, যাব। কেরাসিনের কি হ'ল সেই কথাটা শুনে যাই। কি বললে তোমার বড়কর্তা? চোরার একশেষ উটি!

হুঙ্কার দিয়ে উঠল বনওয়ারী—করালী!

করালী গ্রাহ্য করলে না। হনহন ক'রে চ'লে গেল। যাবার সময় বললে—পাপ নাই তা আমি জানি।

জল নামল। বনওয়ারীর পাওয়া খবরও সত্যি, তাদের খবরও সত্যি। মিলে গেল। সকালবেলা থেকেই নামল—রিমি-ঝিমি রিমি-ঝিমি। মেঘ যেন নেমে এল বাবার শিমুলগাছের মাথার গায়ে। মেঘের পর মেঘ, হু-হু ক'রে চ'লে যাচ্ছে। পাতলা কালচে কুণ্ডলী-পাকানো মেঘ। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে ত্রিভুবন।

বনওয়ারী হালের মুঠো চেপে ধ'রে বলদ দুটোকে থামালে। ব্যাপার তো ভাল নয়। এ যেন প্রলয়ের মেঘ। দূরে হাল বইছিল প্রহ্লাদ। সে তাকে হাকলে।

প্রহ্লাদ থমকে দাঁড়িয়েছে। সে বললে—হুঁ।

—নামবে নাকি? পেল্লাদ?

প্রহ্লাদ একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে নামবার লক্ষণ যেন মিলে যাচ্ছে। নামবে হাতী। আকাশ থেকে হাতী নেমে থাকে। দু-দশ বছর অন্তর নেমে থাকেন দেবরাজের হাতী। কাল সন্ধ্যাতে যেন তার লক্ষণ ছিল। বনওয়ারীর বুঝতে পারা উচিত ছিল। সন্ধ্যেকালের সেই লাল ছটা-মাখা আকাশভরা মেঘের মধ্যে সিঁদুরের মত লাল গোল মেঘখানি বার বার ঠেলা দিয়ে উঠছিল। সে তো মেঘ নয়। দেবহস্তীর সিঁদুর-মাখানো গোল মাথা সেটি। দেবরাজও তবে এবার ক্ষেপলেন। ক্ষেপবেনই তো! বাবা-ঠাকুরের কোপ হয়েছে, উনপঞ্চাশ সালে পবন মেতেছেন, দেবরাজার কি না ক্ষেপে, না মেতে উপায় আছে? হাতী নামবে! নামবে কি? নামল। ওই—ওই দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে, সায়েবডাঙার মাঠের ওপারে বরমপালির খোয়াইয়ের পারে আকাশ থেকে নেমেছে—দেবহস্তীর প্রলয় শুঁড়। মেঘ থেকে দশটা তালবৃক্ষের মত—মোটা গোল একটা থাম সোঁ-সোঁ ক'রে নামছে—মাটির দিকে। থাম নয়, হাতী! হাতীর শুঁড়! মাঠের মধ্যে রব উঠল—পালা—পালা—পালা।

—গরু খুলে দে, হাল থেকে গরু খুলে দে। গোবধ হবে।

খোলা পেতেই ভয়ার্ত গরুগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে লেজ তুলে ছুটল, ডাকছে—হাম্বা—হাম্বা।

গাই ডাকছে বাছুরকে। বাছুর ডাকছে গাইকে। ছাগলগুলো চেঁচাচ্ছে। ভেড়াগুলো নীরবে ছুটছে। হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক শব্দ ক'রে জল থেকে উঠে ঘরে গিয়ে ঢুকছে। চকিত হয়ে ভয়ার্ত পাখীগুলো একসঙ্গে কলরব ক'রে ডাকছে। গাছের শাখায় হনুমানগুলো ডাল আঁকড়ে ধ'রে ভয়ে কাঁপছে।

পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখে বনওয়ারীর বুকের ভিতরটাও গুর-গুর ক'রে উঠল। চারিদিক জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত লম্বা কালো প্রলয় স্তম্ভের মত বিরাট এবং গোল—দেবহস্তীর সে শুঁড় ঘুরপাক খেতে খেতে এক ভীষণ সোঁ-সোঁ-সোঁ-সোঁ ডাক ছেড়ে চ'লে আসছে।—পালাও পালাও। ওর মধ্যে পড়লে রক্ষে নাই। আছড়ে পাড়বে

মাটিতে, দম বন্ধ ক'রে মেরে মাটিকে কাদার মত ছেঁটে তার মধ্যে আধ-পোঁতা ক'রে দিয়ে যাবে। মাঠসুদ্ধ লোক ছুটে পালিয়ে গেল উত্তর মুখে ; বনওয়ারীও ছুটে গিয়ে দাঁড়াল জাঙলের আমবনের আশ্রয়ে।

দেবলোকের হাতী ইন্দ্ররাজার বাহন। জল দেন ইন্দ্ররাজা। হাতীতে চ'ড়ে মহারাজা মেঘের সাত সমুদ্র ঘুরে বেড়ান, তাঁর বাহন মেঘের সাত সমুদ্র থেকে শুঁড়ে জল টেনে নিয়ে ছিটিয়ে দেয় চারিধারে—ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো। মধ্যে মধ্যে ইন্দ্ররাজা হাতের 'ডণ্ড'—তার নাম 'বজ্জডণ্ড' অর্থাৎ বজ্রদণ্ড, সেই 'ডণ্ড' দিয়ে মেঘের সমুদ্রে আঘাত করেন। তা থেকে ঝলকে উঠে আগুনের লকলকানি। কড়-কড়-কড়-কড় শব্দে বাজ ডেকে ওঠে। কখনও কখনও পাপী-তাপীর উপর এসে পড়ে সেই বাজ। পাপী শুধু মানুষই নয়, গাছপালা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ—সবার মধ্যেই পাপী আছে। কখনও কখনও ইন্দ্ররাজার ভাই পবনদেবও তাঁর সঙ্গে বার হন—এই ছিল নিয়ম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইন্দ্ররাজার হাতীটা ক্ষেপে উঠে পিলখানা থেকে শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেঘের সাত সমুদ্রে। তখন মেঘ কালো হয়ে তোলপাড় করতে থাকে। মনে হয়, দিন বুঝি রাত হয়ে গেল। তখন সেই ক্ষ্যাপা হাতী নামিয়ে দেয় তার লম্বা শুঁড় মাটি পর্যন্ত, দোলাতে দোলাতে চলতে থাকে। যেদিকে যায়, সেদিকে এমন জল দিয়ে যায় যে, মাঠ-ঘাট ভেসে সে এক প্রলয় কাণ্ড বেধে যায়। ধুয়ে মুছে ধান উপড়ে আল ভেঙে তাণ্ডব ক'রে তোলে। মাইতো ঘোষ বলেন—জলস্তম্ভ। হে বাবাঠাকুর, হে কালারুদ্র, মাইতো ঘোষের অপরাধ নিয়ো না।

হঠাৎ প্রহ্লাদ তার হাত ধ'রে টানলে। সে প্রহ্লাদের দিকে তাকাতেই প্রহ্লাদ বললে—কি, হ'ল কি তোমার ? আসছে যে !

এসে পড়েছে সেই প্রলয় জলস্তম্ভ। গোঁ-গোঁ গর্জন ক'রে আসছে। সমস্ত লোক মাটিতে শুয়ে প্রণিপাত জানাচ্ছে। বনওয়ারীরও খেয়াল হ'ল, সে উপুড় হয়ে শুয়ে প্রণাম জানালে—নমো নমো নমো, হে দেবতার বাহন ! তুমি কি এসেছ প্রভু, বাবাঠাকুরের বাহনের মৃত্যুর শোধ নিতে ? আগুন

জ্বালিয়ে তাকে মেরেছে—তুমি জল ঢেলে তার শোধ নিতে এলে? সে ধীরে ধীরে শুধু মাথাটি তুললে।

হাতীটা আসছিল পশ্চিম দিক থেকে পুব মুখে। আকাশ আর মাটিতে একাকার ক'রে শুঁড় দুলিয়ে দেবতার ক্ষ্যাপা হাতী মাঠে ভুঁইয়ে জল ঢেলে ঠেসে মেরে চ'লে গেল জাঙলের কোল ঘেঁষে—বাবাঠাকুরের 'থান'টিকে বাঁয়ে রেখে, সোজা পুবমুখে হুই চ'লে গেল নদীর ধারে। ওঃ! মহাশব্দে ধ্বসিয়ে দিলে খানিকটা পাড়! ওই ওপারে গিয়ে ঘুরছে—ঘুরছে! ওই গিয়ে পড়ল মহিষ-ডহরীর ডোমপাড়ার ধারে। ডোমপাড়ার শেষ প্রান্তে রামকালী ডোমের ওই ঘর। ক্ষ্যাপা হাতীর ক্ষেপামির কথা কে বলতে পারে? রামকালীর অপরাধের কথাই বা কে জানে? রামকালী ডোমের ঘরের উপর পড়ল আক্রোশ। চাপালে সেই ঘরের উপর তার 'পেল্লায়' শুঁড়। হুড়-হুড় ক'রে ঢাললে জল, হুড়হুড় ক'রে ভেঙে পড়ল ঘরখানা, ঘরের লাগোয়া ছিল একটা তালের গাছ, গাছটার গোড়া খুলে উপড়ে ফেলে দিলে সেটাকে। তার পর ওই চলল, ওই। কি হ'ল? থামল? হ্যাঁ হাতীকে থামতে হয়েছে, শুঁড় গুটাচ্ছে। বোধ হয় ক্ষ্যাপা হাতীর সন্ধানে বেরিয়ে 'ইন্দরাজা' ধরেছেন তার নাগাল; মাথায় মেরেছেন 'ডাঙশ'। ওই যে—কড় কড় ক'রে বাজ ডেকে উঠল। হাতী শুঁড় গুটিয়ে ওই চ'লে গেল স্বস্থানে।

যাক। বনওয়ারী এর মধ্যে একটা ভরসা পেলে। বাঁশবাঁদির কোন অনিষ্ট হয় নি। বাবাঠাকুর আছেন। যান নি। 'যাব' বললেই যেতে দেবে কে? কাহারপাড়া বিল্ববৃক্ষটিকে যেমন আঁকড়ে ধ'রে টেনে তুলেছে, তেমনি ভাবে আঁকড়ে ধরবে। বনওয়ারী কেঁদে ফেললে।

হে বাবা, তুমিই ভরসা কাহারপাড়ার, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। যদিই নামে আবার ক্ষ্যাপা হাতী, তবে রক্ষে ক'রো তুমি। আঙুল দেখিয়ে ব'লো—ইধার নেহি, উধার যাও। ব'লে দিয়ো, দেখিয়ে দিয়ো—ওই চন্নপুরের কারখানাকে। আর ওই আকাশে উড়ে যাচ্ছে—দিন নাই, রাত নাই, বর্ষাবাদল নাই, ঝড় ঝাপটা নাই, ওই উড়ো-জাহাজগুলোকে। মাথার উপর দিয়ে গোঁ-গোঁ ক'রে

আসছে যাচ্ছে, ওইগুলোকে শুঁড়ে ধ'রে মাটিতে আছাড় মেরে ফেলতে হুকুম দিয়ো।

ওঃ, হ-হ্-হ-হ! কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে মেঘের ভেতরে ভেতরে যাচ্ছে—বুঝবার উপায় নাই; কেবল গোঙানি শোনা যাচ্ছে।

আঃ, ছি-ছি-ছি! কাহারপাড়ায় আবার 'ল্যাই' অর্থাৎ কলহ লাগালে কারা? তীব্র তার স্বর এরোপ্লেনের গোঁঙানিকেও ছাপিয়ে কানে এসে পৌঁছল বনওয়ারীর। মেঘের দিকে চেয়ে উড়ো-জাহাজটিকে দেখা আর তার হ'ল না। পাড়ায় ছুটতে হ'ল।

পাড়াতেও তার যাওয়া হল না। বড়ঘোষের ডাক নিয়ে চাকরের সঙ্গে দেখা মাঝপথে।—এক্ষুনি, এক্ষুনি। বড়কর্তা রাগে কাঁপছে।

সত্যিই রাগে কাঁপছেন বড়কর্তা। বড়কর্তার রাগই স্বভাব। ওই এমনি কেঁপেই থাকেন। সামান্য কারণেই ক্ষেপে যান।

চীৎকার ক'রে উঠলেন বড়কর্তা।—আমার উপরে নালিশ!

—নালিশ! আপনার উপরে? আমি?

—হ্যাঁ। কিছু জান না তুমি? করালীকে দিয়ে নালিশ করাও নি?

—আজ্ঞে? আপনকার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমি কিছু জানি না। মিছে বলি তো বজ্জাঘাত হবে মাথায়। অঙ্গ খ'সে যাবে।

করালী চন্ননপুরে ইউনিয়ন-বোর্ডের আপিসে নালিশ করেছে, দরখাস্ত করেছে—কাহারদের কেরোসিন দেওয়া হয় না কেন? যদি হয়, তবে সে তেল নেয় কে? তার খোঁজ করা হোক। এবং তাদের বরাদ্দ তেল দেওয়ার হুকুমনামা এই খোদ আপিস থেকে দেওয়া হোক।

বনওয়ারী মাথায় হাত দিলে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে উঠল। বললে—এর পিতিবিধান আমি করব। চরণে হাত দিয়ে ব'লে গেলাম আপনাকে।

ফিরল সে পাড়ায়। ঝগড়া তখনও চলছে—তুমুল ঝগড়া।

আজ ঝগড়া বেধেছে—সুচাঁদ এবং নয়ানের মায়ের মধ্যে। সর্বনাশ!

সুচাঁদ ধেই-ধেই ক'রে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে, আর মোটা গলায় চীৎকার করছে—বেটার মাথা খেয়েছিস, এইবার চোখের মাথা খাবি। ভাতে হাত দিতে ছাইয়ের গাদায় হাত দিবি। ভূত হয় নাই বলছিস ? দেখবি লো, দেখবি। সে ওই মাগীর ঘার ভাঙবে, ওই মিনসের ঘাড় ভাঙবে, তা'পরে তোর ঘাড়ে চাপবে। তু ঘাড় নাড়বি, চুল দোলাবি, আর বলবি—আঁমি কাঁলোশশী। কথার শেষে সুচাঁদ সর্বাঙ্গ দুলিয়ে দুই হাত নাড়া দেয় বার কয়েক।

ওদিকে নয়ানের মা তীব্র স্বরে ব'লে যাচ্ছে—সুচাঁদের বলার সঙ্গেই ব'লে যাচ্ছে—হে বাবাঠাকুর, তুমি ধ্বংস করো বাবা, যে তোমার বাহনকে মারলে, যে পরের ঘর ভাঙলে, গাঁয়ের বিধান না মেনে যে উঁচু ঘর বাঁধলে, তাকে ধ্বংস ক'রো—তাকে ধ্বংস ক'রো। যেমন ক'রে উড়ো-জাহাজ পেড়ে ফেললে আজ তেমনি ক'রে পেড়ে ফেলো।

চমকে উঠল বনওয়ারী। উড়ো-জাহাজ পেড়ে ফেললে কি ?

নসুবালা সংবাদ এনেছে—সাঁইথিয়ার ময়ূরাক্ষীর ধারে একখানা উড়ো-জাহাজ আজ মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে। নীচে নামছিল, হাতীর শুঁড়ে জড়িয়ে তাকে মাটিতে আছাড় দিয়ে ফেলেছে। করালী গেল সাঁইথিয়া সেই 'ম্যান'দের সঙ্গে। বসনকে খবর দিয়েই সে বিলাপ করতে করতে ফিরেছে চন্ননপুর।

জয় বাবাঠাকুর! জয় দেবরাজার হস্তী! জয় ধর্মের! বনওয়ারীর অন্তর অপরূপ শান্তিতে ভ'রে উঠল। বুকে বল পেলে।

সদর্পেই সে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হ'ল তাকে। ওদিকেও একটা ঝগড়া বেধেছে যেন। গোপালীবালার গলা মনে হচ্ছে। আর একটা সুবাসীর। পানাও নিজের ঘরে ব'সে গাল দিচ্ছে। কি হ'ল ?

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় ঝগড়ার কারণ যত জটিল, তত বিচিত্র। আজ দুটো ঝগড়া একসঙ্গে পাকিয়েছে। একদিকে নসু খবর এনেছে উড়ো-জাহাজ ভেঙেছে। নয়ানের মা সেই শুনে উল্লাসে নাচছে। ওদিকে আজ বিকালে অর্থাৎ বনওয়ারী যখন মুনিব-বাড়িতে ছিল, তখন আর-এক কাণ্ড ঘ'টে গিয়েছে

রমণ আটপৌরের ঘরে ; রমণের স্ত্রী—সুবাসীর মাসী, কালোশশীর বোন—হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। জ্ঞান অবশ্য হয়েছে, কিন্তু এখন সে ঘোরের মধ্যেই প'ড়ে রয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হয় নাই লোকের। এলোচুলে লঙ্কা নুন পেঁয়াজ দিয়ে পান্তা ভাত খেতে বসেছিল সে আজই ভরা দুপুরবেলায়, সেই সময়—। আজ শনিবার অমাবস্তে। ক্ষণের মুখে এই লোভনীয় খাদ্য খেতে বসায় এঁটো হাতের সুযোগে এবং এলোচুলের অপরাধে তাকে পেয়েছে কোন অশান্ত প্রেতলোকবাসী। এবং সে প্রেতলোকবাসী যে কে, বাবাঠাকুরের কৃপায়, হাঁসুলী বাঁকের উপকথার শিক্ষায় তাও কাহারদের জানতে বাকি নাই। সে আর কেউ নয়, সে হ'ল কালোশশীর প্রেতাত্মা। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে তার, 'অঙে'র খেলার সাধ মেটে নাই তার, অঙের খেলায় লঘু-গুরু জ্ঞান হারিয়ে নিজের স্পর্শে 'বাম্ভন'তুল্য ছত্রি জাতের ভূপসিং মহাশয়ের জাতিপাত করার পাপ নিয়ে সে মরেছে, সে ওই দশা পাবে বইকি!

পানা তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে—সে আজও পুত্রশোক ভুলতে পারে নাই। সে যোগ দিচ্ছে—বাবার থানের ধূপ পিদীম অপবিত্র করে দিয়েছে। হবে না! আমি সাজা পেয়েছি, আরও কত জনকে পেতে হবে।

ওদিকে মৃত কালোশশীর সম্বন্ধে এই সকল তথ্যের প্রতিবাদ করেছে তার বোনঝি সুবাসী। সে ঘরে এসে কাঁদতে বসেছিল! কান্নার মধ্যে সে মাসীর প্রেতাত্মাকে ডেকে বলেছিল—তুমি যদি তাই হয়ে থাক, তবে লাও—লাও, শত্তুদিগে লাও।

এই কান্নার প্রতিবাদ করেছিল বনওয়ারীর বড়বউ। বলেছিল—ভরাভর্তি বেলায় এমন ক'রে কেঁদো না তুমি।

এই প্রতিবাদে সুবাসী কেঁদে বলেছিল মৃত মাসীকে উদ্দেশ ক'রে—ওগো, কত ভালবাসতে গো আমাকে তুমি, আমার রূপকার কর। লাও—লাও, আমার শত্তুকে লাও, তোমার শত্তুকে লাও। আমার কাঁটা তুলে দাও।

'কাঁটা' মানে সতীন-কাঁটা। সতীন মানেও শত্রু। সতীনের চেয়ে বড় শত্রু

কে? এই লেগেছে ঝগড়া গোপালীবালা এবং সুবাসীর মধ্যে। পাড়ার সকলেই গিয়েছে দেখতে। এর মধ্যে সুবাসীর সঙ্গে পাখীর ভাব আছে ব'লে এবং কালোশশী বনওয়ারীর প্রিয়তমা ব'লে—নয়ানের মা গোপালীর পক্ষ নিয়েছে। ঠিক সেই কারণেই সুচাঁদ নিয়েছে সুবাসীর পক্ষ। করালী এবং পাখীর উপর আর সুচাঁদের রাগ নাই। করালী তাকে পাকি মদ খাইয়েছে, কাপড় দিয়েছে, পায়ে ধরেছে, কোলে ক'রে নেচেছে। নয়ানের মা সুবাসীকে বলেছে—মরলে যদি ভূত হয়, আর ভূত যদি কথা শুনত, তবে স্বামী-পুত্র শ্বশুর-শাশুরী একঘর ভূত থাকত আমার। আর যার ঘাড় ভাঙতে বলতাম, তারই ঘাড় ভাঙত। মরণ!

তার প্রতিবাদ সঙ্গে সঙ্গে করেছে সুচাঁদ—মরলে ভূত হয় না? তোর ঘাড়ে যখন চাপবে তখন বুঝবি।

এই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সুবাসী প্রতিবাদ করতে গিয়েছে তার মাসী কালোশশীর প্রেতত্ব বা পেত্নীত্ব প্রাপ্তির। কিন্তু তারই পক্ষ নিয়ে সুচাঁদ তীব্র প্রতিবাদে প্রমাণ করতে আরম্ভ করেছে—কালোশশী নিশ্চয় পেত্নী হয়েছে এবং সুবাসীর শত্রুদের সে নিপাত করেছে।

বনওয়ারীর নিজের বাড়ি অবশ্য এখন স্তব্ধ। গোপালীবালা, সুবাসী—দুজনেই চুপচাপ শুয়ে আছে আপন আপন ঘরের দাওয়ায়। ভাত পর্যন্ত হয় নাই। বনওয়ারীর সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল নিজের স্ত্রীদের উপর। সুবাসীর উপরেই রাগটা বেশী হ'ল। আজ সে জানতে পারলে, সুবাসীর সঙ্গে পাখীর নাকি ভাব আছে; তার উপর কালোশশীর প্রেতাত্মাকে ডেকেছে। একটা লাঠি টেনে নিয়ে তার চুলের মুঠো ধ'রে সে তাকে ঠেঙাতে আরম্ভ করলে। তাকে ঠেঙিয়ে সে ঠেঙালে গোপালীবালাকে। তাকেও দিলে অল্প কয়েক ঘা। তারপর সে লাঠি হাতে এসে দাঁড়াল সুচাঁদ এবং নয়ানের মায়ের মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে সুচাঁদ পিছু হঠতে লাগল। কয়েক পা পিছু হঠে সে হনহন ক'রে চলে গেল মাঠের দিকে। সেখানে কোথাও বসে সে গাল দেবে, পরিশেষে সে কাঁদবে মৃত বাপকে স্মরণ ক'রে, কারণ বনওয়ারী ভাইপো

হয়ে তাকে লাঠি দেখিয়েছে। নয়ানের মা কিন্তু পালাল না। সে বিড়ালীর মত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পানার উদ্দেশ নাই। সে ঘরে খিল দিয়েছে। বউ বললে—জ্বর হয়েছে, শুয়েছে।

—দাদা! ঠিক এই সময় কে পিছন থেকে ডাকল।

—কে?

—আমি বসন।

হ্যাঁ, বসন। বসনের কোন অপরাধ নাই; তবুও করালী-পাখীর কারণে তাকে দেখে বনওয়ারী প্রসন্ন হতে পারলে না। গম্ভীর মুখে বনওয়ারী বললে —কি?

একখানা কাগজ তার হাতে দিয়ে বসন বললে—তোমার কাড।

—কাড?

—হ্যাঁ। কেরাচিনি চিনি—এই সবের ছাড়। নেওনাইন-বোড থেকে দিয়েছে, নসু দিয়ে গেল আমাকে। সেকেটারি করালীকে দিয়েছিল। জাঙলের হেদো মণ্ডলের ছেলে আইছিল, সে সবারই দেখে সবাইকে দিয়েছে, এইটি তোমার।

কার্ডখানা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে বনওয়ারী। তারপর সে বার হ'ল পাড়ায়। নিউনাইন-বোডে এমন কথা বলতে করালীকে কোন্ কাহার বলেছে?

কেউ বলে নাই।

সকলে চুপ ক'রে রইল।

—ফেলে দাও কাড।

প্রহ্লাদ বললে—ব্যানো ভাই!

—না।

না লয়।—একটু শক্ত হয়েই সে বললে—সে ভাই অল্যায় হবে। ভেবে দেখ তুমি। কাড দিয়েছে নিউনাইন-বোড। আমরা বেগার দি। আমাদের কাড কেনে ফেলে দোব?

—হুঁ। কিন্তু যদি কেউ শুধায়, ঘোষ মশায় তোমাদের কেরাচিনি মেরে দিত কি না?

—তা কেন বলব? সে বলব কেন?

—করালীকেও বলতে তোমরা বল নাই?

—না, কেউ বলে নাই। মুখ থাকতে নাকে ভাত কেউ খায় নাকি? বললে তোমাকে বলতাম আমরা।

—বাস্। বাস্। প্রহ্লাদ বনওয়ারীর ছেঁড়া কার্ডখানি এনে জুড়তে লাগল।

বাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে মনে মনে বাবাঠাকুরকে ডাকতে লাগল।

ঝম ঝম ক'রে জল নেমেছে আকাশ ভেঙে। আবার হাতী নামবে না কি?

কে ডাকছে এর মধ্যে! কে? দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে! সুবাসী দরজা খুলতে গেল, কিন্তু ধমক দিয়ে বনওয়ারী বললে—অ্যা-ই-!

কে জানে কে? মানুষ কি না তাই বা কে জানে? কালোশশী নয়, কে বলবে? আজ আবার কালোশশী সাড়া দিয়েছে।

—কে—কে তুমি?

—কাঙাল, কাঙাল আমি। অমনকাকার বউ মারা গেল, খবর দিতে এসেছি!

—মারলে তবে কালোশশী? বনওয়ারী বাবার নাম ক'রে বেরিয়ে এল।

পাঁচ

জয় বাবাঠাকুর! শাওন পার হ'ল। চাষ ভাল। ভালয় ভালয় কেটে যাচ্ছে, বিপদ আসছে, কাটছে। এর চেয়ে আর ভাল কি হবে? ভাদ্র এল। ভাদুরে রোদে চাষী বিবাগী হয়। প্রচণ্ড রোদে জম-জমাট ধান-ক্ষেতের মধ্যে সারা অঙ্গ ডুবিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ক্ষেতের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত

আগাছা নিড়িয়ে বেড়াতে হয় ; ধানের চারার করকরে পাতার ঘর্ষণে সারা দেহ মেজে যায়, ফুলে ওঠে, ধানচারার ভিতরে ওই রোদের ভাপসানিতে শরীরে গলগল ক'রে ঘাম ঝরে। তখন মনে হয়, বাড়ি-ঘর কাজ-কর্ম ছেড়ে বিবাগী হয়ে চ'লে যায় কোন দিকে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় 'পিথিমীর' সব জায়গার মতই আষাঢ় যায়, শাঙন যায়, ভাদ্র আসে। আষাঢ় শাঙন যে কেমন ক'রে কোন্ দিকে যায় তা কাহারেরা জানতে পারে না। কাদায় জলে হাঁসুলী বাঁকের ক্ষেতে বুক পেড়ে প'ড়ে থাকে, মাথার উপরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে, গুর-গুর শব্দে মেঘ ডাকে। শাঙন শেষ হ'লে খেয়াল হয়, ক্ষেতে রোয়ার কাজ শেষ হ'ল। রোয়া শেষ হ'লে বাবাঠাকুরকে প্রণাম করে, আর আয়োজন করে বাবাঠাকুর তলায় ইঁদপূজোর। 'ইঁদ হলেন ইন্দ্ররাজা, যিনি বর্ষায় জল দিলেন, তাঁর স্বর্গরাজ্যের রাজলক্ষ্মীর এক অংশ পাঠিয়ে দিলেন 'ভোমণ্ডলে' অর্থাৎ ভূমণ্ডলে। ইঁদপূজোর ব্যবস্থা করেন জমিদার, খেটে খুটে যা দিতে হয় তা কাহারেরা দেয়, মাতব্বরি করেন জাঙলের জোতদার মণ্ডল মহাশয়েরা। জমিদার দেন পাঁঠা, বাতাসা, মণ্ডা, মুড়কী, দক্ষিণে দু আনা ; মণ্ডল মহাশয়েরা পাঁঠার 'চরণ' অর্থাৎ ঠ্যাঙ বৃত্তি পান, বাতাসা-মণ্ডার প্রসাদ পান, কাহারেরা শেষ পর্যন্ত ব'সে থাকে, ইঁদরাজার পূজোর শেষে থানটির মাটি নিয়ে পাড়ায় ফেরে। ওই মাটিতে পাড়ার মজলিসের থানটিতে বেদী বাঁধে, জিতাষ্টমীর দিন ভাঁজো সুন্দরীর পূজো হয়। ভাঁজো সুন্দরীর পূজোতে কাহারপাড়ায় 'অঙখেলার' চব্বিশ প্রহর হয়ে থাকে, সে মাতনের হিসেবনিকেশ নাই। ভাঁজো সুন্দরীর বেদী তৈরী ক'রে লতায় পাতায় ফুলে সাজিয়ে, আকণ্ঠ মদ খেয়ে মেয়েপুরুষে মিলে গান কর আর নাচ। রাত্রে ঘুমাতে নাই, নাচতে হয়, গাইতে হয়,—জাগরণ হ'ল বিধি। পিতিপুরুষের কাল থেকে দেবতার হুকুম 'অঙে'র গান—'অঙে'র খেলা যার যা খুশি করবে, চোখে দেখলে বলবে না কিছু, শুনলে দেখতে যাবে না। ওই দিনের সব কিছু মন থেকে মুছে ফেলবে।

হারামজাদা করালী এবার জাঁক ক'রে চন্ননপুর থেকে এসে নিজের উঠানে

কাহারপাড়ার পুরানো ভাঁজোর সঙ্গে আলাদা ক'রে ভাঁজো পাতলে। হেঁকে বললে—ঘর ভাঙলে থানাতে নালিশ করেছিলাম, ভাঁজো ভাঙলে মিলিটারী কোর্টে নালিশ করব। দুজনা লালমুখো সাহেব সেই ওর 'ম্যান'রা এল করালীর সঙ্গে। ফটোক তুললে। তারাও ট্যাং ছুঁড়ে ছুঁড়ে নাচলে। তারা চ'লে গেল। চোলাই মদও খেয়ে গেল বোধ হয়। সায়েবে ঘেন্না ধ'রে গেল বনওয়ারীর। করালী সায়েব দেখালে বটে!

ওরে বেটা, বনওয়ারী ওসব দেখে ভয় খায় না। সায়েব! থুঃ!

বনওয়ারীও হুকুম দিলে—লাগাও জোর ধুমধাম ভাঁজোতে। এবার মাঠে প্রচুর ধান হয়েছে। কোন রকমে আশ্বিনে একটা মোট বর্ষণ হ'লেই আর ভাবনা নাই। যুদ্ধের বাজারে ধানের দর চড়ছে, বিশেষ ক'রে শাওন মাসে। চন্নপুরে দেশ দেশান্তরে স্বদেশীবাবুরা 'অ্যাল-লাইন' তোলাতুলির পর থেকে বাজার আরও লাফিয়ে চড়ছে। তা চড়ুক, তাতে কাহারেরা ভয় পায় না। নুন ভাত খাওয়া অভ্যেস আছে। তাই বা খাবে কেন? মাঠে মাছ হয়েছে এখন, মাছ আর ভাত, শাক-পাতেরও অভাব নাই। মাঠের জল শুকালে পুকুরে বিলে মা-কোপাইয়ের গর্ভে আছে শামুক গুগলি কাছিম ঝিনুক। ছেঁড়া কাপড় পরাও অভ্যেস আছে, সুতরাং যুদ্ধের আক্রাগণ্ডায় হাঁসুলী বাঁকের ভাবনা নাই। বরং ধান এবার বেশি হবে—কাহারেরা ভাগেও বেশি পাবে, দর চড়লে লাভ হবে তাদের। সুতরাং করালীর সঙ্গে পাল্লা দিতে লেগে যাও বুক ঠুকে। আগে পাল্লা হ'ত আটপৌরেপাড়ার সঙ্গে, এখন হবে করালীর সঙ্গে। বাবাঠাকুর বোধ হয় সদয়। হাসছেন বেশী, রোষ করলে সে ভুরু-তোলা রোষ। ভাদরের রোদ-মেঘের খেলার মত। এইবার কাটবে মেঘ। কালারুদ্দুর গাজনে এবারও বনওয়ারী হয়েছিল ভক্ত, লোহার কাঁটা-মারা চড়কপাটায় চেপেছিল, বাবার মাথায় আগুনের ফুল চড়িয়েছিল; সে সব কি বৃথাই যাবে?

বাবা পূজো হাসিমুখে নিয়েছেন। তারই ফলে কাহারপাড়ার এবার সময় ভাল।

মোট কথা, ওদিক দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে বনওয়ারী। হাতী নেমে বাঁশবাঁদির ক্ষতি করে নাই, উড়ো-জাহাজ ভেঙে পড়েছে। এই দুটি কারণে ওদিক দিয়ে তার ভয় কেটেছে। আর আছে কালোশশীর ভয়। তার ভয়ও ভুলেছিল বনওয়ারী, কিন্তু রমণের বউকে মেরে আবার যেন ভয় ধরালে নতুন ক'রে। তাও হাতে আছে মা-কালী বাবা-'কালারুদ্দু' কর্তাঠাকুরের মাদুলী। ভয়-কাটার সঙ্গে এবারের এই মাঠভরা ধানের ভরসা তাকে সাহস দিয়েছে অনেক। এ কথাও তার মনে উঁকিঝুঁকি মারছে যে, মন্দ তার এখন হতেই পারে না; এইটাই তার চরম ভালর সময়, কপাল তার ফিরেছে। সায়েবডাঙার 'আচোট' মাটির জমিতে সবুজ ধান দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। যাকে বলে—'চৌকস' ধান, তাই হয়েছে। ঘোষেদের ভাগের জমিতেও ধান খুব ভাল। এরই মধ্যে একবার ধনের পাতা কাটতে হয়েছে। ধানের গোছা হয়েছে মহিষের পায়ের গোছের মত। বনওয়ারীকে এবার খামার বাড়াতে হবে। খামার বাড়বে, একটা মরাইও করবে শক্ত ক'রে। আর চাই 'পুত্তু'সন্তান, ওইটি হ'লেই তার বাসনা পূর্ণ হয়। বাঁচতে হবে অনেক দিন। ছেলেকে ডাগর ক'রে, মাতব্বরির গদিতে বসিয়ে তবে বনওয়ারী নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারবে। এদিক দিয়ে ভয় তার করালীকে। এই যুদ্ধের বাজারে কলে 'ওজগার' করছে দু হাতে, আর গায়েও ক্ষমতা আছে, বুকেও আছে দুর্দান্ত সাহস। সে যদি ছেলেকে ছোট রেখে মরে, তবে করালী জোর ক'রে চেপে বসবে মজলিসের মাতব্বরির পাথরে। হওতো মেরেও ফেলতে পারে কলে কৌশলে। ওই কারখানার কাজের লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে দেবে কলের মুখে ঠেলে। তাকে অনেক দিন বাঁচতে হবে। কাহারপাড়ার মঙ্গল করতে হবে, তাদের দুঃখে কষ্টে বুক দিয়ে পড়তে হবে, পর্বে পার্বণে প্রচুর আনন্দ দিতে হবে। প্রচুর আনন্দ।

বড়লোক মহাশয়েরা, জাঙলের সদ্‌গোপেরা, বাউরী হাড়ি ডোম এদের বলেন—ছোটলোকের জাত! সদাশয়েরা বলেন—গরিব দুঃখী, দুখ মেহনত ক'রে খায়। দুটো কথাই সত্যি। গরিব দুঃখীরা আনন্দ ভালবাসে—আনন্দ পেলেই

ছুটে যায়! আবার ছোট মনেরও পরিচয় দেয়, চিরকাল যেখানে আনন্দ ক'রে আসছে, সেখানের চেয়ে আজ অন্যখানে নতুন ক'রে বেশি আনন্দের ব্যবস্থা হ'লে—চিরকালের স্থান ছেড়ে সেইখানে ছুটবে! করালী আজ তাই করতে চাইছে। রোজকারের গরমে ভাঁজো পেতেছে নিজের 'আঙনাতে' অর্থাৎ আঙিনায়। আলো আনবে ভাড়া ক'রে; বেহালাদার আনবে, 'হারমনি' আনবে; চন্নপুরের কারখানায় যত জাত-খোয়ান মেয়েদের আনবে, তারা নাচবে নসুবালার সঙ্গে। সিধু আসবে, পাখী তো আসবেই। আরও কতজন আসবে।

আসুক। বনওয়ারীও আলো ভাড়া করেছে। খুব ভাল ঢোল সানাই কাঁসি ভাড়া করেছে। হুকুম দিয়েছে—বেবাক 'যোবতী' অর্থাৎ যুবতী কাহার-কন্যে-বউকে নাচতে হবে। সবুজ লাল হলদে রঙ এনে দিয়েছে, কাপড় ছুপিয়ে রঙিয়ে নাও। সুবাসীও নাচবে। সুবাসীকে একখানা রঙিন শাড়িই কিনে দিয়েছে সে। গোপালীবালাও নাচবে। তাকেও কাপড় কিনে দিয়েছে। ছোকরাদের হুকুম দিয়েছে—তুলে আন বেবাক পুকুরের পদ্ম আর শালুক ফুল। সাজাও ভাঁজোর বেদী। এ সমস্তের ভার দিয়েছে পাগল কাহারকে। সেই চাষের সময় পালিয়েছিল, হঠাৎ কাল—ভাঁজোর আগের দিন সে ঠিক এসেছে। ভর্তি দুপুরে মাথায় আট-দশটা ডাঁটিসুদ্ধ শালুক ফুল জড়িয়ে মাঝখানে একটা কাঁচা কাশফুল গুঁজে বুড়ো-ছোকরা গান গাইতে গাইতে হাঁসুলী বাঁকে ফিরেছে—

কোন্ ঘাটেতে লাগায়েছ 'না' ও আমার ভাঁজো সখি হে!
আমি তোমায় দেখতে পেছি না।
তাই তো তোমায় খুঁজতে এলাম হাঁসুলীরই বাঁকে—
বাঁশবনে কাশবনে লুকাল্‌ছে কোন্ ফাঁকে!
ইশারাতে দাও হে সখি সাড়া
আ-ঙা চরণে তোমার লুটিয়ে পড়ি গা
ও আমার ভাঁজো সখি হে!

পাগল-সাঙাতের বলিহারি আছে।

কুড়ুতাং-কুড়ুতাং-তাক্-তাক্-তাক্-তাক্ শব্দে ভাঁজো পরবের ঢোল বেজে উঠল। মাঠের কাজ নাই আজ, মনিববাড়ি নাই আজ, কাহারেরা কেউ আজ 'আজার'ও প্রজা নয়, মহাজনেরও খাতক নয়; কোপাইয়ের পুলের উপর দিয়ে গাড়ি যাওয়ার সময়সঙ্কেতের দিকেও কেউ কান দেবে না; উঠানে সূর্যঠাকুরের রোদ কোন্ সীমানা পার হচ্ছে, সেদিকেও কেউ তাকাবে না। দুধোল গাই-গরুর বাছুরগুলিকে আগেকার কালে এই দিনটিতে বাঁধাই হ'ত না; ওরা পেট ভ'রে দুধ খেত। আজকাল ভোররাত্রে দুধ দুইয়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়? ওদের ছেড়ে দাও হাঁসুলী বাঁকের ধারে—চরভূমিতে। ইচ্ছামত চ'রে খাক। তাতে দু-চারখানা জমির ধান খেয়ে নেয়—নিতে দাও। হাঁড়ি-হাঁড়ি মদ 'রসিয়ে' উঠেছে ভাদুরে গরমে—ঢাকনি খুলতেই বাতাসে গন্ধ বেরিয়েছে। কাহারপাড়ার মাথার উপরে ওই গন্ধে কাকের দল কলরব করছে, মাটির দিকে চেয়ে দেখ—পচা ভাতের কুটির জন্য পিঁপড়েরা সার ধরেছে, কুকুরগুলো ঘুরঘুর ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাগল ঢোলের বাজনার বোলকে নিজের মনের মত ক'রে পাল্টে নিয়ে বলছে—'কাজকাম' 'পাটকাম্' থাক্ থাক্ থাক্ থাক্! নাচ না কেনে মেয়েরা, নাচ না কেনে গো! চল্, কোপাইয়ের ঘাট থেকে ঘট ভ'রে আনি, নে 'পাঁচ আঁকুড়ি'র সরা মাথায় নে। 'পাঁচ আঁকুড়ি' অর্থাৎ পঞ্চাঙ্কুর।

বনওয়ারী নিজে মদ ছাঁকতে বসেছে। 'ম্যাতা' অর্থাৎ পচুই-ছাঁকা পচা ভাতগুলো ফেলে দিচ্ছে কুকুরগুলোকে; ডাব বেঁধে কতক দিচ্ছে ছেলেদের হাতে—দিয়ে আয় গরুগুলোর মুখের কাছে, বলদ গাই বাছুর—সবাইকে দিবি। খাক, আজকের দিনে সবাই খাবে। ভেড়া হাঁস মুরগী—ওদিকেও দে।

এইবার আয় তোরা, ব'সে যা। লে ঢকাঢক, লে ঢকাঢক। মেয়েরা, লে গো, তোদের ভাগ তোরা নিয়ে যা। লে ঢকাঢক। বায়েনরা লাও ভাই। বাজাও, বেশ মধুর ক'রে বাজাও। সানাইদার, দেখব তোমার এলেম—করালী হারামজাদা বেহালা হারমনি এনেছে, কাণা ক'রে দিতে হবে। লে ঢকাঢক।

"ভাঁজো লো সুন্দরী, মাটি লো সরা
ভাঁজোর কপালে অঙের সিঁতুর পরা।
আলতার অঙের ছোপ মাটিতে দিব,
ও মাটি, তোমার কাছে মনের কথা বলিব,
পঞ্চ আঁকুড়ি আমার ধর লো ধরা।"

এইটুকু গান হ'ল—মন্তরের মত। এ সব দলকেই গাইতে হবে। ও দিকে নসুবালার দল বার হয়েছে। করালী নিজে বাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছে। কাপড়-চোপড়ের ঘটা খুব ওদের। সব 'লতুন' কাপড়। চন্নপুরের পাপের পয়সা যে, হবে না কেন? কিন্তু তবু রঙের ছটা কাহারপাড়ার মেয়েদের কাপড়েই বেশি। নতুন-ক'রে রঙ-করা পুরানো কাপড়গুলি রঙের গাঢ়তায় ঝকমক করছে।

কোপাইয়ের ঘাটে একদফা গালাগালি হয়ে গেল দুই দলে। গানে গালাগালি। চিরকাল হয়ে আসছিল কাহারপাড়ায়—আটপৌরেপাড়ায়। এবার হচ্ছে কাহারপাড়ায় আর করালীর দলের মধ্যে। এক দিকে পাগল, অন্য দিকে নসুবালা। এই ভাঁজোর দিনে নসু পাগলের কথায় ক্ষ্যাপে না, ভয় করে না। সমান মাতনে মাতে। মুখে মুখে গান বেঁধে গেয়ে গালাগালি—যে কোন গালাগালি। তবে তার মধ্যে শাপশাপান্ত নাই। 'অঙে'র গাল—'অসে'র গাল।

তারপর ঘাট থেকে ফিরে আরম্ভ হ'ল আপন আপন এলাকায় নাচ আর গান। প্রথমেই নিয়ম—চিরকালের নিয়ম—বয়সওয়ালা মেয়েরা নাচতে আরম্ভ করবে। চিরকাল এ নাচ আরম্ভ করে সুচাঁদ। এবার সুচাঁদ গিয়েছে করালীর দলে। এখানে কে নাচবে?

পাগল ছুটে গিয়ে ধ'রে নিয়ে এল গোপালীবালাকে। গোপালীবালার নেশা ধরেছে, তবুও লাজুক মানুষ বলছে—না না। তার উপর পাগলের তাকে সাঙা করতে চাওয়ার কথা মনে ক'রে সে বেশী লজ্জা পাচ্ছে। মুখে 'অঙ' ধরেছে লজ্জাতে। সকলে খুব হেসে উঠল।—বলিহারি ভাই—বলিহারি ভাই!

বনওয়ারীর মন কিন্তু উদাস হয়ে গিয়েছে। মনে পড়ছে কালোশশীকে। তবু সে হাসছে, না হাসলে চলবে কেন? হঠাৎ তার নজরে পড়ল ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে নয়ানের মা। বড় মায়া হ'ল তার উপর। আহা, সব হারিয়ে নিরানন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! মনে প'ড়ে গেল সব কথা। সে এগিয়ে গিয়ে ধরলে তার হাত। বললে—এস, তুমি আমি আগে নাচব।

'ভাঁজোর পরব' সুখের দিন। মদের নেশায় মাথা ছমছম করছে, আকাশে মেঘ কেটেছে, নীলবরণ মেঘের তলায় ঝাঁকবন্দী সাদা দুধবরণ বক উড়ে চলেছে, নীলের বাঁকে গোরাকান্দায় পদ্ম-শালুক ফুটেছে, পদ্মপাতায় জলের টোপা টলমল ক'রে রোদের ছটায় ঝলছে যেন মানিক-মুক্তোর মত : শিউলি ফুল ফুটে টুপ টাপ ক'রে ঝরে পড়ছে। স্থলপদ্ম গাছগুলিতে ফুল ফুটেছে কাহারপাড়া আলো ক'রে, কোপাইয়ের বুকের বান নেমে গিয়েছে, ঘোলা জল সাদা হয়ে এসেছে ; তবু নয়ানের মায়ের সুখ কোথায়? আউশধানে থোড় হয়েছে—দশ মাসের পোয়াতীর মত থমথম করছে আউশের মাঠ ; পুকুরে পুকুরে শোলমাছেরা ঝাঁকবন্দী বাচ্চা নিয়ে বেড়াচ্ছে ; ডালে ডালে পাখীরা কচি বাচ্চাদের ছাড়ান দিচ্ছে—যাও, তোমরা উড়ে বেড়িয়ে চ'রে খাও গিয়ে। জাঙলে চন্ননপুরে মা-দুর্গার কাঠামোয় মাটি পড়েছে : কাল গিয়েছে জিতেষষ্ঠী। আজ কি নয়ানের মা নয়ানকে ভুলতে পারে? নয়ান যেদিন করালীর হাতে মার খেয়ে হাঁপাচ্ছিল, সেদিনও তার মনে পড়েছিল পুরানো কথা। সেদিনও সে বনওয়ারীর হাত ধ'রে টেনেছিল বাঁশবনের আঁধার রাজ্যের দিকে। কিন্তু আর না—আর না। সে বনওয়ারীর হাত ছাড়িয়ে ছুটে চ'লে গেল নিজের ঘরের দিকে। তার পরে প্রথমে সে ডাকলে নয়ানকে।—ফিরে আয়, সবাই নাচছে, তুই নাই শুধু। ফিরে আয়। তারপর আরম্ভ করলে সে গোটা কাহারপাড়াকে অভিসম্পাত দিতে।

বনওয়ারী স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ কি হ'ল?

পাগল তার হাত ধ'রে টেনে বললে—কিছু নয়। ও দিকে কান দিস না। নাচ্। সে টেনে নিয়ে এল সুবাসীকে। মনের নেশায় সুবাসী টলমল করছে

পদ্মপাতায় জলের টোপার মত। চোখে যেন আধখানা চাঁদ নেমেছে; গায়ে যেন জ্বরের মতন তাপ।

বাঁশের বাঁশি কে বাজায় রে? কে?

বনওয়ারী দেখলে, করালী কখন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের ভাঁজোতলায়, তার আর সুবাসীর নাচ দেখে হাসছে, গানের সঙ্গে বাঁশি বাজাচ্ছে। ইয়া টেরি, পোশাকের বাহার কত, গায়ে খোসবয় উঠছে!

বনওয়ারী বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এল। কিন্তু পাগল ধরলে তাকে।—খবরদার! তু কত বড় মানুষ মনে আকিস। পিতিপুরুষের বাক্যি মনে কর্। আজ অঙের দিন—চোখ থাকতে দেখো না, কান থাকতে শুনো না, পরাণ যা চায় তা অমান্যি ক'রো না। লে লে, বাজা বাঁশি করালী, বাজা বাঁশি।

করালী সুবাসীর দিকে চেয়ে রয়েছে। পাগল তাকে দিলে খোঁচা।—বাজা না কেনে? দেখিস কি? সকলে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। পানা হাসছে সবচেয়ে বেশি। কাঁসার বাসনের আওয়াজের মত তার খনখনে আওয়াজের হাসি। সুবাসীও হেসে উঠল খিলখিল ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাচের চুড়িগুলোও ঝুনঝুন ক'রে বাজল।

বনওয়ারীর সারা অঙ্গ নিসপিস করছে। গায়ে তাপ বেরুচ্ছে। কিন্তু উপায় নাই, পিতিপুরুষের বারণ। তবে সেও যাবে নাকি করালীর ভাঁজোতলায়? পাখীও তো নাচছে সেখানে! ছি-ছি-ছি! হে বাবাঠাকুর! হে ধরমরাখার মালিক, তুমি রক্ষা কর!

যার সঙ্গে ভাব নাই তার সঙ্গে কাহারেরা হাসে না। কিন্তু করালী চন্ননপুরের কারখানায় গিয়ে অন্য রকম হয়েছে। চন্ননপুরের বাবুরা ভাব না থাকলেও হাসেন। মুখুজ্জেবাবুরা এবং চাটুজ্জেবাবুরা চিরকাল মামলা-মকদ্দমা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ক'রে আসছেন, কিন্তু বাইরে থেকে দেখে বুঝবার জো নেই। এ-বাবুরা ও-বাবুর বাড়ি যাচ্ছেন সকালে, বিকালে ও-বাবুরা এ-বাবুদের বাড়ি আসছেন, হাসিখুশি রঙ-তামাশা গালগল্প গান-বাজনা করছেন। দেখে অবাক

হয়ে যায় বনওয়ারী। করালীও, দেখা যাচ্ছে তাই শিখেছে। বনওয়ারীকে বললেও—একবার আমার ভাঁজোর থানে এস কাকা। পাকি মদ—

বনওয়ারী রূঢ়ভাবে মধ্যপথেই বললে—না।

করালী হাঁসতে হাসতে চ'লে গেল। সে হাসি দেখে সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল বনওয়ারীর। হারামজাদা চ'লে গেল কত রঙ্গ ক'রে, শিস দিতে দিতে, সারা ভাঁজোতলায় একটা সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে। বাবুদের মত 'আতর খোসবাই' মেখেছে!

পানা ছড়া কেটে উঠল।—"ভাদোরে না নিড়িয়ে ভুঁই কাঁদে 'রবশ্যাষে'—অজাতে পুষিলে ঘরে সেই জাতি নাশে?"

বনওয়ারী রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকালে পানার দিকে, পানা আজ কিন্তু ভয় পেলে না। আসরটাই আজ ভয় পাবার আসর নয়, ভাঁজো সুন্দরীর আসর 'অঙে'র আসর, আনন্দের আসর, আজ ছোট-বড় নাই; তার উপর পেটে মদ পড়েছে প্রচুর। পা টলছে, মন চনচন করছে। সাহস বেড়েছে। পানা বনওয়ারীর রূঢ়দৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রেই বললে—আমার দিকে তাকালে কি হবে বল? জাত আর থাকবে না, অজাত ঢুকেছে ঘরে। বানের জল ঘরে ঢোকালে—ঘরের জলও তার সাথে মিলে বেরিয়ে যায়। দেখ গা, করালীর আসরে বেবাক ছেলেছোকরারা জুটে যেয়েছে।

বনওয়ারী স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে ব'সে থেকে সে উঠল; উঠে গিয়ে মদের জালার কাছে ব'সে একটা ভাঁড় নিয়ে গলগল ক'রে গলায় মদ ঢালতে লাগল। দেখতে দেখতে পিথিমী যেন ঘুরতে লাগল—নাচতে লাগল তার চোখের সম্মুখে। মনে মনে ডাকতে লাগল বাবাঠাকুরকে। সুবাসী নাচছে, গোপালী নাচছে, প্রহ্লাদের মেয়ে, গুপীর বেটার বউ নাচছে, পাগল গান গাইছে। বনওয়ারী কিন্তু তা দেখছেও না। তার দৃষ্টি বাবাঠাকুরের থানের দিকে। শুক্লাষ্টমীর চাঁদ অনেকক্ষণ ডুবে গিয়েছে, বাবাঠাকুরতলায় অন্ধকার থমথম করছে। কিন্তু বনওয়ারী দেখতে পাচ্ছে, বাবাঠাকুর বেল-গাছটির ডালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বাবা, শুধু দাঁড়িয়ে থেকো না। একবার হাঁক মেরে বল—সাবোধান—সাবোধান! নইলে ইশারা দাও। জানান দাও। চম্‌কিয়ে দিয়ে সকলকে সাবোধান ক'রে দাও। চিরকাল দিয়ে এসেছ বাবা, আজ এই সঙ্কটের সময় তুমি চুপ ক'রে থেকো না। হাঁসুলীর বাঁকের উপকথায় অনেক নজীর আছে। সুচাঁদ বলে—আটপৌরেপাড়ার দল যে বারে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল, সে বারে বাবা সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন।

—আনার ঘুরঘুটি আত, শাওন মাস, আকাশে অল্প ছিলছেলানি ম্যাঘ। আটপৌরেরা ডাকাতি করতে বার হ'ল। অ্যাই—অ্যাই জোয়ান। লাটি ঘোরাচ্ছে যেন বন্-বন্, বন্-বন্। তার আগুতে বাবাঠাকুরের হুকুম হয়েছে—চুরি ছাড়, চাষ কর। কাহারেরা চাষ ধরলে; আটপৌরেরা অক্তের ত্যাজে মাথার গরমে মানলে না। একবার ডাকাতি, দুবার ডাকাতি, তিনবার—চারবার ক্ষমা করলেন, পাঁচবারের বার শাওন মাসে যেই ফের বার হবে—এই দুখানা মাঠ পেরাল্‌ছে, অমুনি কড় কড় ক'রে বাজ পড়ল বাবার দহের ধারে শিমুলগাছের পাশে তালগাছের মাথায়। তবু মানলে না, না-মেনেই যেই যাওয়া অমুনি পিতিফল হাতে হাতে। তিনজনা আটপৌরে ধরা প'ড়ে গেল।

চৌধুরী মহাশয়দের, যে বারে জাঙল বাঁশবাঁদি মহল নীলাম হয়, সেবারে চৌধুরীদের নাচগানের আসরে আটচালার চালে আগুন জ্বলে উঠেছিল তোমার ইশারায়, যে আলো চিরকাল আসরে জ্বলত—পঞ্চাশবাতির আলো, সেই আলোই জ্বলছিল, সেই আলোর শিষ গিয়ে লাগল দড়িতে, দড়ি বেয়ে আগুন লাগল চালে, পঞ্চাশবাতি আছাড় খেয়ে পড়ল। 'কেরাচিনির' তেল ছড়িয়ে পড়ল, জ্বলতে লাগল। বাবা ইশারা দিয়েছিলেন—সাবোধান! মা-লক্ষ্মী চঞ্চল হয়েছেন—নাচ গান মদ মাতালির সময় নয় এখন। কিন্তু কাকে বলছ? কে শুনছে? চৌধুরীরা শোনে নাই—ছ মাসের মধ্যে নীলাম হয়ে গেল সব।

তেমনি ক'রে সাবধান ক'রে দাও। জ্বলে উঠুক করালীর ঘরের চাল, নইলে যারা গিয়ে জুটেছে ওই জাতনাশার আসরে—তাদের চালে। আমাদের

ভাঁজোর আসরে আজই সাবধান ক'রে দাও বাবা সকলকে। না না বাবা, গাঁয়ের ভেতরে আগুন জ্বেলো না বাবা। তাতে কাজ নাই। গরিবের সর্বনাশ হবে বাবা। গাঁয়ের ধারে তালগাছের মাথায় ওই পরমার ঘরের কানাচে ওই সবচেয়ে উঁচু গাছটার মাথায় বাজ ফেলে দাও। না হয়, পরমার ঘরখানা পতিত পড়েছে,—পরমা ফেরার, কালো বউ মরেছে—ওই ঘরটায় আগুন জ্বলে তো জ্বলুক। হ্যাঁ বাবা, তাই জ্বলুক।

পাগল বললে—আর মদ খাস না বনওয়ারী। উঠে আয়। গোপালীবউকে ঘব নিয়ে যা, বে-এক্তার হয়েছে।

নাচতে নাচতে মাতাল হয়ে গোপালীবালা মাটিতে শুয়ে পড়েছে, বমি করছে।

বনওয়ারী উঠে দাঁড়াল। চোখ দুটো তার লাল হয়ে উঠেছে, মদ খেয়ে চোখ অবশ্য সকলের লাল হয়েছে, কিন্তু বনওয়ারীর চোখে যেন লালের সঙ্গে ভর চেপেছে!

পাগল ভয় পেলে, ভয়ের সঙ্গেই ডাকলে—বনওয়ারী!

বনওয়ারী চোখের ইঙ্গিত ক'রে একটা আঙুলে নির্দেশ দিয়ে কি দেখালে, বললে—কত্তাবাবা, বাবাঠাকুর!

—কি? কি বলছিস?

—সাবোধান!—বাবা বলছে। বনওয়ারী টলতে টলতে চ'লে গেল বাবাঠাকুরের 'থানের' দিকে। সুবাসী নাচতে নাচতে থেমে গেল। বনওয়ারীর পিছনে পিছনে খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়াল। একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে সে ফিরল কিন্তু ভাঁজোতলার দিকে নয়। ওদিকে ভাঁজোতলার সকলে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। পাগল বললে—ভাগ্ শালো, বেজায় মদ খেয়েছে! লে—লে, সব গান কর্। আমি গোপালীবউকে বাড়িতে শুইয়ে দিয়ে আসি।—উঁহু, ও পেল্লাদের বউ, তুমি যাও ভাই, গোপালীবউকে তুমিই ধ'রে নিয়ে যাও।

পেল্লাদের বউ মুচকে হাসল।—কেনে হে? ভয় নাগছে না কি? অঙের ভয়?

পাগলও হাসলে, সঙ্গে সঙ্গে গান ধরলে—

যে অঙ আমার ভেসে গেল,
কোপাই নদীর জলে হে!
সে অঙ যেয়ে লেগেছে সই
লালশালুকের ফুলে হে!
(কোপাই নদীর জলে হে!)
সেই শালুকে মন মানালাম
সকল দুখো পাসরিলাম
তোমার মনের অঙের মলা
তুমিও দিয়ো ফেলে হে
(কোপাই নদীর জলে হে!)
নিত্য নতুন ফোটে শালুক
বাসি ঝ'রে গেলে হে
(কোপাই নদীর জলে হে!)

গান চলতে লাগল। মেয়েরা নাচছে। গোপালীবউ যেমন প'ড়ে ছিল, প'ড়েই রইল। ঘরে ধ'রে নিয়ে যাবার কথা সকলে ভুলে গেল মুহূর্তে।

ওদিকে করালীর আসর খুব জমেছে। ওদের গান হালফ্যাশানের গান। কলের গানের 'রেকর্ডে'র গান। বাঁশের বাঁশি—বাঁশেরো বাঁ-শি, বাঁশেরো বাঁ-শি—খুব গাইছে মেয়েগুলো নসুবালার সঙ্গে। কিন্তু করালীর বাঁশি শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ বনওয়ারী চীৎকার করতে করতে ফিরে এল—সাবোধান! সাবোধান! ওই দেখ্ ওই দেখ্!

বাঁশবাঁদির চারি পাশে রাত্রির অন্ধকার ঘন ঘুরঘুটি হয়ে রয়েছে, তারই মধ্যে এক জায়গায় জলজল ক'রে আগুন জলছে। ধোঁয়ার গন্ধ আসছে। ভাদ্র মাসের ভিজে খড়-পোড়া ধোঁয়ার গন্ধ। আগুন! আগুন! বনওয়ারী

ধড়াস ক'রে প'ড়ে গেল ভূতগ্রস্তের মত। গোপালী উঠে বসল হঠাৎ। সে মদের নেশায় রাঙা চোখে বিভ্রান্তের মত চেয়ে রইল বনওয়ারীর দিকে।

পুরুষেরা সকলেই ছুটে গিয়ে পড়ল আগুনের ধারে। আটপৌরেপাড়ার —পরমের ঘরে নয়, রমণের ঘরে। রমণের ঘরও শূন্য প'ড়ে আছে, সে থাকে বনওয়ারীর বাড়িতে। বউ মরার পর থেকেই সে অসুস্থ হয়ে শয্যা নিয়েছে বনওয়ারীর দাওয়ায়।

আগুন কিছুক্ষণের মধ্যেই নিবে গেল। ছোট ঘরের চালে অল্প কিছু খড় তাও ভিজে, তাতেই আগুন লেগেছে; এদিকে কাহারপাড়া ও আটপৌরেপাড়ায় মরদের দল অনেক। আগুন নিবিয়ে আবার সব ফিরল ভাজোতলায়।

নয়ানের মা তীব্রস্বরে গাল দিচ্ছে—হে বাবা, সব পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দাও, যে আগুনে তোমার বাহনকে পুড়িয়েছে, সেই আগুনে সব শ্যাষম্যাস ক'রে দাও।

পাখী বললে—সে কই? সে?

নসু বললে—তাই তো! সে আবার গেল কমনে?

করালী ফিরল আরও কিছুক্ষণ পরে। কারও কোন প্রশ্নের জবাব দিলে না, নাচতে লাগল, সে কি নাচ! পাখীকে টেনে নিলে সঙ্গে।

বনওয়ারীর চেতনা হ'ল সকালবেলায়। মাথার মধ্যে খুব যন্ত্রণা আর একটা আতঙ্ক। গোপালীবালা কেশবেশ এলিয়ে অগাধ ঘুমে অসাড় হয়ে শুয়ে আছে ঘরের দাওয়ায়। সকালবেলায় ভাঁজো ভাসিয়ে স্নান ক'রে ঘরে ঢুকল সুবাসী। যুবতী মেয়ে, শক্ত শরীর, মদ খেয়েও সে একেবারে অচেতন হয়ে পড়ে নাই। বনওয়ারী তার দিকে একবার তাকালে, কিন্তু কোন কথাই বললে না। তার মাথার মধ্যে ঘুরছে যেন একটা ভয়।

সুবাসী তার দিকে তাকিয়ে হাসলে একটু।

স্নান ক'রে এলেও সুবাসীর অঙ্গ থেকে একটা মৃদু সুবাস উঠছে যেন। কিন্তু বনওয়ারীর নাকের কাছে ভনভন ক'রে মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে—মদের গন্ধ উঠছে তার সর্বাঙ্গ থেকে।

ছয়

সমস্ত সকালটাই সে কেমন ‘থম্ব’ অর্থাৎ অসাড় হয়ে ব’সে রইল। সমস্ত পাড়াটা এখনও নিঝুম। বাসি ভাঁজো অর্থাৎ ভাঁজোর পরদিন এমন নিঝুম কোন কালে হয় না। কিন্তু কাল রাত্রে ওই রমণের ঘরের ভিজে চালে আগুন লাগায়, পাড়ার লোক ভয়ে যেন অভিভূত হয়ে পড়েছে। মদের নেশাকে যতক্ষণ আমোদের মাতন দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায়, ততক্ষণ আমোদে মেতে বেশ থাকে কাহারেরা, কিন্তু মাতন বন্ধ হ’লেই অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মদ খেয়ে পাল্কী কাঁধে চলে দশ ক্রোশ—পাল্কী কাঁধ থেকে নামিয়ে গামছা পেতে শুলেই আসে মরণ-ঘুম।

পাড়ার সকলেই প্রায় সেই কাণ্ডের পর ঘুমিয়ে পড়েছে। বনওয়ারীর চোখের উপর এখনও স্বপ্নের মত ভাসছে—অন্ধকারে রাত্রির মধ্যে রমণের চালের রক্তরাঙা দগদগে আগুন। আর কানের পাশে বাজছে নিজের কণ্ঠস্বর —সাবোধান—সাবোধান!

তারপর মনে পড়ছে, সে গিয়েছিল বাবাঠাকুরের থানের দিকে—সেই গভীর রাত্রে। স্পষ্ট মনে পড়ছে, কে যেন তাকে ঘাড়ে ধ’রে নিয়ে গিয়েছিল।

বাবাঠাকুর বললেন—সাবোধান!

বনওয়ারী বলেছিল বাবাকে—ভরা কলি বাবা, একালে মানুষকে মানুষে মানে না। তুমি নিজে মাহাত্ম্য দেখাও বাবা। হাঁক মারো বাবা। বাঁচিয়ে তোল তোমার বাহনকে, তাকে বল বাবা, আকাশে তুলুক ফণা—করালী, এই পাপ করালীর কোঠাঘরের মাথায় নিশ্বেসে জ্বালিয়ে দিক বাবা, আর জ্বালিয়ে দাও পরমের ঘর, ওই ঘরে আছে সর্বনাশী কালো বউয়ের প্রেতাত্মা।

বাবাঠাকুর বলেছেন—হবে হবে। একে একে হবে।

কিন্তু পরমের ঘর না জ্বালিয়ে রমণের ঘর জ্বালালে কেন বাবাঠাকুর?

গরুগুলি ডাকতে শুরু করেছে। মায়েরা ডাকছে, ছায়েরা সাড়া দিচ্ছে,

মায়ের স্তনে দুধ জ'মে উঠেছে, বাঁটগুলি টনটন করছে, মায়েরা তাই ডাকছে। অথবা বাচ্চাগুলির ক্ষিদে পেয়েছে—তারা ডাকছে, মায়েরা সাড়া দিচ্ছে। বনওয়ারী এই ডাকে সচেতন হয়ে উঠল। টলতে টলতেই উঠে দাঁড়াল।

মাতব্বরের দায় অনেক। পাড়াকে জাগাতে হবে। ভাঁজো সুন্দরী শালুক ফুলের মালা প'রে, সিঁদুরের টিপ প'রে পায়ে, মল বাজিয়ে কোপাইয়ের জলের তলা দিয়ে স্বস্থানে গেলেন, কাহারপাড়ার লোকের আর তো শুয়ে থাকলে চলবে না, উঠতে হবে। ঘর আছে, দোর আছে, গরু বাছুর ছাগল ভেড়া হাঁস মুরগী আছে, ঘরদোর নিকুতে হবে, গরুর দুধ দুইতে হবে, ছাগল ভেড়া হাঁস মুরগী ঘর থেকে ছেড়ে দিতে হবে। দুধের যোগান দিয়ে আসতে হবে চন্ননপুরে বাবু মহাশয়দের বাড়িতে। মাঠে সবুজবরণ ধান ডাক দিচ্ছে—আমার আশে-পাশে আগাছা জমেছে, তুলে দাও, নিড়িয়ে দাও। জাঙলের সদ্‌গোপ মনিব মহাশয়েরা রাগে দাঁত কিস-কিস করছেন। ভাদ্রমাসে এই ভাঁজো পরবের উপর তাঁদের ভয়ানক রাগ ; চাষের সময় ঢোল বাজিয়ে মদ খেয়ে ধেই ধেই ক'রে নেচে গোটা একটা দিন কামাই তাঁরা কোন মতেই সইতে পারেন না। একদিন গোটা কামাই গিয়েছে, আবার আজ কামাই হ'লে আর রক্ষে থাকবে না। মারধোর গালমন্দকে তত ভয় করে না কাহারেরা, ভয় হ'ল পেটের, মনিব যদি ধান 'বাড়ি' অর্থাৎ ধার দেওয়া বন্ধ করেন, তবে সর্বনাশ হবে।

সে প্রথমেই ডাকল গোপালীকে।—বড়্‌কী, ওঠ্‌, ওঠ্‌। বড়্‌কী!

গোপালীর তবু কোন সাড়া নাই। একেবারে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছে। কি বিপদ! গাই দুইতে হবে, গরু ছাড়তে হবে। তার নিজের অনেক কাজ, সায়েবডাঙার জমিতে গিয়ে এবার পড়তেই হবে, নইলে আর নিড়ান দেওয়া হবে না। একে ভাঙা মাঠ, তার উপর নতুন জমি, জল শুকুচ্ছে হু-হু ক'রে। আকাশের মেঘ একবার ধরবে। ভাদ্র মাসে ইন্দ্ররাজা পনেরো দিন দেন চাষীকে অর্থাৎ রিমঝিমি জল দেন, আর পনেরো দিন দেন চর্মকারকে অর্থাৎ পনেরো

দিন দেন কাঠ-ফাটা রোদ, সেই রোদে তারা বর্ষাকালে সংগ্রহ করা চামড়া শুকিয়ে নেয়। রোদ উঠলে দিন পনেরো কুড়ি ভীষণ রোদ হবে। সায়েবডাঙার জল আগে শুকুবে, তখন আর আগাছা টেনে তুলবার উপায় থাকবে না। বনওয়ারীকে সায়েবডাঙায় যেতেই হবে।

বনওয়ারী এবার এগিয়ে এসে গোপালীর গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকলে—বড়্কী!

গায়ে হাত দিয়ে সে চমকে উঠল—ইস্, গা পুড়ে যাচ্ছে যে! এত উত্তাপ যে মনে হয়, গায়ে ধান পড়লে ফুটে খই হয়ে যাবে।

বনওয়ারী ডাকলে—বড়্কী! গোপালী!

গোপালী রক্তরাঙা চোখ মেললে—অঁ্যা! তারপর সে হঠাৎ ব'লে উঠল—সাবোধান! শুনে চমকে উঠল বনওয়ারী। সে বললে—কি বলছ? গোপালী ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল তার দিকে।

বনওয়ারী আবার বললে—জ্বর হল্ছে। উঠে ঘরে শো। সুবাসী! সুবাসী!

সুবাসী ওদিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এল কাপড় ছেড়ে।—কি?

ধর্, গোপালীর বেজায় জ্বর।

জ্বর! সুবাসী মুখ বেঁকিয়ে বললে—হবে না, যে মদ খাওয়ার ধুম! পাগলা-পিরীত—এমুনি বটে!

বনওয়ারী ধমক দিল তাকে।—যা বলছি তাই শোন্! ধর্, ঘরে শোয়ায়ে দিয়ে দুধ আজ তুই দুয়ে ফেল্। অমনকাকাকে বল্—গরু মাঠে নিয়ে যাক।

—উঃ—উঃ! তোর গায়ে বাস উঠছে কিসের? অঁ্যা?—গোপালীকে শুইয়ে দিয়েই বনওয়ারী জিজ্ঞাসা করলে।

সুবাসী বললে—গন্ধ কিসের উঠবে? মরণ! মদের গন্ধ উঠছে নিজের শরীর থেকে।

—না, মদের গন্ধ লয়। সুবাস উঠছে।

—তুমি ক্ষেপেছ?

—না।

—হ্যাঁ। তুমি ক্ষেপেছ! কাল এতে কি করেছ মনে আছে? না ক্ষেপলে ওই করে লোকে, না এমুনি বলে—সুবাস উঠছে তোর গা থেকে?

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল বনওয়ারী সুবাসীর মুখের দিকে।

সুবাসী বললে—কাল এতে তুমি অমনকাকার ঘর পুড়িয়ে দিলে?

চমকে উঠলে বনওয়ারী।

—জয় বাবাঠাকুর—জয় বাবাঠাকুর—কালোবউ, অপরাধ নিয়ো না, বাবাঠাকুরের হুকুম।—ব'লে বিড় বিড় ক'রে বকছিলে, সব শুনেছি।

বনওয়ারীর চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটে উঠল। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে সুবাসীর দিকে, মনে হচ্ছিল, চোখ দুটো তার ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

সুবাসী ভয়ে পিছিয়ে গেল।

বনওয়ারী ঘাড় নাড়তে লাগল—না না না।

ঘরের মধ্যে কাতরাচ্ছিল গোপালী—বিড় বিড় ক'রে বকছে জ্বরের ঘোরে।

সুবাসী বললে—যাও, যেখানে যাবে যাও। ভয় নাই। হাসতে হাসতে সে সতীনের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বনওয়ারীর মনে হ'ল, আবার যেন বাবাঠাকুর তার ঘাড়ে 'ভর' করতে চাচ্ছেন। হাত-পা কাঁপছে, কপালে ঘাম দেখা দিচ্ছে, চীৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছে—সাবোধান সাবোধান! বনওয়ারী ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিলে, তারপর চলল পাড়ার ভিতর। কিন্তু সুবাসটা কিসের?

ভাঁজোতলায় পাগল একলা ব'সে বায়েন ভাইয়ের ঢোলখানা নিয়ে কাঠির বদলে আঙুলের টোকা দিয়ে বাজিয়ে গুণগুন ক'রে গান করছে। বায়েনটা গাছতলায় প'ড়ে আছে। এখানে ওখানে শুয়ে অকাতরে ঘুমাচ্ছে কাহার-পুরুষেরা। মেয়েরা ঘুমাচ্ছে ঘরের দাওয়ায়। মেয়েদের মধ্যে নয়ানের মা জেগে ব'সে রয়েছে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে। এখনও সে সমানে গাল দিয়েই চলেছে।—হে বাবাঠাকুর! তোমার বাহনকে মারলে যারা, তাদের বাড়বাড়ন্ত

কেন বাবা? এ কি তোমার বিচার! একবার ক্ষেপে ওঠ বাবা! গাঁয়ের মধ্যে কোঠাঘরের মটকায় আগুন জ্বালো বাবা!

মধ্যে মধ্যে বনওয়ারীর ইচ্ছে হয়, এই মেয়েটার টুঁটি দুই হাতে টিপে ধ'রে তাকে চুপ করিয়ে দেয়। শুধু এই মেয়েটি সম্পর্কেই নয়, ঝগড়াটে মেয়েদের সম্বন্ধেই তার এই ইচ্ছে হয়। কিন্তু আজ সে ইচ্ছে হ'ল না। করালীকে অভিসম্পাত করছে করুক। ওই জন্যই তাকে সে ক্ষমা করলে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় যা কিছু হঠাৎ ঘটে, তাই দৈব। দেবতার রোষ বিনা অপরাধে হয় না—এই কথা শাস্ত্রে আছে,সেই কথাই তারা বিশ্বাস করে। দেবতাদের রোষ হ'লে জানতে হবে, অপরাধ হয়েছে, সে তুমি জেনেই ক'রে থাক আর অজানতেই ক'রে থাক। আবার সঙ্গে সঙ্গেই এ কথাও বিশ্বাস করে—'কে করলে ব্রহ্মহত্যে কার প্রাণ যায়!'

গোপালীবালা ওই অসুখে হঠাৎ তিন দিনের দিন মারা গেল। ওই কথাগুলির সবগুলিই বললে লোকে। সকলেই বললে—হঠাৎ মিত্যু আর এমন 'সাবোধান সাবোধান' ক'রে চেঁচাতে চেঁচাতে মিত্যু যখন, তখন দেবরোষ। দেবরোষের সাক্ষাৎ প্রমাণ—আভদ্রা বর্ষাকালে ভাঁজোর রাত্রে যে ঘরে মানুষ নাই, সেই ঘরের চাল জ্বলে ওঠা। বাবাঠাকুরের ক্রোধ হয়েছে। কিন্তু সে ক্রোধ গোপালীর উপর পড়ল কেন? কেউ বললে—যখন পড়েছে, তখন নিশ্চয় অপরাধ আছে বইকি! কেউ বললে—বনওয়ারীর অপরাধ কেউ দিতে পারবে না। অপরাধ আর কারুর।

নয়ানের মা শুধু কাকে যেন বলেছে—নয়ানের ঘর ভেঙে পাখীর সঙ্গে করালীর বিয়ে দেওয়া অধম্ম লয়, অপরাধ লয়? একশোবার হাজারবার অপরাধ। তাই দিলেন বাবাঠাকুর ওরও পাতানো ঘর ভেঙে। এ নিচ্চয়, এ নিচ্চয়।

কিন্তু ঘর ভাঙল কই? গোপালী গেল, সুবাসী আছে। বনওয়ারীর

দুঃখ অল্প-স্বল্প হবে, কিন্তু তুই সতীনের হাঙ্গামা থেকে তো বাঁচল। অনেক ভেবে-চিন্তে তারা বললে—সুবাসীর কপাল, চার চৌকস সুখের কপাল।

নয়ানের মা তার উত্তরে বলেছে—ও সব আমি মানি না। আমি যা বলছি তাই ঠিক। রাবণের মা নেকষার মত ব'সে আছি আমি বেটার মাথা খেয়ে, আমি যে দেখতে পেছি সব। এই তো কলির পেথম সনজে। এই তো আরম্ভ। গোপালীবউ ছিল ভাগ্যবতী, তাই সে আগেভাগে ড্যাঙডেঙিয়ে চ'লে গেল। সাবোধান সাবোধান—ক'রে সে শেষকাল পর্যন্ত চেঁচিয়ে গেল কেনে তবে? বাবার বাহনকে মেরেছে, তার সাজা হবে না? পাড়ার মাতব্বর তাকে সাজা দিলে না, মাতব্বরের সাজা হবে না?

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার সবচেয়ে বুড়ী হ'ল সুচাঁদ। করালী আর পাখীর জন্য বসন-সুচাঁদের এখন বনওয়ারীর সঙ্গে ঝগড়া নয়; বনওয়ারী পাড়ার মাতব্বর, তার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কাহারপাড়ায় কে বাস করতে পারে? করালী যে করালী, সে নাকি এখন পল্টনী পোশাক প'রে জুতো পায়ে খটমট ক'রে বেড়ায় মাথায় বেঁকিয়ে টুপি প'রে, পকেটভরা যার রোজগার, সে পারলে বাস করতে এখানে? ঘরখানা আছে, মাঝে মাঝে আসে, দু দণ্ড থাকে, পরবে পার্বণে একদিন এসে থেকে যায়, তাকে কি বাস করা বলে? বাস করে না বনওয়ারীর ভয়ে। সুতরাং বনওয়ারীর সঙ্গে পুরো ঝগড়া বসন-সুচাঁদের নাই। বনওয়ারীও তা করে না, মাতব্বরেরও একটা ধর্ম আছে, সে তা লঙ্ঘন করে না। তবু মনের মিল নাই। আর প্রতি কাজে বনওয়ারী সুচাঁদের পরামর্শ নেয় না। সুচাঁদও আসে না আগেকার মত হাঁকডাক ছেড়ে প্রতিটি কাজে। বলে না—তু তো কালকের ছোঁড়া রে, আমার বুকে দুধ ছিল তাই পরাণে বেঁচেছিস! আজ কিন্তু সুচাঁদ-বসন দূরে থাকতে পারলে না, সুচাঁদই সর্বাগ্রে ছুটে এল বুক চাপড়ে কাঁদবার জন্য। সে কাঁদলে বুক ভাসিয়ে, বললে—কিসের পাপ, কিসের অপরাধ! কিসের শাপ, কিসের শাপান্ত রে! পুণ্যবতী ভাগ্যবতী সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে ভরাভর্তি ভাদর মাসে ড্যাঙড্যাঙিয়ে চ'লে গেল

রে! হাসতে হাসতে চ'লে গেল রে! ছ মাস সতীন-কাঁটার দুখ ভোগ করলে না রে! আর আমি প'ড়ে অইলাম রে!

বনওয়ারী চুপ ক'রে ব'সে শুনছিল। কারুর কোন কথাই সে অবিশ্বাস করতে পারছিল না। সবই মেনে নিচ্ছে। নয়ানের মায়ের কথা গভীর ভাবেই তার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। সত্যই তো অপরাধ যদি না থাকবে, তবে এমন ভাবে মরল কেন গোপালীবউ? ভাদ্র আশ্বিন মাসে পিত্তি পড়ে, অম্বল হয়, জ্বরে পড়ে কাহারপাড়ার লোকেরা। বৈদ্যেরা বলে—পুরাতন জ্বর; ডাক্তারে বলে—'ম্যালোয়ারী'। কম্প দিয়ে জ্বর আসে, গলগল ক'রে পিত্তি বমি করে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে, আবার আসে। 'কুনিয়ান' খায়, পাঁচ দিন সাত দিন পর পথ্য পায়, বিছানা ছেড়ে ওঠে, আবার পনেরো-বিশ দিন পর পড়ে। এ কিন্তু তা নয়। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে বিকার। বিকার নয়, বাবাঠাকুরের আদেশ—'সাবোধান সাবোধান' ব'লে চীৎকার করলে শেষ পর্যন্ত। বনওয়ারীর মনে পড়ে, ভাজোর রাত্রের সেই কথা 'মন্দ স্বপনের' কথার মত। সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সুবাসীর কথা। রাগে সর্বাঙ্গ রি-রি করে। কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারে না।

আবার সুচাঁদ যখন কেঁদে বলে—পুণ্যবতী ভাগ্যবতী! তখন তাও সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে; সত্যই তো ড্যাঙড্যাঙ ক'রে চলে গেল! কপালে এক কপাল সিঁদুর, পায়ে আলতা দিয়ে, তার সবচেয়ে ভালো কাপড়খানি প'রে চ'লে যাচ্ছে গোপালীবউ; চারিদিক ভরাভর্তি! ভাদ্রের শেষ, আকাশে রোদ ঝলমল করছে, গোটা হাঁসুলী বাঁকের মাঠে সবুজবরণ ধান দলমল করছে, বাঁশবনের পাতায়, গাছপালার ডালে পল্লবে সবুজ থমথম করছে, রোদের ছটায় ঝলক মারছে, পুকুরগুলিতে পদ্মপাতা পদ্মফুল ফুটেছে, আঙিনাতে স্থলপদ্ম ফুটেছে, শিউলীফুল ঝরেছে শিউলিতলায়, কোপাইয়ের জলের রঙ ফিরছে—লাল জল কাঁচবরণ হয়ে এসেছে। হাঁসুলীর বাঁক সবুজ হয়েছে, তাই সোনার হাঁসুলী রূপোর বরণ নিচ্ছে শোভার জন্যে। নদীর কূলে কূলে কাশ 'ফুলিয়েছে' অর্থাৎ ফুল ফুটেছে। জাঙলে চন্নপুরে বোধনের ঢাক বেজেছে। লক্ষী

সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশ সিংহ অসুর সঙ্গে নিয়ে মা দুর্গা আসছেন। পূজোর উদ্যুগ চলছে, খামার পরিষ্কার হচ্ছে; সঙ্গে সঙ্গে আউশ ধান উঠবে—আউশের সবুজ রঙ ফিকে হয়ে 'লালি' অর্থাৎ লালচে আভা ধরেছে। এই ভরাভর্তি হাঁসুলী বাঁকে স্বামীকে রেখে সতীনকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল। লোকে ধন্য ধন্য করবে বইকি!

পাগল প্রহ্লাদ রতন—এরাই সকলে শ্মশানে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করলে। বসন এগিয়ে এসে আলতা পরিয়ে দিলে। বললে—তুমি ভাগ্যিমানী। আঃ, আমার পেরমাই নিয়ে যদি তুমি বাঁচতে আর আমি যেতাম!

বনওয়ারীর ভাল লাগল বসনের কথাগুলি। বসন বড় ভাল মেয়ে। কিন্তু করালীর জন্য বসন পার হয়ে গেল।

নসুবালাও এসেছিল। সেও মেয়েদের দলে মিশে কাঁদছে;—আঃ—আঃ—হায় হায় গো! গোপালীকাকী আমার মাটির মানুষ, সোনার পিতিমে গো! মুখে ঝরত অমিত্তি, কথা শুনে পরাণ জুড়াত, হাতে ছিল কোপাইয়ের ঠাণ্ডা পরশ, বুলিয়ে দিলে রঙ্গ জুড়িয়ে যেত। আঃ, কোথা গেলি মা গো—পাড়ার নক্ষী মা রে!

সুবাসী এক পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ নসুবালাই বললে—আঃ সুবাসী, তোর বাছা করণ দেখে শরীলটা রি-রি করছে আমার। বলি—দে, সিঁদুর ঢেলে দে—সতীনের মাথায় সিঁদুর দে, বল্—সোয়ামীর দাবি ছেড়ে দাও, তোমাকে আমি সিঁদুর দিলাম, আমার সিঁদুর তুমি বজায় একো।

পাগল ডাকলে—বনওয়ারী!

—কি?

—একখানা লতুন কাপড় চাই যে। শ্মশানে লাগবে। তা বাজারে তো মিলল না। বলে—কাপড় নাই।

বসন বললে—একটা কথা বলব বনোয়ারীদাদা? করালীর কাছে লোক পাঠাও, সে ঠিক বার করবে কাপড়। কোম্পানির দোকান আছে কিনা—

—না। বনওয়ারী ঘাড় নেড়ে বললে—কাপড় দরকার নাই। জাঙলে গিয়ে তাঁতীদের ঘর থেকে গামছা কিনে আন।

'যেমন কলি তেমনি চলি'। উপায় কি? কাল যুদ্ধ লেগেছে। বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। গতবার যুদ্ধ লেগেছিল, কাপড়ের দাম চড়েছিল—পাঁচ টাকা সাত টাকা জোড়া দাম হয়েছিল। এবার যুদ্ধে কাপড়ই নাই, মিলছেই না। গামছা প'রেই যাক গোপালী। তাই যাক। কি করবে বনওয়ারী! এ দুঃখ তার মরলেও যাবে না।

দাহ শেষ করে ফিরবার পথে সাতবার সাত জায়গায় কাঁটা দিতে হয়। প্রেতাত্মা পিছনে পিছনে আসে যে! ঘর-সংসারের মমতা মরলেই কি ছাড়া যায়? বনওয়ারী বড় বড় বাবলা-কাঁটা দিলে পথে। মনে মনে বললে—গোপালীবউ, তুমি তো পাপ কিছু কর না, স্বগ্‌গে তোমার ঠাঁই হবে। ঘরের লোভ তুমি ছাড়। তোমার জন্যে আমার অনেক দুঃখ। কিন্তু আমার এখন অনেক কাজ। কাহারপাড়া-আটপৌরেপাড়ার মাতব্বরি আমার ঘাড়ে। আমার—

মাথার উপর গোঙাতে গোঙাতে উড়ে আসছিল এক ঝাঁক উড়ো-জাহাজ। চলল বোধ হয় নতুন উড়ো-জাহাজের আস্তাবলে চন্ননপুরের কারখানার পাশে—করালী হারামজাদার এলাকায়! হু-হু-হু-হু। বুকের ভিতরটা গুরগুর করছে।

গ্রামে ঢুকবার পথে বাবাঠাকুরের থানে সে উপুড় হয়ে শুয়ে মনে মনে বললে—গোপালীর দিষ্টি থেকে অক্ষে কর বাবা। আমার এখন অনেক কাজ। কিন্তু ওটা কে? পাখী নয়? হ্যাঁ, সেই তো! গ্রামের বাইরে সেই কালো বউয়ের সঙ্গে দেখা-হওয়া বটগাছতলায় দাঁড়িয়ে কয়েকজন অল্পবয়সী ছোকরার সঙ্গে খুব কথাবার্তা বলছে। খুব হাত-পা নাড়ছে। কি কথা এত? যাক, মরুক, যা বলবে বলুক, বনওয়ারীর এখন ওদিকে দৃষ্টি দেবার মত মনের অবস্থা নয়।

একা বনওয়ারীর নয়, শববাহক দলের সকলেরই দৃষ্টি পড়েছিল। পাগল বললে—আঃ, পাখী দেখি কলকলিয়ে বুলি বলছে!

পানা বললে—হঁ্যা, করালী পড়িয়েছে ভাল, সেই বুলি বলছে! ভাঁজোর আত্তিরে চন্ননপুরে কাজের কথা বলেছে করালী। ছোঁড়ারা চুলবুল করছে সেই দিন থেকে। সেই সব কথা হচ্ছে। নিজে আসে নাই, পাখীকে পাঠিয়েছে।

বনওয়ারী কোন কথা বললে না। যত সে বাড়ীর কাছে আসছে, ততই মনে পড়ছে গোপলীবউকে। গোপালীবউ যেন তার জীবনটা জুড়ে বাস করত, তাই গোটা জীবনটাই আজ খালি ব'লে মনে হচ্ছে। যে যা করবে করুক, আজ আর কোন কথা বলতে তার ইচ্ছে হচ্ছে না।

বাড়িতে ঢোকবার মুখেই কিন্তু সে আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না। করালী ব'সে রয়েছে তার বাড়ীর উঠানে। বনওয়ারী চমকে উঠল। দূর থেকেই সে বেশ দেখতে পাচ্ছে—শরৎকালের শেষবেলার রোদ পশ্চিম মাঠের ঘন সবুজ ধানের উপর প'ড়ে দ্বিগুণ ছটা নিয়ে পড়েছে তার আঙিনার দাওয়ার উপর—খানিকটা গিয়ে পড়েছে খোলা দরজার মুখে ঘরের মধ্যে। সেইখানে ব'সে আছে সুবাসী। বড়ই চতুর সে। 'সান কেড়ে' অর্থাৎ ঘোমটা দিয়ে বসেছে বিনা কারণে। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে করালীর দিকে। করালী বনওয়ারীর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে, সে তার দিকে তাকাচ্ছে কি না দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝেছে, সেও সুবাসীর দিকে তাকাচ্ছে। ছোকরা খুব আসর জমিয়ে রেখেছে! চন্ননপুরের শোনা গাল-গল্প জুড়ে দিয়েছে। সায়েব লোকে যুদ্ধ লাগিয়েছে—ইংরেজ আর জার্মানিতে। কামান বন্দুক বোমা, জার্মানি জিতছে, ইংরেজরা হারছে। উড়ো-জাহাজের লম্বা চওড়াই গল্প করছে। তার কলকারখানা, ডানা, লেজ—হরেক রকম কথা।

ওরে হারামজাদা! যুদ্ধ জানে বনওয়ারী। ঘোষেদের বাড়িতে সেও শুনেছে। আরও একবার যুদ্ধ লেগেছিল বাংলা একুশ সালে—সেকাল দেখেছে। যুদ্ধ লেগেছে তো তোর বাবার কি? হাঁসুলীর বাঁকে তার কিসের গাল-গল্প?

ধানচাল আক্রা হবে, কাপড়ের দর চড়বে। হয় হবে, চড়ে চড়বে। 'খানিক-আদেক' দুঃখকষ্ট হবে। মাথায় ধর্মকে রেখে পিতিপুরুষের 'গোনে গোনে' অর্থাৎ পথে পথে সাবধানে বারো মাসে এক এক পাক খেয়ে যে ক বছর যুদ্ধ চলে কাটিয়ে দেবে। কত্তাঠাকুর রক্ষা করবেন। কালক্রমে আশীর্বাদে কেটে যাবে কাল সুখে-দুঃখে। হাঁসুলীর বাঁকের মাঠে মা-লক্ষ্মীর পায়ের ধূলো নিলেই সকল অভাব ঘুচে যাবে।

বনওয়ারী ঘরে ঢুকে গম্ভীরভাবে বললে—করালীচরণ মহাশয় নাকি?

করালী বললে—হ্যাঁ কাকা। কাকীর মিত্যুর খবর শুনলাম। তা ছুটি না হ'লে তো আসতে পেলাম না। এই এলাম খবর করতে।

—তা বেশ করেছ। তাতে মানা নাই, এসব তো করবার কথাই; করতে হয়। কিন্তু বাপু যুদ্ধ-মুদ্ধ এখানে কেনে? কোথা কোন্ থাশে যুদ্ধ লেগেছে তা হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশ-আদাড়ের ভেতরে কাহারপাড়ার কাহারদের কি? উ সব গল্পে তাক লাগিয়ে মেয়েছেলের মনে অঙ ধরানো যায়, কিন্তু উ সব এখানে চলবে না বাপু।

করালী ভুরু কুঁচকে তার দিকে চেয়ে বললে—তার মানে? এ সব কি বলছ তুমি?

—বলছি ঠিক, তুমি বুঝছ ঠিক। তোমার পরিবার আসছে, ছেলেছোকরার কানে মন্তর দিচ্ছে—পিতিপুরুষের কুলকম্ম ছেড়ে জাতনাশা কারখানায় চল মজুর খাটতে। তুমি আসছ মেয়েদের মনে—

করালী চেঁচিয়ে উঠল—ভাল হবে না বলছি ব্যানোকাকা।

বনওয়ারী বললে—জাতনাশা! বেজাত কোথাকার! তোর লজ্জা নাই, তোর মা ওই নাইনে কাজ করতে গিয়ে চ'লে গেল কুল ভাসিয়ে দেশ ছেড়ে, আর তুই ওই নাইনে কাজ করছিস? আবার পাড়ার ছোকরাদের মাথা খারাপ করতে এসেছিস? পয়সার গরমে কোট পেণ্টুল প'রে মেয়েদের কাছে দেখাতে এসেছিস—কত বড় মরদ তু!

করালী উঠে দাঁড়াল, বললে—জাত কার আছে? কোন্ বেটার কোন্

বাবার আছে এখানে? ওই সুচাঁদ বুড়ী ব'সে রয়েছে, বলুক, ওই বলুক, শুনি। জাত! লজ্জাও নাই তোমাদের। সদ্‌জাতের—ভদ্দলোকের পা চেটে প'ড়ে থাক, তারা তোমাদের ভাতে মারে, জাতে মারে। পিঠের উপর জুতো মারে, তোমরা চুপ ক'রে মুখ বুজে সহ্য কর। লজ্জা! লজ্জার ঘাটে মুখ ধুয়েছ তোমরা। জাত! কুলকম্ম! কুলকম্ম তো জাঙলের চাষীদের মান্দেরি কৃষাণি রাখালি? তাতেই রথে চড়ে স্বগ্যে যাবা। পেটে ভাত জোটে না, পরনে কাপড় জোটে না। কুলকম্ম! কুলকম্ম! তোমার কি? তুমি মাতব্বর, গুছিয়ে নিয়েছ, জমি করেছ, ধান বেঁধেছ, বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছ, লোককে তুমি ধম্ম দেখাচ্ছ! লজ্জা! বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে তোমার লজ্জা নাই? মাতব্বর! লোকে গতরে খেটে পেট ভ'রে খাবার মত পরবার মত রোজকার করবে, তাতে তুমি ধম্ম দেখাও! কেনে মানবে তোমার সে কথা লোকে? কেনে মানবে? আমি হাঁক দিয়ে বলে যাচ্ছি—যে যাবে কারখানায় খাটতে, আমি কাজ ক'রে দোব। দিন পাঁচ সিকে মজুরি! কোম্পানি দেবে সস্তা চাল, সস্তা ডাল, সস্তা কাপড়। যার খুশি চ'লে আয়। ওই বুড়োর কথা মানিস না।

খবরদার!—হাঁক মেরে উঠল বনওয়ারী। বনওয়ারী লাফ দিয়ে পড়ল এবার, অনেকক্ষণ সে হতভম্ব হয়ে শুনেছিল করালীর কথা, করালীর যুক্তি। এমন ধারা মুখের উপর কথা কেউ কখনও বলে নাই আর এমন অন্যায় অথচ এমন আশ্চর্য যুক্তির কথাও সে কখনও শোনে নাই, তাই সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। 'ওই বুড়োর কথা মানিস না' বলতেই সে সচেতন হয়ে রাগে ফেটে পড়বার মত হয়ে চীৎকার ক'রে উঠল—খবরদার! সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিয়ে করালীর সামনে এসে খপ ক'রে চেপে ধরলে তার লম্বা চুলের মুঠো। চুলের মুঠো ধরে সে তার মাথাটা টানতে লাগল মাটির দিকে। টেনে মাটিতে তার মাথাটা ঠেকিয়ে দিয়ে জানিয়ে দেবে। জানিয়ে দেবে, মাথা ঝাঁকি দিয়ে কপালে চোখ তুলে কাহারপাড়ার বনওয়ারী মাতব্বরের সঙ্গে কথা বলার আইন নাই। বললে মাথা এমনি ভাবে মাটিতে ঠেকে যায়। নিষ্ঠুর আকর্ষণে

টানতে লাগল বনওয়ারী। কিন্তু করালী চন্নপুরের কারখানায় কাজ করে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করা ভুলে গিয়ে সোজা মাথায় সেলাম করা অভ্যাস করেছে, তার উপর সেও লম্বা-চওড়া জোয়ান, গাঁইতি-হাতুড়ি পিটে শরীর হয়েছে পাথরের মত শক্ত; যন্ত্রণা সহ্য ক'রেও করালী ঘাড় শক্ত ক'রে মাথা সোজা ক'রে রাখলে, কিছুতেই নোয়াবে না সে তার মাথা।

দাঁতে দাঁতে টিপে টানলে বনওয়ারী, করালী তবু নোয়াবে না মাথা, ঘাড় যেন লোহার মত কঠিন হয়ে উঠেছে। সে বললে—ছেড়ে দাও মাতব্বর। ছেড়ে দাও বলছি।

বনওয়ারী হুঙ্কার দিয়ে উঠল—না।

বসন চীৎকার ক'রে উঠল—ব্যানোদাদা! দাদা!

সুচাঁদ হাউমাউ করতে আরম্ভ করলে; নসুবালা বুক চাপড়ে 'হায় হায়' করতে লাগল—হায় হায় গো, কি অমানুষের পুরী! ছাড়িয়ে দাও গো, ছাড়িয়ে দাও। ওগো, তোমরা ছাড়িয়ে দাও।

সুবাসীর মাথা থেকে ঘোমটা খ'সে পড়েছে, সে বিস্ফারিত চোখে দেখছে। ঠিক এই মুহূর্তে ছুটে এল পাখী। সে প্রায় পাগলের মত বনওয়ারীর উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নিষ্ঠুর আক্রোশে কামড়ে ধরলে বনওয়ারীর বাহুমূল।

লোকে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে। সবিস্ময়ে তারা দেখছে, বনওয়ারীর আক্রোশ, করালীর শক্তির পরিচয়। অবাক হয়ে গিয়েছে তারা। পাগল কোথায় ছিল, সে এল এতক্ষণে। সে এসেই ছুটে গিয়ে বনওয়ারীর হাত ধ'রে বললে—বনওয়ারী! ছি! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। তোর বাড়িতে তত্ত্ব করতে এসেছে, তোকে জোড়হাত করতে হয়। করছিস কি? বনওয়ারী!

বনওয়ারীর হাতের মুঠো শিথিল হয়ে এল। করালীর চুল ছেড়ে দিয়ে বললে—যা। ফিরেবারে আর জানে রাখব না তোকে।

করালীর ঘাড় সোজাই ছিল, সে মাথায় ঝাঁকি দিয়ে মাথায় লম্বা চুলগুলোকে পিছনের দিকে ফেলে দিয়ে তিক্ত হাসি হেসে বললে—ফিরেবারে তোমাকেও আর খাতির করব না আমি। আজ আমি স'য়েই গেলাম। তুমি

মাতব্বর, তোমাকে আমার এই শেষ খাতির। তাও করতাম না। কি বলব, আজ তুমি শোকাতাপা হয়ে রয়েছ। আয় পাখী।

পাখীর দাঁতে ঠোঁটে রক্তের দাগ লেগেছে। বনওয়ারীর হাত কেটে তার দাঁত ব'সে গিয়েছিল। পাখীর হাত ধ'রে যাবার সময় সে আবার হেঁকে ব'লে গেল—চন্দনপুর কারখানায় যারা কাজ করবি, তারা আসিস। আমি ব'লে গেলাম।

সাত

বাবাঠাকুর, কর্তাবাবা! তুমি কি বিরূপ হ'লে বাবা? বিরূপ হবার কথা বটে, তোমার বাহনকে যে মেরেছে তাকে সে ক্ষমা করেছে। কিন্তু তোমার বাহনকে যে মারলে, তার চেয়েও কি তার বেশি অপরাধ?

বনওয়ারীর মনে কথাটা প্রায়ই উঁকি মারছে। কাহারপাড়ার ছোঁড়ারা তাকে অমান্য করার লক্ষণ দেখাচ্ছে। তাকে অগ্রাহ্য ক'রে করালী জেদ ক'রে নিত্য সন্ধ্যায় এসে নিজের বাড়িতে আড্ডা জমাচ্ছে। সেখানে গিয়ে জমছে তারা।

আর বনওয়ারীর ঘরে ঢুকেছে কালসাপিনী। সুবাসী কালসাপিনী। তার মতিগতি দেখে বনওয়ারীর সন্দেহ হয়—ওই হয়তো কোন্ দিন তার বুকে মারবে ছোবল!

সুচাঁদ পিসি রূপকথা বলত—এক আজার কন্যেকে যে বিয়ে করত সেই মরত। কন্যের নাক দিয়ে আত্তিরে সুতোর মতো সরু হয়ে বের হ'ত এক সাপ, বের হয়ে সে ফুলত, কেমে কেমে ফুলে সে হ'ত রজগর। তারপর সে ডংশাত আজকন্যের স্বামীকে।

বনওয়ারী ভাবে, মেয়েটাকে দূর ক'রে দেবে। কিন্তু ভয়ে পারে না। ভয় কালোশশীর প্রেতাত্মার ভয়, ভয় গোপালীবালার প্রেতাত্মার ভয়। তাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারে—সুবাসী। মেয়ের প্রেতাত্মার হাত থেকে বাঁচাতে পারে

মেয়ের ভাগ্যি—মেয়ের এয়োত। সুবাসীকে বিদায় করলে, আবার তাকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু এ বয়সে আবার বিয়ে! সে লজ্জা করে তার। তা ছাড়া কাহারদের মেয়ের রীতচরিত সবই প্রায় এক রকম। গোপালীবালার মত আর কজনে হয়? তার উপর তার বয়স হয়েছে, আড়াই কুড়ি হ'ল বোধ হয়; তাকে বিয়ে ক'রে যুবতী কাহার-মেয়ের উড়ুক্ষু স্বভাব আরও খানিকটা উড়ুক্ষু হবেই। তাই সে সুবাসীকে বিদায় করে না। তা ছাড়া সুবাসীকে ছাড়ব মনে করলেও মনটা কেমন করে। সুবাসী তাকে বোধ হয় গুণ কি বশীকরণ করেছে। সুবাসীর ছলা-কলা অদ্ভুত। তাই, সুবাসীই বুকে তার ছোবল মারবে—সন্দেহ ক'রেও সুবাসীকে কড়া নজরে রেখেছে, ছাড়ে নাই। করালী যখন সন্ধ্যাবেলায় আড্ডা জমায়, তখন বনওয়ারী সুবাসীকে সামনে নিয়ে ঘরে ব'সে থাকে। প্রহ্লাদ রতন গুপী প্রভৃতি প্রবীণেরা আসে, পানাও আসে—মজলিস হয়। কিন্তু পাগলের অভাবে মজলিস জমে না। কে গান গাইবে, ছড়া কাটবে। পাগল আবার চ'লে গিয়েছে 'গেরাম' ছেড়ে। গিয়েছে গোপালীবালার শ্রাদ্ধের পরের দিনই। পাগলের জন্য দুঃখ হয় বনওয়ারীর। পাগলের অভাবে মজলিসে হয় শুধু কাজের কথা। সুবাসী রমণকাকা তামাক সাজে। কেরোসিন নাই, বিনা আলোতে মজলিস, শুধু জ্বলে একটা ধুনি। আঙারের শিখার লালচে ছাপ পড়ে সকলের মুখের উপর। নানা কথার মধ্যে চাষবাসের কথা এসে পড়ে।

চাষের কথা এলে বনওয়ারীর সংশয়, মনের ছমছমানি খানিকটা ঘুচে যায়। এবার দেবতা 'পিথিমী'র উপর সদয়। হাঁসুলীবাঁকের বাবাঠাকুরও নিশ্চয় সদয়, নইলে পিথিমীতে এত ধান কেন? পিথিমীর মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে আবার সবচেয়ে বেশি ধান। বাবাঠাকুর সদয় না হ'লে এমন হয় কখনও? মাটভরা সবুজ ধানে কালো মেঘের ঘোর লেগেছে। এক-একটি ধানের ঝাড় দু হাতের মুঠোতে ধরা যায় না।

সকলেই বলে—হ্যাঁ, এবারে বছরের মতন একটা বছর বটে।

পানা বলে—ব্যানোকাকার ভাগ্যের কথা বল একবার

সায়েবডাঙার জমিতে এবারেই কোদাল ঠেকালে, এবারেই দেখ কি ধানটা পায়!

বনওয়ারী মনে মনে কথাটা স্বীকার করে, কিন্তু মুখে বলে—ভাগ্যি আমার লয়, ভাগ্যি বাবু মশায়দের, যুদ্ধের বাজারে লাখো লাখো টাকা ঘর ঢুকছে আমি শুনেছি। তাদের জমির পাশে আমার জমি, তাতেই—লইলে দেখতিস অন্য রকম হ'ত।

রতন বলে—উটি বললে শুনব না ভাই। সায়েবডাঙায় তোমার ধানই সবচেয়ে জোর। তারপর স্মিতমুখে ঘাড় নেড়ে বলে—হ্যাঁ, জবর ধান হয়েছে, গোছা কি!

পানা হেসে বলে—কাকী, এবার কিন্তু নবানে আমাদিগে খাওয়াতে হবে। কথাটা বলে সুবাসীকে। হারামজাদা পানা কম নয়; ছোকরা হয়েও মাতব্বর সাজলে কি হবে, বয়সের বদমায়েসি যাবে কোথায়? কোন মতে সুবাসীর সঙ্গে দুটো বাক্য বলবার ফাঁক পেলে হয়! সুবাসীকে উত্তর দেবার সুযোগ দেয় না বনওয়ারী, তাড়াতাড়ি ব'লে উঠে—আচ্ছা আচ্ছা, পিঠে এবার খাওয়াব।

সুবাসী হাসে, সে বুঝতে পারে বনওয়ারীর মনের কথা। হাসতে হাসতে উঠে যায়, মৃদুস্বরে ব'লে যায়—মরণ! কাকে যে বলে, সে কথা ঠিক বুঝতে পারে না কেউ।

রাত্রিবেলা জিজ্ঞাসা করে বনওয়ারী—কাকে বললি সে কথাটা?

—কোন্ কথা?

—সেই যি বললি 'মরণ'?

—নিজেকে, আবার কাকে?

—না।

—তবে তোমাকে।

—কেনে?

—কেনে?—সুবাসী তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বলে

—তা তুমি বুঝতে পার না? এমনি বোকা তুমি লও। ওই মর্কট পানার স ঙ্গ কথা বললে আমি ক্ষয়ে যেতাম নাকি?

বনওয়ারী একটু চুপ ক'রে থাকে, তারপর বলে—পানা যদি মর্কট না হ'ত, করালীর মত অমনি লম্বা চওড়া ফেশানদুরস্ত হ'ত তবে?

সুবাসী বনওয়ারীর মুখের দিকে সাপের মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ঠিক সাপের মত। চোখ দুটোই শুধু চকচক করে, মুখের মধ্যে কোন ভাব ফোটে না।

বনওয়ারী প্রশ্ন করে—রা কাড়িস না যে?

সুবাসী কথা না ব'লে উঠে চলে যায় বিছানা থেকে। দাওয়ায় গিয়ে ব'সে থাকে। বনওয়ারীও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থেকে উঠে গিয়ে সুবাসীকে তোষামোদ ক'রে ফিরিয়ে আনে। একলা ঘরের মধ্যে ভয় অনুভব করে সে। গোপালীবালা, কালোশশী। বেশি ভয় গোপালীকে। প্রথম পক্ষের পরিবার মরলে বিয়ের 'কুম্ কলসী' অর্থাৎ জলভরা ঘট কাঁধে নিয়ে ফেরে। স্বামীর মৃত্যু না হ'লে সে কলসী ফেলতে পায় না। ঠিক মৃত্যুর কিছুকাল আগে সেই কলসী সে ফেলে দেয়। শব্দ ওঠে। কোথাও কিছু পড়ে না, অথচ একটা শব্দ শোনা যায়। পাড়ায় এখন কারও বাড়িতে বাসন পড়ার কোন শব্দ উঠলেই বনওয়ারী চমকে ওঠে, কৌশল ক'রে খোঁজ নিয়ে আশ্বস্ত হয়। সুবাসীকে ছুঁয়ে শুয়ে থাকে। সুবাসী বড় চতুর। বনওয়ারীর মনের কথাটি ঠিক বুঝতে পারে। বলে—ভয় নাই, বড়কী কোণে দাঁড়িয়ে নাই, ঘুমোও। টুঁটি টিপে মারবে না তোমাকে।

বনওয়ারী চুপ ক'রে প'ড়ে থাকে, ঘুম আসে না তার। অকালে সে মরবে কেন? তাকে বাঁচতে হবে। ভরাভর্তি সুখের সময় তার এখন। সে এখন পাঁচ পাঁচ বিঘা জমির মালিক! সে জমিতে প্রথম বছরেই প্রচুর ফসল হয়েছে। নতুন বিয়ে করেছে।

সে উঠে বসে। সুবাসীর নাকের কাছে হাতের তালু রেখে নিশ্বাস অনুভব করে। সুতোর মত কিছু বের হচ্ছে কি না পরীক্ষা করে।

অন্ধকার কাটলে সকালে আলো ফুটলে বনওয়ারী হয় বীর বনওয়ারী। ছুটে চলে সে মাঠের দিকে।

*　　　*　　　*

কত কাজ, কত কাজ!

বর্ষা কেটেছে, আকাশ হয়েছে নীলবরণ। মা-দুর্গার চালচিত্তিরের ছবির ফাঁকে নীল রঙের মত ঘোরালো নীল হয়ে উঠেছে। কাতিকের বাহন ময়ূরের গলার মত ঝকমক করছে। হাঁসুলী বাঁকের মাঠে হাতীঠেলা ধান বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে, সূর্যঠাকুরের রোদ যেন দুধে ধোওয়া। কাহারপাড়ার মরদেরা ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষেতে ক্ষেতে। দেড় হাত দু হাত উঁচু ধানের জমির মধ্যে ডুব দিয়েছে, হাঁটু গেড়ে ব'সে বুনো দাঁতালের মত চ'লে বেড়াচ্ছে, আগাছা তুলে ভেঙে মুচড়ে পুঁতে দিচ্ছে মাটিতে, প'চে সার হবে।

কিন্তু মধ্যে মধ্যে আজকাল ব্যাঘাত ঘটছে কাজে; মাথার উপর দিয়ে বড় বড় ভীমরুলের ঝাঁকের মত গোঁ-গোঁ শব্দ ক'রে উড়ো-জাহাজের দল চ'লে যায়; তখন হাতের কাজ ফেলে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে দেখে। বনওয়ারী পর্যন্ত দেখে।

ওঃ, কাল যুদ্ধ রে বাবা! ওদিকে চন্নপুরে আর সব বাবু মহাশয়দের 'গেরামে' শহরে লেগেছে গান্ধীরাজার কাণ্ডকারখানা। লাইন তুলছে, সরকারী ঘর দোর জ্বালাচ্ছে; পুলিস-মিলিটারিতে গুলি করছে, তাও খেয়ে মরছে, তবু ভয়-ডর নাই।

চাল-ধানের দর হু-হু ক'রে বাড়ছে। বলছে—আরও বাড়বে। ধানের দর বাড়লে ভাবনা নাই। এবার ধান প্রচুর হবে। শুধু আশ্বিন মাসটা পার করতে পারলেই হয়। এক 'আচাল' অর্থাৎ এক পশলা বেশ জোরালো জল হ'লেই বাস্, আর চাই কি! আধ হাতের চেয়েও লম্বা শীষ বেরিয়ে দিনে দিনে পরিপুষ্ট হ'য়ে পেকে মাটিতে আপনার ভারে শুয়ে পড়বে। এবার মনিবদের দেনাপত্র মিটিয়ে ধান ঘরে আনবে কাহারেরা। বনওয়ারীর ইচ্ছে আছে, করালীকে ডেকে দেখাবে, বলবে—দেখ্। কাহারপাড়ার আদি মা-লক্ষ্মীকে

দেখে যা। আশা আছে, ছোঁড়ারা যতই চুলবুল করুক এবার হাঁসুলী বাঁকের মা-লক্ষ্মী, মাটিকে সেবা করার রস বুঝিয়ে দেবেন তাদের। তবু খটকা লাগছে।

যুদ্ধ তো শুধু ধানের বাজারে আগুন ধরায় নাই। সব কিছুর বাজারে আগুন ধরিয়েছে। কাপড় মিলছে না,—কাপড়ের কথা মনে করতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বনওয়ারী। গোপালীবালার শেষ কাজে সে কাপড় দিতে পারে নাই। কাহারপাড়ার মেয়েগুলি চিরদিনের বিলাসিনী, তারা ফুলপাড় কাপড় পরতে ভালবাসে। কিন্তু তারা ময়লা কাপড় প'রে বেড়াচ্ছে।

কেরাসিন নাই। চিনি তারা খায় না, তবু অসুখ-বিসুখে পুজো পার্বণে দরকার হয়। 'নিউনাইন-বোডে'র কার্ডেও আর পাওয়া যাচ্ছে না। শোনা যায়, দেশেই নাই। এদিকে 'মালোয়ারী' আরম্ভ হয়েছে বেশ জোরের সঙ্গে, কিন্তু 'কুনিয়ন' পাওয়া যাচ্ছে না। শিউলিপাতার রস সম্বল। আশ্বিনের এই কটা দিন যেতে না যেতে পাড়ার শিউলিগাছের পাতা অর্ধেক শেষ হয়ে এল। এখন থেকে জ্বরের আরম্ভ ;—পড়বে উঠবে, আবার পড়বে, দু'একজন মরবে বিকার হয়ে। মরবে বেশি শীতকালে। বুড়ো-ঠারাই মরবে বেশি। চিরকালই এই হয়ে আসছে। এবার ভয়—'কুনিয়ান' নাই। এরই মধ্যে পড়েছে পুজোর কাজ—পুজোর ভাবনা। মা-দশভুজা আসবেন বেটা বেটী বাহন নিয়ে, সিংহীর উপর চড়া মা-জননী, তার সমারোহ কত! দেশ করবে কলকল কলকল, ঢাক বাজবে, ঢোল বাজবে, সানাই বাজবে, কাঁসি বাজবে; নাচবে গাইবে, খাবে পরবে। সে মায়ের ঘরের ওই দূরে দাঁড়িয়ে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে বলবে—অক্ষে কর মা, বিপদে আপদে, অণে বনে, জলে মাটিতে অক্ষে কর। ধম্মে মতি দাও, লোভের হাত থেকে বাঁচাও; আমরা ক্ষুদ্দু মানুষ, আমরা দুই হাতে পূজা করছি, দূর থেকে তুমি পেসন্ন দিষ্টিতে দেখ, তোমার দশ হাতে আমাদিগে দিয়ে যাও। আমাদের পাপ তাপ সব খণ্ডন কর মা।

দশহাতওয়ালা মেয়ে, সে কি কম! তার পুজো! ঘর দোর নিকুতে হবে। নতুন কাপড় চাই। টাকাপয়সার টানাটানি। গেরস্ত বাড়িতে,

পুরানো ধান ফুরিয়ে এল, নতুন ধানের দেরি আছে ; এই সময়ে খরচের পালা। এবার ওই যুদ্ধের জন্যে বিপদ হয়েছে বেশি। মনিব মহাশয়েরা বেশি ধান দিতে চাচ্ছেন না। ধান বেঁধে রাখছেন। খোরাকির উপর বেশি ধান চিরকাল মনিবেরা এ সময়ে দিয়ে থাকেন। এবার বলছেন—না।

করালীর কথা এক এক সময় সত্যি ব'লে মনে হয়। নিজের গরজ ছাড়া ওরা কিছু বুঝবে না। ধান চালের দর দিন দিন বাড়ছে, সুতরাং কৃষাণদের ধান দেবে না। একবারে বন্ধ করলে তারাও চাষ বন্ধ করবে—কাজেই পেটে খাবার মত দাও। কাপড় কিনতে হবে, পুজো আসছে—সে বিবেচনা করবে না। রতন কালই বলেছে—বনওয়ারী, আর বুঝি জাত রাখতে পারলাম না। মনিব তো ধানের কথায় তেড়ে মারতে এল। বলে, কাপড় ? কাপড় হ'ল কি না হ'ল দেখবার ভার আমার নয়। তারপর গালাগালের চরম। শ্যাষে গদাগদ মার।

রতনের মনিব হেদো মণ্ডল এমনই গোঁয়ার। পানার মনিব পাকু মণ্ডল হাতে মারে না, কথায় মারে। ফুরুৎ-ফুরুৎ ক'রে হুঁকো টানে আর বলে—হুঁ ; হুঁ ; হুঁ। 'হুঁ'ই পূরে যায়, শেষকালে বার করে হিসেবের খাতা। বলে—বাকিতে তো পাহাড় হয়েছে। এর ওপর বেশী ধান ? তা খাবার মত দিতে হবেই, দোব। বেশি দিতে ব'লো না বাবা, পারব না।

পানা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। ছেলেছোকরারা বনওয়ারীকে বলছে—তোমার কথায় আমরা চাষে লেগেছি। এর উপায় কর তুমি।

আড়ালে গজগজ করছে—এর চেয়ে কারখানায় কাজ করলে বেঁচে যেতাম আমরা।

বনওয়ারী চাষের কাজের ফাঁকে ফাঁকে জাঙল আর চন্ননপুর যাচ্ছে। জাঙলে যাচ্ছে চাষী মহাশয়দের কাছে, বেশি ধান কিছু দিতেই হবে, আর দিতে হবে সারের দাদন। জমির জন্য সার দেবে কাহারেরা। টাকার দরের চেয়ে এক গাড়ি হিসেবে বেশিই দেবে। নিমরাজী হয়েছেন তাঁরা। আর চন্ননপুরে যাচ্ছে দোকানদারদের কাছে, পুজোর সময় কাপড়ের দাম কিছু কিছু

বাকি রাখতে হবে। ধান উঠলেই পাই-পয়সা মিটিয়ে দেবে কাহারেরা। আমি দায়ী থাকছি।

দত্ত মহাশয় রাজী হয়েছেন। ধানের কারবারের সঙ্গে তাঁর কাপড়ের কারবারও আছে। বাকিটা টাকায় নেবেন না, নেবেন ধানে, পৌষ মাসে। তবে বলেছেন—এই বাজারদরে ধান দিতে হবে।

বনওয়ারী প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। দত্ত মহাশয় কি ক্ষেপে গেলেন? আশ্বিন মাসে ধানের দর বছরের মধ্যে চড়া থাকে, নতুন ধান উঠলেই ধানের দর নেমে যায়। সুতরাং—। হঠাৎ চড়াৎ ক'রে কথাটা মাথার মধ্যে খেলে গিয়েছে তার ; ধানের দর চ'ড়ে চলেছে—চ'ড়েই চলেছে, তা হ'লে নতুন ধান উঠলেও ধানের দর নামবে না!

চার টাকা সাড়ে চার টাকারও উপরে উঠবে ধানের দর? এ তো ভূ-ভারতে কেউ কখনও শোনে না! ন টাকা চালের মণ! হে বাবাঠাকুর, কালে কালে এ কি খেলা খেলছ বাবা! ওঃ! তার পাঁচ বিঘে জমির ধানে এবার খামার ভ'রে যাবে। বিঘেতে তিন বিশ ক'রে ফলন হ'লে পনেরো বিশ ধান। ভাগের জমিতে ধান হবে তার চেয়ে বেশি, অবশ্য ভাগ হবে মনিবের সঙ্গে ; আঠারো-বাইশ ভাগ। চল্লিশ ভাগ করে মনিব পাবেন বাইশ ভাগ, বনওয়ারী পাবে আঠারো ভাগ। তাতেও মনিবের দেনা শোধ দিয়েও ফিরে পাবে সে পাঁচ সাত বিশ। এক এক বিশে দু মণ দশ সের ধান। হিসেব করতে গিয়ে মাথা ঘুরে যায় বনওয়ারীর। বুড়ো রমণকে ডেকে বলে—অমনখুড়ো, হেসেবটা কর দিনি।

বুড়ো দিনরাত ব'সে তামাকই খাচ্ছে— ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ। কাজের মধ্যে গরু-গুলিকে নিয়ে মাঠে যাওয়া। বাস্, তারপর কুটোটি ভেঙে উপকার করবে না। ভাত খায় এক কাঁড়ি।

বুড়ো বলে—হেসাব? তবেই তো মুশকিলে ফেলালে। আটপৌরেপাড়ার লোকে ধানচালের কারবার কখনও করেছে? বস্তায় ভ'রে ধান চুরি ক'রে এনেছি, সামালদারের ঘরে ফেলেছি, ঠাউকো দাম দিয়েছে। সুবাসীকে বল বরং, উ পারবে, চাষী মাশায়দের বাড়িতে তিন-চার বছর ধান-ভাননী ছিল।

সুবাসী হিসাব মন্দ করে না। পনেরো বিশ, বিশে দু মণ—তা হ'লে দু পনেরো মণ আর পনেরো দশ সের। আঙুল গুনে হিসেব করে। হিসেব শেষ ক'রে হঠাৎ পা ছড়িয়ে ব'সে হাসতে হাসতে বলে—এইবার আমি কাঁদব। হ্যাঁ।

ভারি ভাল লাগে বনওয়ারীর। হেসে বলে—কেনে খুকুমণি কাঁদবা কেনে? কি চাই?

—এবার পুজোতে আমি ভাল কাপড় লোব—খুব ভাল।

বনওয়ারীও রসিকতা করে—না খুকু, কেঁদো না। আমি নিচ্চয় কিনে দোব, নিচ্চয় দোব।

সুবাসী হিসাব করে আঙুল গুনে—আর পুজোতে আছে রাম দুই-তিন-চার—

* * *

সে দিনগুলিও ফুরিয়ে এল।

নয়ানের মা আর সুচাঁদের কান্না শুনে বুঝতে পারা যায়। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় এই হ'ল নিয়ম। পিতিপুরুষেরা ব'লে গিয়েছেন পুজোতে-পরবে, বিয়েতে-সাদীতে সুখের দিনে দুখের কথা মনে করতে হয়; যারা ছিল নাকি তোমার আপন জন, যারা তোমাকে ভালবাসত, তুমি যাদের ভালবাসতে, যারা আজ নাই, তাদের মনে ক'রে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলো। টাটকা যারা যায় তাদের কথা আপনিই মনে পড়ে, সে শুধু হাঁসুলী বাঁকে নয়—চন্ননপুর পর্যন্ত পৃথিবীসুদ্ধ লোকেরই মনে পড়ে,—বুক-ফাটানো কত কথা কান্নার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে, চোখ ফেটে আপনি জল ঝ'রে বুক ভাসিয়ে দেয়। নয়ানের জন্য তার মায়ের কান্না সেই কান্না, গোটা কাহারপাড়াটির পুজোর আনন্দ তাতে লজ্জা পাচ্ছে। নয়ানকে মনে ক'রে চোখের জলে তার জিভের বিষ আজ ধুয়ে গিয়েছে। কাঁদছে এই পুজো উপলক্ষ্য ক'রে, যে দিন থেকে সে নয়ানকে ডাকছে, সেই দিন থেকে আর কাউকে শাপশাপান্ত করে নাই সে।

সুচাঁদ কাঁদে সেই নিয়মের কান্না। উপকথার হাঁসুলী বাঁকের সেই যে

আত্তিকালের বুড়ী। সে তার বাপের জন্তে কাঁদে, ভাইয়ের জন্তে কাঁদে, স্বামীর জন্তে কাঁদে, জামাইয়ের জন্তে কাঁদে, তারপর একে একে কাহারপাড়ার যত মরা লোকের নাম ধ'রে কাঁদে আর পায়ের হাড়ে হাত বুলোয়, পায়ে তার বাতের 'বেথা' 'কুন্‌কুন্‌' করছে। মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করে, আঃ, আমি মরলে আর কাহারপাড়ার এ নিয়ম কেউ মানবে না। কালে কালে 'ত্থাশঘাট' বদলে গেল, তার সঙ্গে গেল মানুষও অনাচারী অধর্মপরায়ণ হয়ে। কথার শেষে আক্ষেপ প্রকাশ ক'রে বলে—আঃ! আঃ! হায় হায় রে!

আরও বলে—বনওয়ারী আমার পাখীকে করালীকে তাড়ালে—ধরমনাশা কুলনাশা ব'লে। তা চোখ তো আছে, তাকিয়ে দেখুক—ধরমকে কে একেছে, কুলকে কে একেছে! তবে হ্যাঁ, করালীর একটি ঘাট হয়েছে। একশো বার বলব, হাজার বার বলব—ঘাট হয়েছে বাবার বাহনটিকে পুড়িয়ে মারা। বার বার সে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করে সেই মৃত সাপটিকে। প্রণাম করতে করতে হঠাৎ কাঁদতে আরম্ভ ক'রে স্মরণ করে—'চিত্তবিচিত্ত' অর্থাৎ চিত্রবিচিত্র রূপ নিয়ে বাবা পুজোর দিনে ফিরে এস রে! বাঁশবনে শিস দিয়ে ঘুরে বেড়াও, মনের সাধে ব্যাঙ খাও, ইঁদুর খাও বাবা রে! গাঁয়ের মঙ্গল কর রে!

বনওয়ারী বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল!—জ্বালালে রে বাবা! বুড়ী মরেও না! রতন বললে—উ অমুনি বটে।

—অমুনি বটে—অমুনি বটে!—বলতে বলতে রতনের হাত থেকে হুকোটা কেড়ে নিয়ে টানতে আরম্ভ করে।

প্রহ্লাদ বলে—তা হ'লে চল একদিন উ-পারের মোষদহরী মউটোর।

হঠাৎ মাঠের জলের অভাব ঘটে। আশ্বিনের প্রথম থেকেই বৃষ্টি ধরেছে, ক্ষেতের জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে। অথচ আশ্বিন মাসে ধানের পেটে 'থোড়' হয়েছে, এখন কানায় কানায় ভরা জল চাই। পিত্তিপুরুষে ব'লে গিয়েছেন—একটি ধানের ঝাড় দিনে পাঁচ ঘড়া জল টানে। মাঠে এবার হাতী-ঠেলা ধান। এ ধান নষ্ট হ'লে কাহারেরা বুক ফেটে ম'রে যাবে। ষোল বছরের পুত্রসন্তান মরলেও এত দুঃখ হয় না। তাই কথা হচ্ছে কোপাইয়ের বাঁধ বাঁধবার।

কোপাইয়ের বুকে বাঁধ দিয়ে, কোপাইয়ের জলে মাঠ ভাসিয়ে দিতে হবে। জাঙলের মনিবেরা হুকুম দিয়েছেন। সেই বাঁধের কথা হচ্ছে।

বনওয়ারী অনেক কথা ভাবছে। বাঁধ বাঁধতে গেলেই দু-চারজন যাবে। বাঁধ বাঁধতে জলের ধাক্কায় যাবে, তার উপর আছে দাঙ্গা। বাঁধ বাঁধতে গেলেই নদীর নীচের লোকেরা ফৌজদারি করতে আসবে। আসবে শেখেদের দল। এ সব ছাড়া, করালী নাকি বলেছে—মিলিটারিতে বাঁধ বাঁধতে দেবে না। তারা উড়ো-জাহাজের আস্তানা করেছে, চন্নপুরের ঘাটের খানিকটা তফাতে —সেখানে 'পাম্প্' বসিয়ে জল তুলছে। চান করে, উড়ো-জাহাজ ধোওয়া-মোছা হয়, রান্না-বান্নার বেবাক জল ওই কোপাই থেকে ওঠে। তারা নাকি বাঁধ বাঁধতে দেবে না।

বনওয়ারীর ধারণা—করালীই লাগান-ভজান ক'রে এইটি করিয়েছে। মনিবেরা বলেছেন—নাঃ। ও-বেটার সাধ্যি কি! তাঁরা গালাগাল দিচ্ছেন যুদ্ধকে আর সায়েব মহাশয়দিগে। তাঁরা বলছেন, তাঁরা সায়েবদের কাছে যাবেন। কাহারদের উয্যুগ করতে বলেছেন। আর বলেছেন—পুজোটাও দেখ, মা এবার গজে আসছেন।

বনওয়ারী বললে—আমি বলি অতন, পুজোটা যাক। গজে আসবেন মা। দু-এক আচাল ছিটোবে না গজে? তা'পরে ধর—মোষ পাঁঠা খাবেন মা, মুখ ধুতেও তো হবে।

ষষ্ঠীর দিন উৎফুল্ল হয়ে উঠল কাহারেরা। এসেছে। মেঘ এসেছে।

আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। 'আউলি-বাউলি' অর্থাৎ এলোমেলো বাতাস বইছে। মধ্যে মধ্যে ফিন্ ফিন্ ক'রে বৃষ্টি যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেসে আসছে।

বনওয়ারী উৎসাহভরে কাহারদের বললে—চল্, কাপড় আনিগা চল্। আকাশে মেঘ উঠেছে, দত্ত মাশায় নির্ভাবনায় কাপড় দেবে।

নসুবালা নতুন শাড়ি প'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হা হা ক'রে হাসছে। বলছে—আমাদের কি মাঠের পয়সা? আমাদের পয়সা কলির কারখানার। ঝম্-ঝম্-ঝম্—লগদ লগদ! আমাদের কাপড় সম-সম কালে নয়, আগে-ভাগে।

যাবার আগে সুবাসী বললে—আমি কিন্তু পাখীর মত কাপড় লোব।

বনওয়ারীর মাথায় যেন রক্ত চ'ড়ে গেল।—কার মতন?

—পাখীর মতন।

—কেনে, কেনে, কেনে? পাখীর মতন কেনে?

অবাক হয়ে গেল সুবাসী। কয়েক মুহূর্ত সে স্তম্ভিত হয়ে রইল, তারপর ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। বনওয়ারী দাঁতে দাঁত ঘ'ষে বললে—গোসা-ঘরে খিল দিলেন মানিনী। তিন লাথিতে দোব গতর ভেঙে। ঘরের দরজায় শিকলটা তুলে দিয়ে সে চ'লে গেল। থাক্, বন্ধ হয়েই থাক।

দোকানে গিয়ে কিন্তু সবচেয়ে ভাল শাড়িখানি কিনলে। তাতে কিছু বেশি ধার হয়ে গেল দোকানে। দত্ত মশায় পর্যন্ত রসিকতা করলেন। রতন প্রহ্লাদ হাসতে লাগল। ছেলেছোকরারা গোপনে পরস্পরের গা টিপে হাসলে। তা হাসুক। মনে মনে একটু লজ্জা হ'ল। দোকান থেকে বেরিয়ে আবার ফিরতে হ'ল। কত্তারাবার পুজো আছে দশমীর দিন। বিজয়া-দশমীর দিন বলি হবে, পুজো হবে। তার কাপড় কিনতে হবে। মনে মনে আপসোস হ'ল—বাবার কাপড় কিনতে ভুল হয়েছিল তার। ছি! ছি! ছি!

এমন কাপড়ও সুবাসী হাসি মুখে নিলে না। অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে তার মান ভাঙিয়ে বনওয়ারীকে শেষ স্বীকার করতে হ'ল—কাল সকালে উঠেই সে চন্নপুরে গিয়ে উড়োজাহাজ-পেড়ে 'অড়িন' কাপড় এনে দেবে পাখীর মতন।

হায় রে কপাল, কাপড়ের পাড়েও এল উড়ো-জাহাজ!

এবার সুবাসী আড়চোখে চেয়ে হেসে বললে—হুঁ। কাপড়খানা প'রে ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে যাব।

বনওয়ারী হাসলে। দুঃখও হয়, হাসিও পায়। সুবাসী এসে তার গলা জড়িয়ে ধরলে এবার। খিলখিল ক'রে হেসে বললে—একা যাব না, তোমাকে সমেত নিয়ে যাব পরীর মতন পিঠে ক'রে।

ভোরবেলায় সুবাসীই তাকে ঠেলে তুলে দিলে। পুজোর ঘট ভরতে যাবার আগেই তার কাপড় চাই। কিন্তু—এ কি?

আকাশে ঘোর ঘনঘটা! বাতাস বইছে মাতালের মত। শব্দ করছে বুনো দাঁতালের মত। এঃ, দুর্যোগ করলে—বাদলা নামবে! আশ্বিনের শেষ, ধানের মুখে মুখে শিষ। যদি ঝড় হয়! মাথাভারী ধানগাছগুলিকে যদি ঝাপটায় মাঝখানে ভেঙে শুইয়ে জলে ডুবিয়ে দেয়, তবে সর্বনাশ হয়ে যাবে। হে বাবাঠাকুর! যদি আশ্বিনের সেই সর্বনাশা ঝড়ই হয়, তবে বাবাঠাকুর, একবার তুমি আকাশে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়াও, বাঁশবাঁদির বাঁশের বেড়ে পিঠ দাও, বড় বড় বট পাকুড় শিমুল শিরীষের গাছগুলিকে ঠেলে ধর হাত দিয়ে। মিষ্টি হাসি হেসে অভয় দিয়ে কাহারদের বল—ভয় নাই, আমি ধরেছি শক্ত ক'রে গাছপালার আড়াল, ঝড় উড়ে যাক মাথার উপর দিয়ে, রক্ষা হোক কাহারপাড়ার মনিষ্যিকুল, রক্ষা পাক গরু বাছুর ছাগল ভেঁড়া হাঁস মুরগী কীটপতঙ্গ, সোজা দাঁড়িয়ে থাক মাঠের গলগলে-থোড়ভরা ধান—কাহারদের লক্ষ্মী। হে বাবাঠাকুর! শুধু বনওয়ারী নয়, গোটা কাহারপাড়া দুর্যোগের দিকে তাকিয়ে ডাকতে লাগল—'দয়' বাবাঠাকুর! অর্থাৎ দোহাই বাবাঠাকুর!

ঝড় বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। গাছের মাথা যেন আছাড় খাচ্ছে, বাঁশের বনে বাঁশ উপড়ে পড়ছে, কোপাইয়ের জলে তুফান উঠেছে, মধ্যে মধ্যে দুটো একটা পাখী ঝাপটায় আছাড় খেয়ে এসে পড়েছে উঠানে-দাওয়ায়। যে 'পিথিমীর' বুকে সদাই বাজে পঞ্চ শব্দের বাদ্য, সে পৃথিবীতে ঝড়ের গোঙানি ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায় না। দশভুজার পূজা, চারিদিকে উঠবার কথা ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি কাঁসর ঘণ্টা শাঁখের শব্দ, তার জায়গায় শুধু শব্দ উঠছে—গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ, ঝড় গোঙাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে শব্দ উঠছে মড়-মড়-

মড়-মড়, তারপরই উঠছে প্রচণ্ড একটা শব্দ। গাছ ভেঙে পড়ছে। হে বাবাঠাকুর!

এর মধ্যে কে যেন চীৎকার ক'রে বলছে! কে কি বলছে? কার কি হ'ল? সুবাসী ঝপ ক'রে দাওয়া থেকে নেমে পড়ল। বনওয়ারী এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে ভাবছিল, সে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল—নামিস না, নামিস না।

সুবাসী বললে—সেই ডাকাবুকো। লইলে আর এত সাহস কার হবে?

—কে?

—ওই যে, নাম করলে তুমি আগ করবা। এই ঝড়ের মধ্যেও সুবাসী মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল। বনওয়ারী কঠিন বিরক্তিতে নেমে এল দাওয়া থেকে।

—ঝড় এসেছে, আর আসছে পেলয় ঝড়, 'সাইকোলন'—কলকাতা থেকে চন্ননপুরের ইষ্টিশানে তার এসেছে। ঘর থেকে কেউ বেরিয়ো না। খবরদার!

গায়ে একটা তেরপলের লম্বা জামা আর মাথায় টুপি প'রে হেঁকে বেড়াচ্ছে করালী।

সুচাঁদ চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল—হে বাবা, কত্তাবাবা!

করালী দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললে—বাবাঠাকুরের ডিঙে উল্টাল্‌ছে। বেলগাছ উপড়ে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে—দেখ্ গা। চেঁচাস না বেশি। ঘরে যা।

বনওয়ারী আতঙ্কে চমকে উঠল।

সুবাসী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। সুচাঁদ ঝড়ের বেগে পা পিছলে আছাড় খেয়ে প'ড়ে গিয়েছে।

বনওয়ারী তার গালে ঠাস ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলে। সুবাসী কিন্তু আরও হাসতে লাগল। বনওয়ারী ছুটল সেই ঝড়ের মধ্যেই বাবাঠাকুরের থানের দিকে।

বেলগাছটা সত্যই আবার উপড়ে পড়ে রয়েছে—গাঁথনিটা দু ভাগ হয়ে ফেটে গিয়েছে। বনওয়ারীর সর্বশরীর থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। আবার

বাবাঠাকুরের গাছ উপড়ে পড়ল ? নিশ্চয় আর বাবাঠাকুর নাই ; হাঁসুলী বাঁকের দেবতা, উপকথার বিধাতাপুরুষ চ'লে গিয়েছেন। তবে আর কি রইল তাদের ? দুর্দান্ত ঝড়ের মধ্যে আর দাঁড়াতে পারলে না বনওয়ারী, ব'সে পড়ল ; কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করলে বাড়ির দিকে।

নয়ানের মা এই ঝড়ের মধ্যে ছেলের জন্যে কান্না ভুলে গিয়েছে, গায়ে কাপড় জড়িয়ে—ঝড়-বাদলের আরামে—অলসভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে পরমানন্দে বলছে—আরও জোরে বাবা, আরও জোরে। ভেঙে চুরে উপড়ে সব সমান ক'রে দাও। হে বাবা!

ঝড়—ঝড়—ঝড়! গোঁ—গোঁ—গোঁ!—দেওয়াল পড়ছে, গাছ পড়ছে, বাঁশ পড়ছে। জলের ঝাপটায় সব ঝাপসা। হুড়-হুড় শব্দে জলের স্রোত ব'য়ে চলেছে, কোপাই ফুলে ফুলে উঠছে, নীলবাঁধের মোহানা ভেঙেছে, গোটা হাঁসুলী বাঁকের মাঠ ঘোলা জলে থৈ-থৈ করছে, এবারে সেই হাতী-ঠেলা সবুজ-বরণ মন-ভুলানো চোখ-জুড়ানো প্রাণ-মাতানো মাঠ-ভরা ধান জলে ডুবে যাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে জলের উপরে সবুজ পাতা ভেসে উঠছে, যেন হাত বাড়িয়ে ডাকছে। কিন্তু মা লক্ষ্মীকে কে তুলবে হাতে ধ'রে ? বাবাঠাকুর নাই, কে তুলবে দেবকন্যেকে।

আট

প্রলয় ঝড় শেষ হ'ল। তবু কাহারেরা বাঁচল। চিরকাল বাঁচে। দুর্ভিক্ষ মহামারী বন্যা ঝড় কতবার হয়েছে, কাহারেরা মরতে মরতেও বেঁচেছে। এবারও ঝড়ে কয়েকজন মরেছে, ঘায়েল হয়েছে কয়েকজন ; সুচাঁদপিসী পা ভেঙে প'ড়ে আছে হাসপাতালে—করালী তাকে হাসপাতালে দিয়েছে। নয়ানের মায়ের হয়েছিল কঠিন অসুখ। কোন রকমে সেরে উঠেছে। বনওয়ারীই তাকে এক মুঠো ক'রে ভাত দিচ্ছে। ঘর দোর গিয়েছে, মাঠভরা ফসল বরবাদ হয়েছে, ফসলের শিষে ধান নাই, তুষ হয়েছে শুধু, শাঁস নাই—খোসা, শুধু

খোসা ধরেছে। গাছপালা ডাল ভেঙে ন্যাড়া হয়েছে। বাঁশগুলো শুয়ে পড়েছে। গরু বাছুর ছাগল মরেছে। হাঁস ভেসে গিয়েছে জলের স্রোতে। এর পরেও যারা বেঁচে রয়েছে, তারা ভাবছে—তাদের বাঁচাবে কে ? বাবাঠাকুর নাই, কে তাদের রক্ষা করবে ?

বনওয়ারী চেষ্টা করছে। উল্টে-পড়া গাছটিকে আবার খাড়া ক'রে গোড়াটা নতুন পাকা মসলা দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে। খুব একটা বড় পুজোও দিলে। ফিরে এস বাবা, ফিরে এস।

ওদিকে হাঁ-হাঁ ক'রে এগিয়ে আসছে পেটের ভাবনা। মাঠের ধান তুষ হয়ে গিয়েছে, আগুন ছাড়া সে তুষ গরু-বাছুরেও খেতে পারবে না। ধানের দর হয়েছে চার টাকা থেকে আট টাকা—চালের মণ ষোল টাকা। ভূ-ভারতে কেউ কখনও শোনে নাই এ কথা, মুনি ঋষিতে ভাবে নাই, পুরাণেও 'নেকা' নাই। যুদ্ধে নাকি খেয়ে নিচ্ছে সব। মনিবেরা লাফাচ্ছেন, ধান বিক্রি ক'রে টাকা করবেন। কৃষাণদের ধান দেবেন ব'লে মনে লাগছে না। শুধু তাগাদা দিচ্ছেন—তুষ হোক আর যাই হোক, ধান কেটে ফেল।

বুঝতে পারে বনওয়ারী তাঁদের 'রবিপ্রায়টি' অর্থাৎ অভিপ্রায়টি। ধান কাটলে খড় ঘরে উঠবে। খড়ের দরও চরমে উঠেছে ধানের মতই। চল্লিশ টাকা কাহন বিক্রি হচ্ছে, শেষ তক একশো দুশো টাকা পর্যন্ত উঠবে। খড় ষোল আনাই পাবেন মনিবেরা। কাহারদের শুধু তুষের ভাগ নিয়ে ঘর ঢুকতে হবে। যুদ্ধে তুষ খায় না ?—রতন প্রহ্লাদ এরা সেই প্রশ্ন করে। বনওয়ারীর কিছু প্রত্যাশা আছে। সায়েবডাঙার পাঁচ বিঘে নতুন বন্দোবস্ত-নেওয়া জমির খড়টা পাবে। ভাগের জমিরও খড় কিছু পাবে। সায়েবডাঙা উঁচু মাঠের জমি, ওখানকার ধানও সমতল নীচু মাঠের মত জলে ডোবে নাই, ওখানে কিছু ধান পাবে সে। কিছু কেন, ভালই পাবে। কিন্তু অন্য কাহারেরা কি করবে ?

পাশাপাশি জমিতে ধান কাটতে কাটতে রতন বনওয়ারীকে প্রশ্ন করলে। তখন কার্তিক শেষ হয়েছে, অগ্রহায়ণের প্রথম। এবার ওই জল-ঝড়ের জন্য শীত এরই মধ্যে ঘন হয়ে উঠেছে, তারপর ক্ষেতে ক্ষেতে এখনও সেই জলস্রোত

বেয়ে চলেছে ; গোড়ালি পর্যন্ত জলে ডুবে যাচ্ছে। মাথা কনকন করছে, নাকে টস-টস ক'রে জল ঝরছে।

—কি হবে বল দেখি বনওয়ারী ? খাব কি ?

বনওয়ারী প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারলে না। নিত্যই এই প্রশ্ন তার কাছে করছে পাড়ার লোক। কিন্তু বনওয়ারী তার কি উত্তর দেবে ? আশ্বিনের প্রলয় ঝড়ে সব তছনছ ক'রে দিয়ে গেল।

হঠাৎ ছুটে এল প্রহ্লাদের সেই দিগম্বর ছেলেটা—ওগো, মাতব্বর গো, এই মেলা সায়েব গো ! মটর-গাড়ি গো !

—মেলা সায়েব ?

—হ্যাঁ গো ! সাথে করালী রইছে।

—কোথা রে ?

—জাঙলে। কালারুদ্দুতলায়।

—কালারুদ্দুতলায় ?

—হ্যাঁ। কালারুদ্দুর পাট-আগনেতে তাঁবু ফেলছে। আপিস হবে।

—আপিস হবে ? হে ভগবান !

—যাবা না কি ? ব্যানো ?—রতন প্রশ্ন করলে।

—যাব বইকি। চল, দেখি। কি নতুন ঢেউ এল ?

কালারুদ্রের বাঁধানো অঙ্গনে লোকে লোকারণ্য। দশ বারো জন সাহেব। এরা ঠিক করালীর 'ম্যান' নয়। করালী বার বার সেলাম করছে তাদের।

বড় ঘোষও দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁরই বাড়িতে সায়েবেরা গিয়ে বসলেন। বনওয়ারী চুপি চুপি বাড়ির ভিতর গিয়ে প্রশ্ন করলে বড় গিন্নীকে—কি বেপার ঠাকরুণ ?

—কালারুদ্দু তলায় যুদ্ধের আপিসের তাঁবু পড়ছে দেওর।

—কালারুদ্দু তলায় যুদ্ধের আপিসের তাঁবু ?

—যুদ্ধের আপিসের নয়। ঠিকেদারের তাঁবু, বাঁশ কিনবে, কাঠ কিনবে—

—বাঁশ, কাঠ ? যুদ্ধে বাঁশ কাঠ লাগে ?

মাইতো গিন্নী হেসে বললেন—দেওর, তোমার চটকদার দ্বিতীয় পক্ষটিকে সাবধান ক'রো হে। গাছ কাটতে এসে লতা ধ'রে না টান মারে!

বনওয়ারী চমকে উঠল। গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েই বাড়ি ফিরল। সত্যই সুবাসীকে সাবধান। কাল যুদ্ধ! কাল যুদ্ধ!

আরও দিন চারেক পর। মাঠে ধান কাটতে কাটতে যুদ্ধের কথাই বলছিল সে রতনকে প্রহ্লাদকে।

মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক উড়ো-জাহাজ যাচ্ছিল—সেই দিকে তাকিয়ে বনওয়ারী কথা বলছিল। পৃথিবীতে যুদ্ধ বাধে, কত বার বেধেছে, শহরে দাঙ্গা হয়েছে, হৈ-চৈ কলরব হয়েছে, তাতে হাঁসুলীর বাঁকের কিছু আসে যায় নাই। শোনা যায়, বড় বড় ভূমিকম্পে শহর ভেঙেছে, হাঁসুলীর বাঁকের ছোট-খাটো ঘরগুলির তাতেও কিছু হয় নাই। ছোট বাচ্চার মত মায়ের বুক দু' হাতে আঁকড়ে, পৃথিবীর দোলনের সঙ্গে খানিকটা দুলে দিব্যি বেঁচেছে। যুদ্ধ এবার কালারুদ্রের শাসন ভেঙে বাঁশবাঁদিতে ঢুকল। ঘরে ঘরে টান দিচ্ছে। ঢুকিয়েছে করালী। পাপ করালীর কর্মদোষে দেবতারা বিমুখ হয়েছেন। দেবতাদের ক্ষমারও একটা সীমা আছে। বাবা কালারুদ্দুও এইবার অন্তর্ধান হবেন। কালারুদ্দুর মন্দিরও ভেঙে এসেছে, তার উপর উঠানে পড়ল যুদ্ধের ঠিকাদারবাবুদের তাঁবু। চন্ননপুর থেকে বাঁশবাঁদির মুখ পর্যন্ত পাকা রাস্তা হচ্ছে, মোটর আসবে। আর বাকি কি রইল? পাকা রাস্তা ধ'রে মোটর চ'ড়ে যুদ্ধ আসছেন হাঁসুলী বাঁকে। কাঠ—বাঁশ—সব চাই তাঁর! হে ভগবান হরি! যুদ্ধে কি না খায়? বাঁশ-কাঠও খায়? শোনা যাচ্ছে গরু ছাগল ভেড়া ডিম এ সবও নাকি চালান যাবে। ওই যে চন্ননপুরের পাশে উড়ো-জাহাজের আস্তানা, ওখানে দৈনিক একপাল গরু ছাগল ভেড়া মুরগী হাঁস লাগবে, ডিম লাগবে ঝুড়ি ঝুড়ি। তাতে অবশ্য কাহারদের কিছু লাভ হবে। ছাগল ভেড়া ডিমের দাম এরই মধ্যে অনেক বেড়েছে, আরও বাড়বে, দু পয়সা ঘরে আসবে। গরু তারা কখনও বেচে না কসাইকে, বেচবেও না। বনওয়ারী তা বেচতে দেবে না। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, রাখতে কি পারবে? কি হবেন?

রতন আবার প্রশ্ন করে—বনওয়ারী ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বনওয়ারী বললে—কি বলব অতন ? অদেষ্টের হাল-হদিস কি আছে, তা বল্ ? নেকনে যা আছে তাই হবে।

—তোমাকে ভাই একটা কথা বলি নাই, তিন ছোঁড়া বউ নিয়ে পালাল্ছে—। লারদ, নোঁদা আর তোমার গিয়ে বেঁকা।

—পালাল্ছে ? কোথায় ?

—কে জানে ভাই, জিনিসপত্ত নিয়ে ভোর এতে পালাল্ছে। কাল সন্জেবেলায় এসে বলছিল—মনিবের ধান মনিব কেটে নিক, আমি ধানও কাটব না, ভাগও লোব না।

—তা বললে হবে কেনে ? ই যে মহা অল্যায় কথা। আমরাই দায়িক এর জন্যে।

—অল্যায় তো বটে। কিন্তু আমরা কি বলব বল ?

—তোমরা বারণ করলে না ?

—বারণ ! বারণ করলে শুনছে কে বল ? তুমি তো বারণ করেছ। শুনলে ?

খুব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল বনওয়ারী—শুনছে না। যে শুনবে না, সে চ'লে যাক। কিন্তু তোমরা ? তোমরা কাল সন্জেতে যখন জেনেছিলে, তখন আমাকে বল নাই কেনে বল দেখি ?

—চ'লে যাবে বলছিল সব, তা আতাআতিই চ'লে যাবে, সে কি ক'রে জানব, বল ? তা ছাড়া আত তখন অ্যানেক। তুমি শুয়েছ। এতে ডাকলে তুমি আগ কর।

কথাটার মধ্যে একটু রসিকতা আছে। রাত্রে ডাকলে বনওয়ারী রাগ করে—এ কথার পিছনে তরুণী সুবাসীর অস্তিত্বের ইঙ্গিত রয়েছে। কথাটা কিন্তু অর্ধসত্য। সুবাসীর উপর বনওয়ারীর সেই অবধি প্রখর দৃষ্টি, এবং তরুণী স্ত্রীর প্রতি আসক্তির কথা মিথ্যে নয় ; কিন্তু আরও খানিকটা আছে, কালো বউ আর বড় বউয়ের প্রেতাত্মার শঙ্কায় সে রাত্রে উঠতে চায় না। কেউ ডাকলে, কি বাইরে শব্দ হ'লে সে চীৎকার ক'রে প্রশ্ন করে—কে ? কে ?

বনওয়ারী ক্রুদ্ধ হয়েই জবাব দিল—কবে? কবে? কবে আগ করেছি রে শালো? কবে?

গাল খেয়ে রতন বিস্মিত হ'ল। বনওয়ারী তাকে গাল দিলে?

বনওয়ারী ঘস ঘস ক'রে ধান কেটে যেতে লাগল। এ ধরনের ব্যাপারটার সাড়া সে আবছা আবছা পেয়েছিল, কিন্তু এতটা বুঝতে পারে নাই। অভাবের কথা উঠলে সকলেই মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে চন্ননপুরের কারখানার টিনের ছাউনিগুলির দিকে, মা-কোপাইয়ের পুল বন্ধনের দিকে, লাইনের উপর পোঁতা সিগনালের হাতার দিকে, রাত্রে চেয়ে দেখে লাল নীল আলোর দিকে। এ কথা সে জানে। কিন্তু এমন হবে সে ভাবে নাই। মানুষে সব বেচে খায়, ধরম বেচে কেউ খায় না। বনওয়ারী সেই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিল। গোপনে যে এমন ফাটল দেখা দিয়েছে তা বুঝতে পারে নাই। ফাটল ধরেছে এইবার ধ্বস ছাড়বে। করালী! করালী! করালীর সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করতে হয়েছে। হয় সে-ই থাকবে, নয় বনওয়ারী থাকবে হাঁসুলীর বাঁকে। বনওয়ারী উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় ঝাঁকি দিলে বার কয়েক। তারপর নীরবেই আবার হেঁট হয়ে ঘস-ঘস ক'রে ধান কেটে চলল।

রতনও দাঁড়িয়েই রইল, সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। গতকাল রতনের মনিব হেদো মণ্ডল রতনকে খুব প্রহার করেছেন—অন্যায় ক'রে প্রহার করেছেন। রতনের একটা বাঁশঝাড়কে অন্যায় ভাবে নিজের ব'লে দাবি করায় রতন তার প্রতিবাদ করেছিল, সেইজন্য প্রহার করেছেন। মুখ বুজে প্রহার আর সহ্য হচ্ছে না রতনের। অনেক ঋণও হয়ে রয়েছে তাঁর কাছে। ধানের ভাগও সে নেবে না, ঋণও সে শোধ করতে পারবে না। চ'লে যাবে চন্ননপুর। সে বনওয়ারীকে বললে—তু আমাকে গাল দিলি কেনে?

বনওয়ারী উঠে দাঁড়িয়ে কোমর ছাড়িয়ে নিয়ে বললে—গাল কি তোকে দিলাম? দিলাম তোর করণকে। তা তুও আমাকে দে কেনে গাল। আমি একবার বলেছি, তু তিনবার বল্—শালো—শালো—শালো!

বনওয়ারী ধান কাটা বন্ধ ক'রে তামাক সাজতে বসল। বাঁশের চোঙার

মধ্যে থেকে তামাক, খড়ের নুটি, চকমকি, শোলা বার করলে। বললে—আয়, বস্। তামাক খাই।

আলের উপর ব'সে রৌদ্রে ভিজে পা শুকিয়ে বেশ খানিকটা আরাম বোধ করলে। রতন বললে—আঃ! গায়ে সান হ'ল এতক্ষণে।

—লে, খা। হুঁকাটি এগিয়ে দিলে বনওয়ারী। তারপর বললে—আগ কি সাধে হয় অতন! অনেক দুঃখেই হয়। 'সব বেচে সবাই খায়, ধম্ম বেচে কেউ খায় না'। 'ধম্মপথে থাকলে আদেক এতে ভাত'। তা কলিকালে কেউ বুঝবে না—সব অধম্মের জন্যে, বুল্লি, সব পাপের জন্যে। কলিকালটাই অধম্মের কাল।

রতন হঠাৎ এক আধ্যাত্মিক প্রশ্ন ক'রে বসল—আচ্ছা, জাঙলে মণ্ডল মাশায়রা বলাবলি করছিল কলিকালের নাকি শ্যাষ—এইবারেই শ্যাষ?

বনওয়ারী ঘাড় নেড়ে বললে—মাইতো ঘোষ বই এনেছে একটা 'চেতামুনি'।

—কি মুনি?

—চেতামুনি। মুনি বলেছেন—এইবারেই কলির শ্যাষ।

—কি হবে? সব একেবারে লণ্ডভণ্ড ওলোট-পালোট তছনছ হেঁট-ওপর পুড়ে-ঝুড়ে হেজে-মেজে শ্যাষ নাকি?

—তাও হতে পারে। আবার ধর, আকাশ একবারে হুড়মুড় ক'রে ভেঙে সব চেপটিয়ে দেবে—চুরমার ক'রে দেবে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় প্রলয়ের এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটিই সব চেয়ে পুরানো—আদিম কালের কল্পনা। এবং এইটির চেয়ে কোনটিকেই আজ কলিশেষের উপযুক্ত সংঘটন এবং মহত্তর আধ্যাত্মিক ব'লে মনে হচ্ছে না। বনওয়ারীর মুখে এমনই কিছু শুনতে চেয়েছিল রতন।

বনওয়ারী বললে—লক্ষণ তো সবই দেখা দিয়েছে। এই কি কাত্তিক আগন মাসের হাঁসুলী বাঁক? কোথাও কোন চেহ্নং আছে?

কথা সত্য। কার্তিক-অগ্রহায়ণে হাঁসুলীর বাঁকের উপকথায় পলেনের মাঠের

রঙ হয় সোনার বরণ। ঝিরঝিরে হিমেল বাতাস ; পাকা ধানের গন্ধে ভুরভুর করে গোবিন্দভোগ বাদশাভোগ কনকচুর রামশাল সিঁদুরমুখী নয়ানকল্মা —কত রকমের ধান! এক-এক ধানের এক এক রকম সুবাস, সকল সুবাসে মিলে সে এক সুমধুর বাস। সোনার বরণ ধান-ভরা মাঠের বুকে বেড় দিয়ে কাচ-বরণ জল রূপার হাঁসুলী টলমল—কোপাই নদীর বাঁক। কূলে পাকা কাশগুলির ডাঁটায় পাতায় সোনালী রঙের একটি পাড়। পুকুরে পুকুরে পদ্মগুলি শুকাতে শুরু করলেও পুরো ঝরে না, অল্পস্বল্প গন্ধও থাকে। খালে নালায় ঝির-ঝিরে ধারা জল বয়, রূপার কুচির মত ছোট ছোট মাছ ঝাঁক বেঁধে নেমে চলে নদীর সন্ধানে। আউশের মাঠে আউশ-ধান উঠে গিয়ে রবি ফসলের সবুজে ভ'রে ওঠে। গম, কলাই, আলু, যব, সরষে, মসনে, তিসির অঙ্কুর-রোমাঞ্চ দেখা যায়। হিলহিলে বাঁশবনের মাথা উত্তরে বাতাসে দুলতে থাকে, ক্যাঁ-ক্যাঁ —কট-কট শব্দে, কখনও বা বাঁশীর মত সুর তুলে। আকাশে উড়ে নেচে বেড়ায় নতুন পাখীর দল। বালিহাঁসেরা উড়ে আসে উত্তর থেকে, সবুজবরণ টিয়াপাখীর ঝাঁক আসে পশ্চিম থেকে, কল-কল কলরবে আকাশ যেন নাচনে মেতে-ওঠা ছেলেমেয়ে-ভরা পূজাতলার আঙিনা হয়ে ওঠে। পাখীর দল রাত্রিবেলা মাঠে নেমে ধান খায়, দিনের বেলা আকাশে ওড়ে, গাছে বসে, কলকল ক'রে বেড়ায়। দুপুরে রোদ চনচন করে, রাত্রিবেলা গা সিরসির করে।

এবার মাঠ এখনও জলে ভরা, শীত এরই মধ্যে কনকনে হয়ে পড়েছে। রোদের তেজ নাই। পাখীরা এসেছে, কিন্তু কেউ থাকছে না, ঝাঁকে ঝাঁকে এসে চ'লে যাচ্ছে। ধান নাই, থাকবে কেন? ছেলের দলের মত মাঠ-লক্ষ্মীর দরবারে প্রসাদ পেতে আসে,—লক্ষ্মী নাই, প্রসাদ নাই, কাজেই চ'লে যাচ্ছে কাঁদতে কাঁদতে। আউশের মাঠ এখনও জবজব করছে, পা দিলে পা ব'সে যায়, কাজেই মাঠে রবি ফসলের নাম নাই, মাঠ খাঁ-খাঁ করছে, কেমন এক কালচে বর্ণ ধরেছে। বাঁশবন—সেই আত্থিকালের বাঁশবন, দুলবে কি, শুয়ে পড়েছে উপুড় হয়ে। 'নালাখালায়' এখনও ভরাভর্তি ঘোলাটে জল বইছে হুড় হুড় ক'রে, পুকুরে পদ্ম নির্মূল, সেই প্রলয় জলে পুকুর ভ'রে ডুবে হেজে প'চে

গিয়েছে। কাশ বলতে একটি নাই। ঝড়ে বানে শেষ হয়ে গিয়েছে। সকল দুঃখের সেরা দুঃখ বলতেও গলা ভেরে যায়, চোখ ভ'রে জল আসে, মাঠ-ভরা ধান খড় হয়ে গিয়েছে, সোনার অঙ্গে ঘোলাটে জলের ছোপ লেগে ধূলো-কাদা-মাখা ভিখারিণীর মত নিথর হয়ে প'ড়ে আছেন। চেতামুনি বলেছে—কলির শেষ। তা মুনি-ঋষির কথা কি মিথ্যা হয়? লক্ষণ দেখা গিয়েছে।

বনওয়ারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—অতন, তা যদি না হবেন, তবে বাবাঠাকুর চ'লে যাবেন কেনে?

রতন চাইলে আকাশের পানে। কোথায় কি শব্দ হচ্ছে!

কাহারপাড়ার আকাশময় ডুগডুগ শব্দ উঠেছে।

চমকে উঠল রতন বনওয়ারী দুজনেই। ডুগ-ডুগ ডুগ-ডুগ শব্দে ঢেঁড়া পড়ছে। কি ব্যাপার? কাহারপাড়াতেই যেন ঢেঁড়া পড়ছে! যেন কেন—নির্ভুল, কাহারপাড়াতেই। কিসের ঢেঁড়া? গ্রামের দিকে তারা ছুটে গেল।

ঢেঁড়া দিচ্ছেন চন্নপুরের বড়বাবুরা।

সায়েবডাঙার জমি যারা ভেঙেছিল, তারা যেন এবার ধান কেটে বাবুদের খামারে তোলে। খাজনা নেবেন না বাবুরা, ধানের ভাগ নেবেন। সেলামী দিয়ে যারা জমি নিয়েছে, তাদের কথা বাদ। তার মানে জাঙলের সদ্গোপ মহাশয়েরা, তাঁরা সেলামী দিয়ে পাকা দলিল ক'রে জমি নিয়েছিলেন। কথাটা বনওয়ারী আর আটপৌরেদের নিয়ে।

রতন শুনে বললে—দূরো! আমি বলি, কি বেপার রে বাবা! পিলুই চমকে উঠেছিল। সায়েবডাঙার জমির সঙ্গে তো তার কোন সম্বন্ধ নাই। সেই কারণে ব্যাপারটার গুরুত্ব নাই তার কাছে। কিন্তু জমি তার মনিব হেদো মণ্ডল নিয়েছেন, সে তাঁর পাকা বন্দোবস্ত। সুতরাং তার এই সময়টাই মাটি। সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরল মাঠে। বনওয়ারী কিন্তু নিজের বাড়ির দাওয়ায় মাথায় হাত দিয়ে বসল। তার পায়ে আর বল নাই।

কত সাধের সায়েবডাঙার জমি। কি পরিশ্রম ক'রে পাড়ার লোকের শ্রদ্ধার খাটুনি নিয়ে সে যে এই জমি তৈরি করেছে, সে বাবুরা জানেন

না; জানে সে; জানতেন বাবাঠাকুর; জানেন ভগবান হরি। উঁচু মাঠ ব'লে এবার ওখানে দু মুঠো হয়েছে। বনওয়ারীর ভরসা যে এইবার ওইখানে!

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত বাবু মহাশয়ের হুকুম জারি হয়ে গেল। সে চুপ ক'রে ব'সে রইল অনেকক্ষণ। তারপর সে উঠল। কই, সুবাসী গেল কোথায়? ওই এক ফ্যাসাদ বাধিয়েছে সে—নাচুনীর মত স্বভাব মেয়েটার। চব্বিশ ঘণ্টাই যেন ফড়িং প্রজাপতির মত ফুরফুর ক'রে উড়ে বেড়ায়। এটা যত ভালও লাগে বনওয়ারীর, তত আবার মনের সন্দেহকেও উগ্র ক'রে তোলে। সন্দেহ হয় করালীকে নিয়ে। সে জানে—সে জানে—করালী তার মর্যাদা ইজ্জৎ নষ্ট করতে চায়। ধর্মনাশা করালী। কোন বিশ্বাস নাই তাকে—কোন বিশ্বাস নাই। ক্রমশ তার বিশ্বাস হচ্ছে, তাকে ধ্বংস করবার জন্যই করালী জন্ম নিয়েছে। হাঁসুলী বাঁকের সর্বনাশ করতে জন্ম নিয়েছে।

ছোকরা যেমন ফ্যাশানী, তেমনি জোয়ান। সুবাসীকে সে চন্নপুরের পথে হাঁটতে দেয় না; কিন্তু করালী সন্ধ্যাবেলা আসে। সে সুবাসীকে ঠায় চোখের সামনে রেখে ব'সে থাকে, তবু সন্দেহ হয়। করালী এসে যখন পাড়া মাতিয়ে হাসে, তোলপাড় ক'রে হল্লা করে, সুবাসী তখন চমকে চমকে ওঠে। সেটুকু বেশ লক্ষ্য করেছে বনওয়ারী। করালীর এই কাহারপাড়া আসাটা বন্ধ করতে পারলে না বনওয়ারী—এই মহা আপসোস র'য়ে গেল জীবনে। এইটা তার হার—পরাজয়।

সে জেদ ক'রে রোজ সন্ধ্যাতে আসে; প্রহর খানেক থাকে, ছেলে-ছোকরার কানে ফুসমন্তর দেয়, হল্লা ক'রে চ'লে যায়; আবার দিনের বেলাতেও কখনও কখনও আসতে কেউ কেউ দেখেছে। বলেছে মিলিটারির কাজে এসেছি। হায় ভগবান, এত লোক ঝড়ে মরল, করালী মরল না!

কিন্তু সুবাসী গেল কোথায়? বুড়ো রমণ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ক'রে তামাক খাচ্ছিল, সে বললে—কে জানে?

বুড়ো খাচ্ছে দাচ্ছে, বেশ আছে। কোন কাজ করবে না। তাঁর উপর

করছে চুরি। ওই তো বেশ দেখা যাচ্ছে, তার ছেঁড়া কাপড়ের তলায় এক মুঠো ধানের শিষ।

এই সময় সুবাসীকে দেখা গেল, নদীর দিকের শুয়ে-পড়া বাঁশবনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল—কাঁখে একটা কলসী, মাথার কাপড় খোলা, খোঁপায় এক থোপা ফুল গুঁজেছে। ছাতিম ফুল।

সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল বনওয়ারীর। এ লক্ষণ তো ভাল নয়!

সুবাসী ঘরে আসতেই ফুলের থোপাটা টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। পিঠে গোটা দুই কিল বসিয়ে দিয়ে বললে—ফুল গুঁজেছে! খুন ক'রে দোব একদিন। দে, মুড়ি দে।

সুবাসী মেয়েটা আশ্চর্য। সে মার খেয়েও হাসতে লাগল। বললে—নাগরে দিয়েছিল, ফুলের থোকাটা ফেলে দিলা?

—এই ত্যা-খ? আবার? দোব কিল ধমাধম।

—গতরে বেথা করছে। দিলে আরাম পাব।

—খুন হবি তু কোন্‌দিন আমার হাতে।

সুবাসী বললে—তার আগে ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়ে তোমাকেও মেরে দোব আমি। এ কথা ব'লেও হাসতে লাগল সুবাসী।

আতঙ্কিত হয়ে বনওয়ারী মুড়ির গ্রাস চিবানো বন্ধ করলে। সুবাসী এবার জোরে খিলখিল ক'রে হেসে বললে—মুড়িতে বিষ নাই। মুড়ি খাও। তারপর বললে—তুমি খানিক ক্ষ্যাপা পাগলও বটে। মাতব্বর বলে লোকে! মরণ! ব'লে সে গিয়ে আবার ছাতিম ফুলের গুচ্ছটা তুলে নিয়ে মাথায় গুঁজলে।

বনওয়ারী আর কোন কথা না ব'লে মুড়ি খেয়ে চন্নপুর রওনা হল। জানে কিছু হবে না, হাকিম ফেরে তবু হুকুম রদ হয় না। তবু গেল। এই বছরটার মত বাবুরা ক্ষমা করুন। আসছে বছর থেকে ভাগেই সে করবে।

কাঁধ বেঁকিয়ে ভারী পা ফেলে সে চলল।

জাঙল পার হয়ে খানিকটা এগিয়েই সে শুনতে পেলে—চন্নপুরে কল-কল শব্দ। এত শব্দ আগে ছিল না। রেল-লাইন হওয়ার সময় থেকে চন্নপুরের

কলকলানি বেড়েছে। এবার আবার ভীষণ কাণ্ড! দোসরা লাইন পাতছে। উড়ো-জাহাজের আস্তাবলে শব্দ উঠছেই—উঠছেই। ওঃ, বড় ভীমরুলের চাকে ঢেলা মারলে যেমন গজগজ গোঙানি ওঠে, তেমনি শব্দ। মধ্যে মাঝে ফ্যাস-ফোঁস রেল-ইঞ্জিনের ফোঁসানি—ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ বাঁশী কান ফাটিয়ে বেজে উঠছে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। আলপথের উপর সদ্যভাঙা কয়েকটা পাতা প'ড়ে ছিল, সেই দিকে সে চেয়ে রইল। ছাতিমপাতা। পিছনেও আরও যেন—একটা দুটো ছাতিমপাতা ফেলে এসেছে। এখানে অনেকগুলি প'ড়ে রয়েছে। আশ্চর্য হয়ে দাঁড়াবার কথা নয় এতে। কিন্তু বনওয়ারীর মনে প'ড়ে গেল, সুবাসীর চুলে ছাতিম ফুল। তারপরই তার মনে হ'ল, ছাতিম গাছ আছে মা-কোপাইয়ের কূলে। জাঙলে নাই। আর কোথায় আছে? আর? মনে পড়ল না। তা হ'লে সুবাসীর সঙ্গে আরও কেউ ছাতিমতলায় ছিল। হয়, সেই ছাতিমফুল ভেঙে সুবাসীকে একটা দিয়ে নিজে একটা ডাল নিয়ে এই পথেই গিয়েছে, নয় সুবাসীই ফুল ভেঙে নিয়ে একটা নিজে খোঁপায় গুঁজে অন্য ডালটা যার হাতে দিয়েছে, সেই এই পথে গিয়েছে।

কোশকেঁধে বনওয়ারী কাহারের 'হাঁটন' হাঁটতে শুরু করলে। কাঁধে ভার না চাপলে সে কদমে হাঁটা ঠিক হয় না, তবু মনের আবেগে হাঁটলে।

সমস্ত পথে কেউ নজরে পড়ল না। চন্নপুরে ইস্টিশানে লোকজন অনেক। সেখানে চারিদিক চেয়ে দেখে সে কোন হদিস পেলে না, চিন্তিত মনেই সে বাবুদের কাছারির পথ ধরলে। হঠাৎ দাঁড়াল। কাঁকর-পাথরের পথ। কয়েকটা কাঁকর পাথর তুলে নিয়ে গুনতে গুনতে চলল। বিজোড় যদি হয়, তবে পথের ছাতিম পাতার সঙ্গে সুবাসীর মাথায় গোঁজা ছাতিম ফুলের কোন সম্বন্ধ নাই—জোড় হ'লে আছে। এক দুই তিন, সাত আট নয়—বিজোড়। আর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পথের ধারে একটা মোটা পাথর দেখে সে আবার দাঁড়াল। হাতের একটা পাথর নিয়ে ছুঁড়লে। ওই পাথরটায় লাগলে সুবাসীর দোষ নাই। না লাগলে নিশ্চয়ই দোষ আছে। লাগল ঠিক। আবার ছুঁড়লে।

এবারও লাগল। আবার ছুঁড়লে। বার বার—তিনবার। এবার লাগলে বনওয়ারীর আর কোন সন্দেহ থাকবে না। এবার ঠিক লাগল না। তবে খুব কাছেই গিয়ে পড়ল। বনওয়ারী এগিয়ে এসে ঝুঁকে দেখলে। নাঃ, ঠিকই লেগেছে। ঠুই ক'রে না লাগুক, আস্তে 'সন্তপ্পনে' লেগেছে। যাক, বনওয়ারীর আর সন্দেহ নাই। সুবাসী আপন মনে খুশিতে ছাতিম ফুল ভেঙে চুলে পরেছে, আর-একজন কেউও আপন মনে খুশিতে তুলে নিয়ে এসেছে। হঠাৎ তার আর একটা পরীক্ষার কথা মনে হ'ল। সে মনে মনে ঠিক করলে, বাবু যদি এবার ধান ছেড়ে দেন, তবে নিশ্চয় সুবাসীর দোষ নাই ; ঘরে ধর্ম না থাকলে লক্ষ্মী আসেন না। লক্ষ্মী যদি ঘরে আসেন, তবে নিশ্চয় ধর্ম আছে। আর না হ'লে নিশ্চয় তাই, বনওয়ারী যা ভেবেছে তাই।

* * *

নিশ্চিত হ'ল বনওয়ারী। আঃ! বাঁচল বনওয়ারী।

বাবু বনওয়ারীকে এবারের ধান ছেড়ে দিলেন। শুধু বনওয়ারীকেই নয়, বনওয়ারীর দরবারের ফলে আটপৌরেদেরও সকলকেই ছেড়ে দিলেন। তবে আগামী বার থেকে ভাগচাষের শর্ত হয়েছে। ডেমিতে কবুলতি লিখে টিপ-ছাপ নিয়েছেন।

হাঁসুলীর বাঁকের উপকথায়—দলিল নাই, দস্তাবেজ নাই, রেজেস্ট্রী নাই, পাওনার তামাদি নাই। মুখের বাক্যিতে কারবার চ'লে আসছে আদ্যিকাল থেকে, পঞ্চজন সাক্ষী রেখে টাকা দেওয়া-নেওয়া চলে, কেনা-বেচা চলে। তকরার হ'লে কর্তার থানে বেলগাছের শিকড়ে হাত দিয়ে শপথ ক'রে বলতে হয়। কিন্তু বাবুদের দলিল দস্তাবেজ আছে, খাতাপত্র আছে ; তাঁদের কারবার উপকথার কারবার নয় ; সন, মাস, তারিখ, দলিলদাতার নাম, তস্য পিতার নাম, পেশা, নিবাস, বিক্রয়ের কারণ, স্বত্ব, শর্ত, আমুল মামুল চৌহদ্দী সকল বিবরণ লিখতে হয়—মায় শরীর সুস্থ, অন্তর খোলসা, এ কথাটি থাকবে সে দলিলে!

বনওয়ারী বুড়ো আঙুলের তেল-কালি মাথার চুলে মুছে বেরিয়ে এল।

জয় ভগবান হরি, জয় ধরমদেব! বনওয়ারীর ধন মান বাঁচালে বাবা। বড় আশার ধান তার। তা ছাড়া সুবাসী যে অন্যায় কিছু করে নাই, তাতে আর তার সন্দেহ রইল না। কোন সন্দেহ নাই। মনে হ'ল, কাল বোধ হয় বাবাঠাকুরের বেলগাছটিতে নতুন পাতার অঙ্কুরও দেখতে পাবে সে। বাবাঠাকুর ফিরবেন। কাছারি থেকে বেরিয়ে দেখলে, বেলা প'ড়ে এসেছে। আসবারই কথা। ও-বেলা জল খেয়ে বেরিয়ে, পথে ঢেলা গুনে, ঢেলা ছুঁড়ে যখন কাছারি এসে পৌছেছিল, তখন বারোটা পার হয়ে গিয়েছিল। তিনটের পর কাছারি বসেছে, ততক্ষণ বনওয়ারী খানিকটা শুয়েছে, খানিকটা বসেছে, বার কয়েক আরও কয়েক রকম পরীক্ষা করেছে—ছাতিম ফুলের সমস্যা নিয়ে। বাবুর দরবারে কাজ সেরে খুশি হয়ে বেরিয়ে বেলা পড়েছে দেখে সে গেল পচুইয়ের দোকানে।

সাহা মহাশয়দের দোকান গাঁয়ের বাইরে পুকুরপাড়ে। পচুই মদের গন্ধে মোহ-মোহ করছে। বাবুরা নাকে কাপড় দেয়, কিন্তু হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় এ গন্ধ প্রাণমাতানো গন্ধ—নাকে ঢুকলেই জিভে জল সরে, খাবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে ওঠে। দলে দলে বসেছে সব। চন্ননপুরের জেলেরা ছোট ছোট দলে বসেছে মাছ-পোড়া নিয়ে। সাঁওতালেরা এসেছে গোসাপ-ইঁদুর-পাখী মেরে নিয়ে, আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে নিচ্ছে। চামড়ার পাইকারেরা গো-সাপের চামড়া কিনছে। চারিদিকেই হাঁক উঠছে, ডাক উঠছে। যুদ্ধের বাজারে চামড়ার দর দেখে মনে হয় নিজের অঙ্গের চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করি। মাতন লেগে গিয়েছে অনেকের, গান চলছে—তকরার চলছে, মধ্যে মধ্যে 'ল্যাই'ও অর্থাৎ কলহও লাগছে টুকরো-টুকরো। হাঁসুলীর বাঁকের লোকেরাও এখানে দল বেঁধে বসত। তাদের জায়গাটা খাঁ-খাঁ করছে। পয়সা নাই, হাঁসুলীর বাঁকের লোকেরা মদ খাবে কোথা থেকে? হে ভগবান হরি! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বনওয়ারী বসল। হাঁসুলীর বাঁকের কাহারদের বিক্রম কত এখানে! কতদিন কত দলের সঙ্গে মারপিট ক'রে বাড়ি ফিরেছে। আজ এখানে বসতে ইচ্ছা হ'ল না। এক ভাঁড় মদ কিনে নিয়ে সে ফিরল। পথে খাবে। বাড়ি

নিয়ে যাবে না, কাহারপাড়ার মাতব্বর সে, কোন্ মুখে এক ভাঁড় নিয়ে ঢুকবে সেখানে? কাউকে না দিয়ে ঘরের কোণে একা ব'সে মদ খাবে সে? সুবাসীই যদি এক ঢোক চায়, তবে? পথেই খাবে।

পথ চলতে চলতেই সে মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে খানিকটা ক'রে খেতে লাগল। অবশেষে পাথর ধারে বড় ডাঙাটার মধ্যে সেই ঝাঁকড়া গাছতলাটা দেখে তার তলায় সে মদটুকু খেতে বসল। মনে পড়ল, এই গাছতলায় কত কাণ্ড করেছে সে! কালোশশী যখন চন্ননপুরে বাবুদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত, তখন এইটিই ছিল তাদের মিলবার ঠাঁই। এইখানে কতদিন তারা পাল্কী ব'য়ে এসে পাওনা ভাগ করেছে। আগেকার কালে নাকি এই গাছতলাতেই কাহারেরা চুরি করবার আগে জমায়েৎ হ'ত। শেষ কাণ্ড হয়েছে—এইখানেই হয়েছিল তার সঙ্গে পরমের যুদ্ধ।

আঃ, সে সব দিন কোথায় গেল! বাবাঠাকুর চ'লে যাওয়াতেই সব গেল। বাবাঠাকুর-থানের পাতা-ঝ'রে-যাওয়া বেলগাছটি তার চোখের উপর ভেসে উঠল। তলাটা সে বাঁধিয়ে দিলে কি হবে, প্রতিদিন গাছটি শুকিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ আগেও সে আশা করেছিল, লক্ষ্মী যখন আসবেন তখন ধর্ম আছে; আর ধর্ম যে কালে আছে সে কালে বাবাঠাকুর বোধ হয় ফিরবেন। কালই নিশ্চয় সবুজ সূচের ডগার মত অঙ্কুর সে দেখতে পাবে। কিন্তু মদ খেয়ে তার মনে হচ্ছে—না না, আর হবে না। চন্ননপুরে ওই অধর্মের ছটা ঝলমল করছে যে।

আবার সে এক ঢোক মদ খেলে। মদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, খানিকটা আছে মাত্র। দু ঢোক হবে, সেটাতে চুমুক দিতে গিয়ে সে ভাড়টা নামালে মুখ থেকে। ভাবতে লাগল, সুবাসীর জন্য এক ঢোক রাখবে নাকি? উঁহু। সুবাসী তো একা নয়, তার কাকা 'অমন' বুড়ো আছে। নয়ানের মা আছে। 'অমন' বুড়োর লম্বা লম্বা কথা। কাজের মধ্যে কাজ—গরু চরায়। আজকাল আবার বুড়ো চোর হয়েছে। বনওয়ারীর ধানের শিষ কেটে নিয়ে দোকানে দিয়ে বেগুনি ফুলুরি খেয়ে আসে। ওর চেয়েও বেশি চোর হয়েছে নয়ানের মা। লোকের বাড়ি বাড়ি চুরি ক'রে হেঁসেল থেকে তরকারি অম্বল খেয়ে

বেড়াচ্ছে। ও দুজনেই এই সামনের শীতে যাবে। দায় বনওয়ারীর। হায় রে মাতব্বর! সুচাঁদপিসীও যাবে নির্ঘাৎ। সে এখন হাসপাতালে। পা জোড়া দেবে ব'লে রেখেছে, কিন্তু ওই পা কি জোড়া লাগে? কাটবে, কেটে মারবে ওকে। এই একেই বলে—সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। করালী হারামজাদা—মন্দমতি, তার পাল্লায় প'ড়ে অবশেষে ঠ্যাঙ কেটে ইংরিজী ওষুধ খেয়ে জীবনটা যাবে। সাধে কি বনওয়ারী বলে—হেঁটো না! হঠাৎ কাদের কণ্ঠস্বর কানে এল।

কে? কারা? কারা আবার ঝগড়া লাগালে এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে রাত্রিবেলা? একটি মেয়ের গলা, একটি পুরুষের গলা। 'অঙের খেলা'! হাসলে বনওয়ারী। মেয়েটি রেগেছে, মান করেছে। কে? কার গলা? সোজা হয়ে বসল বনওয়ারী। পাখীর গলা। পাখী বলছে—না না না। তোর সব মিছে কথা। সব মিছে কথা। আমি সব বুঝেছি।

—কি, বুঝেছিস কি?—করালী বলছে। ওরা ফিরছে কাহারপাড়া থেকে, সন্ধ্যেবেলার আসর সেরে রোজ যেমন ফেরে।

—আমি সুবাসীর খোঁপায় ছাতিম ফুল দেখেছি।

—ছাতিম ফুল কোপাইয়ের ধারে আছে, পরেছে।

—পরেছে। দিয়েছে কে? তু সকালবেলা 'কাজ আছে' ব'লে চলে গেলি। দুপুরবেলা ফিরে এলি ছাতিম ফুল নিয়ে। আমার তখুনি সন্দ হয়েছিল, তু নিশ্চয় কাহারপাড়ায় গিয়েছিলি। আমাকে বললি—নদীর পুলের ধার থেকে এনেছি। কিন্তু তু পুলের ধারেই যাস নাই—আমাকে বলেছে নদীর ধারের গ্যাঙের লোকেরা। তবে তু কোথা পেলি ছাতিম ফুল? সুবাসীই বা আমার মাথায় ছাতিম ফুল দেখে কেনে হাসলে, কেনে বললে—তোমাকে ছাতিম ফুল কে দিলে হে? কেনে বললে? সুবাসীর ঘরের উঠানে কেন ছাতিম ফুল পড়ে আছে? কে দিলে তাকে? বুঝি না কিছু, লয়?

—বুঝেছিস বুঝেছিস। জানিস, পোষ মাসে একটা ইঁদুরে দশটা বিয়ে করে। আমার এখন বারো মাস পোষমাস। গ্যাঙের সর্দার আমি। আমি

সুবাসীকে নিয়ে এসে সাঙা করব, তাতে তোর ঘর করতে খুশি হয় করবি, না হয় পথ দেখবি।

পাখী চীৎকার ক'রে উঠল—কি বললি?

সঙ্গে সঙ্গে গাছের অন্ধকার তলাটাই যেন গর্জন ক'রে উঠল। মনে হ'ল বাঘের মত কোন ভয়ানক জানোয়ার চীৎকার ক'রে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে। সে চীৎকারে করালী পাখী ভয়ে চমকে উঠল। অন্ধকার গাছটার ভিতরটায় ঘুমন্ত পাখীরা ভয়ে চমকে উঠে পাখা ঝটপট করতে লাগল। শন শন শব্দ তুলে কয়েকটা বাদুড় উড়েও গেল। করালী চমকে উঠেও চকিতে ঘুরে শক্ত হয়ে দাঁড়াল, হাঁক দিলে—কে?

গাঁ-গাঁ শব্দে জানোয়ারের মত গর্জন ক'রে লাফ দিয়ে তার সামনে দাঁড়াল বনওয়ারী। আকাশ ঘুরছে, মাটি দুলছে, বনওয়ারীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুনের শিখা ছুটে বেড়াচ্ছে, আঙুলগুলো হয়েছে লোহার শিকের মত, নখ হয়েছে শড়কির ডগার মত! দাঁতে দাঁতে ঘষছে, কট কট শব্দ উঠছে। লাফিয়ে প'ড়েই সে খপ ক'রে চেপে ধরলে করালীর টুঁটিটা—ছিঁড়ে ফেলবে, সে ছিঁড়ে ফেলবে। চোখ জ্বলছে। গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে গোঙানি। ক্রুদ্ধ গর্জন।

করালীর মনে হ'ল, তার চোখের সামনে সব বুঝি মুছে গেল। তবু তাকে বাঁচতে হবে। শুধু বাঁচতে হবে নয়, এতদিনের অপমানের শোধ নিতে হবে, কাহারপাড়ার মাতব্বরি ঘুচিয়ে দিতে হবে। সে মারলে এক লাথি বনওয়ারীর পেটে। এবার বনওয়ারীকে ছাড়তে হ'ল করালীর টুঁটি।

কয়েক মুহূর্ত দুজনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুজনের দিকে চেয়ে। সামলে নিলে যন্ত্রণা। তারপর পরস্পরের দিকে ছুটে এলো বুনো শূয়ারের মত। বুনো দাঁতালের মত পরস্পরকে নিষ্ঠুর আক্রমণে জড়িয়ে ধ'রে পড়ল মাটিতে; ডুবে গেল গাছতলার সেই অন্ধকারের মধ্যে। আঁচড়, কামড়, কিল, চড়, ঘুষি। হাঁসুলীর বাঁকের বাঁশবনের ছায়ায় একদিন যুদ্ধটা শুরু হয়েও শেষ হয় নাই। আজ শেষ না ক'রে ছাড়বে না বনওয়ারী। হাঁসুলী বাঁকের

বাঁশবনের অন্ধকার আকাশপথে ভেসে এসে ওই ঝাঁকড়া গাছটার শাখাপল্লব বেয়ে প্রতি মুহূর্তে তলায় নামছে, ওদের দুজনকে ঘিরে গভীর হয়ে উঠছে। নিষ্ঠুর প্রহারের শব্দ, হিংস্র গর্জন, কাতর মৃদু স্বর শোনা যাচ্ছে শুধু। পাখী মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। নড়তে পারছে না, চীৎকার করতে পারছে না। মাথার উপরে বাদুড় উড়ছে পাক দিয়ে। এদিকে ওদিকে টিক্-টিক্—টক্-টক্—কট্-কট্ শব্দে নানা রকমের সরীসৃপ ডাকছে। কিন্তু পাখীর কানে কিছুই যাচ্ছে না, বা দেখতেও পাচ্ছে না, বুঝতে পারছে না, কি হচ্ছে!

কতক্ষণ কে জানে! তবে অনেকক্ষণ পর অন্ধকারের মধ্যে একটা মূর্তি উঠে দাঁড়াল। গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটু সামলে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এল। একজন প'ড়ে রইল অসাড় ভাবে।

এতক্ষণে অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠল পাখী।

যে জিতে উঠে এল সে কে? বনওয়ারী—হাঁসুলী বাঁকের মাতব্বর, কোশকেঁধের ছেলে? সেই হওয়াই তো সম্ভব। আজ তো তা হ'লে পাখীর আর নিস্তার নাই! করালীর প্রিয়া সে। তাকে আজ এই মুহূর্তে সে কখনই রেহাই দেবে না। ধর্ম সমাজ কিছু মানবে না। কাহার-কন্যে, কাহারদের রীতি তো সে জানে। ছুটে পালাবার মতও শক্তি তার নেই, পা দুটো থরথর ক'রে কাঁপছে। তবু সে প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় ক'রে ব'লে উঠল—তোমার পায়ে পড়ি, বাবাঠাকুরের দিব্যি—

হা-হা-হা-হা ক'রে হেসে উঠল করালী।—বাবাঠাকুর, না, কচু!

—তুমি!—আশ্চর্য হয়ে গেল পাখী।

—হ্যাঁ।—ব'লেই করালী আবার ফিরল, একটা লাথি মারল বনওয়ারীর মাথায়। তারপর ফিরে এসে বললে—চল্।

গায়ে হাত দিয়ে পাখী চমকে উঠল—অক্ত না কি?

—হ্যাঁ।

সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে। ক্ষতবিক্ষত-দেহ বিজয়ী বীর টলতে টলতে চ'লে গেল।

অন্যজনও উঠল, দীর্ঘক্ষণ পরে।

হাঁসুলী বাঁকের কাহারের প্রাণ অনাহারে, প্রহারে, দুর্ভিক্ষে, মড়কে, ঝড়ে, বন্যায় সহজে যায় না। সমস্ত জীবনই কাটে অর্ধাহারে। দুর্ভিক্ষে—ফ্যান উচ্ছিষ্ট কুখাদ্য অখাদ্য খেয়েও বাঁচে; দাঙ্গায় মাথা ফাটে, কোদালের কোপে পায়ের খানিকটা কেটে পড়ে, গাছের ডাল ভেঙে ঘাড়ে পড়ে। শয্যাশায়ী হয়ে প'ড়ে থাকে, দীর্ঘদিন ভোগে, লতাপাতা বেটে লাগায়—ধীরে ধীরে সেরে ওঠে; হয়তো অঙ্গের খানিকটা পঙ্গু হয়ে যায়, কিন্তু জীবন সহজে যায় না। বনওয়ারীও উঠল।

কাহারপাড়ার শ্রেষ্ঠ পুরুষ কোশকেঁধে বনওয়ারী বাবাঠাকুরের পরিত্যক্ত স্থানটিতে টলতে টলতে এসে লুটিয়ে পড়ল—হা হা ক'রে কাঁদতে লাগল। বুক চাপড়াতে লাগল আহত আরণ্য বানরের মতো।

রাত্রি কত, তার ঠিক ছিল না। তবে কৃষ্ণপক্ষ, আকাশে চাঁদ উঠেছে—আধখানা চাঁদ, পোয়া আকাশ পার হয় হয়। বনওয়ারী খানিকটা ব'সে খানিকটা উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে এসেছে। এসে কর্তার থানে ঢুকেছে। কত্তার বাঁধান থানটি চাঁদের আলোয় তকতক করছে। বনওয়ারী মাথা ঠুকতে লাগল সেই বেদীর উপর। চোখের জলে তার বুক ভেসে গেল। হা-হা-হা-হা—বুক তার ফেটে যাচ্ছে।

হঠাৎ মাথা তুলে চমকে উঠল। সামনেই শেয়ালের মত একটা কি যেন দাঁড়িয়ে। শেয়ালটা হাঁ করতেই তার মুখে দপ ক'রে আগুন জ্বলে উঠল। আবার জ্বলে উঠল। দপ্-দপ্-দপ্। জ্বলছে আর নিবছে। বনওয়ারীর মাথার ভিতরেও ঠিক ওই ভাবে আগুন জ্বলতে লাগল; উঠে দাঁড়াল সে। শেয়ালটা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালাল। শেয়াল নয় ওটা। কখনও নয়। বাবাঠাকুর চর পাঠিয়েছেন। দপ্ দপ্ ক'রে আগুন জ্বালিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল ইসারা পেয়েছে সে বাবার আদেশ। নিঃশব্দে চকমকির চোঙাটা নিতে হবে, সেটা বাইরেই দেওয়ালে ঝুলানো আছে। তারপর উঠতে হবে করালীর

কোঠায়। অ-মেরামতি কোঠার উপরে কেউ থাকে না, নীচে থাকে নসুবালা। উপরে উঠে খড়ের মুটিতে আগুন ধরিয়ে—। কোঠাঘর জ্বলবে—চন্ননপুর থেকেও দেখা যাবে। বাবাঠাকুরের আদেশ।

বাড়ির কাছাকাছি এসে সে থমকে দাঁড়াল। কে? কারা?

—হুঁ হুঁ হুঁ।

—হুম্। হ্যাঁ হ্যাঁ।

মৃদুস্বরে কারা কথা কইছে ওই শিরীষগাছের তলায়—বাঁশবনের ধারে? কে? কারা? ওরা কারা? বাঁশবনের ধারে তার বাড়ির পিছনে? হুঁ। তাকে ঘায়েল ক'রে সে এসেছে সুবাসীর কাছে। আসবারই তো কথা।

সন্তর্পণে এগিয়ে চলল বনওয়ারী, কুড়িয়ে নিল একটা পাথর। লোহার অস্ত্র হ'লে ভাল হ'ত। কিন্তু সে ধৈর্যও নাই তার, অবসরও নাই। এই পাথরেই হবে—পাথরই যথেষ্ট। রেলের পুলের ধার থেকে কুড়িয়ে এনে এটা করালীই তাকে দিয়েছিল অনেকদিন আগে। সেই পাথর। হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবনে পাথর দিয়ে মাথা ছেঁচার অনেক উপকথা আছে। সুচাঁদ বলে—বনওয়ারীর বাবার বাবার বাবা আর আমার বাবার বাবা এক লোক তো! সে হ'ল আমার কত্তাবাবা। তা, সেই কত্তাবাবা আমার প্রথম কত্তামায়ের—মানে, তার পেথম পরিবারের ঘর থেকে আটপৌরেদের একজনকে বেরিয়ে যেতে দেখে শিল নোড়ার নোড়া দিয়ে মাথা ছেঁচে মেরেছিল। পরিবারের বুকে ব'সে নোড়া দিয়ে—

শুধু পরিবার সুবাসীর নয়—একটা নয়, দুটো ছেঁচতে হবে। করালীর মাথা সমেত ছেঁচবে সে। আগে করালীর। তার পর সুবাসীর। আকাশে আধখানা চাঁদ সত্ত্বেও, বহু পুরাতন বট-পাকুড়-শিরীষের নিবিড় পল্লবের ঘন ছায়া—পাশের বাঁশবনের ছায়ার সঙ্গে মিশে সে যেন অমাবস্যার অন্ধকার। হাঁসুলী বাঁকের আদ্যিকালের অন্ধকার আদিকাল থেকে এখানে থমথম করছে। এখানে শুক্লপক্ষ নাই। পূর্ণিমা নাই। চিরদিনের অমাবস্যা এখানে। অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে নোড়াটা হাতে এগিয়ে চলল বনওয়ারী।

শিরীষ গাছের অদূরে দাঁড়াল—কই? কোথায়? খুব আস্তে হুঁহুঁ শব্দে কথা তো শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। একসময়ে উৎকণ্ঠিত বনওয়ারীর মদের নেশার ঘোরে অর্ধ আচ্ছন্ন চোখের সম্মুখে স্পষ্ট যেন বেরিয়ে এল দুটি ছায়াছবি। স্পষ্ট দেখলে। বনওয়ারীর বুকটা লাফিয়ে উঠল। ওই—ওই চলেছে করালী আর সুবাসী। চলল সে পিছনে পিছনে। ওই চলেছে। ওই চলেছে—ওই। এই ক্ষণে তার চিত্তলোকে প্রস্তরযুগের আবেগ-বিশ্বাস-উচ্ছ্বাস বাসা গেড়ে বসেছে। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির সম্মুখে পীড়িত-হৃদয়াবেগপ্রভাবিত কল্পনার দুটি মূর্তি স্পষ্ট এগিয়ে চলেছে। চলছে, চলুক; কতদূর যাবে! বাঁশবন শেষ হয়ে এল। এবার দাঁড়াল সে। কই তারা, কই? হঠাৎ পাশের একটা ঝোপ থেকে দুটো বড় পাখী হুঁ-হুঁ-হুঁ শব্দ ক'রে পাখা বিস্তার ক'রে উড়ে গেল তার বিভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে। সে চমকে উঠল। ঠিক মনে হ'ল, মূর্তি দুটিই যেন অকস্মাৎ চন্দ্রালোকিত শূন্যালোকের শুভ্র স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে ভেসে চ'লে গেল। ক্রমশ উঁচুতে উঠে তারা সামনের কোপাইয়ের ধারে—দহের উপরে সেই শিমুল গাছটার ডালে গিয়ে বসল।

থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল বনওয়ারী। শূন্যে ভেসে গেল! তবে—তবে তো করালী সুবাসী নয়! কে? ওরা কে?

ও দুটো নিশাচর পাখী। এ দেশে বলে হুমহুমে পাখী। ওরা রাত্রে এমন মুখোমুখি ক'রে ব'সে—"হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুম হ্যাঁ-হুঁম" শব্দ ক'রে যেন পরস্পরের সঙ্গে কথা কয়। বনওয়ারী একথা জানে। কিন্তু আজ বনওয়ারীর মনে পক্ষ-বিস্তার ক'রে চলেছে কৃষ্ণপক্ষের আকাশ—সে আকাশের নীচে আদিমযুগের পৃথিবীতে বিচরণ করছে সে। তাই পাখী দুটো উড়ে গিয়ে শিমুলগাছে বসার সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্কে বিদ্যুতের মত অন্য কল্পনা খেলে গেল। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার কল্পনা। সম্মুখে জ্যোৎস্নায় ধবধব করছে কোপাইয়ের চরভূমি। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—কেউ কোথাও নাই। কিন্তু সে তো অন্ধকারের মধ্যে দুটি মূর্তি স্পষ্ট দেখেছে। স্পষ্ট কথা তাদের কইতে শুনেছে। অথচ আর কেউ নাই! কৃষ্ণমূর্তি দুটি অশরীরী হয়ে উড়ে গেল! রহস্যময়

পক্ষ বিস্তার ক'রে ওই শিমুলগাছের ডালে গিয়ে বসল! ওই দহে মরেছে কালোশশী। ওইখানে পুড়িয়েছে গোপালীকে—। তবে কে, কে ওরা? তবে কি—?

আবার কেঁপে উঠল বনওয়ারী। কালোশশী? গোপালীবালা? তারাই কি দুজনে তাকে আজ নিতে এসেছে? দেখাচ্ছে ওই শিমুলতলার শ্মশানভূমি? আতঙ্কের মধ্যে তার অন্ধবিশ্বাসী মন স্মরণ করলে তার হাতে বাঁধা মা-কালীর বাবাঠাকুরের মাদুলী দুটিকে। সে ডান হাতের কনুইটা নিজের বুকে চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। কই, মাদুলী কই? নাই তো! নাই তো! করালীর সঙ্গে ধস্তাধস্তির মধ্যে মাদুলী ছিঁড়ে প'ড়ে গিয়েছে। কি হবে? কে আজ রক্ষা করবে? বাবাঠাকুর নাই। বেলগাছ শুকিয়ে গিয়েছে। কাকে ডাকবে সে? আকাশ বেয়ে বিরাট সর্পবাহনে চ'ড়ে বাবাঠাকুর চ'লে গিয়েছেন। কে বাঁচাবে? অসহায় বনওয়ারীর চোখের সামনে শিমুলগাছের ডালে ব'সে গোপালী ও কালোশশী কথা বলছে—হুম্—হুম্—হুম্—

হুঁ—হুঁ—হুম্—হা—হা—হা। উচ্চ শব্দে একটা পাখী ডেকে উঠল এবার। সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চীৎকার ক'রে বনওয়ারী প'ড়ে গেল সেইখানে। জ্ঞান হারিয়ে গেল। হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবনের ওদিকে বসতির মধ্যে কাহারেরা ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখছে। এদিকে হেমন্তের শেষরাত্রে কোপাইয়ের জলের বুকে শরতের হালকা সাদা মেঘের মত কুয়াসা জেগে উঠেছে; চরভূমিতেও সেই সাইক্লোনের প্রচণ্ড বর্ষণসিক্ত গলিত পত্রজঞ্জাল ভরা মাটিতেও জেগে উঠছে অনুরূপ কুয়াসার এক-একটা পুঞ্জ, সে পুঞ্জ আশ্রয় করছে ঝোপ-ঝাড়গুলিকে। তেমনি একটি কুয়াসার আস্তরণ হাঁসুলীর বাঁকের বীর কোশকেঁধে বনওয়ারীর বিশাল দেহখানিকে ঘিরে ক্রমশ জেগে উঠতে লাগল।

সুদীর্ঘ ষাট দিন। অর্থাৎ দু মাস পর।

হাঁসুলী বাঁকের চারিপাশে কোপাই নদীর বাঁকে বাঁকে বিচিত্র শব্দ উঠছে। খট-খট-খট-খট-। সে শব্দ ছুটে চ'লে যাচ্ছে নদীর গর্ভের মধ্য দিয়ে; ছুটে গিয়ে ওদিকের বাঁকের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আবার এদিকে ফিরে আসছে। অকস্মাৎ শান্ত হাঁসুলী বাঁক শব্দমুখর হয়ে উঠেছে।

রোগশয্যার উপর বনওয়ারী আজ উঠে বসল। ষাট দিন শয্যাশায়ী ছিল; তার মধ্যে পঞ্চাশটা দিন কেটেছে চৈতন্যহীন অবস্থায়। চামড়া-ঢাকা মোটা হাড়ের কাঠামোখানা শুধু নিয়ে কোনোমতে সে উঠে বসল আজ।

ষাট দিন আগে কোপাইয়ের কূল থেকে জ্বরে অচেতন অবস্থায় কাহারেরা তুলে ঘরে এনেছিল। কারণ কেউ জানে না। বনওয়ারীর কিছু বলবার অবস্থা ছিল না। তবে প্রলাপের মধ্যে শুধু চীৎকার করেছে—বাবাঠাকুর, অক্ষা কর। আর চীৎকার করেছে—ওই কালোশশী, ওই গোপালী! আঃ—আঃ ওরে আমি যে উড়তে পারি না।

চিকিৎসা! সে না-চিকিৎসা। জাঙলের সদ্‌গোপ কবিরাজের ওষুধ। কবিরাজ ষাট দিনের মধ্যে পাঁচ দিন ঘাড় নেড়ে বলেছেন—রাত পার হবে না বাপু।

তবু বনওয়ারী বেঁচে উঠে বসল। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের মধ্যে সবল জীবনীশক্তি-আহরণ-করা কাহার-মাতব্বরের জীবন, এত সহজে যাবার নয় ব'লেই বাঁচল। কিন্তু এর চেয়ে না বেঁচে মরলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। বনওয়ারী আজ নিজেই বললে এ কথা।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা শেষ হয়ে গিয়েছে। আর তার বেঁচে লাভ কি? কেন বাঁচালি আমাকে?—ব'লে বার বার সে গভীর হতাশায় ঘাড় নাড়লে। চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল ঝ'রে পড়ল হাঁসুলী বাঁকের মাটির বুকে।

কথাটা বনওয়ারী সত্যই বলেছে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বোধ হয় শেষ হয়ে গেল। চিরকালের মত শেষ হয়েছে কিনা, সে কথা বলা অবশ্য যায় না; কিন্তু এ কথা ঠিক যে, শেষ হয়েছে বা হবে-হবে করছে।

পাপের ফলে দেবতা চ'লে গেলেন। বাবাঠাকুর চ'লে গিয়েছেন, কালারুদ্রের মন্দিরে যুদ্ধের আপিস বসেছে। কালারুদ্রও চ'লে গিয়েছেন। যুদ্ধ —কাল যুদ্ধ!

বনওয়ারীই বললে। মৃদু স্বরে গভীর দুঃখের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করলে, বলতে বলতে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ল। বললে—যুদ্ধ লেগেই হাঁসুলীর বাঁককে সেরে দিয়ে গেল। হতাশভাবে ঘাড় নাড়লে। মর্মান্তিক আক্ষেপ যেন নেড়ে সমস্ত হাঁসুলী বাঁকে ছড়িয়ে দিতে চাইল সে।

পঞ্চাশ দিনে জ্বর ছেড়েছে, কদিন থেকেই অল্পস্বল্প চেতনা হচ্ছিল তার। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় ক্ষীণ দুর্বল। চোখ মেলে চেয়ে দেখেও যেন কিছু বুঝতে পারছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার চোখের পাতা কিছুর ভারে যেন নেমে পড়ে সে ঘুমিয়ে পড়ছিল। ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে চেতনা স্পষ্ট হয়ে এল।

তার বিছানা—বিছানা একখানা ছেঁড়া কাঁথা—সেই বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে নসুবালা। হ্যাঁ তো, নসুবালাই। চেতনা হওয়ার প্রথম দিন থেকেই সে শুধু তাকেই দেখছে। সেই গোঁফ-কামানো মুখ, মেয়েদের মত ভঙ্গিতে ছেঁড়া ময়লা শাড়ি পরা, মাথায় খোঁপা বাঁধা, হাতে চুড়ি নোয়া শাঁখা পরা নসুবালা তার বিছানার পাশে অহরহ রয়েছে। সুবাসীকে দেখতে পাচ্ছে না। প্রথম কয়েকদিন মনে কোনও প্রশ্ন জাগে নাই, শুধু অতিপরিচিত কাউকে যেন পাচ্ছে না ব'লে মনে হয়েছিল। আর-একজনকে মধ্যে মধ্যে আবছা চিনতে পারছিল—পাগলকে। পাগল? মিতে?

প্রথম দিন সে চোখ মেলে চাইতেই নসুবালা তার মুখের সামনে ঝুঁকে প'ড়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—সোর হয়েছেন? চিনতে পারছ আমাকে?

না।—ঘাড় নেড়েছিল বনওয়ারী। তারপর পাগল এসে পাশে বসেছিল। ব্যানো!—ব'লে পরম স্নেহে তার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়েছিল। বনওয়ারী তবুও তাকে চিনতে পারে নাই।

দ্বিতীয় দিন সে পাগলকে চিনেছিল। নসুবালাকে দেখে প্রশ্ন করেছিল—সুবাসী? নসু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গিয়েছিল।

তৃতীয় দিনে নসুকে চিনেছিল, বলেছিল—নসুবালা?

নসু একমুখ হেসে বলেছিল—চিনতে পেরেছ আমাকে? আঃ, বাঁচলাম। পরাণটা আমার উদ্ব্যাগে খলবল করছিল। আঃ, সেই শূরবীর মানুষ গো!

তারপর এদিক ওদিক চেয়ে খুঁজে না পেয়ে বনওয়ারী জিজ্ঞাসা করেছিল—সে কই?

কথাটা শুনেই পাগল উঠে চ'লে গিয়েছিল। নসু প্রশ্ন করেছিল—কে?

—সুবাসী।

—সে আছে। আসছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে নসুবালা বলেছিল—গিয়েছে কোথা। আসবে।

কিন্তু সুবাসী এল না। সমস্ত দিন চ'লে গেল—তবু এল না। বনওয়ারী বুঝতে পারলে এবার। আর জিজ্ঞাসা করলে না সে। কাহারপাড়ার উপকথার ধারা তো সে জানে। শুধু কাঁদলে খানিকটা। নসু বললে—কেঁদো না। চোখ মুছিয়ে দিয়ে একটু জল দিলে তার মুখে, বললে—জল খাও এক ঢোক। তারপর ছড়া কাটলে—'বেঁচে থাকুক চূড়োবাঁশি, রাই হেন কত মিলবে দাসী'। ঝাঁটা মারি, ঝাঁটা মারি তার মুখে।

বনওয়ারী আর কোন প্রশ্ন করে নাই। তার মনেও পড়েছে সব, দশ দিনে তার বুদ্ধি এবং অনুমানশক্তির মধ্যে সজীবতা এসেছে। সুবাসী কোথায় সে কথা সে কল্পনা করতে পারছে। চুপ ক'রে শুয়ে শুধু ভাবলে—আপনার যত পুরানো কথা। এই যে অবস্থা তার হয়েছে—এমন যে হবে, এ কোনও দিন সে মনে ভাবে নাই। আজকের এই দিনে নসু ছাড়া আর তার কেউ নেই? তার এই দিনগুলির জন্যেই কি বাবাঠাকুর দয়া ক'রে নসুকে নারীর

স্বভাব দিয়ে গড়েছিলেন ? গ’ড়ে বলেছিলেন—আমি যখন চ’লে যাব হাঁসুলী বাঁক ছেড়ে, বনওয়ারী যখন কুটোর মত তুচ্ছ লোক হবে, তখন তার ভার নেবার জন্যেই তোকে গড়লাম ?

খট-খট-খট-খট ! খটাং, খটাং, খটাং ! শব্দ ছুটে যাচ্ছে, ফিরে আসছে। আজ মনে হ’ল—খট-খট খট-খট ক’রে কিসের একটা শব্দ উঠছে। শব্দটা বোধ হয় চেতনা হওয়ার পর থেকেই শুনছে, কিন্তু ওদিকে শব্দটা খুব স্পষ্ট ছিল না, কানে সে শুনতে পেত না ; মনটাও ওদিকে যেত না। মন শুধু এ কদিন খুঁজে ফিরছে পুরানো কথা। আজ সে পুরানো কথা খুঁজে পেয়েছে। সব মনে পড়েছে। কানেও আজ শুনতে পাচ্ছে। শব্দটা আজ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল। আজ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। অনবরতই শব্দ উঠছে। নিঝুম তেপান্তরের মাঠে কে যেন কাঠের উপর কিছু ঠুকেই চলেছে—খট-খট খট-খট !

কোপাইয়ের বাঁক থেকে শব্দটা ঘুরে আসছে—খট-খট—খট-খট—খটাং, খটাং, খটাং ! সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—খটাং, খটাং, খটাং !

সে একলা শুয়ে ছিল ঘরে। শব্দটা শুনে শুনে তার মনে প্রশ্ন জাগল।

সে ডাকলে—নসু ! পাগল !

কেউ উত্তর দিলে না। ধীরে ধীরে সে চোখ বন্ধ করলে।

কি রকম যেন ! কোথাও মানুষের কোন সাড়া শব্দ নাই, কেউ চীৎকার ক’রে কাউকে ডাকছে না, কেউ কাঁদছে না, কেউ হাসছে না, কেউ ঝগড়া করছে না, গাই বাছুরকে ডাকছে না, বাছুর মাকে ডাকছে না। ছেলে-ছোকরারাও কি গান ভুলে গেল ?

কেবলই শব্দ উঠছে—খট-খট—খট-খট—খটাং—খটাং—খটাং—

শুধু খট-খট-খটাং-খটাংই নয়। গোঁ-গোঁ—গোঁ—গোঁ ! উড়ো-জাহাজ উড়ে যাচ্ছে বোধ হয়। শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়ল বনওয়ারী। এর পরের দিন বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বললে—দরজাটা ভাল ক’রে খুলে দে দেখি। দিনমণিকে একবার দেখি, ওদ দেখি। তারপর সে প্রশ্ন করলে—

পুলের ওপর গাড়ি যেছে, লয়? এরই কিছুক্ষণ পরই আবার সেই শব্দ উঠতে লাগল—খট-খট খট-খট খটাং খটাং! ভুরু কুঁচকে সে নসুর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—কি নসু? শব্দ?

—বাঁশ কাটছে।

বাঁশ কাটছে? সকাল থেকে সনজে পর্যন্ত প্রতিদিনই বাঁশ কাটছে? হবে। জাঙলের ঘোষ মহাশয়েরা মালিক, ঘর দোর ছাওয়ানোর সময়। হবে।

কিছুক্ষণ পরেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

খাবার সময় নসু তাকে ডাকলে—সাবুটুকুন খাও।

শব্দ উঠছে—খটাং খটাং!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। ভাবতে লাগল, সুবাসীর কথা, তার দশার কথা, করালীর কাছে তার সেদিনের নিষ্ঠুর পরাজয়ের কথা। চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল। লুকাবার জন্য সে বিছানায় নিস্পন্দের মতো প'ড়ে রইল।

বিকালে পাগল ডাকলে—ওঠ ভাই, দুটো কথা বল।

বনওয়ারী উঠে বসল। এইবার তার কানে এল—খটাং-খটাং খটাং-খটাং! শব্দ ছুটছে হাঁসুলী বাঁকের এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক।

পরের দিন আবার শব্দ উঠতে লাগল। খট্-খট্—খটাং—

সে আজ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে—আজও বাঁশ কাটছে নসুবালা? এত বাঁশ কে কাটছে? নিম্মূল করলে বাঁশগুলান?

পাগল বললে—যুদ্ধুর ঠিকেদারেরা বাঁশ কিনছে ভাই, জাঙলের সদ্‌গোপেরা বেচেছেন। টাকায় দুটি বাঁশ! তারাই কাটছে বাঁশ।

টাকায় দুটি বাঁশ? টাকায় আটটা বাঁশ—দুটি দরে বিক্রি হচ্ছে? যুদ্ধুর ঠিকেদারে সব বাঁশ কাটছে? হে ভগবান! এ কি হ'ল? আগুন লেগে গেল দেশে? কিন্তু কেন?

আকাশের দিকে মুখ তুলে পাগল বললে—পিথিমীতে ভীষণ যুদ্ধ লেগেছে এমন যুদ্ধ ভূভারতে কখনও হয় নাই। জাপানীরা খুব যুদ্ধ চালিয়েছে।

কলকাতায় বোমা মেরে ভেঙে চুরমার করছে। সেখানকার লোকে কুকুর বিড়ালের মত পালিয়ে এসেছে। চন্ননপুরের কুঁড়ের ভাড়া পাঁচ গণ্ডা টাকা। চন্ননপুরে ঘর না পেয়ে জাঙলে সদ্‌গোপদের বাড়ি ভাড়া নিয়েছে দশ-বারো ঘর কলকাতার লোক। চালের মণ চল্লিশ টাকা, ধানের মণ ষোল টাকা। আরও নাকি নানান দেশ থেকে লোকেরা পালিয়ে আসবে। যাবে শুনেছি চন্ননপুরের রেল-লাইনের পাশের পাকা সড়ক দিয়ে। কাটোয়া হয়ে দুমকা হয়ে চ'লে যাবে পশ্চিম দেশে। তারা পথে চন্ননপুরে থাকবে, জিরোবে দুদিন, তার জন্য বাঁশের খড়ের ঘর তৈরী হচ্ছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাগল আবার বললে—সেই, ভাই, সেই সন্ধান দিলে—বাঁশবাঁদির বাঁশের, হাঁসুলী বাঁকের কাঠের। সেই করালী! সব্বনেশে করালী!

বনওয়ারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—করালী!

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, সেই তো দেবে। তার ধরমই তো এই। কেউ গড়ে, কেউ ভাঙে।

আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—চন্ননপুরে তা হ'লে খুব জমজমাট!

—খুব।

হাত পা নেড়ে ভঙ্গি ক'রে নসুবালা বললে—সে একখানা বড় গেরাম, বুল্লে কিনা! তার মধ্যে দশ-দশটা কাহারপাড়া ঢুকে যায়। বাবা রে, বাবা রে, বাবা রে, সে কত কাণ্ড গো! তার জন্যে ইঁদারা হয়েছে, ডাক্তার বসেছে, পাঁচ শো মণ চিঁড়ে তৈরি ক'রে এখেছে, জালায় জালায় মণ মণ গুড় এখেছে। সেই সব ঘরের জন্যে বাঁশ কাটছে। তা'পরেতে উত্তরে যে এললাইন বসেছে, যেখানে উড়ো-জাহাজের আস্তাবল হয়েছে, সেখানে সব কি হচ্ছে, তাতে বাঁশ লাগবে। সরকার থেকে হুকুম হয়েছে—বাঁশ দিতে হবে, দাম যা চাও লাও। বড় বড় গাছ কেটে কাঠ ক'রে আখছে আন্নাবান্নার জন্যে।

অবাকবিস্ময়ে ভাবতে লাগল বনওয়ারী। বুঝতে পারলে না। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় এ কখনও ঘটে নাই। বান এসেছে, ঝড় এসেছে, গাঁয়ে আগুনও লেগেছে, মড়কও হয়েছে, পৃথিবীও কেঁপেছে—তাও আছে হাঁসুলী

বাঁকের উপকথায়। দাঙ্গা আছে, ডাকাতি আছে, কালোবউ বড়বউয়ের প্রেতাত্মা আছে, কিন্তু যুদ্ধ নাই। যে যুদ্ধে হাঁসুলী বাঁকের তন্দ্রা ভঙ্গ হয়, উপকথায় ছেদ পড়ে, এখানকার মানুষের জীবনস্রোত—পৃথিবীর জীবনস্রোতের আকর্ষণে ইতিহাসের ধারায় মিশে যায়, সে যুদ্ধ উপকথার কল্পনায় নাই। বাবাঠাকুর কখনও বলেন নাই, স্বপ্ন দেন নাই। কালারুদ্দ্ও কখনও জানান নাই। কি ক'রে জানবে তারা? স্থূলমস্তিষ্ক হাঁসুলী বাঁকের মানুষ বিরাটদেহ বনওয়ারী, যে কাঁধ বেঁকিয়ে চলে, ধপ ধপ শব্দ ওঠে যার অতিকায় পায়ের সবল পদক্ষেপে, তার মস্তিষ্কে এ কিছুতেই ঢুকল না।

পরদিন আবার শব্দ উঠতে লাগল। বনওয়ারী বললে—আমাকে একবার বাইরে নিয়ে যাবি নসু?

—বাইরে যাবা?

—হ্যাঁ। একবার মা-জনুনীকে দেখি।

—মা-জনুনী?

—হ্যাঁ রে। আমার হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদি মা-জনুনীকে একবার দেখি, কি দশা করলে তার? আঃ-আঃ! বুক ফেটে আক্ষেপ বেরিয়ে এল তার।

—যেতে পারবা?

—ধর্, খুব পারব আমি। সে নিজেই উঠে বসল। উঠে দাঁড়াল। মটমট শব্দ ক'রে উঠল দীর্ঘদিন-শুয়ে-থেকে জাম-ধরা মোটা হাড়গুলি।

খাঁ-খাঁ করছে—চারিদিক খাঁ-খাঁ করছে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদির বাঁশবন নির্মূল হয়ে গিয়েছে। শুধু বাঁশবন নয়, বড় বড় বটগাছ অশ্বত্থগাছ পর্যন্ত নাই। ঘর থেকে বার হতেই—তীব্র আলো চোখে এসে লাগল। আকাশের কোলে এতটুকু সবুজ নাই। এখানে ওখানে রয়েছে শুধু দুটো চারটে শীর্ণকায় পল্লবহীন শিরীষ-শ্যাওড়া-বেলগাছ। কোথাও কোন ছায়া নাই, চোখে এসে লাগে ছটা, চারিদিকে খটখট করছে মাঘের রৌদ্র। চারিদিকে দেখা যাচ্ছে নদীর কিনারা পর্যন্ত হাঁসুলী বাঁকের বেড়। নদী পার হয়ে ওপারে

দেখা যাচ্ছে গ্রাম-গ্রামান্তর। পথ চ'লে গিয়েছে কোন্ দেশ দিয়ে। সে হাঁসুলী বাঁকের কোন চিহ্নই আর নেই যেন। গাঁয়ে ঢুকে ছায়ার নেশায় একটা কেমন ঢুলুনির ঘোর লাগত। ছায়ায় ছায়ায় চলতে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবনা ভাবতে ভাল লাগত। বাঁশবনের আর বট-অশ্বত্থের ঘন ছায়া মুছে যাওয়ার সঙ্গে সে সব ঘুচে গেল। আর গাছতলায় ব'সে চোখে তন্দ্রা নামবার অবকাশ হবে না, ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাঁসুলী বাঁকের উপকথার স্বপ্ন রচনার ঠাঁই রইল না।

ফিরে তাকালে সে বাবাঠাকুরের থানের দিকে। বাবাঠাকুরের থান, আর তার মধ্যে ছিল আটপৌরেপাড়ার সেই বটগাছটি, যার তলায় আলো নিবিয়ে দিয়েছিল কালোশশী, যার তলায় সুবাসীকে দেখে তার কালোশশী ব'লে ভ্রম হয়েছিল। কই সে গাছ? বাবাঠাকুরের থানই বা কোন্ দিকে? ওটা কোন্ জায়গা? এত মোটর গাড়ি কিসের? কাদের? চন্ননপুরের কারখানাটা এগিয়ে এল? গোঁ-গোঁ শব্দ করছে কখানা গাড়ি। কি বিশ্রী ধোঁয়ার গন্ধ! এখান পর্যন্ত এসে বনওয়ারীর নাকে ঢুকছে।

সে অসহায় আর্তের মত পাগলের দিকে চেয়ে বললে—পাগল, এ যে আমি কিছু ঠাওর পেছি না ভাই। বাবাঠাকুরের থান কোথা গেল? ওটা কোন্ জায়গা? এত গাড়ি? পাগল?

—ওই তো ভাই! বাবাঠাকুরের থান তো আর নাই। যুদ্ধুর মটর-গাড়ির আড্ডা হয়েছে।

চিহ্ন নাই বাবাঠাকুরের স্থানের! বেলগাছ নাই, বাঁদরলাঠির গাছটি নাই, কুলগাছের ঝোপগুলি নাই, আলোকলতা নাই, তালগাছের বেড় নাই। লাল কাঁকর বিছানো চত্বর চারিপাশের সাদা রঙ-মাখানো ইটের ঘেরার মধ্যে ঝকমক করছে। মোটর গাড়ি যাচ্ছে আসছে গোঙাচ্ছে।

পাগল বললে—বাবার থানকে কেটেকুটে সমান ক'রে মটরগাড়ীর আস্তানা করেছে বনওয়ারী ভাই। কলির শেষ আমাদেরও শেষ। ওইখানে থেকে বাঁশ কাঠ বোঝাই ক'রে নিয়ে যায় চন্ননপুর। চন্ননপুর থেকে হাঁসুলী বাঁক পর্যন্ত পাকা আস্তা করেছে। কিছু আর আখলে না।

ওই সেই রাস্তা। পাকা শাহী চওড়া রাস্তা। লাল কাঁকরে মোড়া সোজা চ'লে গিয়েছে হাঁসুলী বাঁক থেকে জাঙল হয়ে চন্ননপুর ; তীরের মত সোজা রাস্তা। রাস্তার গাঁটছড়াটা চন্ননপুরের সঙ্গে হাঁসুলী বাঁককে বেঁধে দিয়েছে। ধানের জমি মেরেছে, খাল পুরিয়েছে, নালা বেঁধে সাঁকো তুলেছে। ভোঁ-ভোঁ শব্দ ক'রে ওই পথে গাড়ি যাচ্ছে আর আসছে।

পাগল বললে—কোপাইয়ের ঘাট পর্যন্ত গিয়েছে পথ। এইবার কোপাই পেরিয়ে ওপারে উঠবে। ওপারের গাছও সব কাটবে কিনা!

বনওয়ারী আর্তনাদ ক'রে উঠল এবার—কেনে বাঁচালি আমাকে পাগল ? ওরে নসুবালা, এ তোরা কি দেখাতে বাঁচালি ? আঃ, হায় রে, কেনে বাঁচলাম আমি ?

চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি তুলেই সে আবার কাহারপাড়ার দিকে তাকালে।

এতক্ষণে আর একটা জিনিস তার চোখে লাগল, মনে ধরা পড়ল।

খাঁ-খাঁ শুধু চারিপাশের দিক্‌দিগন্তরই করছে না। হাঁসুলী বাঁকের বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকের উপকথার পুরী বাঁশবাঁদি গ্রাম—সেও যেন খাঁ-খাঁ করছে। ঘরগুলি রয়েছে, কিন্তু কলরব নাই, গরু নাই, বাছুর নাই, ছাগল নাই, ভেড়া নাই, মেয়েরা কলহ করছে না, নীল বাঁধের জলে হাঁস চরছে না, ছেলেরা খেলা করছে না, এ কি হ'ল ? এমন কি কাহারপাড়ার কুকুরগুলোও দেখা যায় না। হাঁসুলী বাঁকের বুকের মধ্যে উপকথার কৌটার ভিতর ভোমরা-ভোমরীর মত কালো কাহারদের মেয়ে-পুরুষেরা কোথায় গেল ?

পাগল হাসলে, বললে—তারা আছে, সুখেই আছে। করালী তাদের ডেকে নিয়ে গিয়েছে। চন্ননপুরে কারখানায় মজুরি খাটছে—খাচ্ছে। কেউ কেউ সন্ধ্যেতে আসবে। কতক বা আসবে না। বেশির ভাগই আসে না। সুখেই আছে হে তারা।

বনওয়ারী আর কোনও আক্ষেপ প্রকাশ করলে না। থাক্, তারা সুখেই থাক্। নসু বললে, কতক মরেছে, কেউ বা পালাল্‌ছে।

নসুবালা হিসেব দিলে। ব'লে গেল একে একে এক এক-জনের কথা। তার মুখের কাছে হাত নেড়ে বললে—সেই অমণ বুড়ো গো! সবচেয়ে আগে পালাল্ছে সেই অমণকাকা তোমার। তোমাকে যেদিন অসুখ হয়ে ঘরে নিয়ে এল, ঠিক তার দুদিন বাদেই।

বুড়ো রমণ তার দুদিন পরেই গরু চরাতে গিয়ে সেখানেই বনওয়ারীর একটা ভাল গাই পাইকারদের বিক্রি ক'রে দিয়ে মাঠের পথ ধ'রে পালিয়েছে। শোনা যায়, সে আছে কাটোয়ায়, লাঠি হাতে, কুঁজো হয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভিক্ষে ক'রে। বলে—শেষ দশা, তাই এলাম মা-গঙ্গার ধারে। হাড় কখানা গঙ্গায় পড়লে আসছে জন্মে উঁচুকুলে জনম-টনম হবে।

নয়ানের মা মরেছে। সে মরণ তার ভীষণ। অন্তত নসু তাই বললে—নবান্নের দিন, অগ্রহায়ণের শেষ মাসে গিয়েছে নবান্ন। নয়ানের মা জাঙলে সদ্গোপ মহাশয়দের চার বাড়িতে আকণ্ঠ এঁটোকাটার প্রসাদ খেয়ে দম বন্ধ হয়ে হাঁস-ফাঁস ক'রে মারা গিয়েছে। নড়তে পারে নাই, কথা বলতে পারে নাই, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মরেছে।

নসুবালা হঠাৎ কেঁদে ফেললে—তার মনে প'ড়ে গেল সে কথা। চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল নয়ানের মায়ের সেই মরণকালের ছবি। শিউরে উঠল সে। চোখ জলে ভ'রে উঠল। কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে সে বললে—এই দেখ, ওইখানে ওই গাছতলাটিতে মরেছেল নয়ানের মা। একা প'ড়ে অইল, কেউ দেখলে না। তুমি অসুখে প'ড়ে, মাতব্বর নাই, মুরুব্বি নাই, অনাথাকে দেখবার গরজ কার, বল ? তবে তোমাকে নিয়েও খুব হৈ-চৈ তখন, নোকে ভাবছে—কি হয়, কি হয় ? নয়ানের মাকে কে দেখবে বল ? আমি দেখে কাছে বসলাম। ভাবলাম—আহা, ভাতার যেয়েছে, যুগ্যি পুত যেয়েছে—অনাথা। মনে হ'ল কি জান ? আমারও হয়তো শেষে এই দশাই হবে। আমারও তো কেউ নাই। আমাকেও এমনি ক'রে মরতে হবে। মুখে জল দেলাম তো খেলে, আবার হাঁ করলে। আবার দেলাম, আবার খেলে। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললাম—কি হয়েছে নয়ানের মা ?

তা মুখে কিছু বলতে লারলে, শুধু অনেক কষ্টে হাতটি তুলে কপালে আখলে। বুল্লে কিনা, বললে—কপাল—নেকন। তা'পরেতে কোঁতাতে লাগল। সে কি কোঁতানি! মনে হ'ল, জীউটা বেরিয়ে যেলে খালাস পায়। তা কি সে সহজে যায়? অ্যানেক এতে আঁধারের মধ্যে কখন যে জীউটা বেরিয়ে গেল, তা বুঝতে লারলাম।

আটপৌরেদের একজন মরেছে—ওই যে গো—বেশ নামটি। কিন্তু কিছুতেই মনে থাকে না।

পাগল বললে—বিশ্বামিত্ত।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিশ্বামিত্ত।

'বিশ্বামিত্র' নামটি নসুর মনে থাকে না।

বিশ্বামিত্রের বাবা যাত্রার পালাগান দেখে ওই নাম রেখেছিল ছেলের। বিশ্বামিত্র মরেছে জ্বরে। তার পর এর ছেলে মরেছে, ওর কচিকাচা মরেছে—সে সব ধর্তব্যের মধ্যে নয়। নসু বললে—পায়ের হাতের আঙুলে গোনা যায় না ব্যানোকাকা, হিসেব দোব কি? একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ ব'লে উঠল—আর তোমার নিমতেলে পানার হয়েছে জেল। আহা! পানকেষ্ট কদমতলায় বিহার করতে যেয়ে গেল জেলখানাতে।

—জেল?

—হ্যাঁ, জেল। নসু খুব রঙ দিয়েই বললে—যেমন জেলাপীর পাক বুদ্ধি, তেমনি ফল। মনিবের সঙ্গে হিসেব নিয়ে ঝগড়া হ'ল। পানু আমার পানকেষ্ট; মনিবের শোধ নিতে—মনিবের উপো-বাঁধানো হুঁকো চুরি করেছেল। পানার মনিবকে তো জান! পেকো মোড়ল নাম। কাজেও পেকো মোড়ল।

পাগল বললে—ধরা পড়ত না ছোঁড়া। ধরা পড়ল পরিবারের টানে। ধরিয়ে দিলে করালী। পুলিসে খবর দিয়েছিল পেকো মণ্ডল। পানু তখন লুকিয়ে পড়েছে। কোথা যে লুকিয়ে থাকত কেউ জানত না। রাত্তে এসে ঘরে চারটি ক'রে খেয়ে যেত। তুমি তখন শয্যাশায়ী অজ্ঞান, করালী বুক ফুলিয়ে আসে যায়; ছোঁড়া এখন পানার পরিবারকে নানা রকম লোভ

দেখাতে লাগল। বলে—চন্নপুরে চল্, খাটবি খাবি। ভাল কাজ ক'রে দোব আমি। সেই লোভে মেয়েটা স্বীকার করলে। রাত্রে পানা এসে খেয়ে যায় বাড়িতে। করালী শুনে রাত্রে তক্কে তক্কে ছিল—ধরলে একদিন চেপে। দিয়ে দিলে পুলিসে। পানা ব'লে যেল কি জান? বললে—যাক, কিছুদিন এখন নিশ্চিন্দি।

নসু বললে—পানার বউ এখন চন্ননপুরে আঙামুখো সাহেবের উড়ো-জাহাজের আস্তানায় খাটে। খাটুনি, না, মাথা। ওজকার খুব; ফেশান কি!

বনওয়ারী উদাস হয়ে চেয়ে রইল। চোখ গিয়ে পড়ল তার চন্ননপুরের রাঙা পাকা পথের উপর। রাস্তাটা ঝকঝক তকতক করছে। ওই পথে সব ছুটে যায় চন্ননপুরে খাটুনি খাটতে। পাঁচ সিকে দেড় টাকা মজুরি। যারা আবার রেলের তেরপল ঢালা মালগাড়িতে লাইনের কাজে সেই খানেই দিন-রাত্রি থাকে, তারা পায় বেশি। কয়লা পায়, রেলের লোকেরা কম দামে চাল ডাল দেয়।

হঠাৎ বনওয়ারী পাগলের মুখের দিকে চেয়ে বললে,—পাগল, কুলধম্ম সবাই ছাড়লে? অতন, গুপী, পেল্লাদ—সবাই?

কথার উপরেই কথা দিয়ে জবাব দিলে নসুবালা—সবাই—সবাই—সবাই। কেউ বাকি নাই। মেয়েপুরুষ সব চন্ননপুরে ছুটছে ভোর না হতে। সময় নাই। রবকাশ নাই। কি করবে বল? পেটের দায়।

পাগল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—ওদর, পেট, বনওয়ারী, উনিই সব।

নসুবালা বললে—ম'রে যাই। শুধু ওদর? লোভ পাপ, বুয়েচ ব্যানোকাকা পাপ। পিথিমীতে পাপের ভারা ভরতে আর বাকি নাই। একটি নোক দেখলাম না, যে ধম্মের মুখ তাকায়। ঘোষেরা—তোমার এতকালের মনিব ভাগের জমি ছাড়িয়ে নিলে। সায়েবডাঙার জমি, তুমি উইকে এক পিট ভুঁইকে এক পিঠ দিয়ে ভাঙলে। চন্ননপুরের বাবু তা সব কেড়ে নিলে। পাগলমামা যেয়েছিল একবার বাবুদের ঠেনে, তা—

বনওয়ারী পাগলের মুখের দিকে চেয়ে বললে—পাগল!

পাগল মাটি খুঁটতে খুঁটতে বললে—যেয়েছে, সে সব যেয়েছে, ভাই। বাবুরা এক ছটাক ভাগ দিলে না।

বনওয়ারীর কাছে পিতিপুরুষের আমল থেকে যে জমি ভাগ দিয়েছিল, ঘোষেরাও তা ছাড়িয়ে নিয়েছে।

বনওয়ারী হাসলে। যাক, সর্বস্বান্ত হয়েছে তা হ'লে। নিশ্চিন্ত।

অনেকক্ষণ পর বনওয়ারী বললে, নিজের কথা বাদ দিয়ে কাহারদের কথাই বললে—তা লোকে কারখানায় গিয়ে ভালই করেছে। দোষ দেবার কিছু নাই।

নসুবালা ব'লে গেল—দুর্দশার দিনে করালী ওদের ডাকলে। নিয়ে গেল চন্নপুরের রেলের কারবারে কারখানায়। কাজ দিলে। সব সুড় সুড় ক'রে চ'লে গেল। তোমার এত ব'ড় ব্যামো গেল, কেউ খোঁজও করলে না।

বনওয়ারী হাসলে—তা না আসুক।

নসু বললে—না এলে দুঃখ হয় বইকি! দুঃখ হয় না?

পাগল হেসে বললে—দুঃখ ক'রেই বা কি করবে বুন?

বনওয়ারীর হাতপায়ের ডগাগুলি ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

নসু বললে—আমি শুধু যাই নাই। ব্যানোকাকা, ওই মুখপোড়া করালীর উপর ঘেন্নায় লজ্জায় যাই নাই। যত ভালবাসতাম তাকে, তত বিষ হয়েছি তার ওপর। ছি-ছি-ছি! লজ্জায় ম'রে যাই! সে আবার সেপাইদের মতন পোশাক প'রে আজকাল বলে—মেলেটারি। জুতো পরে, টুপি মাথায় দেয়।

নসুবালা ব'লে যায় করালীর লজ্জাকর ঘৃণার্হ কীর্তিকলাপের কথা। বনওয়ারী কয়েকদিন তখন শয্যাশায়ী, এখন-তখন অবস্থা, সেই সময় একদিন সকালে দেখা গেল, সুবাসী নাই। সুবাসী তার আগের দিন বনওয়ারীর চিকিৎসার খরচের অজুহাতে গরু-বাছুরগুলি বিক্রি করেছিল। সেই টাকা-কড়ি সব নিয়ে বনওয়ারীকে ফেলে গভীর রাত্রে সে অদৃশ্য হ'ল। দুপুর নাগাদ খবর এল, সুবাসী চন্নপুরে—করালীর বাসায়। বনওয়ারীকে 'কাকা' বলত

করালী। সম্পর্ক বাছলে না—ছি-ছি-ছি! রোগা মানুষ বনওয়ারী, মেয়েটা চ'লে গেলে তার কি হবে, সে কথাও একবার ভাবলে না। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ঘৃণার্হ করালী। শুধু গায়ের জোরে, রক্তের তেজে, আর রোজগারের গরমে ধর্মকে পায়ে মাড়িয়ে গেল, রীতি-ব্যবহারকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলে, থুথু দিলে। ছি! ছি!

বনওয়ারী মাটির দিকে চেয়ে রইল স্থিরদৃষ্টিতে। না বললেও, সে এ কথা মনে মনে বুঝেছিল। তার অন্তর ব'লে দিয়েছিল—সুবাসী যখন পাশে নাই, ঘরে নাই, তখন করালী তাকে নিয়ে গিয়েছে। হাসতে হাসতে কালো বউয়ের মত রঙ্গ ক'রে করালীর সঙ্গে গিয়েছে, সে তা জানে। যাবেই—এই নিয়ম। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় এই কথাটি পুরানো কথা। পাগল হাসলে, ঘাড় নাড়লে সেও জানে—হাঁসুলী বাঁকে এই নিয়ম। নসু চোখ মুছছিল, চোখ মুছে সে আবার বললে—বলব কি ব্যানোকাকা, পাখীর মত মেয়ে, তার মুখের দিকেও চাইলে না সে। পাখী—আঃ—কি বলব ব্যানোকাকা—'চোখ গেল' পাখী যেমন 'চোখ গেল' ব'লে ডেকে কেঁদে সারা হয়, তেমনি ক'রে কাঁদলে, বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদলে।

আবার কাঁদতে লাগল নসুবালা। চোখ মুছতে লাগল। বললে—আঃ আঃ, পাখীর কথা মনে হ'লে আমার হিয়েটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আবার চোখ মুছে বললে—আমি আর লারলাম কাকা। আমি করালীকে শাপ-শাপান্ত ক'রে গাল দিয়ে চ'লে এলাম—গাঁয়ে চ'লে এলাম। ব'লে এলাম—জনমের মত হ'ল তোর সঙ্গে। গাঁয়ে এলাম। এসেই মনে পড়ল তোমার কথা। আঃ, তোমাকে কে দেখছে? ঘরে তো আর দ্বিতীয় জন নাই। সুবাসী পালিয়েছে, অমণ পালিয়েছে, কে দেখবে? রোগা মানুষ, প্রলয় জ্বর, অচেতন অবস্থা—কি হবে মানুষটির? সম্বলহীন অবস্থা; যথাসর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে সুবাসী। সংসার নিয়ে যারা ব্যতিব্যস্ত, মাথার ঘায়ে পাগল কুকুরের মত ছুটে বেড়াচ্ছে যারা, তাদেরই বা অবসর কোথায়? মেয়েরা দু-একজন আসছিল, যাচ্ছিল, দেখছিল; কিন্তু ঘরে তো আর স্ত্রীলোক ছিল না। শূরবীরের মত

বিকারগ্রস্ত পুরুষ বনওয়ারী, পরের ঘরের স্ত্রীলোকেরা তাকে সামলায় কি ক'রে ? তবে কি মানুষটা, এতবড় শূরবীর, এতবড় মান্যের 'নোকটি'—বিনা সেবায় মরবে ? রাত্রে জলের জন্য হাঁ ক'রে জল পাবে না, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে ছাতি ফেটে ম'রে যাবে ? আমার মন বললে—তবে তু কি করতে আছিস ? ভগবান যে তোকে পুরুষ গ'ড়েও মেয়ের মন দিয়েছে, মেয়ের মতন কাজকর্ম করবার ক্ষমতা দিয়েছে, কেনে দিয়েছে ? আর একদণ্ডের জন্য ভাবলাম না। চ'লে এলাম, শিয়রে এসে বসলাম।

ভগবানকে প্রণাম ক'রে নসু বললে—তা তাঁর চরণে পেনাম, তোমাকে বাঁচাতে পেরেছি।

বনওয়ারী আবার বললে—কেনে বাঁচালি নসু ?

—তোমার পেরমাই আর আমার হাত ধন্যি।

পাগল হেসে বললে—মরলেই তো ফুরুল বনওয়ারী। বহুভাগ্যের মনিষ্যি-জন্ম নয়ন ভ'রে সাধ মিটিয়ে দেখে লে। মরণ আছেই। হঠাৎ সে গান ধ'রে দেয়—

হাঁসুলী বাঁকের কথা—বলব কারে হায় ?
কোপাই নদীর জলে—কথা ভেসে যায়।

ওদিকে বাঁশ কাটা, গাছ কাটা চলছেই। খট-খট-খট-খট ! খটাং খটাং ! মড়-মড় শব্দে আছাড় খেয়ে পড়ছে গাছ, বাঁশ শুয়ে পড়ছে অল্প শব্দ ক'রে—মার-খাওয়া গরিব মানুষের মত। গাছ পড়ছে—হাঁসুলী বাঁক পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

খট—খট—খট—খট—খটাং—খটাং শব্দ ছুটে চলেছে চারিদিকে। হাঁসুলী বাঁকের বেড়ের কূলে কূলে ছড়িয়ে যাচ্ছে ; দূরে দূরান্তরে, কোপাইয়ের পুলে ঘা খেয়ে আবার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে। হয়তো হাঁসুলী বাঁকের ভাবীকালে দেশদেশান্তরের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘোষণা ক'রেও তার তৃপ্তি হচ্ছে না--প্রতিধ্বনির মধ্য দিয়ে ফিরে এসে অতীতকালের কল্পে কল্পে যেন আঘাত হেনে চলেছে।

নসুর কথা ফুরাবার নয়। সে আবার আরম্ভ করলে—দুঃখ আমার পাখীর জন্যে। আঃ, সোনার বরণ 'হলুদমণি' 'বেনেবউ' পাখী গো—সেই পাখী মনে পড়ে আমার পাখীর কথা মনে হ'লে। হ্যাঁ, মেয়ে বটে। বুঝলে, যেমনি সুবাসীকে নিয়ে গেল করালী, পাখী বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। পাখীর কান্না দেখে আমি তো গালি-গালাজ ক'রে পালিয়ে এলাম। সেই দিন সন্‌জে-বেলায় এই খানিক আত হয়েছে, এমুনি সময় পাখীও পালিয়ে এল গাঁয়ে, মায়ের কাছে। কাপড় অক্তে আঙা হয়ে যেয়েছে। পাখীর চোখ জ্বলছে।

জ্বলবে বইকি! কাহার-মেয়ে ক্ষেপে উঠেছিল যে! সে যে তখন দু-কূল-ভাঙা কোপাইয়ের মত ভয়ঙ্করী।

সন্ধ্যাবেলা কান্না শেষ ক'রে পাখী ঝগড়া আরম্ভ করেছিল করালীর সঙ্গে। তারপর একখানা কাটারি নিয়ে নিজের মাথায় মারতে গিয়ে হঠাৎ সে ব'লে উঠল—একা মরব কেন? করালী চেষ্টা করেছিল তার হাত ধরতে, তবু পাখী কাটারি বসিয়ে দিল করালীর মাথায়। শুধু করালীর মত পুরুষ আর তার হাত ধ'রে ফেলেছিল ব'লেই বেঁচেছে করালী, নইলে তাকে বাঁচতে হ'ত না। তবু খানিকটা চোট লেগেছিল করালীর মাথায়। সেই রক্ত মেখে পাখী এখানে পালিয়ে এল পাগলিনীর মত। পরদিন সকালে করালী এল কাহারপাড়ায়, মাথায় ডাক্তারখানার ফেটা বেঁধে। তখন পাখী সাধের খাঁচায় ম'রে প'ড়ে আছে। তার সাধের কোঠাঘরের সাঙায় দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে; তবে হ্যাঁ, করালীর কপালে পাখী চিরস্থায়ী দাগ এঁকে দিয়ে গিয়েছে। পাখীকে ভুলবার পথ রাখে নাই পাখী।

বসন—পাখীর মা চিরকালের ভাল মানুষ। আর চৌধুরীবাবুর ছেলের সঙ্গে প্রেমের কথা তো সবাই জানে। কাহারপাড়ার বিচিত্র মেয়ে বসন্ত! ওই চৌধুরীর ছেলেকে সে যে ভালবেসেছিল, তারপর সে আর কারও দিকে ফিরে তাকায় নাই। কাহারপাড়ার নীল বাঁধে শালুকের বনের মধ্যে পদ্মকলি যেমন উদয়াস্ত সূর্যের দিকেই চেয়ে থাকে, তেমনি ওই একজনের দিকেই ছিল তার মন প্রাণ চোখ সব। চৌধুরীদের ছেলের মৃত্যুর পর সে থাকত সংজাতের গৃহস্থ

ঘরের বিধবার মত। শান্ত মৃদুভাষী বসন্ত—মেয়ের মৃত্যুর পর গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ওই ভাঙা চৌধুরী-বাড়িতে। সেইখানেই এঁটোকাঁটার প্রসাদ খায়, আর মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প'ড়ে থাকে।

বসন্তের মা সুচাঁদ চন্নপুরে আছে। রেলের হাসপাতালের আশ্চর্য চিকিৎসা! পা কাটতে হয় নাই। বুড়ী বেঁচেছে। লাঠি ধ'রে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেড়ায় ভিক্ষে ক'রে। চন্ননপুরের ভদ্রলোকদের বাড়ি গিয়ে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বলে, ইস্টিশানের গাছতলায় ব'সে বলে। কেউ থাকলেও বলে, না থাকলেও বলে, ব'লেই যায়, ব'লেই যায়—বাঁশবনে-ঘেরা তন্দ্রা-মাখা স্বপ্নসুলভ ছায়াচ্ছন্ন হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। ফুলে ভরা, বিষে ভরা, রঙে স্নিগ্ধ, বেরঙে উগ্র, হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় বসন্ত তার সাদা রঙের তুলির দাগ, পাখী তার রক্তলেখা। এই কথা সে নিজের ভাষায় বলে। সম্ভবত হাঁসুলী বাঁকের উপকথার ঝুলি কাঁধে নিয়ে সে নিজে হ'ল আদ্যিকালের বুড়ী; করালী হ'ল দৈত্য কিংবা শয়তান—কিংবা সে-ই হ'ল রাজপুত্র, নতুন কালের মাতব্বর। যুদ্ধকে ওই ডেকে নিয়ে গিয়ে বেশি ক'রে ঢোকালে হাঁসুলী বাঁকের কাহারপাড়ায়। সেই ঠিকাদারকে খবর দিলে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে আদ্যিকালের বুড়ো বট রয়েছে। কেটে ফেলল সেই বটগাছটা। প্রথমে এসেই তারা কাটলে সেই বটগাছ। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার হাড়-পাঁজরা-মেরুদণ্ড কাটিয়ে এনে তৈরি করছে যুদ্ধের হুকুমমত ইতিহাসের ছাঁদে ঘরবাড়ি।

মড় মড়—দুম! প্রচণ্ড উচ্চ শব্দে চকিত হয়ে উঠল হাঁসুলী বাঁক। এক ঝাঁক পাখী কলরব ক'রে উঠল। অল্প এক ঝাঁক, ঝাঁকে ঝাঁকে বন্য পাখীর দলের বাসা ঘুচে গিয়েছে হাঁসুলী বাঁক থেকে। দাঁতালের দুটো একটাও এ শব্দে ছুটে বার হ'ল না। ঊর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে ভয়ার্ত গরু ছুটে এল না, ছাগলও না। ছেলেরা ছুটে বেরিয়ে গেল না দেখতে, এত কিসের শব্দ! ছেলেদের নিয়েই যে খাটতে যায় কাহারেরা চন্ননপুরে। তা ছাড়া থাকলেও হয়তো তারা এ শব্দে বিস্মিত হ'ত না; চন্ননপুরের ধ্বনির উচ্চতা এবং বৈচিত্র্য এর চেয়ে যে অনেক সমৃদ্ধ।

ছাগল গরু নাইই আর কাহারপাড়ায়। যুদ্ধ লেগেছে। চালান যাচ্ছে। দু টাকার ছাগল দশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দশ টাকার গাইয়ের দাম তিরিশ টাকা। পঁচিশ টাকার বলদ একশো টাকা। দুধের দাম নয়, হেলের শক্তির দাম নয়, মাংসের দাম। যুদ্ধ কাহারদের গোসেবা দুধবিক্রি ভুলিয়ে দিলে, ও ব্যবসাটাই ঘুচিয়ে দিলে।

নসু উঠে দেখলে, ব্যাপারটা কি? গালে হাত দিয়ে শিউরে উঠল সে। —মা, গো, দহের ধারে সেই শিমুলবৃক্ষটিকে কাটলে গো। মড়মড় শব্দে প্রচণ্ডবেগে পড়ছে আদিকালের বনস্পতি। তার পড়ার বেগের ঝটকা এখনও বাতাসে ব'য়ে চলেছে। বোধ হয় শুধু বেগের মধ্যে দিয়ে ব'লে যাচ্ছে—আমি যাচ্ছি।

খট-খট-খট-খট-খট-খট! বাঁশ কাটছেই। আজ একটা পাশ একেবারে সাফ হয়ে হাঁসুলী বাঁক মিলে গেল—দূর দেশান্তরের সঙ্গে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় শেষকালে শুধু গাছকাটার শব্দ। মানুষেরা চন্ননপুরে চ'লে গিয়ে শহরে বাজারে রাজপথে চলমান দ্রুতধাবমান জনস্রোতের মধ্যে মিশে গিয়েছে। স্থাণু স্থাবর বনস্পতি, যারা সর্বপ্রথম গড়েছিল হাঁসুলী বাঁকের উপকথার ছায়াচ্ছন্ন শান্ত-তন্দ্রালু গ্রামখানি, তারাই যাচ্ছে এবার, তারা হচ্ছে বিগত। তারই মধ্যে ব'সে আছে সে যুগের শেষ মানুষ বনওয়ারী, স্থাবরের মত।

খুঁটি ধ'রে সে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। কিছুই নাই—কিছুই নাই—হাঁসুলী বাঁকের সে কাহারপাড়ার আর কিছুই নাই। বাঁশবনের বেড় নাই, আদ্যিকালের বৃক্ষ নাই, মানুষ নাই, জন নাই, পশু নাই, পক্ষীরা পর্যন্তই নাই। পক্ষীর মধ্যে আছে কাকেরা, তারা উচ্ছিন্ন বাঁশবন, আগাছার জঙ্গল থেকে গৃহহীন পতঙ্গগুলিকে ধ'রে খাচ্ছে। চারিদিকে শুধু শক্ত বাঁধানো লাল কাঁকরের পথ। আছে শুধু কোপাইয়ের বেড়, হাঁসুলী বাঁকের মাটি, আর পুরানো আমলের পড়-পড় জনহীন ঘরগুলি। ওগুলির দিকে তাকিয়ে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালে—শূন্য বাঁশঝাড়ের দিকে। একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। ও ঘরগুলিও থাকবে না।

সন্ধ্যার সময় সে পাগলকে বললে—দেহ এইবার আখি, কি বলিস?

—দেহ রাখবি?—পাগল চমকে উঠল।

—আর বাঁচব না। বেঁচেও লাভ নাই। দেখার লোভ তোর আছে, তু দেখ, নয়ন ভ'রে দেখ।

পাগল তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললে—মন খারাপ করিস না ভাই।

—মন খারাপ নয় পাগল, মন আমার পাষাণ হয়ে যেয়েছে। কথা তা নয়। আমার ডাক এসেছে। বুয়েচিস—বেশ বুঝতে পারছি। একলা থাকলেই অন্তর আমাকে বলছে—চল্।

—ও তোর মনের ভুল।

—উঁহু!—ঘাড় নাড়লে বনওয়ারী।—আজ আবার খানিক জ্বর হয়েছে।

বনওয়ারী কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠল পাগল।

বনওয়ারীর বললে—আমার একটি সাধ ছিল পাগল, অ্যানেক দিনের সাধ। কত জনকে জ্ঞানগঙ্গা নিয়ে গিয়েছি। মনে আছে তোর, কাঁদরা যেয়েছিলাম বিয়েতে, আটমঙ্গলায় বর-কনে পৌছিয়ে ফিরে আসছি—গাছতলায় এক বুড়ো বাবাজীর সাথে দেখা হয়েছিল?

—মনে আছে বইকি। মহাপুরুষ। মনে থাকবে না! দুপুরে ওদে গাছতলায় ঠেস দিয়ে ব'সে ছিলেন, গলা দিয়ে রজ বেরোয় না। তু জল দিলি। জোড় হাত ক'রে বললি—নীচ জাত জল দিয়েছি মুখে, আমার অপরাধ লেবেন না বাবা। বাবা বললেন—আমার নিজেরই জাত নাই বাবা, আমি জাতহারা বোষ্টম, বৈরাগী। মনে আছে বইকি।

আমি শুধালাম—এই দেহ নিয়ে পথে কেনে বেরিয়েছেন বাবা? বাবা বললেন—বাবা, দেহখানা আর বইছে না ব'লেই ওকে রাখতে চলেছি। মনে আছে? বললেন—অনেক দিন ও আমাকে বয়েছে বাবা, আমিও ওকে অনেক ভালবেসেছি। কত সাজিয়েছি, কত মাজ্জনা করেছি, ওর গরবে কত গরব করেছি, তাই যেখানে সেখানে ওকে ফেলে যেতে আমার মন সরছে না। চলেছি মা-গঙ্গার কূলে, জলে শোব, মাথাটি রাখব কূলে—প্রভুকে ডাকতে ডাকতে

চ'লে যাব, ওকে মা-গঙ্গার জলে দিয়ে যাব। মনে আছে? আমরা তখন ধরলাম— বাবা চলুন, এই পাল্কীতে আপনাকে বহন ক'রে নিয়ে যাব। বাবা হাসলেন।—চল, নিয়ে চল।

একটু চুপ ক'রে থেকে বনওয়ারী আবার বললে—জানিস, গঙ্গাতীরে বাবাকে আমি শুধিয়েছিলাম, তোরা ছিলি না কাছে, একা পেয়ে শুধালাম—বাবা, আপনার তো ওগ কিছু নাই, তা কি ক'রে বুঝছেন? বাবা বললেন—বাবা, মন বলছে আমার। এই রাতদুপুরে—। হ্যাঁ। তারপরে হেসে বললেন—বাবা, মন বাইরের মায়ায় ভুলে থাকে ব'লে ভিতরের খবর পায় না। মোটা কথা ধর না বাবা, চাষে যখন মেতে থাক, তখন ক্ষিধে বুঝতে পার না। খেতে মনে থাকে না। মন যদি বাইরের থেকে চোখ ফিরিয়ে আপনার ভিতরের মনের সঙ্গে কথা বলে, তবে সে ঠিক বলবে—ভাই, এইবার আমি যাব। তা আমার বাইরের নেশা ছুটেছে ভাই। আমি ভিতরের জনের কথা শুনতে পেছি রে। বলছে—আমি যাব।

পাগলের চোখ দিয়ে দরদরধারায় জল পড়ছিল। বনওয়ারী বললে—কাঁদিস না মিতে। জ্ঞানগঙ্গা কাহারের ভাগ্যে হবার নয়। তবে আমার মা-কোপাই তো অয়েছেন, আমি যখন বলব রে, তখন যেন কোপাইয়ের কূলে আমাকে তোরা দুজনে ধ'রে নিয়ে যাস। বুয়েচিস?

সে পাগলের হাত দুটি চেপে ধরলে।

পাগল বললে—যাব।

আর কাহারদিগে একবার খবর দিবি। যদি আসে, তো একবার দেখে যাব নয়ন ভ'রে।

সে হাসলে।

পাগল অনেকক্ষণ পর বললে—নটে গাছটি মুড়িয়ে গেল, হাঁসুলী বাঁকের কথা শেষ হয়ে গেল। হাঁসুলী বাঁকেরও শেষ হয়ে গেল।

বনওয়ারী ঘাড় নাড়লে—না।

না। বাকী আছে। কত্তা বলেছেন, কালরুদ্রের খেলা, হরির বিধান, বান

না এলে শেষ হবে না—হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। প্রলয়ঙ্কর বান। কোপাই হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় ক্ষ্যাপা কাহার-মেয়ের মত কোপাই ক্ষেপে উঠে হাঁসুলী বাঁককে শেষ ক'রে দিয়ে যাবে।

এল বান। তেমনি ক্ষ্যাপা বান। হুড় হুড়—দুড় দুড়—কল কল—খল খল শব্দে ভেসে উঠল—কোপাইয়ের দু কূল। সেই বাবাঠাকুর যেবার খড়ম পায়ে দিয়ে বন্যার জলের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন, তার চেয়েও বড় বান। প্রলয় বান। এবার কিন্তু কাহারেরা ডুবে মরল না। গাছেও চড়ল না। এবার তারা ছিল চন্ননপুরে। হাঁসুলী বাঁক বন্যায় ডুবে গেল। বাঁশবনের বেড় নির্মূল হওয়ায় কোপাইয়ের বান এবার শতগুণ বেগ নিয়ে ব'য়ে গেল কাহারপাড়ার উপর দিয়ে। ভূমিসাৎ ক'রে দিয়ে গেল গোটা কাহারপাড়া। একখানি ঘরও রইল না দাঁড়িয়ে। নীল বাঁধ পুরে গেল বালিতে। সায়েবডাঙার জমিগুলি পলিতে সোনা হয়ে উঠল। সায়েবদের কুঠি শেষ হয়ে গেল, চিহ্ন পর্যন্ত রইল না।

বন্যার কথা উপকথা নয়, ইতিহাসের কথা। ১৩৫০—ইংরিজী ১৯৪৩ সালের বন্যা। তের শো পঞ্চাশের যে বন্যায় রেল-লাইন ভেসে গেল, সেই বন্যা। ইতিহাসে আছে তার কথা। দামোদরের অজয়ের ময়ূরাক্ষীর কোপাইয়ের বন্যায় শুধু রেল-লাইনই ভাসে নি, হাঁসুলী বাঁকের মত অগণিত স্থানের উপকথার পটভূমি ভেসে গিয়েছে, পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ইতিহাস অবশ্য কর্তার বাণী, কালরুদ্রের খেলা, হরির বিধান মানে না। সে বলে—আকস্মিক, কাক-তালীয়। বলুক—সত্য যাই হোক, কাহারেরা একে সত্য ব'লেই মানে।

পাগল বলে—বনওয়ারী জানত। সে হেসেছিল কাটা বাঁশবেড়ের দিকে চেয়ে। তার সে হাসি আমি চোখে দেখতে পেছি।

বনওয়ারী প্রবল বন্যার আগেই দেহ রেখেছে। ঠিক যেমনটি তার সাধ ছিল, তেমনটি ক'রেই রেখেছে। মৃত্যুর তিন দিন আগে—কোপাইয়ের গর্ভে গিয়ে কুঁড়ে বেঁধে শয্যা পেতেছিল। গোটা কাহারপাড়াকে ডেকে, তাদের নয়ন

ভ'রে দেখে, হাসতে হাসতে দেহ রেখেছে সে। শুধু দেখা হয় নাই করালীর সঙ্গে। করালী—ডাকাবুকো করালী, সেই শুধু আসে নি। এল তার মৃত্যুর পর। বনওয়ারী আরও বলেছিল—ওই দহের ধারে আমাকে দাহ করিস। যেখানে কালো বউ দহের জলে পড়েছিল, যেখানে তার বড় বউকে দাহ করা হয়েছিল—সেইখানে। তাই হয়েছিল। সেই দাহের সময় সে এসে দাঁড়াল। নিয়ে এসেছিল পাকা শাল কাঠ আর ঘি। তাতেই চিতা সাজিয়ে বনওয়ারীকে চাপিয়ে তার পায়ের পরশ নিলে মাথায়। বললে—যাও, চ'লে যাও সগ্‌গে।

উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গেল।

কাহারেরা এখন নতুন মানুষ। পোশাকে-কথায়-বিশ্বাসে তারা অনেকটা পালটে গিয়েছে। মাটি ধুলো কাদার বদলে মাখে তেলকালি, লাঙল কাস্তের বদলে কারবার করে হাম্বর-শাবল-গাঁইতি নিয়ে। তবে চন্ননপুরে কারখানায় খেটেও তারা না খেয়ে মরে, রোগে মরে, সাপের কামড়ের বদলে কলে কেটে মরে, গাড়ি চাপা প'ড়ে মরে। কিন্তু তার জন্যে বাবা ঠাকুরকে ডাকে না। ইতিহাসের নদীতে নৌকা ভাসিয়ে তাদের তাকাতে হচ্ছে কম্পাসের দিকে—বাতাস-দেখার যন্ত্রটার দিকে।

তবু চন্ননপুরের পাকা ঘুপচি কোয়ার্টার্স থেকেও তাকায় বালিভরা ওই হাঁসুলী বাঁকের দিকে। কিন্তু কি ক'রে ফিরে যাবে তারা, আগে পথ ধরবে কে?

হাঁসুলী বাঁক বসতিহীন হয়ে চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। বন্ধ্যা মেয়ের মত নতুন সন্তান-সন্ততির জন্য তপস্যা করছে। বন্যায় চাপানো বালির রাশি—হাঁসুলী বাঁকের সোনার মাটির উপর চেপে ধু-ধু করছে, সেখানে শুধু নসুবালাই যায়। নিত্যই যায়। তার না গেলে চলে না। সে যায় ওই বাঁকে গোবর কুড়াতে, কাঁকড়া মাছ ধরতে, কাঠ ভাঙতে। চারিদিক তাকিয়ে দেখে আর পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদে—মা জননী গো! ওগো আমার মা-জননী গো!

পাগল গান গায় গাঁয়ে গাঁয়ে, দোরে দোরে—ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে—

হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়!

পাগল গান গায়, ঢোলক বাজায়, তার সঙ্গে নসুবালা কাঁচা পাকা চুলের বেণীতে লাল ফিতে জড়িয়ে খোঁপা বেঁধে নূপুর পায়ে নাচে। ঘুঙুর পছন্দ করে না নসু।

পাগল আর ক্ষ্যাপায় না নসুকে। নসুও ক্ষ্যাপে না। হাসে। দুজনে মিলেছে সেই বনওয়ারীর ঘর থেকে।

পাগল গায়—

যে বাঁশেতে লাঠি হয় ভাই সেই বাঁশে হয় বাঁশি
বাঁশবাঁদির বাঁশগুলিরে তাই তো ভালবাসি।

নসু নাচতে নাচতেই গান ধরে—

বেলতলায় বাবাঠাকুর কাহার-কুলের পিতা
বাঁশবনেতে থাকত বাহন অজগরো চিতা
পরাণ-ভ্রমরে সে থাকত আগুলি,
(ও হায়) তারে দাহন ক'রে মারল করালী!
বাঁশের বেড়া বাঁশের ঝাঁপি তাহারই ভিতর
কাহার-কুলের পরাণ-ভ্রমর বেঁধেছিল ঘর।
বাঁশের বেড়ের ঝাঁপি শেষে ভাঙলে মিলিটারি—
কাহারেরা হায় রে বিধি হ'ল ভ্রমণকারী।
ঘর-ভোমরার মত তারা ঘুরিয়া বেড়ায়
দুখের কথা বলব কারে হায়!

পাগল গান ধরে—

জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই,
বিধাতা বুড়ার খেলা দেখে যা রে ভাই।

পাগল গানের মধ্যেই কাহারপাড়ার আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত সুচাঁদের হাঁসুলী বাঁকের উপকথাকে গান গেয়ে ব'লে যায়। সর্বাগ্রে বলে—

সৃষ্টিতত্ত্ব ; শেষে বলে সেই শেষ কথা—দুঃখই বা কিসের, চোখের জলই বা ফেলছ কেনে ? ভাঙা গড়া—এই হ'ল বিধাতা বুড়োর খেলা। একটা ভাঙে একটা গড়ে—এই চলছে আদিকাল থেকে। ছেলেরা যেমন বালি দিয়ে ঘর গড়ে আবার ভাঙে, মুখে বলে—হাতের সুখে গড়লাম, পায়ের সুখে ভাঙলাম, ঠিক তেমনি, ঠিক তেমনি, ঠিক তেমনি!

সুচাঁদও গাছতলায় ব'সে ব'লে যায় হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। শ্রোতারা কেউ শোনে গোড়াটা, কেউ মাঝখানটা, কেউ বা শেষটা। অর্থাৎ খানিকটা শোনে তারপর উঠে চ'লে যায়। বুড়ী আপনমনেই ব'লে যায়। গল্প শেষ ক'রে বলে—বাবা, ছেলেবেলায় শুনেছি, হিয়ের জিনিস যা—তা মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাঠিতে রাখলে পিঁপড়ে ধরে, হাতে রাখলে নখের দাগ বসে, ঘামের ছোপ লাগে। তাই হিয়েতে রেখেছি। হিয়ের জিনিস নিয়ে হিয়েতে যদি কেউ রাখত—তবে থাকত। তা তো কেউ নিলে না, রাখলে না। আমার সাথে সাথেই—এ উপকথার শেষ। তবে পার তো নিকে রেখো! আঃ—হাঁসুলী বাঁকও শেষ—আমিও শেষ, কথাও শেষ! আঃ—আঃ!

কিন্তু—। বলতে বলতে থেমে যায় সুচাঁদ। আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে। ভাবে, শেষ কি হয় ? কিছুর শেষ কি কখনও হয়েছে ? চন্দ সুয্যি যত কাল, তার পরেও তো শেষ নাই ; তার পরে আছেন যে মহাকাল। বাবা কালারুদ্দের চড়ক পাটার ঘোরা। সে ঘোরার শেষ নাই। আলো নাই অন্ধকার নাই তবু পাটা ঘোরার শেষ নাই। সেই ঘোরাতেই তো কখনও প্রলয় কখনও সৃষ্টি! আঁধারে সৃষ্টি ডোবে, আবার আলোতে ওঠে। তবে শেষ কি ক'রে হবে ? সে ভাবে।

হঠাৎ একদিন ছুটে এল নসুবালা। প্রায় বছর দুয়েক পর। বললে—ওলো দিদি দিদি লো! আমার নূপুর জোড়াটা দে লো! আমি নাচব।

দিদি তখন কথা শেষ ক'রে বলছে—সব শেষ লো—সব শেষ।

নসু হেসে ঢলে প'ড়ে ব'লে উঠল উচ্চ কণ্ঠে—না লো দিদি, শোন্! আমি কি দেখে এলাম শোন্। দেখে এলাম, বাঁশবাঁদির বাঁধের বেড়ে বালি ঠেলে

বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে! আর কি কচি কচি ঘাস! আর দেখে এলাম সেই ডাকাবুকোকে।

—বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে!

—হ্যাঁ।

—আর সেই ডাকাবুকোকে দেখে এলি? করালীকে?

—হ্যাঁ লো পিসী। লুকিয়ে একা গিয়েছে—গাঁইতি হাতে। বালি খুঁড়ছে। বালি খুঁড়ছে। বালি খুঁড়ছে আর কি খুঁজছে। খানিক খুঁজছে, আবার উঠছে, আবার খুঁড়ছে। শুধালাম—কি খুঁজিস? বললে—মাটি। ঘর করব আবার। নতুন কাহারপাড়া হবে। নতুন বাঁধ দেবে।

সুচাঁদ দু হাত তুলে সানন্দে বলে—আবার নতুন বাঁশের বেড়া উঠবে—

নসু বললে—না, বাঁশের বেড় দেবে না। এবার বালি মাটি স্তূপ্যাইগান ক'রে বাঁধ দেবে। দিয়ে, তার গায়ে শরবন লাগাবে। বাঁশের বেড়ে আঁধার হয়। সে আমাকে অনেক কথা বললে পিসী—অনেক কথা। এক ঘর কথা।

পাগল ঘাড় নাড়তে লাগল। তার মনে গান এসেছে। নতুন গান।

যে গড়ে ভাই সেই ভাঙে রে ভাই, যে ভাঙে ভাই সেই গড়ে;—
ভাঙা গড়ার কারখানাতে, তোরা, দেখে আয় রে উঁকি মেরে।"

নসু সঙ্গে সঙ্গে পায়ে নূপুর বেঁধে নাচতে লেগে গেল—

তাই ঘুনা ঘুন বাজে লো নাগরী
ননদিনীর শাসনে, পায়ের নূপুর থামিতে চায় না।
তাই ঘুনা-ঘুন—তাই ঘুনাঘুন!

হাঁসুলী বাঁকে করালী ফিরছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, বালি কাটছে, আর মাটি খুঁজছে। উপকথার কোপাইকে—ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে। নতুন হাঁসুলী বাঁক।

শেষ

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL